আধুনিক রাষ্ট্র

আর. এম. ম্যাকাইভার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আর. এম. ম্যাকআইভার

আধুনিক রাষ্ট্র

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আর. এম. ম্যাকআইভার

আধুনিক রাষ্ট্র

এমাজউদ্দীন আহমদ
অনূদিত
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৮৩
[ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭]

বাএ. ৮০৬

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি,
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
এ. কে. সাদী
টাইম প্রেস
৩৮১, মধুবাগ, ঢাকা

প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ ইদ্রিস

মূল্য : সাতাশ টাকা

ADHUNIK RASHTRA : *The Modern State* by R. M. Mac Iver; Bengali translation by Emajuddin Ahmed. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. First Edition 1977. Price : Tk. 27·00.

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

রাষ্ট্রের কোন চরম উৎকর্ষ নেই, নেই তার কোন পরম পরিণতি। সর্বাঙ্গসুন্দর, সার্থক ও পরিপূর্ণতার কোন আকৃতিও হ'তে পারে না। যাকে আমরা গণতন্ত্র বলি তা শুরু মাত্র, কোন সমাপ্তি নয়। রাষ্ট্র সামাজিক মানুষের এক হাতিয়ার বিশেষ। তাই তার নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করছে পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আদর্শ। যুগ যুগ ধরে যে অভিজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তাই রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করেছে। এ প্রক্রিয়া অনুধাবন করলে তাই আমরা সঠিক প্রকৃতি, তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ও তার সীমারেখা সম্পর্কেও জ্ঞাত হই। এ গ্রন্থটিতে তাই আমি চেয়েছি রাষ্ট্রের সঠিক এক চিত্র তুলে ধরতে—সামাজিক বিবর্তনে কিভাবে আধুনিক রাষ্ট্র প্রাণ পেল, অভিজ্ঞতার সূতিকা-গৃহে কিভাবে তা নির্দিষ্ট কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব পেল ও সুস্পষ্ট কোন্ কোন্ কল্যাণকর্মের ভার হাতে এল, কোন্ কোন্ দাবীকে পরিত্যাগ করে কোন্ কোন্ দাবীর সাথে সে একাত্মতা স্থাপন করল এবং বিশেষ করে তার ক্ষমতার আশীর্বাদকে ঘিরে যে ঝড়-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হয়েছে, যুগে যুগে সেসবকে ছাপিয়ে কিভাবে রাষ্ট্র আরও ব্যাপক ও নিশ্চিত ভিত্তির উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। আমি জানি আমার এ শ্রম সার্থক হ'লে—কৃতিত্বের দাবীদার হবেন মহান সে চিন্তানায়করা, মহান সে অগ্রপথিকের দল—যাঁরা সর্বকালে সর্বযুগে অন্তহীন এ লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের কাছে আমার ঋণ শোধ হবার নয়।

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, আর. এম. ম্যাকআইভার
১৯২৬ সন—এপ্রিল মাস

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ভূমিকা : রাষ্ট্র কি ? .. – ১
এক : সংঘরূপে রাষ্ট্র, ১
দুই : সার্বভৌমের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র, ৬
তিন : আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র, ১৪

প্রথম পর্যায় : রাষ্ট্রের উৎপত্তি

প্রথম অধ্যায় : রাষ্ট্রের উৎপত্তি ১৯
এক : পরিবার ও সামাজিক কাঠামো, ১৯
দুই : সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্র, ২৬
তিন : কর্তৃত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস, ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন সাম্রাজ্য ৪২
এক : সাম্রাজ্য গঠন, ৪২
দুই : দেশীয় শক্তি ও সামুদ্রিক শক্তি, ৫০

তৃতীয় অধ্যায় : নাগরিকত্বের বিকাশ ৫৮
এক : নগরের মর্মকথা, ৫৮
দুই : গ্রীসের রাজনীতি, ৬৩
তিন : সর্বাত্মক অংশীদারত্বের প্রতীকরূপে নগর, ৭১
চার : রোমের মহান কীর্তি, ৭৮
পাঁচ : গ্রীস ও রোমে আইনের বিবর্তন, ৮৬
ছয় : নগর ও সাম্রাজ্য, ৯৪

চতুর্থ অধ্যায় : মহাদেশীয় রাষ্ট্রের সংগঠন ১০১
এক : সামন্তবাদ, ১০১
দুই : জাতীয়তার তাৎপর্য, ১০৬
তিন : স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র, ১১৭

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ক্ষমতা ও কাজকারবার

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা ... ১৩১

এক: যে সব বিষয় শাসকের আওতার উর্ধ্বে, ১৩১
দুই: রাষ্ট্র ও অন্যান্য মহান সংঘ, ১৪৬
তিন: রাষ্ট্রের কার্যকলাপ, ১৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ কর্তৃত্বের অবস্থান ১৭২

এক: জনগণের ইচ্ছা, ১৭২
দুই: প্রতিনিধিত্ব ও দায়িত্ব, ১৭৯
তিন: কর্তৃত্ব ও বিপ্লব, ১৮৯

সপ্তম অধ্যায়ঃ শক্তি ও সার্বভৌম ... ১৯৬

এক: চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বলপ্রয়োগ, ১৯৬
দুই: বিশ্বশক্তিরূপে বিখ্যাত রাষ্ট্রচক্র, ২০৫
তিন: যুদ্ধের রাজনৈতিক বিবর্তন, ২১৪

অষ্টম অধ্যায়ঃ আইন ও শৃঙ্খলা ২২২

এক: আইনের প্রকৃতি, ২২২
দুই: আইনের প্রশাসন, ২৩৩
তিন: আইন ও রাষ্ট্র, ২৪২
চার: আন্তর্জাতিক আইন, ২৪৯

নবম অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ...২৫৯

এক: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, ২৫৯
দুই: রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবন:
অতীত দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ দর্শন, ২৭০

তৃতীয় পর্যায়ঃ সংগঠন ও বিলুপ্তি

দশম অধ্যায়ঃ সংগঠন ও বিলুপ্তি ২৮৫

এক: রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, ২৮৫
দুই: সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ২৯০

একাদশ অধ্যায়ঃ রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ ৩০৩

এক: ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক রাষ্ট্র, ৩০৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দুই : রাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ, ৩০৭
তিন : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ৩১৪

দ্বাদশ অধ্যায় : সরকারের ক্ষমতাভ্রান্তি ৩২৬

এক : ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, ৩২৬
দুই : সরকারের ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা, ৩৩৬
তিন : কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, ৩৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায় : দলীয় ব্যবস্থা ৩৫৫

এক : দলের বিবর্তন, ৩৫৫
দুই : দলীয় ব্যবস্থার বিন্যাস, ৩৬৪
তিন : বহু দলীয় ব্যবস্থা ও সরকারের কলাকৌশল, ৩৭৩

চতুর্থ পর্যায় : আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের বিবর্তন

চতুর্দশ অধ্যায় : আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের বিবর্তন ৩৮১

এক : সূচনা : সকল সমাজিক তত্ত্বের প্রাথমিক অসুবিধা, ৩৮১
দুই : ক্ষমতার প্রতীক রাষ্ট্র বনাম ন্যায়বিচারের প্রতীক রাষ্ট্র, ৩৮৪
তিন : চুক্তিবাদ ও রাষ্ট্র, ৩৯৫
চার : দুর্জ্ঞেয় সত্তা হিসেবে রাষ্ট্র, ৪০২

পঞ্চম পর্যায় : আধুনিককালের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

পঞ্চদশ অধ্যায় : আধুনিককালের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ৪১২

এক : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমূহবাদ, ৪১২
দুই : চরম সার্বভৌমত্বের প্রতি আক্রমণ, ৪২৩

ষোড়শ অধ্যায় : রাষ্ট্রের পুনর্ব্যাখ্যা ৪৩৫

এক : সম্প্রদায়ের একাংশ হ'ল রাষ্ট্র, ৪৩৫
দুই : সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত চিন্তা, ৪৪১
তিন : ঐক্য কোথায় অবস্থিত, ৪৪৪

www.nagorikpathagar.org

প্রথম পর্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

রাষ্ট্র কি ?

এক : সংঘ রূপে রাষ্ট্র

রাষ্ট্র কি—এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সমগ্র গ্রন্থে। সংবিধানের কাঠামো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শুধু চলে না, বরং জীবন্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার। কিন্তু ঘটনা প্রবাহের পূর্ণ অনুধাবন সম্ভব হয় এর কাজকর্মের আলোকে। এরই মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সচল হয় ও বেড়ে উঠে কিন্তু প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে এবং যেহেতু এ শব্দটির সাথে অনেক ভিন্নমুখী ধারণাও জড়িত হয়েছে, তাই এর কাজ চলা গোছের একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই দরকার।

এটা অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হবে যে, রাষ্ট্রের ন্যায় এক বিরাট ও সুস্পষ্ট সত্তার পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞা থাকতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত হলেও তা সত্যি। কোন কোন লেখক রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন এক শ্রেণী-সংগঠন রূপে যেখানে একটি শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব করে।[১] অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রকে মনে করেন এমন এক প্রতিষ্ঠান রূপে যা সকল শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠে গোটা সম্প্রদায়ের পক্ষে কাজ করে। কিন্তু কেউ আবার একে 'ক্ষমতা-চক্র' ব'লে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে, অনেকে রাষ্ট্রকে 'মঙ্গল-কেন্দ্র' ব'লেও অভিহিত করেছেন। এ ভিন্নমত থেকেই যে দ্বন্দ্বের সূচনা, তার ফলে আধুনিক কালের মহান রাষ্ট্রচিন্তানায়করা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন মেকিয়েভেলির নিকট থেকে, আর অন্য দল গ্রোসিয়াস বা অ্যালথুসিয়াসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

---

১. 'রাষ্ট্র' (*The State*) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় *Oppeimen* এভাবে বর্ণনা করেছেন। মার্কস্‌-তত্ত্বে এ সত্য বহু প্র এবং অন্য দলের অনেক লেখকও এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

বহু লেখক আবার একে পুরোপুরি একটা আইনগত সত্তা হিসেবে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অষ্টিনের প্রাচীন মত অনুসারে রাষ্ট্রকে বর্ণনা করেছেন শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক রূপে। অন্যেরা, আধুনিক ব্যবহারতত্ত্বের ভাষায়, রাষ্ট্রকে বর্ণনা করেছেন এক সম্প্রদায় হিসেবে যেখানে আইনানুসারে কাজ চলে।[২] অনেকে আবার রাষ্ট্রকে জাতি হিসেবে গণ্য করেন, কিন্তু কেউ কেউ জাতীয়তাকে প্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় বা অসত্য এক উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তার কাজকর্ম দূষিত হয়ে ওঠে। কোন কোন লেখক রাষ্ট্রকে পারস্পরিক নিশ্চয়তা বিধানকারী সমাজ হিসেবে মনে করেন, কিন্তু অনেকের মতে রাষ্ট্র হ'ল আমাদের সমগ্র জীবনের ঠাসবুনোনী। কেউ কেউ আবার একে 'প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকর এক প্রতিষ্ঠান'রূপে গণ্য করেন এবং মনে করেন যে, একদিন এক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবেই। কিন্তু অনেকের মতে রাষ্ট্র হ'ল এমন 'এক জগৎ যা অধ্যাত্মচেতনা আপন স্বরূপে' এর সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ রাষ্ট্রকে 'পৌর সভা' বা সমিতির পর্যায়ে নামিয়ে চিন্তা করেছেন, কিন্তু অনেকে আবার রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন করে দেখেছেন।

এটা ঠিক যে, রাষ্ট্র যেমন হওয়া উচিত বা রাষ্ট্রের কি কি কাজ করা উচিত—এ ধারণা আংশিকভাবে এ ধরনের মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাই আদর্শগত দিক নিয়ে যখনই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখনই বিপদের সম্মুখীন হই, কেননা ভবিষ্যতের কার্যক্রম যেমন আদর্শে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, তেমনি বর্তমানের ধারণাও রূপায়িত হয়। তা'ছাড়া, এটাও সত্য যে, রাষ্ট্রের বিবর্তন ও বর্তমান কালে এর ভিন্নমুখী প্রকৃতি যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ফলেও এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রের সাধারণ প্রকৃতির চেয়ে নির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হওয়া সহজ। কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এমনভাবে যা সকল রাষ্ট্রের বেলায় খাটে, এবং সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। রাষ্ট্রের মূল সূত্রটি খুঁজতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগির স্বচ্ছতায়, হেগেলের

---

২. ঐতিহাসিক ব্যবহারতত্ত্ব (*Historical Jurisprudence*) গ্রন্থে *Vinogradoff* এমনি এক সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মত অর্চনার মনোভাব নিয়ে নয়, স্পেন্সারের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়েও নয়।

প্রথমতঃ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। সামাজিক ঘটনাকে রাজনৈতিক ঘটনার সাথে এক করে দেখলে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র কোনটিরই সঠিক অনুধাবন সম্ভব হবে না। পরিবার, চার্চ বা সমিতির মত কতকগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা রাষ্ট্র থেকে জন্মলাভও করেনি বা কোনরূপ প্রেরণাও পায়নি। তেমনি রয়েছে প্রথা বা প্রতিযোগিতার মত কতকগুলো সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র কোনদিন সৃষ্টি করেনি। অবশ্য রাষ্ট্র তাদের সংরক্ষণ বা পরিবর্ধণ করতে পারে। ঠিক তেমনি রয়েছে বন্ধুত্ব বা ঈর্ষার ন্যায় কতকগুলো সমাজিক প্রবণতা যাদের ফলে সৃষ্টি হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। সেগুলোও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বস্তুতঃ রাষ্ট্র অবস্থান করে সমাজের মধ্যে যদিও তা সমাজের স্বরূপ নয়। রাষ্ট্র যা করে তার মধ্যেই এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের যথাযোগ্য এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এক কথায়, রাষ্ট্র সামাজিক মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। সামাজিক জীবনের উপর কতৃত্ব লাভ করে রাষ্ট্র স জ জ বনকে পোষণ অথবা শোষণ করে, সংযত অথবা মুক্ত করে, পূর্ণতা দান করে অথবা ধ্বংস করে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, যন্ত্র জীবন নয়।

সমাজের আদিম পর্যায়ে শিকারী, জেলে বা বৃক্ষমূল সংগ্রহকারী বা ফল কুড়ানোদেরও এক রকম সামাজিক সংগঠন ছিল, কিন্তু তারা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছুই জানত না, আজও কোন কোন এস্কিমো সম্প্রদায়ের মত সাদাসিধে লোকদের তেমন কোন রাজনৈতিক সংগঠন নেই। কিন্তু অন্যদিকে, শ্রেষ্ঠতম সভ্যতাগুলোর ক্ষমতার উদগ্র কামনার বিরুদ্ধে যে সুদীর্ঘ সংগ্রমে সংঘটিত হয়েছে, সে পটভূমিকায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত সত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তা রাষ্ট্রের আওতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে মুক্ত হয়েছে।

এ পার্থক্য একবার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আমরা বলব যে, হয় রাষ্ট্র হবে এক প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। না হয় হবে একটা সংঘ। এর তৃতীয় কোন বিকল্প নেই। যত রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সমাজের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র ব'লে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমরা

www.nagorikpathagar.org

এগুলোকে সম্প্রদায় ব'লে অভিহিত করব। সমাজে সচেতন ও সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল কর্মকেন্দ্র রয়েছে তাদেরকে বলব সংঘ। আর প্রতিষ্ঠান হ'ল ঐ সকল স্বীকৃত কর্মপন্থা যার মাধ্যমে সংঘ ও সম্প্রদায়গুলো নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করে। সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে অন্যত্র তার আলোচনা করেছি। এখানে এ ব্যাখ্যাই যথেষ্ট হবে যে, একটা সংঘ বলতে বুঝায় একদল লোক বা সদস্য যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা ক'রে সংঘবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় না। বরং কোন ব্যক্তিবর্গের কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতিকে বুঝায়। পরিবার ও বিবাহপ্রথা, চার্চ ও ধর্মোৎসব, পেশাদারী কোন সংঘ ও তার বিধিবিধানকে লক্ষ্য করলে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রদায় ও সংঘ প্রতিষ্ঠান রচনা ক'রে থাকে। প্রথা হ'ল সম্প্রদায়ের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এ বিষয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই, কেননা অনেক সময় একই শব্দ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সংঘের বেলায়ও খাটে। রাজনৈতিক দল, পরিবার, চার্চ, কোন বিভাগ, হাসপাতাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন আমরা কিছু বলি তখন সেগুলোকে সুসংগঠিত সম্প্রদায় হিসেবে না নিয়ে বরং সংগঠন হিসেবে গণ্য করি। তা'ছাড়া, প্রায়ই আমরা 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটি হাল্কাভাবে সংঘ অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

সামাজিক সম্বন্ধ-প্রকৃতির যে সংক্ষিপ্ত সার নিচে দেয়া হ'ল তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ

সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ	সম্প্রদায়সমূহ	উদাহরণ—দেশ, নগর, গ্রাম, জাতি, উপজাতি।
বিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ	সংঘসমূহ	উদাহরণ—পরিবার, চার্চ, রাজনৈতিক দল, শ্রেণী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতি বা প্রণালী প্রতিষ্ঠানসমূহ উদাহরণ—উত্তরাধিকার, দীক্ষা-দান, দলীয় সংগঠন, শ্রেণীভেদ, বাজার।

সংঘের মধ্যে বা সংঘের সভ্য হিসেবে কোন ব্যক্তি জীবনের মাত্র একাংশ ব্যয় করে। কিন্তু সম্প্রদায়ের চাকার মধ্যে এসে পড়ে সমগ্র ব্যক্তিজীবন—তা সে আওতা ছোটই হোক আর বড়ই হোক। অতীতে এক সময়ে সমগ্র ব্যক্তিজীবন পরিবারের আওতায় এসে পড়েছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে পরিবার আজকের যে পরিবারকে আমরা জানি তার অনুরূপ ছিল না। সে পরিবার ছিল বরং এক 'পরিবার-সম্প্রদায়' যার আওতায় এসে পড়েছিল রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক সামাজিক সম্বন্ধের সামগ্রিকতা। তেমনিভাবে এক সময়ে রাষ্ট্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ দাবী করেছিল, কিন্তু সে দাবী অবশ্য কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি, কেননা নিরঙ্কুশ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায় যে, রীতিনীতি, প্রথা-ঐতিহ্য ও সামাজিক কর্তৃত্ব সম্প্রদায়ের জীবন সংগঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু এগুলো রাষ্ট্র থেকে উদ্ভূত নয়, যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিমূল হ'ল রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য প্রভৃতি।

রাষ্ট্র একটা সম্প্রদায় নয়, এবং এর মধ্যে সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বিন্দুমাত্র নেই; তা'ছাড়া, নিঃসন্দেহে আমাদের এটা ঘোষণা করতে হবে যে, রাষ্ট্র- পরিবার বা চার্চের পদমর্যাদা সম্পন্ন একটা সংঘ মাত্র। রাষ্ট্রও ওদের মত বিশিষ্ট এক পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ সদস্য নিয়ে গঠিত। আর এর লক্ষ্যও সীমিত। রাষ্ট্রের সংগঠন আদৌ সামাজিক সংগঠন নয়। মানুষ যেসব লক্ষ্যের সন্ধানে ছুটে চলে তার সবগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। আবার রাষ্ট্র যে সকল পন্থায় তার লক্ষ্য অর্জন করে, সামাজিক মানুষ উদ্দেশ্য সাধনে তাদের কয়েকটি গ্রহণ করে মাত্র। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কর্ম পদ্ধতিরও ব্যবধান রয়েছে।

রাষ্ট্র তার কতকগুলো চরিত্র বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য সংঘ থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য এ কথা পরিবার বা চার্চের বেলায়ও খাটে। এ ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করতে হবে, কেননা যে কারণে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রাষ্ট্রের সংঘমূলক চরিত্র আজও প্রতিফলিত

www.nagorikpathagar.org

হয়নি তার ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাস করে তাদের সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত—তা তারা রাষ্ট্রের সদস্য হোক বা নাই হোক। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—রাষ্ট্র মানুষের সাধারণ ইচ্ছায় সচেতনভাবে সৃষ্টি কোন সংগঠনের উপর বা সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকে না। জন্মের দিক থেকে দেখলে আমরা আরও বলতে পারি যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বেও কতকগুলো 'রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান' ছিল। যখন রাষ্ট্র দিনের আলোয় পা বাড়াল তখন 'ক্ষমতার-যুক্তি' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে সংঘের উপরে আসন ক'রে দিল। তাই বলা যায় যে, বিদেশী রাষ্ট্র পদানত কোন দেশে রাষ্ট্র বর্তমান না থাকলেও 'রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান থাকে। আধুনিক বিশ্বে 'রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান-সমূহের' আওতা সংঘরূপী রাষ্ট্রের আওতার প্রায় সমপরিমাণ। এ রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করবার জন্য রয়েছে গণতন্ত্রের আদর্শ। এর ফলে আধিপত্যকারী ইচ্ছা যা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কর্তৃত্ব করেও সাধারণ ইচ্ছা বা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়—উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে দূর করে।

দুই ঃ সার্বভৌমের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র

রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘ থেকে স্বতন্ত্র করতে পারলে তবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এজন্য যা দরকার তা হ'ল—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা। রাষ্ট্রের কি নিজস্ব কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে? যদি থেকে থাকে তা'হলে সেগুলো আমাদের অনুসন্ধান-কাজে সাহায্য করবে। সুতরাং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দুটো বৃহৎ শক্তিকেন্দ্রের পরীক্ষা করে দেখা যাক। তাদের একটি হ'ল সার্বভৌম ক্ষমতা যা রাষ্ট্রের সরকার প্রয়োগ করে এবং অন্যটি হ'ল আইন যার বিধান অনুযায়ী সাবভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হয়।

সার্বভৌমের প্রকৃতি অনেক অহেতুক প্রহেলিকার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ যেন এক উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল দিয়ে ঘেরা, যার ইতিহাস প্রাচীনকালের উপজাতীয় শ্রদ্ধার সাথে সংযুক্ত। আদিম যুগে তাই ছিল নির্দেশদানের একমাত্র মঞ্জুরী স্বরূপ। শোনা গেছে যে, প্রথম চার্লস ও ষোড়শ-লুই-এর ফাঁসির কথা শুনে আকস্মিক আবেগে

www.nagorikpathagar.org

বহুলোক প্রাণত্যাগ করেছিল। যেমন করে সভ্যতা বিবর্জিত মানুষ তাদের দলপতি ও তার বিষয় সম্পদ সংক্রান্ত ধর্মীয় নিষেধ অজান্তে লংঘন ক'রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩] বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ বিধাতা প্রদত্ত অধিকারে রূপ লাভ করায় সার্বভৌম ক্ষমতার যাদু কালক্রমে আইনগত চরমাধিকারে রূপান্তরিত হয়। টালমাটাল রাজতন্ত্রের শিথিল হাত থেকে যখন সে গৌরবোজ্জ্বল উপাধি খ'সে পড়ে, তখন তা ব্যক্তির নিকট থেকে রাষ্ট্রের শিরোপায় শোভা পেতে লাগল। যে যাদুকরী উপাধি রাজকীয় বাস্তবতার গৌরব এনেছিল তা এখন রহস্যময় সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিল। দুর্যোগ ও সামাজিক বিপ্লবের দিনে যে চোখ ঝলসানো আলো সিংহাসনের চার পাশে প্রজ্বলিত ছিল তা প্রাচীন জ্যোতির্মণ্ডলকে ম্লান করে দিল, কেন না জ্যোতির্মণ্ডল তখনই দেখা যায় যখন জ্যোতির ছটা কমে আসে। কিন্তু নতুন সার্বভৌম গণ-মনের দৃঢ় প্রত্যয়ে ভর ক'রে বিমূর্তের আলো-আঁধারী রাজ্যের এক পাশে বাস করতে লাগল।

যদি আমরা রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি সংঘ হিসেবে ভাবি—যা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও অন্যান্য সংঘের মত একটা সংঘ মাত্র-তবে অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। তা-হলে সার্বভৌমের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অহেতুক প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটবে, এবং সার্বভৌম আইনগতভাবে বা কার্যতঃ জনসাধারণের নিকট না নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট বা সংসদ না রাজার নিকট অবস্থান করে সে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। রাষ্ট্রের মত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংঘের বিভিন্ন স্তরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে যে কোন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবে দেখি। এতে রয়েছে যৌথ কারবারের অংশীদারদের একটা সংস্থা যারা প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থরক্ষায় একমত। আমরা একে সংঘটির 'সাধারণ ইচ্ছা বলে বর্ণনা করতে পারি এবং তা রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছার অনেকটা অনুরূপ। এ ধরনের সাধারণ ইচ্ছা যে কোন সংঘের সাধারণ লক্ষ্যকে তুলে ধরতে' সমর্থন করতে ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। কিন্তু তা নীতি নির্ধারণে ও তার বাস্তবায়নে সক্ষম হয়

৩. ল্যাঙের (*Lang*) '*Magic and Religion*' গ্রন্থে ও ফ্রেজারের (*Frazer*) *Crolden Bough* গ্রন্থে এমনি অনেক উদাহরণ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

না। লক্ষ্য সম্বন্ধে একমত হ'লেও সকলে লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হতে পারে না। তাই অংশীদারগণকে এক পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন করতে হয়। অবশ্য এ নির্বাচনে বা পরিচালক মণ্ডলীর নীতি নির্ধারণ বিষয়েও সকলে একমত হয় না। এক প্রভাবশালী অংশ যা খুব জোর হয় সংখ্যাগুরু তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানে আমরা পাই নীতি-নির্ধারক ইচ্ছা যা উন্নত রাষ্ট্রে 'সার্বভৌম জনগণ' বা 'সার্বভৌম নির্বাচক মণ্ডলী' নামে পরিচিত। 'সাধারণ ইচ্ছা' থেকে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কেননা অখণ্ডতা ও ঐক্য সত্ত্বেও এ খুব জোর হয় সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা। সাধারণ ইচ্ছার সাধারণ লক্ষ্যের সাথে আংশিক বিরোধ থেকে এর জন্য।

আবার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা সংস্থা বা পরিচালক মণ্ডলীর প্রয়োজন রয়েছে, এর কাজ হবে প্রভাবশালী সদস্য বা সংখ্যাগুরু সদস্যবৃন্দের স্বীকৃতি বা সমর্থিত সীমারেখায় প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণ, বিকাশ সাধন ও তার বাস্তবায়ন করা। উল্লিখিত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পরিচালকমণ্ডলী স্বাধীনভাবে কাজ করে, অংশীদারগণ প্রধানতঃ নিয়োগের মাধ্যমেই তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নীতি নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারই হ'ল পরিচালক মণ্ডলী। এখানেও আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'সার্বভৌম সংসদ' ও রাজতন্ত্রে 'সার্বভৌম রাজা' কথাগুলোর মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতাকে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ সার্বভৌম প্রশস্ত 'গণইচ্ছা' থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে; কেননা সার্বভৌমকে যে নির্বাচণ করে বা গ্রহণ করে তা সাধারণ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। নাগরিকত্বের তাই হ'ল মর্মকথা। গ্রীন (Green) দেখিয়েছেন যে এ কথা যেমন স্বৈরতন্ত্রের বেলায় খাটে, তেমনি খাটে গণতন্ত্রের বেলায়ও।

সার্বভৌম ক্ষমতার নিম্নলিখিত বিভিন্ন স্তর আমরা দেখতে পাই।

(ক) সাধারণ ইচ্ছা

সাধারণ ইচ্ছাকে যতটুকু রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলা যায় তার থেকে বেশী বলা ভাল 'রাষ্ট্রের জন্য ইচ্ছা' কেননা এ হ'ল রাষ্ট্রকে চালু রাখার ইচ্ছা। আনুগত্য ও দেশপ্রেমের অনুভূতিতে এর প্রকাশ। এর প্রকাশ ঘটে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিবার আগ্রহে। এর প্রকাশ দেখি

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবার আগ্রহে, যদিও সে সিদ্ধান্ত অনেক সময় হয় ত্রুটিপূর্ণ। দেশের আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আমাদের আস্থাশীতলায় এর প্রকাশ ঘটে— তা আমাদের জন্য যে কোন পরিণতি ডেকে আনুক না কেন। দল ও মতের ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক ঐক্যের যে বন্ধন আমরা অনুভব করি যার চারদিক ঘিরে রচিত হয় একগুচ্ছ ঐতিহ্য ও অনুভূতি যা অনেকের নিকট স্থায়ী ও বহু মূল্যবান আধ্যাত্মিক সম্পদ তার মাধ্যমেও এর প্রকাশ ঘটে।

অবশ্য এটাও অনুধাবন করা দরকার যে এ ধরনের ইচ্ছা যা দৈনন্দিন ভাবলেশহীন জীবনের মধ্যে অর্ধেক ডুবে থাকে তা রাজনৈতিক আচরণের স্পষ্ট নীতি নয়। রুশোর (Rousseau) মতে যে সাধারণ ইচ্ছা সতত প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে নিয়োজিত এ হ'ল তার ঠিক উল্টো। এ হ'ল এর বাস্তব দিক যদিও তা অবিধিবদ্ধ। সার্বভৌম যতটুকু নাগরিকের ইচ্ছা তার থেকে বেশী হ'ল সে ব্যক্তির ইচ্ছা যে নাগরিক হবে—এ দু'য়ের মধ্যে যে তফাৎ তাই আমাদের টেনে নিয়ে যায় সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিমূলে। এ আলোচনার শেষদিকে এর সঠিক চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব। তবে এটা বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন অনেক লোক থাকে যারা রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছায় মোটেই অংশ গ্রহণ করে না। সাম্রাজ্যবাদী এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে বিপুল জনসংখ্যার নিকট সরকার এক বিজাতীয় সত্তা ছাড়া কিছুই নয়, বা সরকার তাদের ঊর্ধ্বে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল কিছু বা তার ক্ষমতা এমন গগনচুম্বী যে তার ইচ্ছার নিকট জনসাধারণ নিজেদের খেলার সামগ্রী ছাড়া কিছুই মনে করে না। তবে প্রথম কথা হ'ল—আইন ও কর্তৃত্বের আওতায় যারা বাস করে তাদের সবাই রাষ্ট্রের সদস্য নয়। যেমন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী সে প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়। অধীনস্থ প্রজা রাষ্ট্রের কোন অংগ নয়। দাসদের তো কথাই উঠে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—রাষ্ট্রের জন্য সাধারণ ইচ্ছার বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। রাষ্ট্রের দাবী-দাওয়া যাই থাক না কেন—রাষ্ট্র সামাজিক জীবনের রীতিনীতিকে সংরক্ষণ করে এবং তাই জনগণের নিকট থেকে সশ্রদ্ধ আনুগত্য লাভ করে। গণতান্ত্রিক যুগের পূর্বক্ষণে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ছিল মোটামুটি এমনি।

www.nagorikpathagar.org

(খ) চূড়ান্ত সার্বভৌম

সুতরাং যে ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে বা পরিচালনা করে আমরা সে ক্ষমতার নির্দেশ করব। সে বিষয়ে মোটা-মুটিভাবে একমত হওয়া যায় তা হ'ল রাষ্ট্রের ইচ্ছা। ত'াছাড়া, নীতির প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নে দ্বিমত থাকে। জনগণের ইচ্ছায় খুব কম সময়ই সকল জনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তো নয়ই, সম্ভবতঃ কোন ধরনের রাষ্ট্রেই কার্যকরী সরকার সকল নাগরিকের পছন্দ মত হয় না। খুব জোর দোদুল্যমান সংখ্যাগুরু ক্ষমতার সিংহাসনে আসীন থাকে। সে সংখ্যাগুরু বা কার্যকরী দল পরিবর্তিত হলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে সরকারের শক্তিবৃদ্ধি হয় বা তার পতন হয়। এর ফলে সরকারের নীতিও পরিবর্তিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার যুগ যুগ ধরে বহু তাত্ত্বিক যে 'এক ও অবিভাজ্য' গুণের আরোপ করেছেন এখানে তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এ সার্বভৌম হ'ল বাতাসের মত অস্থির ও প্রহেলিকাময়—হাজারো সচেতন ও অচেতন প্রভাবের ফলে ইচ্ছার চঞ্চল সাম্যাবস্থা। কিন্তু এভাবেই আসে নির্দেশনা যা বিকল্পের সতত প্রত্যা-খ্যানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের আড়ম্বরের তুলনায় অত্যন্ত অনিশ্চিত ও বেখাপ্পা মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নীতি হচ্ছে শুধুমাত্র সাময়িক অবস্থার ফসল মাত্র। এর গভীরে রয়েছে ইচ্ছার সুগভীর এক ঐক্যবোধ।

প্রত্যেক নীতি এবং কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত মূলতঃ বিতর্ক ও অনৈক্য থেকে জন্ম লাভ করে, কিন্তু প্রত্যেকটি যখন অতীতে মিলিয়ে যায়, যখন সমালোচনার মর্মকথায় সত্য পরিস্ফুট হয় বা পরিবর্ধিত হয় এবং যখন অভ্যাসবশে সর্বপ্রথম আপোষমূলক মনোভাব গড়ে উঠে পর-বর্তীকালে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় তখনই রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর ফলে ছোট খাট মত-পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে উঠে, এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সাময়িক ঘটনারাজি মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করলেও গভীরে থাকে রাজনৈতিক সচেতনতার সুস্থির প্রশান্তি।

(গ) সংসদীয় সার্বভৌম বা ব্যাপক অর্থে সরকার

কোন প্রতিনিধি স্থানীয় সংঘে যেমন পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তেমনি চূড়ান্ত সার্বভৌমের কাজকর্ম বা অপূর্ব

www.nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক পরিবেশে সার্বভৌমের সম্মতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জ্যোতিঃকেন্দ্র সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সার্বভৌমের স্পষ্ট প্রকাশ ও সুস্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। নিজ প্রকৃতিগুণে চূড়ান্ত সার্বভৌম নিজ আওতার মধ্যে সার্বজনীন আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকারী। সে আইন বিধিবদ্ধ হ'তে পারে, অবিধিবদ্ধও হতে পারে।

এর পর প্রণীত আইনকে কার্যকরী করতে ও কার্যকরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষ—যেমন শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যাদের মাধ্যমে আইন কার্যকরী করা হয়—বজায় রাখতে বলপ্রয়োগ করবার অধিকারীও সে সার্বভৌম ক্ষমতা। এ পরমাধিকার যে সংস্থা প্রয়োগ করে তাই হ'ল রাজনৈতিক সরকার। আমাদের সংজ্ঞায় অবশ্য সার্বভৌমের প্রকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে। এর মর্মকথা এতে প্রকাশিত হয়নি। এতে পরমাধিকারের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু ক্ষমতার মূলসূত্রের কোন সন্ধান নেই। আইনগত দিকটি হ'ল এর প্রকৃতি যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা খুব বিভ্রান্তিকর। কিন্তু ক্ষমতার সার কথা উপাধির তুলনায় অনেক হ্রস্ব। সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সংবিধান নির্দেশিত সীমারেখার পরও রয়েছে রাজনৈতিক আইনের চরিত্রগত সীমারেখা। তার পর রয়েছে চূড়ান্ত সার্বভৌমের সদাজাগ্রত সচেতনতা এবং সর্বোপরি ঐতিহ্যমালার চাপ যার পেছনে রয়েছে সাধারণ ইচ্ছা। ক্ষমতার মনস্তত্ব সরকারকে ঐ সকল সীমা লঙ্ঘনে প্ররোচিত করলেও বাঁচবার তাগিদে সরকার তা থেকে বিরত থাকে।

অজ্ঞ ও ঐতিহ্যমান্যকারী জাতির উপর সরকার স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু তা সম্ভব হয় তখনই যখন সরকার জনগণের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ফলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ এ ক্ষেত্রেও সীমিত হয়ে আসে। এ সকল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সরকার নিজেও 'এক ও অবিভাজ্য' নয়। সংখ্যাগুরু বা প্রভাবশালী অংশের যে অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের সাম্যাবস্থা এ ক্ষুদ্র চক্রের মধ্যেও কাজ করে তা আমরা চূড়ান্ত সার্বভৌমের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করেছি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভক্তিকরণ সরকারের বিভিন্ন অংশে একরকম স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে। তাই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার হয় ব্যাপক সার্বভৌমের নিয়মিত সমর্থন এবং এর উপরই নির্ভর করে সকল সরকার।

এ পর্যন্ত আমাদের যে আলোচনা হয়েছে তাতে আমরা সার্বভৌম—

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা মতবাদের সাথে 'একক' 'প্রভুত্বব্যঞ্জক' ও 'সার্বজনীন কর্তৃত্বের' যে আলোক রয়েছে তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি। রাজনৈতিক ঘটনার সাথে এমন আইনগত সংজ্ঞা খাপ খায় না। লিউইস (Lewis) তাঁর 'Use and Abuse of political Terms' গ্রন্থে বলেছেন যে, সার্বভৌমের হাতে রয়েছে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের জীবন, অধিকার ও কর্তব্যের পুরো কর্তৃত্ব। হবস্ (Hobbes), বেন্থাম (Benthem) ও অস্টিনের (Austin) মতবাদে বিশ্বাসী সকল চিন্তাবিদেরও ঐ একই মত। সার্বভৌমের মতবাদকে তাঁরা চরম পর্যায়ের 'প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা রাজনৈতিক জীবনের বাস্তবতায় যতটুকু খাপ খায় তার থেকে বেশী খাপ খায় কোন 'ভূমিদান আবাদ ক্ষেত্রে' বা প্রদর্শনীর জন্য কোন বন্য পশুর আখড়ায়। আমরা আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার স্তর অনেকটা অন্যান্য সংঘের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মত। শুধুমাত্র মান্য করা : বাধ্যকরণ ও শাস্তি-দানের মত কাজের মধ্যে আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার আসল রূপের পূর্ণ বিবরণ পাই না। এ ক্ষমতার সমর্থন রয়েছে অন্যত্র। ব্যবহারবিদগণ যেভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এ ক্ষমতা একদিনওটিকতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা হ'ল সাধারণ ইচ্ছার একটা গুণ যা লক্ষ্যের সমতায় সার্বজনীন। সার্বভৌম ক্ষমতা সমধর্মী কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে ও তাদেরকে জিইয়ে রাখে। বলপ্রয়োগ হ'ল তাদের অন্যতম এবং তাও গৌণ বৈশিষ্ট্যের একটিমাত্র।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলতেই হবে যে, বলপ্রয়োগ সার্বভৌমের মর্ম-কথা না হ'লেও নিশ্চয়ই তার বৈশিষ্ট্য ও নির্ণায়ক। এ ক্ষমতার গুণেই রাষ্ট্র হ'ল একমাত্র সংঘ যার অধিকারে রয়েছে বলপ্রয়োগের সর্বাধিকার। কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন এবং প্রবল প্রতাপ সর্বব্যাপী রাষ্ট্র যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন—তার মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গৌণ এবং রাষ্ট্র তা কৃপা করে অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে অর্পণ করে-ছেন। সে রাষ্ট্রের নিকট থেকে সনদ পেয়ে কর্তৃত্ব লাভ করেছে এবং তার অবস্থিতির মূলে রয়েছে অধিকার ও দায়িত্বের চুক্তি-বাদী মননশীলতা যা রাষ্ট্র স্বযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। এটা অবশ্য অন্যান্য সংঘের বেলায়ও খাটে। তাই এত অসম ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্বের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে কোন তুলনা চলে না। রাষ্ট্রের মহিমান্বিত প্রতাপের সাথে তেমন লঘু কর্তৃপক্ষের তুলনা কি ক'রে চলে ?

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে সম্পর্ক কি তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এবং বিশেষ করে আমাদের বিবেচনা করতে হবে—এ সংঘগুলোর কোন মৌলিক ও তেমন কোন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কর্মক্ষেত্র রয়েছে কি না। যদি আসলে তাদের তেমন কোন যোগ্যতা থেকে থাকে, রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া যদি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন মৌলিক নিয়ন্ত্রণ থাকে যা গভীর ভাবে জীবনের মূলকে নাড়া দেয় তবে অবশ্য আমাদেরকে রাষ্ট্রের সার্বজনীন প্রভুত্বের সেকেলে দাবী অস্বীকার করতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা অবশ্য এটা তুলে ধরতে পারি যে, অন্তত উন্নত রাষ্ট্রসমূহে বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না। মূলতঃ বৈধ ক্ষমতার বর্ম ধারণ করেছে আইন ও সংবিধান, সার্বভৌমত্ব নয়। এটা যেন এক যন্ত্র বা কর্মপদ্ধতি, কার্যালয় নয়। সরকার সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে তথা আইনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ক্ষমতা লাভ করে, আপন অধিকারে নয়। একজন শক্তিশালী লোককে অস্ত্রসজ্জিত করা যেমন অর্থহীন, আইনের আওতা ছাড়া সরকারের বলপ্রয়োগও তেমনি হাস্যাস্পদ। সুতরাং রাষ্ট্রের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হ'লে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে আইনের দিকে, সার্বভৌম ক্ষমতার দিকে নয়।

সরকারের নিছক আদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সার্বভৌমের কোন বৈশিষ্ট্য আছে একথা মনে করা ভুল। প্রজা হিসেবে নীরবে আদেশ পালন করবার জন্য কোন সংসদ কোন নির্দেশ জারী করতে পারে না। যে স্বৈরাচারী তার দায়িত্বহীন ইচ্ছার বশে মানুষকে পদানত করে সে অনেকটা এক জুলুমবাজ ছাত্রের মত যে নেহাত গায়ের জোরে তার সাথীদের দমিয়ে রাখে। এতে রাজনৈতিক সরকারের কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। যুগ যুগ ধরে জনগণ দারিদ্র্য ও কুসংস্কারে নিমগ্ন থেকে অজ্ঞতার কালো আঁধারে রাজা ও সরকারকে তাদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দিয়েছিল। তাই 'সার্বভৌম' শব্দের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পুতিগন্ধময় এক ধারণা। কিন্তু সে ধারণা সার্বভৌম-ক্ষমতা নীতির প্রয়োজনীয় অংশ নয়। বরং আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন যেভাবে ঘটেছে তাতে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি সম্বন্ধে এটা আমাদের বিভ্রান্তির

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করে। উন্নত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্বের সাথে আইনের সম্পর্ক রয়েছে, কেননা সরকার আইনকে কার্যকর করে। সে নিজেও আইন মান্য করে এবং সংবিধানের সীমারেখার মধ্যে সরকার আইকে পরিবর্তন করে ও প্রয়োজনবোধে নতুন আইনের সংযোজনও ঘটায়।

তিনঃ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র

প্রত্যেক সংঘের নিজস্ব আইন রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আকৃতি ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে রাজনৈতিক সার্বভৌম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিচালনার মত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে মূলতঃ স্বতন্ত্র নয়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইচ্ছার প্রয়োগই হ'ল সরকার। বৃহত্তর ঐক্যবোধে অবশ্য এরও সমর্থন রয়েছে। এ সত্য রাষ্ট্রের বেলায় যেমন খাটে, চার্চ বা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও তেমনি খাটে। কিন্তু রাজনৈতিক আইন হ'ল অনুপম—একক, আর এ অসাধারণত্বেই রয়েছে রাজনৈতিক সার্বভৌমের একক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক সংঘ আইন তৈরী করে, আর উন্নত রাষ্ট্রে সংঘের সদস্যগণ সে আইন মেনে চলে শুধুমাত্র সদস্য পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধা হারাবার ভয়ে। আমি যদি আমার ক্লাবের আইন অমান্য করি, তবে আমি আমার সুবিধা হারাই। ব্যস এ পর্যন্ত! ক্লাবটি এর নিয়মভঙ্গের জন্য আমাকে জরিমানা করতে পারে, কিন্তু আমি যদি সে সুবিধা পরিত্যাগ করতে রাজী থাকি তবে সে জরিমানাও আমাকে দিতে হয় না। আমি কোন অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় সংঘের আইনকে অনুমোদন না করলে ইচ্ছামত সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারি। তাদের আইনের সাথে চূড়ান্ত কোন শাস্তি জড়িত থাকে না। সংঘে পুনরায় যোগ দিতে বাধ্য সরকার বা পদত্যাগ থেকে বিরত করবার কোন ক্ষমতা এর নেই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পরিবারের দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য যদি আমার শাস্তি হয় তবে তা হয় রাষ্ট্রের জোরে। নির্ধারিত সমাজে বা উন্নত সমাজে একমাত্র রাষ্ট্রের আইনই হ'ল বাধ্যকরী। প্রয়োজন হ'লে একমাত্র সে আইনই আমাকে বাধ্য করে। যদি আমি কোন রাষ্ট্র পরিত্যাগ করি—অবশ্য তা অনেক সময়ই বে-আইনী—তবে আমাকে সে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের বাইরে চলে যেতে হবে এবং আপনা থেকেই অন্য রাষ্ট্রের আইনের আওতায় পদার্পণ করতে হবে। রাষ্ট্রের আইন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, এতে শাসক ও শাসিত—এ দুই-ই নিয়ন্ত্রিত হয়। আইন এ অর্থে সার্বজনীন যে, কোথাও

www.nagorikpathagar.org

এর কার্যকারিতা বন্ধ থাকে না। সমাজের প্রত্যেক এলাকায় রাজনৈতিক আইন হ'ল একটা সুদৃঢ় ও স্থায়ী কাঠামো।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে বিশিষ্ট পার্থক্যের এ হ'ল সুষ্ঠু ব্যাখ্যা, যাজক সমিতির মত অন্যান্য সংঘের জন্ম হয়, পতন হয় পুনর্গঠন হয়, মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে অতি সহজে যা রাষ্ট্রের বেলায় ভাবা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্র দ্বি-খণ্ডিত হ'লেও তা হয় ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের পর।[8] অবশ্য কখনও কখনও প্রচণ্ড বিপর্যয় সৃষ্টি না ক'রেও দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র সাময়িক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, যেমন সুইডেন ও নরওয়ের মৈত্রীবন্ধন বা বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মিলন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টার ফলে শুরু হয়েছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। সুতরাং তার রাজনৈতিক আইনের দুষ্পরিবর্তনীয়, অখণ্ড ও বলপ্রয়োগাত্মক কাঠামোর জন্য রাষ্ট্রের রয়েছে এক প্রকার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা যা তাকে অন্যান্য সংঘ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

যদি আমরা রাজনৈতিক আইনের প্রকৃতি আরও বিশ্লেষণ করি তবে দেখব যে, সার্বজনীনতা ও বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতার জন্য একে বহুমূল্য দিতে হয়। এ বিশ্বজনীনতার জন্য সাধারণ অবস্থা ও সকল প্রকার ব্যক্তি ও ঘটনার মোকাবেলা এর করতে হয়। ঘটনার জটিলতার জন্য নির্দিষ্ট-ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আইন তেমন খাপ খায় না। ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য আইনের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাদের প্রকৃতি অস্বাভাবিক। এজন্য অনেকে এগুলিকে আইনের-প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলেও আখ্যায়িত করেন। আইন রচিত হয় অতি বিস্তারিত এক পদ্ধতিতে। বিচার বিবেচনা ও আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে যে সূত্র রচিত হয় তারই স্পষ্ট প্রকাশ হ'ল আইন। প্রচলিত বিধিবিধানের জটিল কাঠামোতে সযত্নে আইন-সূত্রকে খাপ খাইয়ে এর প্রণয়ন হয়। এর বিশিষ্ট প্রকৃতি তথা আইন প্রণয়নের জটিল পদ্ধতির অর্থ হ'ল সরকারের বিশেষ কোন জরুরী সমস্যা

---

৪. এটাও বলা যায় যে, চার্চের মত কোন কোন সংঘের ধ্বংসের মুহূর্ত রাষ্ট্রের ন্যায় মারাত্মক দুর্যোগপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'রিফরমেশন'এর বিপ্লব, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয় যার ফলে চার্চ নিজেই রাষ্ট্রের সাথে এক হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

সমাধান নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতীক হিসাবে স্থায়িভাবে বেঁচে থাকা কতকগুলো আইন সীমিত সময়ের জন্য প্রণীত হয়, যেমন বার্ষিক আর্থিক বিবরণী। এ আইন প্রণীত হয় এক বছরের জন্য কিন্তু এদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। আইনের মহান বিধিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত এরা নয়। যাহোক বছর বছর এদের পুনরুজ্জীবন করতে হয় এবং বার্ষিক সংশোধন সাপেক্ষে তাদেরকে স্থায়ী ধরনের আইন বলেও গণ্য করা চলে। অন্য দিকে আইনের সর্বাধিক অংশ প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হয়।

আইনের এ সাধারণত্বের জন্য একে শৃঙ্খলার কাঠামো বলা যেতে পারে। কোন কোন বিচারালয় আইনের ব্যাখ্যা দান করে এবং সর্বোপরি আইনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া, আইন নির্ধারিত সীমারেখায় শাস্তির বিধান দেয় ও খেসারতের পরিমাপ করে। কিন্তু এসব আপোষ রক্ষা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু বিচারালয়ের সাহায্য সত্ত্বেও আইন বিরাট এক কাঠামো ছাড়া কিছুই নয়, এবং এর কাজ হ'ল মানুষের অযুত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করা। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনধর্মী কাজগুলোর গতি প্রকৃতি আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রাষ্ট্রের মৌলিক অস্ত্র আইন এত বেশী সাধারণ, এত বেশী হিজিবিজি, এত বেশী আচারনিষ্ঠ যে তা চরিত্র বা গূঢ় কাজকর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যান্য সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন মিটায়।

রাষ্ট্রের সেবা তখনই হয় সর্বোৎকৃষ্ট, যখন তা স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার এক সুষম পরিবেশ সৃষ্টি করে যে পরিবেশে অন্যান্য সংঘ গড়ে ওঠে আর তারা আরও হৃদ্যতাপূর্ণ ও বিশিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে। পরিবার বা চার্চ বা ট্রেড ইউনিয়ন বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে উদ্দেশ্য সাধন করে সম্ভবতঃ রাষ্ট্র তা পূরণ করতে পারে না। এদের যে কোনটির কাজকর্মে রাষ্ট্রের অনধিকার চর্চা ইতিহাসে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যখন বিপ্লবী ফরাসী সরকার ঘোষণা করেছিল যে— 'একই রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সব ধরনের পৌরনিগমের অবলুপ্তিই হবে ফরাসী সংবিধানের মৌলভিত্তি'—তখন সে ঘোষণায় এক নীতিবাদী স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হয়েছিল যা কোন রাষ্ট্রই বাস্তবায়িত করতে অক্ষম।

আইনের সার্বজনীন ও নিয়মনিষ্ঠ প্রকৃতি অন্য আর এক দিক দিয়েও

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করে। প্রকৃতিগত দিক থেকে দেখলে যে সকল বিষয় বিশ্বজনীন, আইনের আওতাও সে সকল ক্ষেত্রে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—রাষ্ট্রের পক্ষে তার নাগরিকদের বিশেষ একটি ধর্ম আচরণে সমর্থন করা, বিশেষ করে কোন ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের একাত্মতা প্রকাশ করা সামঞ্জস্যহীন। এমন অনেক বিষয় আছে যাতে অংশ গ্রহণ করে নাগরিক গোষ্ঠীর একাংশ মাত্র। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিচিত্রতর, এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির ফলে মানবিক লক্ষ্য ও আদর্শ অধিক পরিমাণে ভিন্নমুখী হয়ে ওঠে ও বিচিত্র রূপ ধারণ করে। এ সব কারণে রাষ্ট্র স্বীয় সংগঠনের মধ্যে এদের সাথে আপোষ করতে অক্ষম। সমকালীন রাজনৈতিক সচেতনতায় জনগণের স্বার্থ হিসেবে যা চিহ্নিত, রাষ্ট্রকে তারই প্রতিধ্বনি করতে হবে। সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত দ্বারাই নিঃসন্দেহে ঠিক করতে হবে সাধারণ স্বার্থ কি, এবং ফলে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বিশিষ্ট প্রভাবশালী স্বার্থদ্বারা তাও বিকৃত হতে পারে; কিন্তু নীতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এখন খুব পরিষ্কার যে, নির্দিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ স্বার্থগুলো বিশেষ বিশেষ সংঘের আওতাভুক্ত, রাষ্ট্রের নয়।

রাষ্ট্রের আয়তন যত বড় হয় তার আইনগুলোও হয় তেমনি ব্যাপক। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নগর বা কাউন্টি সরকার স্থানীয় বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে। কেননা, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তা পরিচালনা করতে পারে না; অন্যদিকে, কোন শুভক্ষণে যদি বিশ্বরাষ্ট্র দিনের আলো দেখে, তবে তার কাজ হবে বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করা। বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক আইন সে আদর্শের প্রাথমিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্রতম প্রান্তেই হোক আর রাষ্ট্রের বৃহত্তম ক্ষেত্রেই হোক—রাজনৈতিক আইনের প্রকৃতি একই। স্বার্থের বিভিন্নতা ও ব্যবধানের মূল কেন্দ্র অঞ্চল নয়। একটি-মাত্র অঞ্চলে—তাই বা কেন—একটি মাত্র ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বব্যাপী স্বার্থের বৃহত্তর ক্ষেত্র অস্ফুট থাকতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক আইন ক্ষুদ্র কেন্দ্রেই হোক আর বৃহৎ ক্ষেত্রেই হোক—তার সার্বজনীন প্রকৃতি সংরক্ষণ করে চলে। তাই গ্রামাঞ্চলই বল, আর বিশ্বরাষ্ট্রই বল—সর্বত্রই রয়েছে অন্যান্য সংঘের প্রয়োজন, যেখানে সাধারণ শৃঙ্খলার ভিত্তিতে মানব মনের হাজারো সুর ঝংকৃত হ'তে পারে।

শুধুমাত্র সার্বজনীনতাই নয়, বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতাও রাষ্ট্রীয় আইনের

২—

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগকে সীমিত করেছে। আইন মেনে চলার প্রবণতার মূল হ'ল সাগ্রহ ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়। তা যাই হোক—আইন অবশ্য পালনীয়, সুতরাং আইন সমাজের বাহ্যিক দিকের নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। চরিত্রের বাহ্যিক দিকের উপর আইনের অনমনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। তাই গ্রীন সত্যি বলেছেন—"সমাজের নৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হ'ল যে কাজ করা উচিত বা যা থেকে বিরত থাকা উচিত, তা করা বা না করা, তা সে যে কোন মানসিকতা থেকে হোক না কেন"।[১] অন্যান্য সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমেও আইনকে সমর্থন করা প্রয়োজন; কিন্তু সে সকল প্রভাবের ভিত্তিমূলক হ'ল সম্প্রদায়, রাষ্ট্র নয়। আইন হল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয়। সমাজের মধ্যে আইনের আরও অনেক সমর্থন রয়েছে, যা অনেক বেশী কার্যক্ষম। প্রথা ও ঐতিহ্য মানুষকে তাদের নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে ধ'রে রাখে। কিন্তু বায়ু যেভাবে পানির উপরিভাগকে আন্দোলিত করে রীতি ও ফ্যাসান (Fashion) তেমনি ভাবে মানুষকে চালায়। তার ঊর্ধ্বে থাকে নৈতিক মূল্যবোধ, যা সংবেদনশীল ও সৃষ্টিধর্মী মনকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করতে পারে এবং বহু জটিল ও সমস্যা-সঙ্কুল মুহূর্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নৈতিক মূল্যবোধ সমগ্র জাতির হৃদয়কে বিপুলভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম।

সংঘ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হ'ল, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, রাষ্ট্রের গুরুত্ব হ্রাস করা নয়। এর সঠিক আওতা এত বিরাট আর এর কার্যকলাপের পরিধি এত বিস্তীর্ণ যে, কোন সীমা-রেখাই তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদাকে হ্রাস করতে পারে না। অপর-পক্ষে, রাষ্ট্র যে-পরিবেশে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারে, তারই প্রকাশ ঘটেছে এ পার্থক্য নির্দেশে। রাষ্ট্র যে কি, তারই শুধু যে সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে তাই নয়, এ পার্থক্যের ফলে আমরা জানতে পারি রাষ্ট্র কিরূপ হ'তে পারে।

অবশেষে আমরা আমাদের সংজ্ঞা নির্দেশে সক্ষম হয়েছি।

রাষ্ট্র হ'ল এমন এক সংঘ, যা সরকারের ঘোষিত আইন অনুসারে কাজ করে। সরকার আইন ঘোষণা করবার ও তা পালন করবার শক্তিধর। ঐ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্য ও সার্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে।

১। গ্রীনের '*Principles of Political Obligation* গ্রন্থের *Synopsis* (সংক্ষিপ্তসার) ১৫।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়
রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(এক) পরিবার ও সামাজিক কাঠামো

জন্ম কাহিনী সব সময়ই অস্পষ্ট। যে ঘটনা আমাদের আমলে ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে যার জন্ম হ'ল, তেমন ঘটনার জন্মকাহিনী যদি বর্ণনা করতে চেষ্টা করি—যেমন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বা এক নতুন ধর্মমতপ্রচার, বা একটা যুদ্ধবিগ্রহ, কি একটা বিপ্লব—তবুও আমরা কখনও তার উৎসমূলে পেঁৗছতে পারি না। কোন নদীর উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়লে অবশেষে আমরা পৌঁছি দুর্গম জলাভূমিতে আর অপ্রকাশ্য জলাশয়ে; কিন্তু কোনদিন আমরা স্বচ্ছ ঝরনায় পৌঁছুতে পারি না। সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে এ সত্য হ'লে, অজ্ঞাত ও দূর-অতীতে সংঘটিত কোন সামাজিক ঘটনার জন্মবৃত্তান্ত আঁচ করা যে কত কঠিন, ভেবে দেখুন। এখানে কিন্তু তেমন কাজে হাত দিতে আমরা চাই না। আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হ'ল, রাষ্ট্রের ন্যায় বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি অনুধাবন করা। আমরা এর প্রাচীনতম আকৃতির কিছু কিছু ধারণা রাখি এবং যে-সমাজে এ রূপের সন্ধান এখনও মেলে, তাও আমাদের জানা আছে। এ থেকেই আমরা রাষ্ট্রের মৌলপ্রকৃতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট হ'লেও কিছু কিছু আলো পেতে পারব। রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ কিভাবে চলত, তা যদি জানতে পারি, যদি জানতে পারি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আরম্ভ থেকে আজকের বিপুল প্রতাপের দিনে রাষ্ট্র কিভাবে ও কেন বৃদ্ধি পেল, তবে আমরা অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি, যে-বিভ্রান্তি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

যে স্তরে মানুষ আত্মীয়তা বন্ধনের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে আত্মীয় বর্গ, গোষ্ঠী বা পরিবারের মিলিত একক আত্মীয়তাভিত্তিক সমাজ ও উপজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজবদ্ধ রয়েছে, রাষ্ট্রের অনুশীলন ক্ষেত্রে আমরা সে স্তরের নীচে নামতে চেষ্টা করব না। গুহাবাসী ও অন্যান্য প্রাক-ঐতিহাসিক মানবগোষ্ঠী প্রথমস্তর পার হয়ে যে-বৃহত্তর পারিবারিক ঐক্য অর্জন করে, আত্মীয়তাভিত্তিক এ সামাজিক এককগুলো তারই পরবর্তী পর্যায়। আদিম

www.nagorikpathagar.org

সমাজের বৈশিষ্ট্যই হ'ল এগুলো এবং সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়।[১] পারিবারিক জীবনের পূর্বে আত্মীয়তাভিত্তিক সামাজিক একক ছিল স্বাভাবিক জীবনের অংগস্বরূপ। এর অবশ্য কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। পশু, পক্ষী ও মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাজ ছিল পরিবার; কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তা-ও টিকতে পারে না। জৈবিক প্রয়োজনে এক পরিবারের যুবক-যুবতী অন্য পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে নতুন পরিবার গঠন করেছে। এভাবে দু'পরিবারের মিলনে নতুন পরিবার গঠিত হ'তে থাকে। রক্তের সম্পর্কের টানাপোড়েনে গঠিত আত্মীয়তাভিত্তিক সামাজিক একক একদিকে যেমন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সগোত্রতা স্বীকৃতির ফলে আত্মীয়তাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে এবং কালক্রমে তা সমাজের এক স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে।[২]

আদিম সমাজের আত্মীয়তাভিত্তিক মানবগোষ্ঠীর অন্যতম দৃষ্টান্তরূপ আমরা উত্তর-আমেরিকার ইরোকোয়স উপজাতির কথা বলতে পারি।[৩] এখানে সামাজিক কাঠামো মোটামুটি বিস্তারিত, যা সগোত্রতাভিত্তিক সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, এবং এক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই কিভাবে আত্মীয়তা বিস্তারলাভ করে রাজনৈতিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত তালিকার সাথে একটা বংশানুক্রমিক তালিকার তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথমটিতে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য উপাদানও প্রতিফলিত হয়েছে। একটি বংশানুক্রমিক তালিকায় থাকে শুধু রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক-আত্মীয়তা। এতে প্রকাশিত হয় বর্তমান কালের চারিদিকে ছড়ানো পারিবারিক একক ও ব্যক্তিদের কথা, যাদের মধ্যে বর্তমান থাকে বহুযুগের-বহুকালের সাধারণ উত্তরাধিকারের ঐক্য সূত্র। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোতে বর্তমান

---

১. গোলডেনওয়াইজার (*Goldenweiser*) তাঁর '*Early Civilisation*' গ্রন্থে বলেছেন যে, পরিবার ও স্থানীয় সংঘ প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার অংশ হ'লেও গোষ্ঠি ও উপজাতি শুধুমাত্র আদিম যুগেই বর্তমান ছিল। প্রাচীনতর ইতিহাসের ও প্রারম্ভিক যুগে এগুলোও ছিল অজ্ঞাত।

২. হার্টল্যাণ্ড (*Hartland*) তাঁর '*Kinship*' গ্রন্থে বলেছেন যে, সগোত্রতা হ'ল দৈহিক, কিন্তু আত্মীয়তা হচ্ছে সামাজিক।

৩. মরগানের (*Morgan*) '*The league of the Iroquois*' গ্রন্থে এর বিবরণ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কুইস উপজাতির আদিম সমাজের আত্মীয়তাভিত্তিকসম্পর্ক

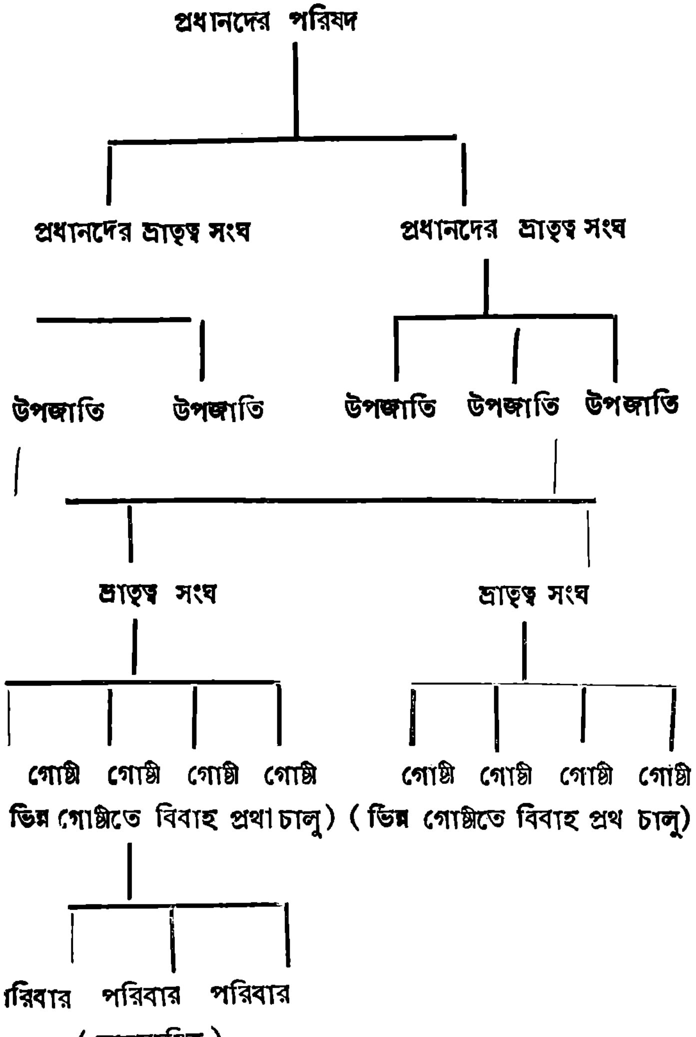

www.nagorikpathagar.org

কালের বহু পরিবার ও বহুব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে সম্মিলিত হয়। আত্মীয়তা-সম্পর্ক যেন একটা সময়-বন্ধনী আর রাজনৈতিক সম্পর্ক আঞ্চলিক বন্ধনী। কালের গতির সাথে সাথে মানুষকে তাদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এটা সমাজবিন্যাসের জন্য মোটেই প্রয়োজনীয় নয়, কেননা, জীবন-বৃক্ষ ডাল-পালা চারিদিকে বিস্তার করবার সাথে সাথে অতীতের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানের সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন থাকাই হ'ল অবশ্য প্রয়োজনীয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষিত হ'তে হবে এবং অবশেষে সামাজিক সম্পর্কে তা পরিশোধিত হ'তে হবে।

এ তালিকায় দু'টি আত্মীয়তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আমাদের নজরে পড়ে, যা ব্যাপক আত্মীয়-সংঘের মত সভ্যতার মিশে গেছে; প্রাচীন সমাজে সে-গুলো ছিল আত্ম-সংরক্ষণের বিশিষ্টসংঘ, ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহপ্রথা নিয়ে প্রচুর অনুসন্ধান চলেছে এবং একে কেন্দ্র করে অনেক অনুমান করাও হয়েছে। নিজেদের গোষ্ঠীতে বিবাহ নিষিদ্ধপ্রথা বা সাধারণভাবে বিশেষ-প্রথা দিয়ে চিহ্নিত গোষ্ঠীতে বিবাহ নিষিদ্ধপ্রথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এসব গোষ্ঠীতে নির্দেশ দেয়া থাকত যে, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে বা তার বাইরে বিবাহ চলতে পারে। আধুনিককালে প্রচলিত 'নিষিদ্ধপর্যায়ের তালিকার' যে-নীতি, তা আদিমযুগে এভাবে সভ্যতা বিবর্জিত মানুষদের দ্বারা কঠোরভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। যৌন প্রবৃত্তির কেন্দ্রবিমুখী গতির যে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন—ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সত্য। এটা গভীর জৈবিক প্রবণতার প্রকাশ হ'তে পারে, কিন্তু এর বিরাট সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। পরিবারের উর্ধ্বে সমাজের প্রাথমিক বিন্যাসের এই-ই হ'ল উৎস এবং উপজাতীয় কাঠামো সংরক্ষণেরও বৃহত্তম পন্থা।[১] যৌন প্রবৃত্তির বহির্মুখী গতির ফলে অনেক অসন্তোষ ও সংঘর্ষ সংঘটিত হ'তে পারে। এরও ইঙ্গিত মিলে আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নারী সংগ্রহের অভিযান ও নারী ধর্ষণের মধ্যে। এর স্থায়ী ফল হয়েছে আত্মীয়তার ভিত্তিতে বিস্তৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। এমন দুর্ধর্ষ প্রবৃত্তি ও সমাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এল এবং অন্যান্য আদিম প্রতিষ্ঠানগুলোর মত এখানেও কড়াকড়িভাবে চালু হ'ল গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহপ্রথা, আর যে সবক্ষেত্রে আন্তগোষ্ঠী-বিবাহ চালু থাকবে তারও নির্দিষ্টকরণ সম্পন্ন হ'ল।

---

১. স্মিথ ও ডেলের (*Smith and dale*) গ্রন্থ *'Iba speaking peoples of northern Rhodesia'* পৃষ্ঠা—২৮৩--৭,২৯২--৪।

www.nagorikpathagar.org

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হ'ল আর একটি আত্মীয়তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। সভ্যতার চাপে তার অবসান ঘটেছে। 'মাতৃতান্ত্রিক' ও 'মায়ের শাসন'—এ শব্দগুলো এ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। আদিম যুগের সামাজিক পরিবেশে 'মায়ের শাসন' বা 'নারীর শাসনের' কোন কথাই উঠতে পারে না। এ প্রতিষ্ঠানে 'মায়েদের অধিকার' কথাটি যেভাবে আরোপ করা হচ্ছে তাও সঙ্গত মনে হয় না, কেননা এতে নারীদের পদমর্যাদার যে ছবি তুলে ধরা হয় তখনকার অবস্থায় তার কোন নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

নারীদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন কিন্তু তা নয়, বরং বিশেষ যুগের যুক্তিই নারীর মাধ্যম বংশ পরিচয়ের প্রথা চালু করেছিল, এরই ফলে 'মাতৃতান্ত্রিক পরিবার' কথাটির অপপ্রয়োগ ঘটে, এর কারণ হ'ল---সে যুগে পিতৃত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বই ছিল নিশ্চিত প্রমাণ। এর সাথে এ স্থায়ী শর্তটি যুক্ত হয়েছিল যে, সন্তানের সাথে পিতার যে সম্বন্ধ তার চেয়ে গভীরতর ও হৃদয়গ্রাহী সম্বন্ধ হ'ল মায়ের সাথে।

কোন কোন সময় এ রীতির সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটি প্রথা। তা হ'ল বিয়ের পর বরকে স্বগৃহ ও স্বজন ছেড়ে যেতে হ'ত কনের পরিবারে। অনেক সময় দল প্রধান বা রাজা বিয়ের অধিকারে উচ্চপদ বা রাজত্ব লাভ করতেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর তা হারাতেন। কিন্তু এ সকল দৃষ্টান্তে যা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হ'ল—নারী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে নারী ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করে নাই।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, এ প্রতিষ্ঠান সমাজিক কাঠামো সংরক্ষণে ও এর বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান নারীকে, স্ত্রীকে এবং মার হাতে দিয়েছে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার বদলে সামাজিক মর্যাদা, পরিবারের সংযুক্তির ক্ষেত্রে পুরুষের 'স্বাভাবিক' প্রাধান্যের ভারসাম্য রক্ষা করেছে নারীর সমাজিক শ্রেষ্ঠত্ব। এ ভাবে নতুন পরিবারটি দু'ভাবে এর দু'উৎসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং বহির্মুখী যৌন প্রবণতা বিরোধী গোষ্ঠীর নর-নারীকে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত করে হৃদ্যতার মণিকোঠার গভীরে টেনে দিয়েছে। ফলে সমগ্র গোষ্ঠী গভীর এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে এবং পরিবার সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হবার পথ হয়েছে প্রশস্থ। বস্তুতঃ এক বৃহৎ সম্প্রদায় গঠিত হতে যা দরকার ছিল তা হ'ল মানুষের পারিবারিক অনুভূতি। কোন কোন বিষয়ে পরিবার মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সব-

www.nagorikpathagar.org

চেয়ে ঈর্ষাপরায়ণ ও স্বতন্ত্র হ'লেও এর একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে পরিবার উপজাতি বা জাতি থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেককালে বা পুরুষে[১] পরিবার বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেককালে বা পুরুষে পরিবারের সদস্যদের অন্য পরিবারের সাথে সংযুক্ত হ'তে হবে যাতে তার স্থায়িত্ব লোপ না পায় (বিয়ের মাধ্যমে)। সুতরাং পারিবারিক অনুভূতি যদি দ্বিতীয় পুরুষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে তবেই তো বৃহত্তর সমাজ গ'ড়ে উঠল। এ ভাবে অজ্ঞাতসারে পরিবার আত্মীয়তার সূত্রকে ছাপিয়ে ওঠে।

স্বল্প অথচ নিশ্চিত সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং শৃঙ্খলাবোধের আদিম বোঝাপড়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে এ ভাবে সৃজনধর্মী যৌন প্রবণতার কার্যকারিতায় সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে এক্ষেত্রে আর একটি উপাদানও উল্লেখযোগ্য। যৌন প্রবণতার নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ। যৌতুক, সংসার চালনা—ও তার জন্য প্রস্তুতির ব্যয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি যে, সম্পত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে যতটুকু সংশ্লিষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশী হ'ল পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট। আদিম পরিবেশে সম্পত্তির পারিবারিক স্বার্থ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আদিম জীবন ব্যবস্থায় সম্পত্তির মত খুব কম জিনিসই ছিল, যা পরিবারের উপভোগে আসত না। অন্য কথায়, বিলাসিতা বা ব্যক্তিগত উপভোগের সুযোগ ছিল খুবই কম। যোদ্ধার ধনুক ও বর্শা পশু-পালকের পশুদল, মাছ-শিকারীর ডোঙ্গা, কৃষকের জমির মত যা কিছু মূলধন ছিল তা স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক জীবন রক্ষায় ব্যয়িত হত। পরিবারের স্বার্থেই মোটামুটি ভাবে তা ব্যবহৃত হত এবং পরিবারের প্রধানই সব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করত। এখানে এটা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, সম্পত্তি অর্জনের প্রবণতা যৌন প্রবৃত্তি থেকে জন্মলাভ করেছে। আমাদের বক্তব্য হ'ল—প্রাচীন সমাজের পরিবেশে এ দুটি ছিল অনেকটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পারিবারিক জীবনেই সম্পত্তি উপভোগ করা হত। সম্পত্তির সমস্যা, এর নিশ্চিত মালিকানা ও সুশৃঙ্খল বন্টন পারিবারিক সংগঠন দ্বারাই মীমাংসা করা হত। প্রাথমিক যৌন আবেদনের চাঞ্চল্য ও ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে পরিবারের সমস্যা, তথা তার স্থায়িত্বের সমাধান এল সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী আকাঙ্খার সাথে যুক্ত হয়ে। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে

১. পুরুষ—উদাহরণ: তিন পুরুষ আগে, সাত পুরুষ ধ'রে—ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের সন্তান-সন্ততি সহযোগে নারী নিজেই সম্পত্তিরূপে গণ্য হত এবং নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও তার মঙ্গলামঙ্গল ও প্রতিপালনের জন্য সযত্ন ব্যবহার তার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে গেল। আদিমকালের পরিবেশে কেন, আজ পর্যন্ত, ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিহিসেবে অত্যন্ত দুর্বল।

'সাম্যবাদ' শব্দটি যা আদিমযুগের সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তা এক ভুল ধারণার অবতারণা করেছে—এটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। ঐ শব্দটি উৎপাদনক্ষম উপাদানের উপর, বিশেষ করে ভূমির উপর সাধারণ মালিকানার ধারণা জোরদার করে। কিন্তু আদিম জীবনের প্রয়োজনে পরিবার-চক্রে যা সাধারণ মালিকানায় থাকত তা হ'চ্ছে উপাভোগযোগ্য উৎপাদন—শ্রমের ফল। তা কিন্তু আমাদের যুগের মত শ্রমের ফলের অনেকটা অনুরূপ। পরিবারের প্রয়োজনে উৎপাদনক্ষম উপাদানসমূহ পরিবারের অধিকারে রাখা হ'ত। সুতরাং আমরা সাধারণ মালিকানার কথা আদৌ বল্‌লে তা পরিবারের ক্ষেত্রে খাটে, ব্যাপক অর্থে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খাটে না। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, রুশীয় মীরের (*Mir*) ন্যায় 'গ্রাম্য সম্প্রদায়' তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত সামাজিক সংগঠন এবং এটাও জানা গেছে যে, সে ব্যবস্থা সাম্যবাদী ব্যবস্থার মত ছিল না।[১] জমির ক্ষেত্রে গৃহস্বামীরা ছিল অংশীদার। এটা ছিল অনেকটা সমষ্টিগত ভূমিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং এতে পরিবার বা গৃহস্থের মালিকানা ও সম্পত্তির অধিকারের নিশ্চয়তাবিধান করা হ'ত। শুধুমাত্র পতিত জমি ও কোন কোন সময় মাঠ ছিল সত্যি সত্যিই সাধারণ মালিকানাধীন। পতিত জমি ছিল অনেকটা পানি ও সূর্যকিরণের মত ঐ শ্রেণীর জিনিস, অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাষায়, যার রয়েছে 'উপযোগিতা কিন্তু নেই কোন মূল্য'।

সামাজিক সংগঠনের মূলে যৌন আবেদন ও সম্পত্তির যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের দিকে দৃষ্টি দেই। পশুদের পোষ মানানোর প্রক্রিয়া তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। গোষ্ঠীপতি বা পরিবারের কর্তা মাথাপিছু সম্পদ হিসেব করে মূলধনের মালিকানা লাভ

---

১. বিলো (*Below*) তাঁর। *Probleme der wirtschaftges chichte,* গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। ক্রমবর্ধমান এ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরাধিকার, পোষমানানো জীব-জন্তু এবং ভূমি যার উপর সম্পদ উৎপন্ন হয়—সবকিছু নিশ্চয়ই আপনা থেকে ঘর জামাই প্রথার বিরুদ্ধে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্পত্তি বৃদ্ধির ফলে পুরুষদের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায় এবং এর সাথে সাথে আনুসঙ্গিক অন্যান্য কারণেও পিতৃত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লবের কারণ এখানে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি না। তবে সন্দেহাতীত এ সত্য নিয়েই আমরা ক্ষান্ত যে, মোটামুটিভাবে পশুপালন ব্যবস্থা স্থিতি লাভ করে ও কৃষিকাজ গড়ে ওঠে। এরই অবশ্য-ম্ভাবী ফল হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে উঠে।

যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেখা দিলে কুলপ্রথার গুরুত্ব বেড়ে যায়। পিতার নাম হয়ে ওঠে উত্তরাধীকারের প্রতীক এবং পৈতৃক নাম, যেমন পুত্র, ম্যাক, বিন, স্থায়ী উপাধিতে পরিণত হয়। গোষ্ঠী বা দল বৃহত্তর হয়ে উঠলে নামের যাদু আত্মীয়তাবোধকে আরও সুদৃঢ় করে। 'পুত্রত্বের' রক্ত-সম্পর্ক অজ্ঞাতসারে ব্যাপক ভ্রাতৃত্বের সামাজিক বন্ধনে রূপ নেয়। পিতার কর্তৃত্ব প্রধান বা মাতব্বরের কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। আত্মীয়তার নিগড়ে আর একবার নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যা তাতে আবার মিশে তাকে ব্যাপকতর করে তোলে। আত্মীয়তা সৃষ্টি করে সমাজ এবং সমাজ অবশেষে সৃষ্টি করে রাষ্ট্র।

(দুই ঃ) সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্র

প্রত্যেক সামাজিক বস্তুর তিনটি দিক রয়েছে যাদের মোটামুটিভাবে তুলনা করা চলে দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে। এগুলো হ'ল প্রত্যেকটি জীবন্ত জিনিসের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। পরিবারের 'দেহ' গড়ে ওঠে যৌন প্রবণতা, পিতৃত্ব ও সগোত্রতা দিয়ে। এর 'মন' বা 'অন্তরাত্মা গড়ে ওঠে অনুভূতি, প্রবণতা, ভয়, ক্ষুধা, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি দিয়ে যার ফলে এ বিষয়গুলো আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এর পারিপার্শ্বিকতা প্রাণ পায় আত্ম-রক্ষা, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সেবার কাজ-কর্মে। আরও কুশলী শব্দ প্রয়োগ করলে বলতে হয় যে, এ তিনে রয়েছে বস্তুগত, আত্মিক ও প্রতিষ্ঠানিক উপাদান যার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোন পরিপূর্ণ সামাজিক বস্তু। এতে বিভ্রান্তিও কমে আসে। পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও আমরা এর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। সান্নিধ্য, উপলব্ধি ও ব্যাপক আত্মী-

www.nagorikpathagar.org

য়তার মধ্যে রয়েছে এর বস্তুগত উপাদান, 'ভ্রাতৃত্ববোধ' 'আনুগত্য' সাধারণ ঐতিহ্য ও সাধারণ নিয়তি অনুধাবনে রয়েছে এর আত্মিক উপাদান এবং প্রথা যা এর সদস্যদের কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে ও গভীরভাবে সকলকে প্রভাবিত করে তাই হ'ল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানিক উপাদান।

সমাজিক এক বিরাট সৌধস্বরূপ যে রাষ্ট্র—সম্প্রদায়ের মত তারও রয়েছে ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এর বস্তুগত দিক, বিভিন্নভাবে প্রকাশিত নাগরিকত্বের ধারণা যা থেকে জন্ম লাভ করে জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ রূপ—তাই হ'ল এর আত্মিক দিক এবং রাজনৈতিক সার্বভৌম ও আইনের মধ্যে রয়েছে এর প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান। কিন্তু এতগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এ বিরাট রাজনৈতিক সৌধ অতি সহজে সম্প্রদায়ের সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। রাষ্ট্র প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজের আদিম জীবনের মধ্যে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা যদি দেখানো যায় তবে এ ভুল ধারণার নিরসন হবে।

আদিম সম্প্রদায়ের জীবন বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাষ্ট্রের ন্যায় মহা প্রতিষ্ঠানটির দুর্বল ও পরীক্ষামূলক সূচনা বুঝতে বেশ সাহায্য করে। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ সাধারণ বিবরণ দেয়া সম্ভব, কারণ পরিবারের বৈচিত্র্য ও জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও আদিম সমাজের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা সেলিগম্যানের (**Seligman**) সাথে ভেদা (**Veddah**) রাজ্য ভ্রমণে বেরোই বা নিউগিনির মেলানেশিয়ানদের (**Melanesians**) দর্শনেই যাই বা অষ্ট্রেলিয়ার উষর মরু অভ্যন্তরে স্পেনসার (**Spencer**) ও গিলেনকে (**gillen**) সঙ্গ দেই, অথবা যদি আফ্রিকার বুশমেনদের (**Bushmen**) এলাকা পরিদর্শন করি বা উত্তর-আমেরিকার ভারতীয় উপজাতিদের ন্যায় 'দক্ষ শিকারীদের' এলাকায় উঠে যাই—তবে সর্বত্র কতকগুলো সাধারণ সমাজ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যা প্রত্যেকটি উন্নত ও সভ্য জাতির বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্র। আদিমযুগের পরিবেশ, প্রয়োজন ক্লেশের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আদিম যুগের সে প্রকৃতি সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ এ আদিম সমাজগুলোর সব কয়টিই ছোট ও মোটামুটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ প্রয়োগ ও পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফলে নির্মম প্রয়োজনের বশেই বুঝি তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে চলেছে। রোগব্যধি, মহামারী ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে তেমন কোন

www.nagorikpathagar.org

প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় মৃত্যুর হার একদিকে যেমন বেশী, অন্যদিকে তেমনি শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা ও অন্যান্য হাজারো রকম যৌন-নিষেধ প্রথা চালু থাকায় জন্মহারও তেমন বেশী নয়। এক অর্থে, এ সব জনগোষ্ঠী বাস করত 'প্রকৃতির ক্রোড়ে'। তা অবশ্য সভ্যতার কুফল থেকে বাঁচবার পন্থা হিসেবে সুশিক্ষিত দার্শনিকদের নির্দেশিত পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের জীবনকে যা পূর্ণ করেছে ও তাদের চিন্তাধারাকে যা আন্দোলিত করেছে তা হচ্ছে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল চেহারা, তার অনিশ্চিত দান এবং তার রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ ক্ষমতা। তারা 'প্রকৃতির ক্রোড়ে' বাস করত, কেননা বন্যপ্রাণীর জীবন ও মানবজীবনের মধ্যে কোন বিস্তৃত কাঠামোর ব্যবধান ছিল না, বা প্রকৃতির আদিম নির্মম শক্তিকে প্রতিহত করবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'প্রকৃতির ক্রোড়ে' তারা বাস করত, কারণ প্রত্যেক পরিবারকে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করতে হ'ত পশু শিকার, মাছ ধরা, ফলমূল সংগ্রহ বা প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষিকাজের উপর। সুতরাং 'শ্রম-বিভাগ' ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। আর ছিল খুব অল্প লোক যারা দক্ষকর্মী হিসেবে ধনুক বা বর্শা, মাটির ডোঙ্গা বা নৌকা বানাতে পারত বা কৃষিকাজ করত অথবা ডাইনীর আক্রমণের চিকিৎসা করত। কোন সম্প্রদায়ে এমন লোকের সংখ্যা একজন বা দু'জনের বেশী ছিল না।

সভ্যতার উপাদান সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলেই আমরা এরূপ সম্প্রদায়ের চূড়ান্তরূপ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারি। কোন লিখিত বক্তব্য, শিক্ষার কলাকৌশল, বিজ্ঞানের প্রামাণ্য কোন লিপির অনুপস্থিতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকত মৌখিক ঐতিহ্য ও আচার আচরণে। যে ক্ষেত্র অভিজ্ঞতার দীক্ষায়, নিয়ন্ত্রিত হয় নি, সেখানে মানব মনের স্খলন হ'ত সর্বাধিক। রাত্রি ভরে থাকত প্রেতাত্মা ও কল্পিত দৈত্য দানবে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলো অস্পষ্ট ব্যক্তিগত ক্ষমতায় রূপ নিয়েছিল। মানুষ তাদের ভয় পেত, তাদের শান্ত করত এবং কখনও কখনও যাদুর সাহায্যে মানুষ তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাই তাদের মধ্যে ছিল বৃষ্টি নামিয়ে আনার রহস্যময় পদ্ধতির হোতা। ভূত-তাড়ানো ওঝা ও রোগসারানো বদ্যি। ফ্রেজার বলেছেন যে, মানুষ তাদের চিন্তাধারাকে প্রাকৃতিক বিধান বলে মনে করত এবং ফলে তারা বাস করত এক সংকীর্ণতম বিশ্বে, যার ঘটনাপ্রধান ক্ষুদ্র চক্রের বাইরে ছিল মাত্র কল্পিত রাজ্য। ভুলবোঝা প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর ভীতি মানুষের চিন্তাকে করেছিল প্রতিহত, পরাস্ত ও বিভ্রান্ত।

www.nagorikpathagar.org

যে সমাজে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার উপায়ের এত স্বল্পতা, যেখানে মানুষ একদিকে আশু প্রাণরক্ষার তাগিদে চিন্তাগ্রস্ত এবং অন্যদিকে যে সমাজ সাধারণ মনের অসংগত যুক্তি গ্রহণ করতে এত ব্যগ্র যে সমাজে আভ্যন্তরীণ পৃথকীকরণ বা প্রভেদ নির্ণয়ের সুযোগ খুব অল্পই থাকতে পারে যা উন্নত সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। সভ্য সমাজে একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য স্তরভেদ দেখা যায়। এর কারণ হ'ল সংগঠনের জটিলতা, সুযোগের অসমতা এবং জ্ঞান ও কাজ-কর্মের সূক্ষ্ম বিশেষত্বশীলতা। কিন্তু আদিম সম্প্রদায় অনেকখানি সমজাতীয়। এর সংস্কৃতি হ'ল একেবারে 'গণ-সংস্কৃতি'। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথা, রীতিনীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু যে কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স, নারী ও পুরুষের প্রভেদ ছাড়া জনগণের মধ্যে রয়েছে একই প্রথা, রীতিনীতি ও নৈতিকতা। এসব অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আদিম ও উন্নত সমাজের মধ্যে যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তফাত তাতে আমরা এসে পড়েছি। আদিম সমাজে 'প্রথাই হ'ল মানুষের রাজা'। প্রথাকে প্রায়ই অলিখিত আইন বলা হয়, কিন্তু একথা আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, রাজনৈতিক বিধি-বিধান থেকে প্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অজ্ঞাতসারে হ'লেও প্রথা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, এবং সম্প্রদায় একে সমর্থন করে ও কার্যকরী করে। প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক আদৌ সৃষ্টি হয় নি। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে প্রথাকে আইনে রূপান্তরিতকরণ, আদিম সমাজে মানুষের সম্পূর্ণ জীবনই হ'ল প্রথা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক কাজ করবার একটা সঠিক পন্থা আছে এবং সেটি হ'ল মাত্র একটি। শিকার করা, মাছ ধরা, ডোঙ্গা তৈরী করা, ফসল বোনা, চারা রোপণ করা ও ফসল কাটা, ব্যবসা করা ও যুদ্ধ করা, খাবার তৈরী ও অসুস্থকে সুস্থ করার কলাকৌশলের বাইরে আনুষ্ঠানিক কাজ চালাবার জন্য রয়েছে আর একটি জটিল পদ্ধতি যা আদিম মানুষের নিকট সমানভাবে প্রামাণ্য। ভোজ দেয়া ও ভালবাসারও নির্দেশিত পন্থা রয়েছে। কতকগুলো অধিকার আছে যা প্রতি মুহূর্তে প্রতিপালন করতে হবে। যৌবন ও জীবনের প্রতিটি সন্ধিস্থল শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃতি পায়। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর ন্যায় আদিম সত্যগুলোর আছে বিস্তারিত সমাজিক স্বীকৃতি। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো যথাযোগ্য আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এসব আচার অনুষ্ঠান কঠোরভাবে পালন করা হয়, এবং কোনক্রমে নিয়মভঙ্গ হ'লে

www.nagorikpathagar.org

অজানা ব্রহ্মাণ্ডের দেবরূপী ভয়াল শক্তি শাস্তি দিতেও উদ্যত হয়। সম্প্রদায় যদি প্রথাভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান করে তবে তা করে সামাজিক নীতির অবিভাবক, এ সকল দেবতাদের রোষ প্রকাশিত করবার জন্য। যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বেশী করা চলবে না, আর ধর্মীয় নিষেধ হ'ল প্রথার নিশ্চিত আনুসঙ্গিক।

সুতরাং এ অবস্থায় ব্যক্তিগত উৎসাহের তেমন কোন স্থান নেই। মানুষকে হতে হয় জাতির সাধারণ ছাঁচে ঢালা—নিয়মের অধীন। নির্ধারিত পথে মানুষ চলাফেরা করে। এর ফলে নির্দিষ্ট নমুনার সাথে তাল মেলে। জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তি স্ব-নির্দেশে চলে না। স্বাধীনতার জন্য না আছে তার ক্ষমতা না আছে সমর্থন। হাজারো পদলাঞ্ছিত সরু পথে সে চলে। ভিন্ন পথের বিপদকে আবিষ্কার করবার তার কোন সাহস নেই। সে সর্বদা থাকে তার সমাজের অনুগত। নৈতিকতা হ'ল প্রথার চরম পরিণতি। অবশ্য যে মহত্তর ও জটিলতর নৈতিক আইন প্রতিষ্ঠিত ধর্মবোধকে উপেক্ষা ক'রে কোন মূল্যবোধের প্রতি অনুগত হবার মানসিকতা সৃষ্টি করে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে যে একদিকে যেমন নৈতিকতার সঠিক আদর্শ বর্জিত, অন্যদিকে তেমনি আইনের প্রকৃত আদর্শ থেকেও বঞ্চিত। প্রথাভিত্তিক কাজ-কর্মই হ'ল সঠিক ও সমর্থিত কাজ-কর্ম। সভ্যজীবনে কিন্তু 'সমাজ-নিয়ন্ত্রণের' উর্দ্ধে ধর্ম যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে তা ছাড়াও ত্রিবিধ অনুমোদন মানুষের কার্যবিধিকে প্রভাবিত করে। যেমন আইনের প্রভাব, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ও 'অন্তরের আবেদন'। কিন্তু আদিম জীবনে তার সবকটিই সর্বপ্রাণী সম্প্রদায়-প্রথায় মিশে গেছে। ধর্ম ও ভীতিপ্রদ আর এক শ্রেণীর অভিভাবককে (দেবদেবী) আবাহন করে প্রথার দাবীকে জোরদার করেছে।

প্রগতিশীল সভ্যতার আলোকে সম্প্রদায়ের নৈতিকবোধের মারাত্মক দু'টি ত্রুটি ফুঠে ওঠে। একদিকে এর ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ পদদলিত হয়। অথচ এমনি ব্যক্তিগত উৎসাহ থেকে জন্মলাভ করে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো যার প্রতিফলন ঘটে তার গৌরবময় কাজ-কর্মের মধ্যে। অন্যদিকে তা সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করে ও তাকে বিকৃত করে। ''উপজাতীয় বিশেষণ যোগ করলে যেমন উপজাতীয় ঈশ্বর ধর্মবোধের বিপরীতধর্মী হয়ে ওঠে তেমনি ন্যায়নীতি ও সম্মানবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তা মানুষ হিসেবে মানুষের উপর প্রযোজ্য না হয়ে

www.nagorikpathagar.org

প্রযোজ্য হয় আত্মীয়-স্বজন বা জনগোষ্ঠির সদস্য মাত্র হিসেবে। যে কোন আদিম যুগের মানুষের মানসিকতা থেকে এ উভয় ত্রুটির দৃষ্টান্ত মেলে। বৃটিশ নিউগিনির, 'কয়টা (Koita) সম্প্রদায়ের লোকদের বিবরণ দিতে গিয়ে সেলিগম্যান বলেন: দায়িত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টার ধারণা ব্যক্তিগত নয়, বরং সাম্প্রদায়িক। কয়টা নীতিবোধ ব্যক্তিগত মুক্তি বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা শিক্ষা দেয় না বা প্রকাশ করে-না। বরং তা উপজাতীয় কর্মক্ষেত্রের বিরাট কেন্দ্রে ব্যক্তি ও তার অধীনতার মূলনীতি শিক্ষা দেয়। এর ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহের কোন অবকাশ থাকে না। সুতরাং, গণহত্যা বা চৌর্যবৃত্তিকে জঘন্য মনে করা হয় না যদি না তা সম্প্রদায় বা উপজাতির সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় বা বাইরের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে হয়, যারা এ উপজাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।''[১]

আমরা যদি এ আদিম নৈতিকতাকে নিম্নমানের বলি এবং বর্তমান সভ্যতার সম্প্রদায়গুলোর নৈতিকতা উচ্চমানের বলি, তবে তা সঠিক হবেনা; কেননা কখনও কখনও তাদের সততা ও সরলতার যে প্রকাশ আমরা দেখি তা আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া সে নীতিগুলো সমাজবন্ধনে কম কার্যকরী নয়। কারণ এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, সেগুলো সামাজিক বন্ধনসূত্র হিসেবে অত্যন্ত কার্যোপযোগী। কিন্তু সে নৈতিকতা সম্প্রদায়ের রীতিনীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হবার ফলে তাতে জনগোষ্ঠির হেলেমিই প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া, তার কোন আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও নির্দেশ নেই এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তা মোটেই উপযোগী নয়। এর ফলে ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে, না হয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে আদিম জীবনের সাথে এ ব্যবস্থার মিল রয়েছে। এর নিরোধ ক্ষমতা অস্তিত্বে মূল্য স্বরূপ। ফলে এ নৈতিকতা কোন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বা সচল সভ্যতার সংস্পর্শে এলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হতে পারে ভয়ানক। কোন বিদেশী সরকারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 'সংস্কার' এবং ধর্ম প্রচারকদের প্রচার- কার্য সামাজিক মৃত্যুর হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে।[২] আদিম সমাজের

১. সেলিগম্যানের (*Seligman*) *The Melanesians of British New Guines*, গ্রন্থে এর বিবরণ রয়েছে। পৃঃ ১৩১।

২. ম্যালিনোস্কির *Malinowski Argonauts of the westcvn Pacifie* গ্রন্থে এর আলোচনা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সংযোগ-ঐক্য আমাদের সমাজের ঐক্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অর্থে তেমন না হলেও নৈতিক জীবনের দৃকোণ থেকে এটা হল সাম্যবাদী সমাজ-এর ভোজন ও ধর্ম সংক্রান্ত উৎসব; এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, এর সঙ্গীত ও নৃত্য, এর ঐতিহ্য ও প্রথার সমষ্টি প্রত্যেক সদস্যকে সামাজিক নিরাপত্তার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখে।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা রাষ্ট্রের সূচনা সম্বন্ধে জানতে পারি। এ বিবরণে আমরা আমাদের এ বক্তব্যেরও সমর্থন পাই যে, রাষ্ট্র সমাজের সমকালীনও নয়, সমান ব্যাপকতাসম্পন্নও নয়। বরং বিশিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার দিক থেকে প্রাচীনকালের রাষ্ট্রগুলো ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তারা সম্প্রদায়ের আত্মিক লক্ষ্যগুলো মোটেই স্পর্শ করে নি, বরং সেগুলো সংরক্ষিত ছিল প্রথার নিরাপদ আবরণে। প্রতিরক্ষা ও বিজয়াভিযান এবং বিচারের প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রণয়ন ছাড়া রাষ্ট্র কতিপয় শাসনকারী প্রবল ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতা নিয়েই ছিল ব্যস্ত। সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কল্যাণে এর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাদের শাসকরা ছিলেন বীর্যপূর্ণ তেজস্বী ব্যক্তি বা দেব-চরিত্র বা বিজয়ী যোদ্ধা বা তাঁদের বংশধরগণ। আইন প্রণেতা হিসেবে তাঁরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন না, বরং তাঁরা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে কর্তৃত্ব করতেন। তাঁরা কোন বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করে কোন সামাজিক ব্যবস্থা খাড়া করতেন না, বরং রাষ্ট্রের ভেতরে বা বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করে কোন ব্যবস্থা চালু করতেন।

আইন তৈরী করবার বহু পূর্বে তারা প্রথাকে কার্যকরী করতেন। রাজার পূর্বেই এসেছিলেন বিচারকগণ।[১] বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেলে ও ভেতর বাহির থেকে প্রাচীন ব্যবস্থায় গোলমাল সৃষ্টি হলে নেতৃবর্গ প্রচলিত প্রথাগুলোর একাংশ নিয়ে এক বিধি-বিধান রচনা করেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জোরদার করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এগুলো অবশ্য বহু পরের অগ্রগতি, কেননা ততদিনে লেখার কৌশল বা পাথরে খোদাই করবার পদ্ধতি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। 'বার তালিকা' (**Twelve Tabls**) 'মুসার আইন' (**Moses code**) ও 'হাম্মুরবির

১. মেইন (*Maine*) তার *Ancient Law* গ্রন্থে দেখিয়েছেন—প্রথম অধ্যায়ে।

www.nagorikpathagar.org

আইন' (Code of Hammurabi) প্রভৃতি প্রকৃষ্ট উদাহরণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সত্যিকারের রাজনৈতিক আইন প্রতিষ্ঠায় তারা তখনও পর্যন্ত কত পশ্চাদপদ ছিলেন। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত: এধরণের আইন কোন একটি ঐশ্বরিক ক্ষমতা থেকে আইন প্রণেতাগণ পেয়ে থাকেন। হ্যামুরবি তা পেয়েছিলেন 'শামস' (Shamash) নামক ঈশ্বরের নিকট থেকে এবং মুসা পেয়েছিলেন 'জিহোভা'র (Jehovah)-নিকট থেকে। এঁরা দু'জনেই আনুষ্ঠানিক আইন, নৈতিকতা ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সত্যিকার অর্থে বিধিবদ্ধ আইনের ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য নির্ণয় করেন নি।

অতিরঞ্জিত না করে একথা সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন রাজন্য-বর্গ রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতেন না। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সুবিধাবাদী। ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে জনসাধারণের উপর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা রীতিমতো স্বেচ্ছাচার এবং খেয়ালীপনার পরিচয় দিতেন।

মিসরের উচ্চতর সভ্যতার প্রাচীন রাজন্যবর্গ যেমন থিনাইটি (Thinitae) প্রজাদের উপর জীবনমৃত্যুর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, ইচ্ছা মাফিক প্রজাদের সম্পত্তি ও নারীদের অধিকারে আনতে পারতেন এবং ঈশ্বরের অবতাররূপে শ্রদ্ধা লাভ করতেন। কিন্তু তাঁরা প্রজাদের জীবন নাশ করতে সক্ষম হ'লেও বা তাদের সম্পত্তি যে কোন অজুহাতে হস্তগত করতে পারলেও জনগণের আচার-অনুষ্ঠান বা জনগণের কোন প্রতিষ্ঠানের নাম বদলাতে সাহসী হতেন না কোনদিন।[১] রাজার গৌরবময় ক্ষমতার উর্দ্ধে ছিল আর এক কার্যকরী ক্ষমতা। তা ছিল এমন এক স্থায়িত্ব, যা তাঁদের বিশেষ অধিকারও পাল্টাতে পারত না। এটা হ'ল সমাজ

১। পশ্চিমাঞ্চলের গোত্রপ্রধান বা রাজন্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানিক রদ-বদলের জন্য পূর্বাঞ্চলের সমগোত্রীয়দের চেয়ে অধিক ক্ষমতা ধারণ করতেন। এ-ব্যাপারে বহু এ্যাংলো সাক্সন রাজাদের মধ্যে ক্যানিউট উল্লেখযোগ্য। এতে জানা যায় যে, পশ্চিমাঞ্চলের রাজন্যবৃন্দ পরিষদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন ; যেমন এ্যাংলো স্যাক্সনদের পরিষদ (*Witan*) ছিল। কিন্তু রাজন্যবর্গের নির্বাচন বা বহিষ্কারে পরিষদের ক্ষমতা কতটুকু ছিল, সে ব্যাপারে বিতর্ক থাকলেও (তুলনীয়, *Chadnick*-এর *Studies on Anglo—Saxon Institutions, P.P. 355—66*) রাজন্যবর্গের উপর তার মোটামুটি প্রভাব ছিল ; যার থেকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজন্যবর্গ মুক্ত ছিলেন—তুলনীয় *Meyer*-এর *Geschichte des Altertums, vol, i, Pt. II, Bk. i, Ch. iii.*

www.nagorikpathagar.org

শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত বিধি এবং এরই একাংশ সংরক্ষণ করতে ও তার বিকাশ সাধন করতে রাষ্ট্রের কাজের যৌক্তিকতাও এর সঠিক বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট।

যেখানে সমাজ বিদ্যমান, সেখানেই রয়েছে নেতৃত্বের প্রকাশ ও কর্তৃত্বের প্রয়োগ। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সর্বত্রই বিশেষ ক্ষমতা চক্রের জন্ম দেয়। এর প্রকাশ ঘটে একদিকে যেমন ফচকে ছোঁড়াদের সংগে, তেমনি অন্যদিকে কেবিনেট কমিটিতে। যেমন দেখা যায়, তস্করের দলে, তেমনি দেখি ধর্মযাজকদের সমিতিতে। কিন্তু এসব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে কেউ রাজনৈতিক আখ্যা দেবে না অথবা কোন বন্য উপজাতির মধ্যে 'প্রধান' বা 'মাতব্বরের' সন্ধান পেলেই তাকে আমরা রাষ্ট্র বলব না। কখন কোথায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু নেতৃত্ব আনুগত্যের সার্বজনীন প্রবণতায় রাষ্ট্র রয়েছে সুপ্ত। কর্তৃত্ব যখন সরকারে এবং প্রথা যখন আইনে রূপান্তরিত হয়েছে তখনই হয়েছে রাষ্ট্রের উদ্ভব।

সাধারণ লোক ও তাদের পরিবারের মধ্যে ঝগড়া করবার অধিকার গোষ্ঠী প্রধানের কাজের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়; এর ফলে একরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর নিরসনের জন্য তিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাধ্য হন। এর থেকেও যা স্বাভাবিক তা হ'ল শাস্তির মাধ্যমে লোকজনের স্বাধীনতা খর্ব করতে হত। এ প্রসঙ্গে ফৌজদারী আইনেই বিবর্তন ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'চোখের বদলে চোখ'—'দাঁতের বদলে দাঁত'—প্রতিশোধের এ প্রাচীন নিয়ম প্রাক্ রাজনৈতিক যুগেও প্রচলিত ছিল। ক্ষতিগ্রস্থ লোক বা তার দলবল এমনি ধরনের আদিম প্রতিশোধে সন্তোষ লাভ করত। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'প্রতিশোধের' ধারণা হ'ল নিছক ব্যক্তিগত। রাজনৈতিক ধারণা এটা নয়। "হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী শুধুমাত্র হত্যাকারীকে হত্যা করবে: যখন সে তার দেখা পাবে, তখন সে তাকে হত্যা করবে" (নুন—৩৫—১৯)। সর্বোপরি, এটা হ'ল আত্মীয় স্বজনদের কর্তব্য এবং প্রায়ই তা প্রায়শ্চিত্তকারী দেবতাদের ভয়াল চেহারার অবতারণার মাধ্যমে কার্যকরী হ'ত। ওরেস্টেসকে (Orestes) মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে তার মায়ের উপর। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, প্রতিহিংসা ব্যক্তির ব্যাপার রাষ্ট্রের নয়। এর পদ্ধতিও অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ঘটনায়

www.nagorikpathagar.org

এ বর্বর যুক্তির কঠোরতার দৃষ্টান্ত মিলবে। একটি বালক গাছে উঠেছিল এবং তার ছোট সঙ্গী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ গাছ থেকে বালকটি তার সঙ্গীর ঘাড়ে পড়ে যায়। এতে তার সঙ্গীর মৃত্যু হয়। বিচারের রায় হ'ল, বেচারা বালককে একইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার সঙ্গীর ভাই একইভাবে গাছে উঠতে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বালকটির মৃত্যু না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার ঘাড়ে পড়তে থাকবে।[১] প্রতিশোধ গ্রহণের অন্যান্য ঘটনায় জরিমানার ব্যবস্থাও দেখা যায় এ থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ে দেওয়ানী বিধি-বিধানের মত ক্ষতিপূরণের ধারণা এসেছে। চীনা সমাজের এ বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান ; কেননা এখনও অন্যায়কারীর পরিবারের নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব ঘটনায় অন্যায়ের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এখনও তুলে ধরা হয়নি।

কোন কোন অন্যায়ের সামাজিক গুরুত্বের জন্য সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ; তবে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু আচনের (Achon) কাহিনী এখানে তুলে ধরলেই চলবে। আচনের নাম ইস্রাইলকে উদ্বিগ্ন করে তুলল এবং ইস্রাইলের সকল অধিবাসী আচনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল। নিরাপত্তার জন্য তার পরিবারকেও শেষ করা হল (জসুয়া ৭—২৪ —৬)। এখানে অভিপ্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। এরূপ পাপের প্রত্যক্ষ কুফলকে বাদ দিলেও 'ঈশ্বরের ক্রোধ' থেকে সমাজকে রক্ষা করতে দোষীকে শাস্তি দেয়া হয়। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বটে ; কিন্তু রাষ্ট্র তখন পর্যন্ত 'উপায়' হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি।

এ পদ্ধতির কয়েকটি দিক যা সহজেই বোঝা যায়। পরিবারের কর্তার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব উপজাতীয় প্রধানের ক্ষমতার ক্ষেত্র রচনা করে। পরিবারের কর্তা যেমন স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। তেমনি প্রধান হলেন প্রথার অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। সে চক্রে তিনি পুরোহিত ও ঔষধ দাতাও। বয়োবৃদ্ধ মানুষদের খাপছাড়া বৈঠকগুলোও যেমন

১। পার্কিনস্ (*Parkyns*)-এর *Life in Abyssinia, ii, 236 apud* ওয়েস্টারমার্ক (*Westermark*)-এর *Origin and development of the Moral Ideas, I, ch. ix.*

www.nagorikpathagar.org

'প্রবীণদের পরিষদের' মর্যাদা লাভ করে থাকে ; তেমনি এসবও কালে বৃহৎ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করে এবং আংশিকভাবে তা প্রধানদের বা নেতাদের এক রকম অধিকারে পরিণত হয়। প্রথমে আইন তৈরীর কোন ধারণা ছিল না এবং ছিল না কোন সরকারী ব্যবস্থপনার ধারণা। তখন যা মূল্যবান ছিল তা হচ্ছে প্রচলিত সামাজিক নীতির প্রতিপালন, আচার-অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান। মেইন (**Main**) বেগহেট (**Bagehot**) ও অন্যান্য লেখকগণ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ যে আইন প্রণয়ন করা তা আদিম সম্প্রদায়গুলোর নিকট ছিল অজানা। 'প্রথাই ছিল মানুষের রাজা'। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মীয় নীতি। তাই দেখা যায়, মানব জীবনে মানুষের রচিত কোন আইনের স্থান ছিল না। প্রথা ও ধর্মভিত্তিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে। এর মাঝে যুক্ত হয়েছিল যাদুবিদ্যার অদ্ভুত কায়দা-কানুন ; যার ফলে অন্যায়ের শাস্তি বিধান হত আপনা আপনি যাদুকরের চৌকস কায়দার মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের ছিল শুধুমাত্র গুটিকতক শাসন বিভাগীয় কাজকর্ম। আজকের উন্নত রাষ্ট্রে ক্ষমতার যুক্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে তা বহু বিস্তৃত হয়েছে।

এ্যাংলো সেক্সন জনগোষ্ঠির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ পদ্ধতির আরও ব্যাপক গতি লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমতঃ, আদালতগুলো শুধু মাত্র সম্প্রদায় ভিত্তিক আইনই কাজে লাগাত এবং তাদের কোন শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ছিল না। পরিবারগুলো তখন প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মীমাংসা নিজেরাই করত। ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেড়েই গেল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, আত্মীয় গোষ্ঠির আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসহায়তাকারী স্বাতন্ত্র্য ততই হ্রাস পেতে লাগল। ব্যক্তিগত কোন্দল আইনগত পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে লাগল। নিহত ও হত্যাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং আত্মরক্ষাকারী জনসমষ্টি সরকারী ন্যায় বিচারের অংশ বিশেষরূপে এর সহায়তায় এগিয়ে আসতে লাগলো।[১]

১। পোলক ও মেটল্যাণ্ড (*Pollock and Maitland*)-এর *History of English Law, Vol. i.*

www.nagorikpathagar.org

প্রতিশোধ বা প্রতিদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা, ব্যায় বাহুল্য ও সীমাহীন সংঘর্ষ বৃদ্ধি যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার পথ প্রশস্ত করেছে। এর দৃষ্টান্ত মেলে আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো বা কর্সিকায় অনুষ্ঠিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বা আমেরিকার লিঞ্চিং মাধ্যমে নির্বিচার গণশাস্তিতে। প্রথমতঃ রাষ্ট্র শুধুমাত্র হস্তক্ষেপ করে ; সে হস্তক্ষেপ কিন্তু সমাজকে রক্ষা করতে নয়, এবং প্রথাকে সংরক্ষণ করতে শক্তিশালী অন্যায়কারী যেন নির্বিবাদে মুক্তি না পায় ; রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করে এবং লক্ষ্য করে যেন ক্ষমতাশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী ক্রোধে প্রতিহিংসার সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দানের কাজ হাতে নেয়। রাষ্ট্র তা করতে গিয়ে কালক্রমে অজ্ঞাতসারে শাস্তির রাজনৈতিক যৌক্তিকতার প্রবর্তন করে ; কেননা রাষ্ট্রের নিকট প্রতিশোধ গ্রহণ বা পরিশোধের কিই বা প্রয়োজন আছে। একজন আর একজনকে আঘাত করেছে বলে রাষ্ট্র তার আর একজন সদস্যকে আঘাত করবে, এতে কোন সন্তুষ্টি থাকতে পারে ; রাষ্ট্র তার সামগ্রিক আঘাতকে আরও জোরদার করবে কেন ? সামাজিক সংরক্ষণের ধারণা ও তার সাথে সাথে সংশোধন ও নিবারণের সদিচ্ছাই নিশ্চিতরূপে সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্ধন করেছে। ফলে শাস্তির প্রথা সামাজিক নির্বাসনে গিয়ে ঠেকে এক শাস্তিদানের রাজনৈতিক নীতি এর স্থান দখল করে। এ্যাংলো সেক্সন ইংলণ্ডে 'রাজার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব' এ-নীতি পরিবর্তনে সাহায্য করে ; এর ফলে শাস্তিদান রাষ্ট্রের অন্যতম কাজে রূপ নেয়। জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যক্তির নিরাপত্তা বোধের মাধ্যমে এর যৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যেন অভিপ্রায়ের রূপান্তর এবং এ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এখনও আসে নি। আজও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে নেহাত সীমিত ও ন্যায়ানুগ প্রতিশোধ গ্রহণের নামে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে এবং রাষ্ট্র উত্তরোত্তর নতুন নতুন ক্ষেত্র জয় করে চলছে।

তিন : কর্তৃত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস

সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ এ দু'টি হল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী ; অথচ সংমিশ্রিত অভিপ্রায়। রাষ্ট্র সংগঠনে এদের ভূমিকা হল অত্যন্ত গৌরবময়। এরাই যুগিয়েছে সর্বাধিক উৎসাহ। প্রথমটি ভেতর থেকে

www.nagorikpathagar.org

শাসকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে ; কেননা, তাঁদের কাজকর্ম ও কর্তৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকদের কথা তাঁদের ভাবতে হয়েছে। দ্বিতীয়টি দিয়েছে বাহির থেকে প্রেরণা। যখন দু'টি অভিপ্রায় একযোগে বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে, রাষ্ট্র তখনই পেয়েছে তার নিশ্চিত ভিত্তি ও দ্রুতবিকাশের পথ। শাস্তিদানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এই হল ইতিহাস ; কেননা, এ সূত্রেই গড়ে উঠেছে বিচার ব্যবস্থা, ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও প্রয়োগ করবার ক্ষমতাসম্পন্ন এক শাসন-বিভাগ ; ন্যায় বিচারের ধর্ম স্পষ্টতঃ সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, অথচ সাথে সাথে এই ছিল সামাজিক শৃঙ্খলার প্রকৃষ্ট হাতিয়ার। অভিপ্রায়ের এমনি এক সংমিশ্রনের ফলে সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল ; আর সে সাথে প্রবর্তিত হল যৌন সম্পর্কের সুনিয়ন্ত্রিত এক ব্যবস্থা ; কেননা এ সব ব্যাপারে মানবিক প্রকৃতি সাধারণতঃ সীমা লঙ্ঘন করে এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বহির্চক্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধবাহিনী প্রসঙ্গে ঐ দুই অভিপ্রায়ের কৌশলপূর্ণ সংযোগ ঘটেছে এমনকি কোথাও দেখা যায় না। এখানে নিরাপত্তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং এখানেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত প্রেরণা যুক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রেই জনগণের ক্ষমতা-রূপে চিহ্নিত হয়ে প্রধানের ক্ষমতার বিকাশ আছে পূর্ণরূপে। অন্যত্র শাসকের ক্ষমতার গৌরব প্রজাদের নগণ্যতর প্রতীক। কিন্তু ঐ একটি ক্ষেত্রে শাসক ও জনগণের ক্ষমতার গৌরব সমন্বিত হয়েছে এ ক্ষেত্রে জনগণ শাসকের সাথে মুক্তি ও নিরাপত্তার গৌরব অনুভূতি ও বিজয়ের মনোভাব এক সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এমনি সুদৃঢ় সংযোগ বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রকে প্রবল প্রতাপান্বিত এক সংস্থায় রূপান্তরিত করেছে। এর দায়িত্ব হল ভেতরে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বাইরে যুদ্ধ পরিচালনা।

বহু প্রমাণ দিয়ে এটা দেখানো সহজ হবে, কিভাবে অনেক প্রাচীন রাষ্ট্র উল্লিখিত অভিপ্রায়ের প্রভাবে ক্রমশঃ এমন ব্যাপক সংগঠন গ'ড়ে তোলে যা সমাজের সাথে এক হয়ে যায়।° কিন্তু এমনি ক্রিয়াকলাপের ধারণা শুধুমাত্র ইঙ্গিতের মধ্যে আমাদের সীমিত রাখে। এর পরিবর্তে বরং বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রের অন্যদিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ; যার সঠিক অনুধাবন ব্যতীত যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র সম্প্রদায়ের ভেতর ও বাইরের প্রভাব

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়ায় গ'ড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে। এপর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রকে শাসক ও প্রজা, সরকার ও সীমিতদের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছি। এ হ'ল এর আইনগত দিক ; কিন্তু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কাঠামো কোনরূপ সহজ দ্বিধা-বিভক্তিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেনি। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই করে না ; সাথে সাথে তা বিভিন্ন স্তর বা কর্তৃত্বের পর্যায়ও সৃষ্টি করেছে। একজনের প্রতি বহুর আনুগত্যই শক্তি নয়। শক্তি হ'ল পর্যায়ক্রমিক এক স্তরবিন্যাস। শ্রেণী কাঠামোর ইঙ্গিত রয়েছে এতে। ক্ষমতা হ'ল ইচ্ছার সার্থক প্রয়োগ ; কিন্তু এটা একজনের ইচ্ছা ব'লে মনে হ'লেও এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এক জটিল ও পর্যায়-ক্রমিক সংগঠন ; যে সংগঠন সে ইচ্ছার সমর্থন যোগায়, তার কাজে অংশ গ্রহণ করে ও সর্বসম্মত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে আধিপত্য ও আনুগত্য সাপেক্ষে শ্রেণী প্রতিষ্ঠা বা শ্রেণীর পুনর্গঠন। আদিম উপজাতি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রথার উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে পারতেন, কিন্তু যে শাসক প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন করেন, সম্প্রদায়ের সম্পদ থেকে নিয়মিত কর আদায় করেন এবং সম্পত্তি ও যৌন-প্রবণতা সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করেন, তাঁকে বিশেষ সুবিধাভোগকারী এক শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতেই হবে, যাদের স্বার্থ তাঁর নিজস্ব স্বার্থের প্রায় অনুরূপ। এ ভাবে এ সত্যটিরও ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথাভিত্তিক সহজ পর্যায়ে গণ-সংগঠনের প্রকৃতি ছিল গণতান্ত্রিক ; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা ক্রমে ক্রমে অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গল ও জার্মান উপজাতির সিজার ও ট্যাসিটাসের দৃষ্টান্ত অথবা এশিয়ার সমতল ভূমির যাযাবর বা আমেরিকার ভারতীয় উপজাতিদের সাম্প্রতিক বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষমতার অসম্পূর্ণ সংগঠনের জন্য এরূপ আদিম গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অত্যন্ত উন্নত সংগঠন।

অবশ্য এ শ্রেণী সংগঠনের মূল নিহিত রয়েছে মানবীয় পরিস্থিতির অসমতার মধ্যে। আত্মীয়তায় রয়েছে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চক্র। বংশপরিবারের রয়েছে গৌরবময় ও হীনতর আবেষ্টনী। বয়স ও অভিজ্ঞতারও প্রভাব রয়েছে যা সময়কালে দুর্বল হয়ে পড়ে। সার্থক যোদ্ধারও

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে যথেষ্ট মর্যাদা ও ক্ষমতা। যার প্রচুর সংখ্যক পশু আছে বা যার ভূমি অধিক উর্বর বা ব্যাপক; তারও গর্ব করবার মত কিছু রয়েছে। ব্যক্তি বা পরিবারের গৌরবময় সম্পদ হিসেবে কারো কারো বিদ্যার গৌরবও থাকতে পারে। কলাকৌশল, চাতুরী বা দৈহিক বলের জন্যও কেহ কেহ সম্মানিত। এভাবে নির্বাচিত ভ্রাতৃত্ব ও দলের জন্ম হয়। যা হ'ল মানবকূলের স্বাভাবিক আভিজাত্য। তারা বিশেষ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দাবী করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়ে তারা তাদের দাবীকে আরও জোরদার করে। এভাবে তারা একদিকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করে ও অন্যদিকে সরকারকেও সামাজিক সমর্থন দান করে। এভাবে রাষ্ট্র একটা শ্রেণী-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দলগত সুবিধা আদায়ের জন্য উপজাতীয় প্রথা সংকীর্ণতর হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতি সাধারণ মঙ্গলের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে আধিপত্য অর্জনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়।

সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে বিভিন্নস্তর সমন্বিত সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয় ও রাজনৈতিক আভিজাত্য গ'ড়ে ওঠে, তার চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় 'গুপ্ত সমাজগুলোর'[১] ইতিহাসে। এ হ'চ্ছে আদিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিম্নে উদ্ধৃত লাইনগুলোতে এ ধরনের সমাজের বিবর্তনের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে।

"অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিদের 'বোরা' (Bora) এবং বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের 'ডুকডুকের' (Dukduk) ন্যায় উপজাতীয় গুপ্ত সমাজ বা পশ্চিম আফ্রিকার 'ইগো' (Egho) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যখন সদস্য সংখ্যা সীমিত করবার নীতি প্রবর্তিত হয়, তখন মূলতঃ সে পরিবর্তনের জন্য তাদের জন্ম হয়েছে ব'লে মনে হয়। যে প্রক্রিয়ায় যুব প্রতিষ্ঠানটি উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকদের গুপ্ত সমাজে পরিণত হয়; তাতে মনে হয় উপজাতির সকল সদস্যের ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগঠনের মান অবনত হয়েছে। এ পদ্ধতির ফলে একদিকে সংগঠনের সদস্যপদের সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে; কেননা যারা প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা পূরণ করতে পারবে শুধু তারাই এর সদস্য হবে। অন্যদিকে, বিভিন্ন পর্যায়ে গড়া ভ্রাতৃত্বে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে পদপার্থীরা পর্যায়ক্রমে প্রবেশ

১। ওয়েবস্টার (*Webstar*)-এর *Primitive Secret Societies.*

www.nagorikpathagar.org

করতে পারে। গুপ্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোর পূর্ণ বিকাশের ফলে এ পর্যায়ক্রমিক স্তরগুলো হয় অসংখ্য এবং এতে প্রবেশ হয়ে ওঠে দুরূপ। উচুঁ পর্যায়ের সদস্যগণ তখন নির্বাচিত উৎসাহীদের নিয়ে আভ্যন্তরীণ চক্র গঠন করে নিজেদের স্বার্থে সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করেন।" ১

সামাজিক জীবন যখন জটিল হয়ে ওঠে, তখন কিভাবে সহজ ও সরল প্রথার গণতান্ত্রিক শাসন, আনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণের নতুন পর্যায়ে পা ফেলে তারই একটা দৃষ্টান্ত এটা। রাষ্ট্রের এইই হ'ল একটা সুযোগ। সামাজিক শৃঙ্খলাবোধের জন্য সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু তা হয় খুব নিরোধ-ক্ষম। রাষ্ট্রকালে সর্বশেষ সুবিধাভোগকারী শ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তা আধিপত্য ও আনুগত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। অবশ্য অস্টিন-পন্থীরা সংকীর্ণ আইনগত অর্থে এখনও এভাবে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দিতে চায়। যে অনুপাতে রাষ্ট্র বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা শ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত হয়ে পড়ে, সে অনুপাতে তা ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। এভাবে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ যত বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণাও তত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; সুতরাং মানবের ভাগ্য এতদিন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার ফলে সাম্রাজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল।

১। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে যখন নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ওহিও এবং লেক-অণ্টারিওর উত্তরে ক্যানাডার অংশসমূহ পর্যন্ত তাদের বৃহত্তর সাম্রাজ্য হয়েছিল; সে সময় তারা উন্নতির তুঙ্গে অবস্থান করছিল—মরগ্যান (*Morgan*)-এর *Ancient Society*, *ch. v.*

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন সাম্রাজ্য

এক : সাম্রাজ্য গঠন

এ পর্যন্ত আমরা ছোট ছোট সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করেছি ; যার মধ্যে মৌলিক রাজনৈতিক কাঠামোর বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু 'রাষ্ট্র' শব্দটির সাথে যোগ রয়েছে বিস্তৃত ও ব্যাপক এক অঞ্চলের। ইতিমধ্যে ইতিহাসের পটভূমিতে আমরা বহু সুবিস্তীর্ণ রাষ্ট্র আবিষ্কারও করেছি—যাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ছিল ব্যাপক। কিভাবে এদের জন্ম হ'ল ? স্বাভাবিক মিলনের মাধ্যমে, না আত্মীয়তাভিত্তিক ব্যবস্থার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের ফলে চুক্তির মাধ্যমে, বৃহত্তর মিলনে এদের জন্ম হল ? না কি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিজয় ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে ?

তবে এটা নিসন্দেহ যে, বিজয়াভিযান বৃহত্তর রাষ্ট্রের পথ প্রশস্ত করেছে। ইতিহাসের ধারার সুশৃঙ্খল ব্যাপ্তির জন্য কেন্দ্রাপসারী শক্তিগুলো বরাবরই ছিল খুব প্রভাবশালী, এবং প্রয়োজনবোধে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নতুন নতুন সৃষ্টি হয়েছে যুগে যুগে। এর সঠিক মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ঈর্ষার মনোভাব, অনিশ্চিত জীবিকার দুর্ভাবনা, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, ক্ষমতার গর্ব, সমাজ রক্তের সম্পর্ক-ভিত্তিক বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ধারণা এসব সহযোগিতামূলক মনোভাবের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সত্যি ; কিন্তু অতি সহজে সকলে বিজয়াভিযানের সুরে সুর মিলায়। তা'ছাড়া, পুরাকালের যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বৃহত্তর এক এলাকায় সকলের পক্ষে রাজনৈতিক কাজ-কর্মে সহযোগিতা দান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রত্যেকটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতা নির্ভর করে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর—এ সত্য অনেকে আমরা অনুধাবন করিনা ; কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে জনগণ দূরদূরান্ত থেকে দ্রুতভাবে নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। এ যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্য

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া খুব জোর গড়ে উঠতে পারে মৈত্রী বন্ধন বা সন্ধি চুক্তি। নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কোন মহান ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সমজাতি ও সমতা জনগণের ইচ্ছাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও সে ইচ্ছা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় না।

আদিম জনগণের মধ্যে তাই আমরা দেখতে পাই, মৈত্রীবন্ধন ও সন্ধি চুক্তির প্রকাশ। ইরোকেইরাদের বিখ্যাত পাঁচ উপজাতি সন্ধি-চুক্তি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে। এককালে তা এমন এক বিস্তীর্ণ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল যা অনেক বৃহৎ আধুনিক রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর।[১] কিন্তু এর ফলে সত্যিকারের কোন রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন পর্যায়ে বৃহৎ জনপদ গড়ে উঠেছিল। এতে ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক ধারণার উপর ক্ষমতার রাজনীতির বিজয় সূচিত হয়েছিল। এর ফলে শ্রেণী সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও লোকে যুগ যুগ ধরে নির্দেশ দান করেছে।

আদিম মানবের জীবনে উদ্বৃত্ত সম্পদ ছিল না; যার উপর শ্রেণী-ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারে। গোটা সম্প্রদায়ের জন্য জীবন যাত্রা কোন মতে চলে যাবার মত ছিল। ফলে সামাজিক স্বতন্ত্র গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত দক্ষতা, জন্ম পরিচয় বা বিক্রম বা ঐসব প্রাচীন সুবিধার ভিত্তিতে যা আচার-অনুষ্ঠানে বা প্রথাভিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে প্রকাশিত হত; কিন্তু এসব পার্থক্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করত না। আদিম উপজাতির মধ্যেও দারিদ্র্য সম্পর্কে এক ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল; কিন্তু তা মোটেও প্রগতিশীল ছিল না। যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র গড়ে উঠল তাতে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ বিবর্তনে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠল তাতে সাম্যের বদলে প্রতিষ্ঠিত হল আনুগত্য। সে ব্যবস্থায় সাহচর্য ও ভ্রাতৃত্বের বদলে আধিপত্যকে এবং সহযোগিতামূলক শাসন-ব্যবস্থার বদলে শ্রেণী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া হল। সম্পদের গতিশীলতার ফলেই এ পরিবর্তন সম্ভব হয়। যেসব এলাকায় পশুপালন ও কৃষি কাজের ক্ষেত্রে শান্তিকালের ও যুদ্ধের কলা-কৌশলে, উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় ত্রুটি ক্রমে অতি ধীরে অগ্রগতি সাধিত হয়; সেসব স্থানে ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে রাষ্ট্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

১। পার্কার (*Parker*)-এর *China, ch. i.*

www.nagorikpathagar.org

ইউফ্রেতিস ও টাইগ্রিস, নীলনদ, ইয়োলো ও ইয়াংসির উর্বর উপত্যকা-গুলোকে আমরা সভ্যতার শৈশব ভূমি বা সভ্যতার ক্রোড়ভূমি বলে আখ্যায়িত করি এবং এসব অঞ্চলেই সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চিত হয়। এর সাথে সাথে গড়ে উঠল নগর এবং নগরই হল গতিশীল সম্পদের কেন্দ্র-স্থল। নগরের জন্ম এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, একদল লোক ভূমি থেকে জীবিকার্জনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং এরা অন্য লোকের পরিশ্রমের ফল থেকে জীবিকা গ্রহণের পথ আবিষ্কার করেছে। নগরের অর্থ হল সম্পদের সমাহরণ এবং এর মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রায়িত-করণ। সাম্রাজ্যের প্রথম শর্তই হল নগর। সুমেরিয়া, আসিরীয়, পারস্য, মিসর ও চীনে বিশ্বের যে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো গড়ে উঠেছিল তার কারণ হল ঐ অঞ্চলের লোকেরা সর্বপ্রথম নগর জীবনের কলাকৌশল আয়ত্ব করেছিল। নগরই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নানা কৌশল গড়ে তোলে। প্রাচীনকালে গ্রামীন পশ্চাদভূমিতে প্রভাব বিস্তার করে নগর রাষ্ট্রে রূপ ধারণ করতে চেয়েছিল। বহুসংখ্যক নগর মৈত্রীবন্ধন বা সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধন করে একত্রিত হয়েছিল। যদিও তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও অন্তদ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। কালক্রমে ক্ষমতা ও নেতৃত্বগুণে একটি অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এক সাম্রাজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

নগরে ক্ষমতার সংগঠন এমনভাবে হয়েছিল যা যাযাবর বা মেষপালক বা কৃষিকাজে রত জনগোষ্টির মধ্যে হওয়া সম্ভব ছিল না। আবার অন্য সকলের চেয়ে কৃষক জনসমূহ ক্ষমতার চক্র সংগঠনে নেহাত অপারগ; কেননা তাদের নিয়ত বিচ্ছিন্ন কাজে রত থাকতে হয়। যাযাবর গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সুসংহত ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য দ্রুত সংঘবদ্ধ হতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে নিজেদের জিনিস-পত্র স্থানান্তরিত করতে পারে। ঘোড়া ও উট একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে সাহায্য করে। তারা সম্মুখে পশু দল চালিয়ে যায় ও নিজেদের জিনিসপত্র ও অচল লোকদের গাড়ীর সাহায্যে টেনে নেয়। যেখানে যাযাবর ও কৃষককুল পাশাপাশি বাস করে সেখানে কৃষককুল প্রায়ই তাদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ইয়োলো নদীর তীরবর্তী শান্তিপূর্ণ কৃষকদের প্রতি মঙ্গোলিয়া মরুভূমির অস্থির অশ্বারোহীদের আক্রমণের কাহিনী এ ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাম্রাজ্য গঠনের যোগ্যতা অর্জনের পর্যায়ে এ সব যাযাবর

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণী পৌঁছুতে পারে না। সাম্রাজ্য গঠনের জন্য যে অধ্যবসায় এবং অর্থপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন করা এর অনুপযুক্ত। রাষ্ট্র গঠনের বদলে তারা সংগঠন করে এক সৈন্যবাহিনী। সাধারণতঃ তারা আক্রমণ করে ও লুটপাট করে ফিরে চলে যায়। যখন কোন অসাধারণ নেতৃত্বের প্রভাবে তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়; কিন্তু নিজেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে নিজেদের পুরোনো বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেদের পুনর্গঠন না করা পর্যন্ত তারা কোন সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না। হুন, তুর্কী ও আরবদের কার্যকলাপে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন দেশের শুধুমাত্র ঐ সকল লোক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রহস্য আয়ত্ব করতে পারে, যারা সম্পদের অধিকারী এবং নগর সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতার সুশৃঙ্খল সমাহরণে অভ্যস্ত।

প্রাচীন নগরীতে আদিম সমাজের আত্মীয়তা ভিত্তিক সংগঠন গুরত্ব হ্রাস পায় ও শ্রেণী সংগঠন গড়ে উঠে। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরে আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়ে আসে বাসস্থানের সমস্যা ও বহুজনের ঠাসাঠাসি বাস করাকে—নগরের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে; তার ফলে পরিবারের বিভিন্ন জন ও আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া নগরে বিভিন্ন প্রভাবের ফলে অনেক নতুন নতুন সংঘও গড়ে উঠে। গৃহের আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে এখানে মন্দিরে পূজা-অর্চনা পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে যাজক সম্প্রদায়ের জন্ম হয় এবং কালক্রমে তা সংঘবদ্ধ হয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক বিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত হয়। রাজার চার পাশ ঘিরে গড়ে উঠল জটিল ও বিশিষ্ট পেশাগত কর্মচারী সহযোগে এক দরবার। এখানে গড়ে ওঠে বিশিষ্ট চালচলন ও জীবন যাত্রার এক চিরাচরিত রীতিনীতি। এর ফলে দরবারের লোকজন দেশের অবশিষ্ট লোকজনদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। নগর ও গ্রামাঞ্চল এ শ্রেণীর শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিস্থান খাড়া করে এসব অঞ্চলে তারা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে এবং এ উদ্দেশ্যে তৈরী হয় সচিব, কর সংগ্রাহক, বিচারক সহযোগে একদল কর্মচারী। সাথে সাথে নগরের সাধারণ সভ্যতাও গড়ে ওঠে; যার ফলে দেখা দেয় শ্রমবিভাগ, প্রকৌশলী অগ্রগতি ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা। এভাবে উন্নততর কলাকৌশল ও শ্রমের সাধারণ কাজ-কর্মের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়ে শ্রেণীবিন্যাস দৃঢ়তর হয়ে উঠল।

www.nagorikpathagar.org

দ্রব্য বিনিময়ের অচল অবস্থা থেকে মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থাও মাথা তুলল এবং এভাবে সম্পদ শুধুমাত্র গতিশীল ও সংগ্রহযোগ্যই হল না, এতে সম্পদ ক্ষমতার ধারক ও বাহক হয়ে উঠল। এর বিনিময়ে যে কেহ যে কোন উপযোগ অতি সহজে পেতে লাগল।

সাময়িক কর আদায় বা গোষ্ঠী ও উপজাতির লোক সংগ্রহের বদলে স্থায়ী সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠায় মুক্ত ও গতিশীল সম্পদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ্য করা যায়। পেশাদারী কর্মকর্তা নিয়ে এক সামরিক শ্রেণী গঠিত হয়। এখানে কঠোর আনুগত্যের নীতি প্রতিপালিত হয়। এবং এসকল কর্মকর্তারা পর্যায়ক্রমিক কর্তৃত্ব ও আনুগত্যকে জীবনের মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে সামরিক শ্রেণী এক রক্ষণশীল শ্রেণীতে রূপ নেয়। এর ফলে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হয়; সাধারণ কাজ-কর্ম থেকে কর্তৃত্বের নীতি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং আদেশদানের মধ্যে সেবার ধারণা বিলুপ্ত হয়। আদেশ বা নির্দেশ হ'ল কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত ও প্রভুত্বব্যঞ্জকদারী; যা সকলকে ক্ষমতা বা পদের নামে মান্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ বা লক্ষ্য নির্বিশেষে অধীনস্থদের কর্তব্য হ'ল তা বিনা প্রতিবাদে মান্য করা।

এভাবে সংগঠিত সম্প্রদায় আদিম উপজাতি থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। ইজিপ্টের প্রাচীন সভ্যতার যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আমরা গোষ্ঠী বা উপজাতির মত কোন কিছু দেখতে পাই না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিত্তি এখানে শ্রেণী বা পেশা। আত্মীয়তা সূত্র নয়। এ ব্যবধানগুলোও অনেকাংশে বংশানুক্রমিক। যদিও সৌভাগ্যবশে বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কেহ কেহ শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে উঠেছে। ইজিপ্ট সাম্রাজ্যের উচ্চতর ও নিম্নতর এ দু'টি অংশেরই রয়েছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ভূখণ্ডে বা প্রদেশে রয়েছে স্থানীয় রীতিনীতি ও স্থানীয় দেবতা। কিন্তু কোন সৌকর্যে খচিত কারুকার্যের ন্যায় তারা সকলেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সুবিন্যস্ত। কয়েকটি শাসনবিভাগীয় স্বতন্ত্র এলাকা ব্যতীত মূলতঃ সেগুলো ছিল স্বায়ত্ব শাসিত সম্প্রদায়। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে সকলে রাজা ও পুরোহিতের মিলিত কর্তৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করেছে। দমনমূলক ধর্মীয় নীতির ফলে কয়েকটি স্থানীয় দেবতার আবেদন হয়ে ওঠে সাধারণ ও সার্বজনীন।

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওসিরিস্, হোরাস ও সেথের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধর্মনীতি ছিল হাস্যকর, নিরানন্দ ও ভয়াল। রাজা ও দেবতার আসনে উন্নীত হয় এবং রাজা ও দেবতাদের প্রতীক হ'ল এক 'হোরাসের বাজপাখী'। এভাবে রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সমগ্র দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে ও সকল লোক হয় প্রজা। প্রতিষ্ঠান জীবনের প্রভু হয়ে পড়ে। মানুষ ও এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভুলে গেল ও কুসংস্কার ও শ্রেণী স্বার্থের প্রবল প্রভাব সকলকে সচকিত ক'রে তুলল। মানুষ এখন আর রক্তের সম্পর্কে ভাই বা সহযোগী রইল না। সম্প্রদায়ের মুক্ত মানুষ হিসেবে তারা যে আচার-অনুষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছিল, সে স্মৃতিও মুছে গেল। এখন তারা হ'ল ক্ষমতার ভৃত্য। জনগণের মঙ্গল কর্মের চেয়ে এখন তাদের বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ বা রাজার সমাধি তৈরী বা যে সকল দেবতাদের তারা সেবা করে, তাদের যে কোন একটির মন্দির তৈরী করা। সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও ধর্মীয় নীতি এ দু'অস্ত্রে সুসজ্জিত রাষ্ট্র এখন এল সবার উপরে।

সাধারণ সেবার মূলনীতি থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র, যে সেবার মূলমন্ত্র থেকে এত বিচ্যুত হ'তে পারে তার একমাত্র দৃষ্টান্ত হ'ল প্রাচীন ইজিপ্ট। অন্য সম্প্রদায়ে এমনটি দেখা যায় না; তবে এটাও সত্য যে, অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠী যারা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে বা আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করেছে বা নগর জীবনের পর্যায়ে পৌছেছে, তাদের প্রত্যেকটি কমবেশী সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্তরে উঠেছে। সুমেরিয়া, ব্যবিলনিয়া, ভারত বা চীনের ইতিহাস-ধারা একই রকম। প্রত্যেক স্থানে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র নগর ভিত্তিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার চক্রধারী শ্রেণীর বা শ্রেণীগুলোর হাতে সাধারণ মানুষের আনুগত্য সমর্জিত হয়ে সাম্রাজ্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। ইজিপ্টে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে 'আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তির' সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে। সর্বত্র অবশ্য তেমনই হয়নি। কোথাও কোথাও যাজক শ্রেণী ছিল পৃথক ও রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু কোথাও কোথাও ছিল এদের মহিমা সর্বোচ্চ; কিন্তু সর্বত্র সমাজের শ্রেণীবিন্যাসকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য আধিপত্য ও আনুগত্যের পথ ধ'রে এ দু'শক্তি একে অপরকে শক্তি যুগিয়েছে। ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শ্রেণী ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠেছে।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবার ফলে সুযোগ বুঝে ক্ষমতার হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এসেছে নেতা এবং সে নেতা নিজ রাষ্ট্রে আধিপত্য কায়েম ক'রে অন্য রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আকাদিয়ার সারগণ (Sargon), আসিরিয়ার প্রথম তিগলাথ পিলেসার (Tiglath—Pileser 1) ও চেট বংশের প্রতিষ্ঠাতা উ ওয়াং (Wu wang) নেতৃত্বের এমনি ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা সাধারণ অর্থে যুদ্ধে বিজয়ী ছিলেন না। নিজ নিজ রাষ্ট্রে তাঁরা ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব ক'রে সাম্রাজ্য বিস্তারে এগিয়ে গেছেন মাত্র।

সাম্রাজ্যের আগমনে নূতন নূতন সমস্যার উদয় হয়। সে যুগের মন্থর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বৃহৎ এক অঞ্চলে এক শাসকের অধীন শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা সত্যই ছিল দুরূহ। আঞ্চলিক সেনাপতি ও প্রদেশ পালগণ প্রচুর পরিমাণে স্বশাসন উপভোগ করতেন এবং প্রায়ই তাঁরা প্রধান শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে বা তাকে উপেক্ষা করতে প্রলুব্ধ হতেন। সম্রাটের দরবারেও ক্ষমতাশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা প্রায়ই ওঁৎ পেতে থাকত ও সুযোগ পেলে সিংহাসন দখল করবার চেষ্টা করত। বংশানুক্রমিক নীতির ফলে যখন রাজদন্ড দুর্বল হাতে ন্যস্ত হত, তখন প্রায়ই এরূপ ঘটত। ক্ষমতাকে 'অধিকার' ব'লে গণ্য করবার স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল উত্তরাধিকার; কিন্তু এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিংহাসনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও কোন কোন সময় কার্যকরী ক্ষমতায় এতে হ্রাস পেত। এভাবে প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে নিহিত ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান-পতনের এক ধারা। সাম্রাজ্য ছিল আধা-স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠির মিলিত-রূপ মাত্র। এর ফলে রাজদন্ড শুধু বংশ থেকে বংশেই ঘোরাফেরা করত তা নয়; এক নগর থেকে অন্য নগরেও স্থানান্তরিত হত। সত্যি বলতে কি, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য যা দরকার ছিল, তা হ'ল সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও শ্রেণী কাঠামোর পুনর্গঠন। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার ফলে শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয়, তাতে প্রজাদের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ত্রুটিগুলো শুধু তখনই দূর হ'ত যখন কোন শক্তিশালী সম্রাট স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করে অন্যান্য ক্ষুদ্র শাসক ও বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতা-কেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতেন। ইজিপ্টের দ্বাদশ বংশের প্রথম আমেনেমহাট (Amenemhet 1) ও তৃতীয় সেসোসস্ট্রিস্ (Sesostris III) এভাবে

www.nagorikpathagar.org

স্বায়ত্তশাসিত প্রধানদের দমন করেন। কিন্তু রোমে যেরূপ সার্থক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এমন কি তৃতীয় সেসোসস্ট্রিসের আমলে ইজিপ্ট যা দেখা গেছে, তার মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধানের অবসান। তাঁরা ছোট বড় সকলের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করতেন। স্বৈরতন্ত্রের মহিমায় সম্রাট নিজের ও সকল প্রজার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা তু'লে ধরেন এবং শাসকশ্রেণীকে অবনত করে ফেলেন। এভাবে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের ক্ষেত্র রচনা করে। পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যায়ে অবশ্য সচেতন গণতান্ত্রিক উপাদানে সমর্থনপুষ্ট হয়ে গণতন্ত্রের নামে এ সত্য ঘোষণা করা হয় যে, তারা 'সাধারণ মানুষ'। এ আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়েই গ্রীসের 'স্বৈরাচারিবৃন্দ,' 'গ্র্যাফচাই' ও প্রথম দিকের 'সিজাররা' কুলীনতন্ত্রের বিরুদ্ধ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়; কেননা একজন ও বহুজনের স্বার্থের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা বহুজন ও কয়েকজনের স্বার্থের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞান আহরণের ন্যায় কঠিন কাজ আর নেই। প্রাচীন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে; কিন্তু তারা কোনদিন রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জনে সক্ষম হয় নি। সুমেরিয়া ও আসিরিয়ার মত কোন কোনটি বাইরের যাযাবর আক্রমণে ধ্বসে পড়েছে। সেখানে আবার নতুন সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে; কিন্তু রাজনৈতিক স্থায়িত্বের চাবিকাঠি তাদেরও আয়ত্বে আসেনি। চালদিয়া, মিডিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের সুদিন এসেছিল। ইজিপ্টের ন্যায় কোন কোনটি ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নামে ও আকৃতিতে সাম্রাজ্য হিসেবে টিকেছিল; কিন্তু সেখানেও বিজয়াভিযান, যুদ্ধবিগ্রহ ও ক্ষমতার হস্তান্তর বহুবার ঘটেছে। এদের মধ্যে মাত্র চীন সাম্রাজ্য, এক অর্থে, কোন এক অজ্ঞাত কাল থেকে আজ পর্যন্ত আছে; কিন্তু এর শিথিল ঐক্য রাজনৈতিক অখণ্ডতার কোনদিন তেমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তা'ছাড়া, এর মূলে রয়েছে সাধারণ সভ্যতার প্রতি সমাজের দুর্নিবার আকর্ষণ, যা অদ্ভুতভাবে পরিবারের জীবনে প্রোথিত। তা না হ'লে এটাও অতীতের অন্যান্য সাম্রাজ্যের ন্যায় অবলুপ্ত হত। সাম্রাজ্যের প্রাচীন আকৃতি সাধারণ সম্পদ-সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল; আর মালিকানার অধিকার ছিল রক্ষিত। এভাবে রাষ্ট্রশক্তির সুনিশ্চিত অভিভাবক যে সাধারণ ইচ্ছা, তাকে ক্ষমতা

www.nagorikpathagar.org

দখলের প্রলোভন ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত রাখা হয়। যে হাত ক্ষমতাকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ছিল, ক্ষমতার হাতিয়ার সে হাতেই ভেঙ্গে পড়ে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মননশীলতার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির জন্য প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর পতন হয়। এতে মানুষ ক্ষমতা এবং আড়ম্বরের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে।

দুইঃ দেশীয় শক্তি ও সামুদ্রিক শক্তি

যে সাম্রাজ্যগুলো সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, সেগুলো ছিল দেশীয় বা মহাদেশীয় শক্তি। সমুদ্র ছিল তাদের কাছে এক প্রতিবন্ধকস্বরূপ সচল মহাসড়ক—সড়ক নয়। তাই তারা সীমানা অতিক্রম করতে পারত না; যখন সীমানা শুরু হয় তখন সমুদ্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করত। ব-দ্বীপটির মূলে কিন্তু মিসরীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অবস্থিত ছিল না—তা ছিল মিসরীয় নীলনদের মধ্যভাগে। ইয়োলো নদীর উপত্যকার অভ্যন্তর থেকে চীন সভ্যতা দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং আজ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসিদের কথায়, সমুদ্রতীর রয়েছে পৃথিবীর শেষ সীমানায়; যেখানে সত্যিকারের স্বর্গীয় দূতেরা আর বাস করে না।[১] বিরাট এক বিভাগকারীর মত সমুদ্র যেন দুভাগ করে দিয়েছে, সে যেন বিচ্ছিন্নকারী। সমুদ্রতীরবর্তী গ্রীকদের সাহিত্যে সমুদ্র-ভীতির প্রতিধ্বনি আজও শোনা যায়। বছরে দু'এক মাস বাদ দিয়ে নৌচালন সারা বছরই সমুদ্রতীরে সীমিত থাকত। আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে—প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর জাহাজ ছিল অনেকটা অচল ও সমুদ্রে চলার অনুপযুক্ত; তাছাড়া, দস্যুদলেরও কম উপদ্রব ছিল না। ডেমস্থেনিসের আমলেও সমুদ্রগামী জাহাজের বীমার হার ছিল খুব চড়া। আস্তে আস্তে ও সভয়ে মানুষ সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস রয়েছে, তা আবিষ্কার করে।

বিশ্বের সব এলাকার চাইতে ইজিয়ান সাগরের উপকূল স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র অভিযানের উপযোগী ছিল। এখানে একটার পর একটা দ্বীপ ছড়িয়ে রয়েছে। এদের দেখলে মনে হয়, বিভিন্ন স্থলের সংযোগ সাধনের জন্য যে সেতু নির্মিত রয়েছে। তাই এখানে দেখা যায় সর্বপ্রথমে

১। তুলনীয়: ক্যাভিগনাক (*Cavignac*)-এর *Histoire de l'antiquite', vol. i, ch v.*

www.nagorikpathagar.org

সামুদ্রিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। আসলে এ হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতার এক নতুন ও অভূতপূর্ব সূচনা। এশিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, চীন বা ভারতের দেশীয় সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এ সভ্যতা। ইজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠে ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠারও হাজার বছর আগে। ক্রীট দ্বীপে (Crete) ঘটেছিল এর গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ; কিন্তু ট্রয়ের (Troy) অবস্থান ক্ষেত্রে এবং পরে খ্রীস্টের জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় হাজার বছরের দিকে মাইসিনি (Mycenae) ও টাইরানসে (Tiryns) তা উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। সমুদ্র থেকে দূরে এ নগরগুলো গড়ে উঠলেও তারা নিঃসন্দেহে সমুদ্র-তীরবর্তী সভ্যতার অংগ ছিল। তাছাড়া, সভ্যতাকে আমরা অনেকটা আমাদের এ সভ্যতার মত মনে করি। প্রাচ্য সভ্যতার সাথে তুলনা করলে এর মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার ন্যায় ঐ প্রাচীন জীবন-ব্যবস্থা ভূমি ও সমুদ্রের সম্মিলিত প্রভাবে গড়ে উঠা পরিবেশ ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এ প্রাচীন সামুদ্রিক শক্তিগুলো আয়তনের তুলনায় অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। ক্রীটে একটি ছোট রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কানসোস (Knossos)। এ ছোট রাষ্ট্রটি সাইক্লেডের (Cyclade) উপর আধিপত্য করত এবং এর প্রভাব আইয়োনিয়া (Ionia) ও গ্রীক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সে দ্বীপেই ফিসটোস (Phaestos) ছিল আর এক শক্তি কেন্দ্র। এ রাষ্ট্র প্রাচ্যের সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ওডেসীতে (Odyssey) ক্রীট দ্বীপকে পাঁচটি ভিন্ন জাতির আবাসভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হল সভ্যতার সঙ্গমস্থল এবং এখান থেকে আর এক নতুন ও মহত্তর সভ্যতার উদয় হয়। এটা ছিল বাণিজ্যপথে অবস্থিত। ফলে বিভিন্ন ভাবের মিলন ঘটেছে এখানে। এ যেন সঞ্জীবনীর এক প্রক্রিয়া ; যার ফলে সম্ভবতঃ বিশ্বের প্রত্যেক মহান সভ্যতা প্রাণ পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর সাথে সমুদ্রপথ সংযোগ সাধন করে ; অথচ এর মাধ্যমেই যে জনস্রোত যে সকল স্থানের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ধ্বংস করতে পারে, তার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে একদিকে যেমন দ্রব্য বিনিময় হয়, অন্যদিকে তেমনি ভাবের আদান-প্রদানও চলে। তাই এর প্রভাবে

www.nagorikpathagar.org

জগদ্দল পাথরের মত দমন মূলক প্রথার চাপ থেকে মানুষের মন মুক্তি লাভ করে ও চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রেরণা আসে। কোন সমুদ্রচারী জাতির ভাগ্যে ইজিপ্টের সাংস্কৃতিক সৌভাগ্য আসেনি বটে; কিন্তু বণিক নিশ্চয়ই অনেক সামাজিক নমনীয়তা অর্জন করে এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়। সামুদ্রিক শক্তি দেশীয় শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, যে রাষ্ট্রের সম্পদ বেশী পরিমাণে বাণিজ্য থেকে অর্জিত হয়, সেখানে কৃষকদের সংখ্যা হয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং সেখানকার জনসংখ্যায় গতিশীলতা থাকে অনেক বেশী। বাণিজ্যের সম্পদ অনিশ্চিত হলেও সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তা ভূমি থেকে অর্জিত সম্পদ থেকে অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ সম্পদ সহজে সঞ্চিত হয় ও খোলা ব্যয়ের জন্য তা হয় সহজলভ্য। এর ফলে সুকুমার কলা ও শিল্প উৎসাহ পায় বেশী। এসব থেকে সমুদ্র তীরবর্তী সাম্রাজ্যগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশীয় লোকদের মধ্যে যাযাবর শ্রেণীর প্রচুর গতিশীলতা থাকে; যদিও তাদের সম্পদ তেমন পরিমাণে থাকে না। কিন্তু কৃষিকাজেরত ব্যক্তিদের সম্পদ থাকলেও তাদের কোন গতিশীলতা থাকে না। কিন্তু সমুদ্রতীরবর্তী ও সমুদ্রচারিদের দু'টোরই কিছু কিছু সুবিধা রয়েছে। সমুদ্রতীরবর্তী শক্তিগুলোর এই সম্পদ ও শক্তি দু'টোই ছিল। তাদের পক্ষে রাজ্য 'কর' 'দেয়' ও 'রাজস্ব' প্রভৃতি চালু করা ছিল অত্যন্ত সহজ ও কম ব্যয়-সাপেক্ষ। সমুদ্রতীরবর্তী সাম্রাজ্যগুলো এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ভূমির নিরবিচ্ছিন্ন দখলের উপর নয়। তাদের নগরগুলো একদিকে ছিল যেমন দুর্গ, অন্যদিকে তেমনি ছিল বাজার। মুক্ত আদান-প্রদানের ফলে তাদের যে উদ্বৃত্ত সম্পদ অর্জিত হত, তার মাধ্যমে তারা আরও উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করত এবং দুর্বল ও কম সম্পদশালী নগর থেকে রাজস্ব আদায় করত। যাহোক, এ দু'টোর মিলিত সম্পদ থেকে তারা বিভিন্ন উৎসকে কাজে লাগাত। ফলে তাদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ইজিয়ান সাগরের ক্ষমতাশালী ব্যয়ভার থেকে ছিল মুক্ত; অথচ তাদের সামাজিক জীবনের কাঠামো বাহির্বিশ্বের আলোকে ছিল উদ্ঘাটিত; এর ফলে সেখানে অবকাশরঞ্জনের ভিত্তি রচিত হয়; যার সুযোগে গড়ে উঠে জীবনের

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্নিহিত সুকুমার শিল্প—অতীতে যা কোনদিন দেখা যায়নি। এদিক থেকে এগুলো ছিল অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্তী সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র। এর পরিপন্থী পর্যায়ে গড়ে উঠা সমুদ্রতীরবর্তী সাম্রাজ্য ফিনিসিয়া (Phaenicia) বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তার সৃজনশীল ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করে। কিন্তু ক্রীটের সাম্রাজ্যগুলোর সাথে পরবর্তীকালের আর একটি সমুদ্রতীরবর্তী এথেন্সের মহান সাম্রাজ্যের বেশ মিল দেখা যায়। এর বিখ্যাত মনীষিবৃন্দ জীবনের লক্ষ্যের সঠিক অনুধাবন করে বিশ্বকে দিয়েছেন অবিস্মরণীয় এক অনুপ্রেরণা।

দেশীয় শক্তি ও সামুদ্রিক শক্তির মধ্যে রয়েছে কতকগুলো প্রভেদ; রাষ্ট্রের বিবর্তনে যাদের রয়েছে প্রচুর দায়িত্ব। সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বদা একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং তা হল বিশেষভাবে অর্থনৈতিক। এ লক্ষ্য সামনে রেখে দেশীয় শক্তি সাধারণত: বলপূর্বক পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে এবং সেখানকার অধিবাসিরা প্রত্যক্ষভাবে আনুগত্য স্বীকার করে রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীকে রাজস্ব দেয়। কৃষককূল প্রায় ভূমিদাসে পরিণত এবং কৃষকের শ্রমই হয় শাসকের সম্পদ ও মর্যাদার উৎসস্বরূপ। দেশীয় সাম্রাজ্য যেমন বৃদ্ধি পেত, তার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও তেমনি দুর্বল হয়ে পড়ত; কেননা অতীত-বিশ্বে সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্তৃত্বকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে বাধ্য হ'ত উদ্বৃত্তির একাংশ পেতে। সাথে সাথে তাকে বৃহৎ এক সামরিক বাহিনী পরিচালনা করতে হত; যার ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। এতে শাসককে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতে হত এবং এর ফলে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎপাদকের মধ্যে হতাশা দেখা দিত। এদিকে সা্রাজ্যের প্রদেশগুলো বৃদ্ধি পাবার জন্য সাথে সাথে আরও স্ব-শাসন লাভ করত এবং কেন্দ্রের সাথে ঐক্যের সাধারণ সূত্র হারিয়ে ফেলত। তাদের অধীনস্থ গভর্নর ও ভূ-স্বামীরা আরও ক্ষমতা দাবী করত ও প্রয়োগ করত। এতে সাম্রাজ্যের কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে উঠত। তার কেন্দ্রবিমুখী শক্তিগুলোর জন্য শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ত। ভারত, চীন, ইজিপ্ট এবং উত্তর আফ্রিকার পরবর্তী যুগে সৃষ্ট সাম্রাজ্য ও মধ্যযুগীয় জার্মান সাম্রাজ্যের ন্যায় দেশীয় শক্তিগুলোর ভাগ্যে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রতীরবর্তী সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থা ঠিক এর উল্টো। একটু একটু করে এগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করেনি; বরং এর পরিবর্তে তারা গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করেছে। পশ্চাদ্‌ভূমি সংলগ্ন সুরক্ষিত বাণিজ্য কেন্দ্র গড়েছে বা দুর্বল রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরী এরূপ কেন্দ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সম্পদ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। এর জন্য এদের দীর্ঘকাল ধরে সামরিক বাহিনীর অধিকারে কোন স্থানকে রাখতে হয়নি। এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের সমন্বয় ঘটেছে। এদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আহরণ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় ক্ষমতা প্রয়োগ না ক'রে শুধুমাত্র হুমকি দিয়েই কাজ হাসিল করেছে। এদের সম্পদ আপনা থেকেই কেন্দ্রে সংগৃহীত হয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে দ্রুতগতিতে পরিধির যে কোন ক্ষেত্রে পৌছেছে। সুতরাং এরা অত্যধিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন একদল অধীনস্থ শাসক সৃষ্টি ব্যতীত শাসন করেছে। তাছাড়া এদের এক অংশ অন্য অংশের সাথে এবং তা কেন্দ্রের সাথে ব্যবসায়ের সুবিধা, শুল্ক ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। আসলে দেশীয় শক্তি অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে সামুদ্রিক শক্তিগুলোর অস্ত্র-শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং এ অর্থের পরিমাণে তারা ততটুকু শক্তিশালী। ভেতর থেকে সহজে এরা বিধ্বস্ত হয় না এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে খুব কমই ভেঙ্গে পড়েছে। তবে এথেন্স ডেলিয়ান লীগকে বলপূর্বক একটা অধীনস্থ সাম্রাজ্যে পরিণত করে ও বাণিজ্যের উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে অধিক পরিমাণে বলপূর্বক কর আদায়ের উপর নির্ভর করে নিজের দুর্ভাগ্য টেনে আনে। সামুদ্রিক শক্তিগুলোর পতনের কারণ অন্য কিছু।

কয়েক শতকে বাণিজ্যের পথ পরিবর্তন হয়। নতুন নতুন শক্তির উদয় হয় ও বহির্শক্রর সঙ্গে নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হ'তে পারে। যদি সামুদ্রিক শক্তির একমাত্র প্রাণকেন্দ্রকে বিধ্বস্ত করা যায়, তবে কার্থেজের মত এর পতন হয় আকস্মিক ও চরম। দেশীয় সাম্রাজ্য নির্ভর করে ভূমিজ সম্পদের উপর, যা অত সহজে ধ্বংস হয় না এবং ফলে তা 'হাজারো বিজয়ীর লাঞ্ছনা ও পদচিহ্ন' সত্ত্বেও টিকে থাকে। প্রকৃতির মন্থর পরিবর্তন, ব্যয়বহুল অভিযান ও মানুষের ধ্বংসলীলা তাকে দুর্বল ও দরিদ্র ক'রে তুলতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, আরব ও সম্ভবতঃ গ্রীসেও তাই ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃতি সাধারণতঃ ভূমির সম্পদকে আবার পূরণ ক'রে দেয়; যদিও নতুন শক্তি আবার তা অধিকার করতে ছুটে আসে। কিন্তু সামুদ্রিক শক্তির গৌরব-রবি একবার অস্তমিত হলে চিরদিনের জন্য সেখানে অন্ধকার নেমে আসে।

এ দু'ধরনের সাম্রাজ্যের মধ্যে আর একটি বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। জমিতে যে ফসল জন্মে তার উদ্বৃত্ত অংশ দেশীয় শক্তি আত্মসাৎ করে। সে উদ্বৃত্ত অংশ কিন্তু প্রকৃতির সীমাহীন দানের উদ্বৃত্ত নয়, বরং তা হ'ল কৃষকের পরিশ্রমের ফল। সাম্রাজ্য তা গ্রহণ করায় কৃষক তা ভোগ করতে পারে না। সামাজিক বিবর্তনে কৃষিকাজেরত দুটি শ্রেণীর উদয় হয়—একটি হ'ল ভূমিদাস ও অন্যটি হ'ল স্বাধীন কৃষক সমাজ। কিন্তু যে সাধারণ বোঝা তাদের উভয়কে বহন করতে হয়, বাধ্যতামূলক যে শ্রমে তারা সমান অংশীদার হয়ে ওঠে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবে অর্থের মাধ্যমে যে লেন-দেন হয়, তা গুরুত্বহীন হওয়ায় ও শিল্পকর্মে নিয়ত দেখা-শোনা ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে; কৃষিক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতির ফলে উভয় শ্রেণীর কৃষক এক পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে ভূমিদাস ও মুক্ত কৃষক উভয় দলই কৃষক শ্রেণী হিসেবে এক মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। সামাজিক পরিস্থিতিতে কৃষকই হ'ল সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও রক্ষণশীল উপাদান। যে আইনের দ্বারা আবদ্ধ, সে আইনের মাধ্যমে তারা কতকগুলো অধিকারও ভোগ করে। অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে তারা এ অধিকার আঁকড়ে থাকে; কিন্তু ইচ্ছা করে তারা এ অধিকারকে কার্যকরী রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করে না। কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিতেই তারা খুশী। সামুদ্রতীরবর্তী নগরের অন্তর্নিহিত উত্তেজনা যা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে, এখানে তা অজ্ঞাত। তারা সবচেয়ে বেশী খুঁজে প্রথাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যদি না তা একেবারে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তার জীবনে যে আনন্দ ও সন্তুষ্টি আসে, তা পরিবার-চক্রে বা আত্মীয় মহলেই সীমিত থাকে, বা প্রকৃতির সাথে অন্তরঙ্গতার জন্য যে সুষ্ঠু পুরস্কার, তা আসে ঐভাবে। তারা সহজ, সরল ও মুক্ত খোলাখুলি প্রতিযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন নয়। যে ব্যবস্থার তারা অংশস্বরূপ, তাকে ওলোটপালট করতে বা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে

www.nagorikpathagar.org

তারা রাজী নয়। প্রাকৃতিক প্রবণতায় প্রভাবিত হবার ফলে তাদের মধ্যে স্থায়িত্ব ও স্থিরতার একরকম মনোভাব গড়ে ওঠে এবং এর ফলে তারা ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে। তাদের নিকট ঈশ্বর ও রাজার মধ্যে যে দূরত্ব, তা হল পরিমাণগত। তাই দেশীয় সাম্রাজ্যের শ্রেণী-সংগঠনের সঙ্গে কৃষিকাজেরত ব্যক্তিরা ঐক্যমত পোষণ করে। যে আভ্যন্তরীণ শক্তি এর ধ্বংস টেনে আনে, তা ভেতর থেকে আসে না ; বরং আসে বাহির থেকে—বিশেষ করে ভূ-স্বামিদের বিভ্রান্তিকর দাবী থেকে ; দেশের অধীনস্থ প্রজাদের কাছ থেকে নয়।

সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের অবস্থা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। মুক্ত ব্যক্তি ও দাসদের মধ্যে যে ব্যবধান, এর বিবর্তনধারা তার কোন পরিবর্ধন করে না ; বরং তাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলে ধরে। মুক্ত মূলধনের জন্য সামুদ্রিক শক্তি ক্রয় বা বিজয়াভিযানের মাধ্যমে বহু পরিমাণে দাস সংগ্রহ করতে পারে এবং বাণিজ্যিক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অন্যান্য কর্মীদের সাথে তাদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। প্রাচীন সামুদ্রিক সাম্রাজ্যগুলোর দাসদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বিদেশী হিসাবে তথা অন্যদের অধীনে 'কাজ করবার যন্ত্ররূপে' তাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতে হত। এজন্য তাদের অবস্থা ছিল নিম্নতম মানের ও তারা মুক্ত ব্যক্তিদের সমাজের বাইরে ছিল এক শ্রেণীস্বরূপ। তারা মুক্ত লোকদের জীবনে আনত স্বাচ্ছন্দ্য ও নগরীর বহুজনের জীবনে তারা এনেছিল অবকাশ রঞ্জনের সুযোগ। নিঃসন্দেহে এর জন্য তাদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। যে সভ্যতার ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা, সে সভ্যতাকে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তা যাইহোক, স্বাধীন লোকেরা প্রচুর অবকাশ পেয়েও কিছু কিছু ক্ষমতার আস্বাদ লাভ করে বাণিজ্য প্রধান নগরে রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ অংশীদার হ'তে দাবীমুখর হয়ে ওঠে। ক্ষমতাকেন্দ্র রাষ্ট্র এখানে ভেতর থেকে আক্রান্ত হয়। এটা একটা প্রাচীন প্রবাদ, যে সম্প্রদায় বাণিজ্য থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে, সেখানে সামাজিক পদমর্যাদার প্রশ্ন গৌণ। সামাজিক পদমর্যাদা থেকে চুক্তির ধারায় সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে—হেনরী মেইনের এ বক্তব্য এখানে সুন্দরভাবে খাপ খায়। বাণিজ্যের ভিত্তি হল চুক্তি, এবং ব্যবসায় জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনার যে সম্ভাবনা নিহিত, তাতে পদমর্যাদা আলোড়িত হতে পারে। কৃষক যে প্রান্তে থাকে, বণিক থাকে তার ঠিক উল্টো প্রান্তে। বণিক

www.nagorikpathagar.org

চায় সুবিধা, পরিবর্তন, নতুনত্ব এবং সবশেষে চায় ক্ষমতা। সামুদ্রিক শক্তি থেকে যে নতুন জিনিস জন্মলাভ করে তা হল গণতন্ত্র।

এ সম্পর্কে পরে বলা হবে। দেশীয় সাম্রাজ্য ও সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ব্যবধানকে যাতে আরো বাড়িয়ে না বলি, সেজন্য এটা বলা নেহায়েত প্রয়োজন যে, যেকোন ধরনের আধিপত্যের ফলে সাধারণ প্রথা, সাধারণ বক্তব্য ও সাধারণ চিন্তাধারার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এভাবে সভ্যতা হয় ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। সাম্রাজ্য শান্তি ও স্থায়িত্বের এক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় তা হয় দীর্ঘস্থায়ী। এ সময়ে মানবিক ধীশক্তি প্রচুর সুযোগ লাভ ক'রে দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে তার সীমাহীন সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলে। এভাবে যে মানবিক শক্তি স্ফুরিত হয়, তাও সময়কালে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করে। বোধের অগম্য যে শক্তি, তারই আবরণে মানবের সাধারণ ও সার্বজনীন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গ'ড়ে উঠতে থাকে। ক্ষমতা ও সেবা—রাষ্ট্রের এ দু'টি দিকের মধ্যে প্রথমটি তার নিয়ত কার্যকারিতায় রাষ্ট্রের আয়তন নির্ধারণ করে এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সেবা নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের গভীরতা ও আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি। মানুষ সাধারণতঃ নাগরিক হবার পূর্বে প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে প্রজা বা দাস। কিন্তু দাসত্বের পারিপার্শ্বিকতাই তার নাগরিকত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

নাগরিকত্বের বিকাশ

এক : নগরের মর্মকথা

ট্রয় ও ক্রীট মাইসিনি ও টাইরিন্‌সের ইজিয়ান সভ্যতা দীপ জ্বেলে গেল এবং সে দীপ বহু পূর্বে নিভেও গেছে। প্রামাণ্য ইতিহাসের পাতায় কাল্পনিক কিংবদন্তী ছাড়া এ সভ্যতার তেমন কোন নিদর্শন আর নেই। খননকারীর কোদাল সন্দেহাতীত বাস্তবকে উদ্ধার করেছে এবং এর ফলে পরিস্ফুট হয়েছে এক সমৃদ্ধ, সুরুচিসম্পন্ন ও বিশিষ্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ জীবনের স্মৃতির সাথে সমাধিস্থ হয়েছিল গাঢ় কাল কাঁচের বর্শার ফলক, লৌহবলয়, স্বর্ণপাত্র, মূল্যবান রত্নভাণ্ডার, সুদৃশ্য মৃন্ময়পাত্র, ভাস্কর্যবিদ্যার সুকুমার সৃষ্টি, দেয়ালচিত্র ও অন্যান্য বহু সৃষ্টি; যা খননকাজ চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। এ সভ্যতার জীবনীধারা নিঃশেষিত হয়েছিল বলে এর পতন ঘটেছিল—একথা ঠিক নয়। কেননা সভ্যতার ইতিহাসে কোন 'স্বাভাবিক' সমাপ্তি নেই; আছে শুধু রূপান্তর। উত্তরাঞ্চল থেকে আগত আক্রমণকারী এক জাতির হাতে এর পতন ঘটে। তারা দুর্দমনীয় বেগে ধেয়ে এসে গ্রীক রাজ্য, গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ও ইজিয়ান সাগরের উপকূলভাগ অধিকার করে। বিজয়ীদের উচ্চারণের তারতম্য থাকলেও তারা এক ভাষা ব্যবহার করত এবং তাদের ছিল সাধারণ ঐতিহ্য, সাধারণ রীতিনীতি এবং ছিল সর্বদেবতার মন্দির—যেখানে তারা তাদের স্থানীয় দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠা করে। এ অর্থে তাদের একজাতি বলা চলে; কিন্তু তারা আসলে এক জাতি ছিল না এবং জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতেও সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে তারা এক সাধারণ নামে পরিচিত হয় ও নিজেদেরকে সাধারণ এক পৌরাণিক পূর্ব-পুরুষের বংশধর ব'লে মনে করত। সে পূর্ব-পুরুষের নাম ছিল হেলেন। কিন্তু কোন সময়ই তারা সাধারণ এক রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে পারেনি।

অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্ন এ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কীর্তির মধ্যে যেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হ'ল বিজিত রাজ্যের এক অভিনব ও অনবদ্য

www.nagorikpathagar.org

সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটানো। গ্রীকদের সাথে নগর-জীবনের শুরু হয়নি ; কিন্তু তাদের হাতে নগর-জীবনের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য অভিনবরূপে ফুটে ওঠে। নগরের দাবীর নিকট অন্যান্য মানবীয় সম্পর্ক গৌণ হয়ে পড়ে। আদিম জীবনের বিস্ময়কর সামাজিক বন্ধন—আত্মীয়তা—তার গুরুত্ব হারায় এবং নাগরিকত্বের বহুমূল্যবান সূত্র ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রাচীন সাম্রাজ্যে শাসক বা প্রধানের প্রতি আনুগত্য বা অধীনতার যে ভিত্তি ছিল, এ জনগোষ্ঠির উপর তার প্রভাব শিথিল হয়ে আসে। হোমারের ঐতিহ্যমণ্ডিত সর্বশক্তিমান 'রাজা' যিনি ছিলেন জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র তা হ'ল বিলুপ্ত ; না হয় হ'ল বিরাট এক নামের ছায়ার মত সাধারণ পর্যায়ের জনৈক কর্মকর্তা। প্রাচ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের তুলনায় এ জনসমূহের মধ্যে ধর্মের প্রভাবও তেমন গভীর ছিল না। রাজা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে কোন সুসংগঠিত যাজক-শ্রেণী জনগণের মধ্যে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের নতুন বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের যে স্বচ্ছ ধারণা, তারই সৌন্দর্যবোধের রূপায়ণ ঘটেছে তাদের ধর্মে। এতে সন্দেহের অতীত কোন নীতি প্রতিপালনের ভয়াল নির্দেশ প্রকাশিত হয় নি। এমনি মনোভাবসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মহান এক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত এবং ইজিয়ান উপকূলও এর যোগ্য ক্ষেত্র রচনা করেছিল।

এ বিবরণ দিয়ে অবশ্য আমরা গ্রীসের রাজনৈতিক প্রতিভার কুলজী নির্দেশ করছি না। যে অঙ্কুর উদগত হ'ল, তার মধ্যে ভবিষৎ জীবনের বিশিষ্ট রূপের সম্ভাবনা কেন প্রকাশিত হয়, তার ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি না। সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের অনবদ্য অবদানের কারণও ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, গ্রীস ও তার উপকূলভাগ এমন ছিল, যা ছাড়া গ্রীসের রাজনৈতিক জীবন কোনদিন পূর্ণতা লাভ করতো না। ছোট সমতলভূমি ও পাহাড়-প্রাচীর ঘেরা সে দেশ যেখানে রয়েছে গভীর খাতের উপকূল ও পরপারে দ্বীপরাজি, যা প্রাচ্য সভ্যতাসমূহের সাথে করেছে আত্মীয়তা। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাই ও গমের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এ দেশে রয়েছে কৃষিজ সম্পদের স্বল্পতা। ফলে অধিবাসিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও পুরস্কারের প্রতি। তাছাড়া, জলবায়ুর প্রভাবে এখানে রয়েছে মুক্ত আলোর

www.nagorikpathagar.org

ছড়াছড়ি, এবং তা নগরগুলোকে পর্যন্ত কর্মচঞ্চল করে তুলেছে। এমনি পরিবেশ সত্যিই এর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সমুদ্র ও উত্তর-গ্রীসের পর্বতমালার প্রহরায় বর্বরদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিল সে সকল নির্জন সমতলভূমি ও উপত্যকা. এবং অন্যদিকে তার পোতাশ্রয়গুলোর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে নিয়ত ভাবের আদান-প্রদান চলত। ফলে সেখানকার 'নগর রাষ্ট্রে' স্ব-শাসনমূলক কাজ-কর্ম বিকাশলাভ করবার সুন্দর সুযোগ লাভ করে। প্রথমে উচুঁ পর্বত বা সংরক্ষিত কোন পোতাশ্রয় বা নদীর মোহনায় বসতি স্থাপন ক'রে তারা তাড়াতাড়ি তাদের গ্রামগুলোকে এক রাজনৈতিক এককে সম্মিলিত করে। অ্যাটিকার (Attica) 'শহরগোষ্ঠী' হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ; যার মাধ্যমে ছোট ছোট শহরগুলো এক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তাদের নাগরিকত্ব এক হয়ে যায় ও কেন্দ্র হয় এথেন্স।

নতুন পরিবেশে এ জনগোষ্ঠী নগর-জীবনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে ওঠে এবং শহুরে জীবনের বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এ জীবন-বোধের যথার্থ অনুধাবনের জন্য কিভাবে শহর প্রত্যেকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায় তা জানা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, গ্রীসের অধিকাংশ অধিবাসী প্রাচীন রীতিনীতির বিধি-নিষেধ উপেক্ষা ক'রে নতুন জীবনধারাকে দুঃসাহসের সাথে গ্রহণ করে।

মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কই নগর-জীবনে চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান; প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নয়। শহরে জীবিকা ও সাফল্য নির্ভর করে মনের পারস্পরিক মিলনের উপর; ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং নিরাসক্তির উপর। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে ওঠে সতর্কতার এক মনোভাব, সহিষ্ণুতা ও বাক্‌সংযম। এর মূলে থাকে প্রকৃতির অজানা ও নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সাথে একদিকে যেমন নিয়ত সংযোগ; অন্যদিকে তেমনি ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা, যা থেকে মানুষ পায় শ্রমের প্রচুর পুরস্কার। বিভিন্ন ঋতুর পালা বদলের ফলে মানুষের মনে জাগে চরম পরিণতির সার্থক ধারণা; তেমনি জীবনের গতিধারা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের স্থির ধারায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এ পরিবর্তন-শীলতার ঊর্ধ্বে রয়েছে অনাদিকালের পরিবর্তনহীন বস্তুর প্রতিকৃতি—প্রতি প্রভাতে ফিরে আসা সূর্য, ঝিকমিক করা তারকারাজি এবং স্থির পৃথিবী—

www.nagorikpathagar.org

যার ফল ও জীবজন্তু বিনষ্ট হ'লেও জন্মের রহস্যে জীবনের অঙ্কুর পুনর্জীবন লাভ করতে থাকে। অস্থায়ী ও চিরন্তনের মধ্যে যে পার্থক্য, তাই দেশবাসির ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ জীবনের প্রত্যেক বিবরণে এ সুর প্রতিধ্বনিত হয় এবং এ কালের হামসুনের (Hamsun) 'ভূমির বৃদ্ধি' গ্রন্থেও তা দেখা যায়। পৃথিবীর চিরন্তন প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জীবন, মৃত্যু ও বিবাহের ন্যায় মৌলিক ঘটনাবলী গভীর গুরুত্ব অর্জন করে। কিন্তু নগরের অধিবাসিরা আর এক জগতে বাস করে। তাদের কাছে ক্ষণকালীন ও নিত্যপ্রাকৃতিক ঘটনার গুরুত্ব অনেক কম। অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বিপ্লব ছাড়া প্রকৃতির খামখেয়ালী ও ভয়াল পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তারা সদা প্রস্তুত। প্রকৃতির প্রক্রিয়া নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তার উৎপাদন নিয়েই তারা কারবার করে। বিভিন্ন দৃশ্য ও ঘটনাবলির পরিবর্তনশীলতার পটভূমিতে মৃত্যু তার মনে কমই ছায়াপাত করে। তাদের সমকালীন ধারণা তীক্ষ্ণতর; যদিও তাদের দীর্ঘকালীন বোধ একটু স্থূল। প্রকৃতির সাথে সংযোগের চেয়ে শিল্পকলার সাথে তাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। প্রথার সাথে রীতিনীতিও তাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। তাই একই সাথে তারা হয় সমালোচনা-মুখর ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন।

নগরের এ মর্মবাণী সামাজিক ঐক্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করে। রক্তের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসে; কেননা বিভিন্নরূপ সংযোগের ফলে নির্দিষ্ট স্বার্থ বৃদ্ধি পাবার সুযোগ পায়। এর আবেদন হয় বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন বয়সী জনগোষ্ঠীর নিকট। আত্মীয়তাভিত্তিক সংগঠন হিসেবে শুধুমাত্র পরিবারই থাকে কার্যকরী। মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিকে কেন্দ্র ক'রে সে পরিবার গড়ে ওঠে। অন্যান্য স্বার্থ আত্মীয়-চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি পারিবারিক সম্বন্ধ থেকেও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রায় সকল কাজ-কর্মের কেন্দ্র হিসেবে পরিবারের সে মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। পরিবারের হাতে থাকে শুধু যে সকল কাজ-কর্ম, যা তার প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। অতীতে যে সকল কাজ-কর্ম পরিবার সম্পন্ন করতো, তাদের অনেকগুলোই এখন পরিবারের হাত থেকে সরে আসে। নগর যে সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ দান করে এবং বিভিন্ন স্বার্থের প্রভেদ নির্ণয়ে যে

www.nagorikpathagar.org

উৎসাহ নগর-জীবন দান করে, তার ফলে মানুষ বিভিন্ন কর্মের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র খুঁজে ফেরে। এককালে বাড়ী যে সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তা ক্লাব, হোটেল, নাট্যশালা, মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। মূলতঃ পরিবারই ছিল একদিন সম্প্রদায়; কিন্তু এখন তা রূপান্তরিত হল সংঘে এবং নগর হল মৌলিক এক সম্প্রদায়। সামগ্রিকভাবে মানুষ নগরের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। নতুন অর্থে মানুষ হল নাগরিক।

নগর-জীবনে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকে তারা সভ্যতার সাথে এক করে ভাবতে শুরু করে। যে 'স্বাভাবিক' পরিবেশ গতিহীনতা ও ঐতিহ্য একে অন্যের শক্তি যোগায়, সে পরিবার থেকে মুক্তিলাভ করে তারা এক নতুন ঐক্য ও নতুন জীবন সংগঠনে আত্মনিবেদন করে।

ক্ষমতার প্রকৃতিও তেমনি এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। নগর-জীবনের ব্যবস্থাপনার জন্য আরও কেন্দ্রীভূত জটিলতর এবং নিরবিচ্ছিন্ন নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করা হয়। আইনের লক্ষ্য ও প্রয়োজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ যা অনুভব করে তা সৃষ্টি করে। ফলে আইন-শৃংখলা ও সাধারণ মঙ্গলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নগরের চার দেওয়ালের মধ্যে কর্তৃত্বের রহস্য কমে আসে এবং এর সরকারী ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নগর তাই সংঘবদ্ধ গণতন্ত্রের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। সে গণতন্ত্র বিবেচনাপ্রসূত, সমালোচনা-মুখর, অস্থির এবং তা উপজাতীয় জীবনের আকারহীন রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ গণতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে প্রসারিত হয়; কিন্তু সাথে সাথে তা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তিরস্কারও করে—নিয়ন্ত্রণও করে। নাগরিক হল প্রজা বা দাসের ঠিক বিপরীত। বাহ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে একদিকে যেমন নগরে ব্যবস্থাপনার আয়তন বৃদ্ধি পায়; তেমনি অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের দাবীও এখানে মুখর হয়ে ওঠে। এ দুই প্রয়োজনের তীব্র দ্বন্দ্ব সমগ্র রাজনৈতিক সমস্যাকে নতুনভাবে দাঁড় করাল।

সংক্ষেপে, এই হল নগর-জীবনের মর্মকথা; যা অতীতে এবং বর্তমানেও অনুভব করা হয়। প্রামাণ্য ইতিহাসে গ্রীস দেশেই সর্বপ্রথম এ মর্মবাণী সকল বিরোধী প্রভাবকে কাটিয়ে উঠেছিল এবং প্রাচীন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে অমর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

দুই : গ্রীসের রাজনীতি

কৃষ্ণসাগর থেকে সিসিলি পর্যন্ত ও ইতালীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ ও দ্বীপগুলোর গ্রীক বসতি স্থাপনকারিরা নিজেদের স্ব-শাসিত নগর স্থাপন করে এবং সবগুলোতে তারা একই রাজনৈতিক বিবর্তনের বীজ বপন করে; হোমারের গানে বর্ণিত উপজাতীয় রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ততদিনে অবলুপ্ত হয়েছে। রাজার কর্তৃত্ব অভিজাত সম্প্রদায়গুলোর হাতে চলে এসেছে এবং তাঁরাই নগরের আইন-পরিষদ ও শাসন-বিভাগগুলো পরিচালনা করছে। অভিজাত ভূস্বামী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়, তারই ফলশ্রুতি হ'ল এ সব সরকারী পদ। এ সংগ্রামের ফলে এক নতুন সংবিধান গ'ড়ে উঠেছে, যা হ'ল একধরনের আপোষ-মীমাংসা বা 'পূর্ণগণতন্ত্র'। সংগ্রামের গতিধারায় কিছু দিনের জন্য নগর-শাসনের জন্য কোন স্বৈরাচারী বা 'একনায়কের' জন্ম হয় বটে; কিন্তু কালক্রমে সরকারের এমন বৈশিষ্ট্য দানা বাঁধে, যেখানে নাগরিকদের এক সংস্থা—তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, রাজনৈতিক কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কর্মচারী নির্বাচনেই শুধু যে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করে তা নয়; নগরের কাজ পরিচালনাতেও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে।

এ বিবর্তন ধারা দেখাবার জন্য বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে; কিন্তু স্পার্টা ও এথেন্সের মত কোনটির এত স্পষ্ট, এত গুরুত্বপূর্ণ ও এত কেন্দ্রাপসারী নয়। স্পার্টা নগরী গঠিত হয়েছে পাঁচটি গ্রামের সমন্বয়ে। কিন্তু এ পাঁচটি গ্রাম সংযুক্তির পরও তারা রইল স্বতন্ত্র ও এলোমেলো। সম্ভবতঃ এ সংযুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দুটো উপজাতির মিলন; কারণ স্পার্টায় দুজন রাজা বর্তমান আছেন। তা'ছাড়া, নাগরিকত্বের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও সে রাজাদের ক্ষমতা লোপ পায়নি। তাঁদের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেলেও তাঁরা রাজা রয়ে গেলেন। রাজা হিসেবে তাঁরা হলেন দেশের সেরা পুরোহিত ও সামরিক নেতা। কিন্তু আইন-সংক্রান্ত, বিচারবিভাগীয় ও শাসন-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা পরিচালিত হয় সিনেট (গেরুসিয়া—Gerousia) ও আইন-পরিষদ (এপেলা—Apella) কর্তৃক। পদাধিকার বলে দু'জন রাজা ও ত্রিশজন সদস্য বিশিষ্ট সিনেট আইন-পরিষদ কর্তৃক আজীবনের জন্য নির্বাচিত হয়ে এক উপদেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

সংস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু আইন-পরিষদ গঠিত হ'তো প্রত্যেক নাগরিকের সমন্বয়ে—অর্থাৎ ৩০ বছর ও তদূর্ধ স্পার্টার প্রত্যেক ব্যক্তি সদস্য। এর ইচ্ছাই ছিল দেশের আইন। দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ই হোক বা পররাষ্ট্রীয় বিষয়ই হোক, সিনেট বা রাজাদের বা শাসন কর্তৃপক্ষের সকল সুপারিশ সিদ্ধান্তের জন্য আইন-পরিষদে পাঠান হ'ত। তথাপি স্পার্টার বৈশিষ্ট্য ছিল রক্ষণশীলতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক সুসামঞ্জস্য সমন্বয়। এজন্য আইন-পরিষদে পাঠাবার পূর্বেই সিনেট ও কর্তৃপক্ষ যেকোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। আইন-পরিষদ তা অগ্রাহ্য করলে সিনেট তখন বিরুদ্ধমত পোষণ করত ও আইন-পরিষদকে ভেঙ্গে দেবার ঘোষণা জারী করত।

প্রথমদিকে আইন-পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন আহ্বান করতেন রাজা; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর অধিবেশন আহ্বান করতেন 'তত্ত্বাবধায়ক' নামধারী কর্মকর্তাগণ। তাঁরা রাজার ন্যায় আইন-পরিষদকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন। এসব তত্ত্বাবধায়ক এক বিশেষ ধরনের শাসন পরিচালক ছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন পাঁচজন। তাঁরা প্রধানতঃ বিচারবিভাগীয় কাজ করতেন। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রাথমিক দ্বন্দ্বে তাঁরা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা দখল করেন; কিন্তু সমগ্র নগর-রাষ্ট্রে সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁদের। তাঁরা রাজার ক্ষমতা প্রয়োগেরও তত্ত্বাবধান করতেন। যেকোন নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত হ'তে পারতেন; কেননা তা একপ্রকার ভাগ্য নির্ধারণের দ্বারা সম্পন্ন হত। ভাগ্যের দ্বারা এ নির্বাচনকে আমরা হয় গণতন্ত্রের যুক্তিসংগত পূর্ণতা হিসেবে গ্রহণ করব, না হয় তাকে গণতন্ত্রের অযৌক্তিক ত্রুটি হিসেবে গণ্য করব। কিন্তু তা যাইহোক, এ রীতি গ্রীক-রাষ্ট্রমন্ডলে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

এ অদ্ভুত সংবিধান গ্রীসের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সমগ্রকাল ব্যাপী প্রায় অপরিবর্তিতরূপে বিদ্যমান থাকে; কিন্তু এর রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তা ইজিপ্ট বা প্রাচ্যের সমকালীন সভ্যতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সংগঠিত সরকার শেষ পর্যায়ে জনগণের মন্ত্রী-পরিষদের আকার ধারণ করেছিল; কেননা এ মন্ত্রী-পরিষদ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হ'তো ও জনগণের নিকট তা দায়ী থাকত। এ পদ্ধতিতে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ও

www.nagorikpathagar.org

আইনগত সার্বভৌম এক হয়ে গিয়েছিল। নগর-রাষ্ট্রের উপযোগী এ সমাধানকে সাময়িক সমাধান বলা যেতে পারে; কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার বিকাশে এর গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়. গ্রীক নগরগুলো ছিল অনেকটা মুক্ত নগরের মত। সরকারের লক্ষ্য ছিল নগর-রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন, এবং নাগরিকরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে তা সম্পন্ন করত। পৌর ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল অভিন্ন। সামগ্রিকভাবে নাগরিকদের দৃষ্টিভংগী এর বিকাশে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। হবস্ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বলেছিলেন যে, "প্রাচীন গ্রীস ও রোমানদের ইতিহাস ও দর্শনে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা এতবার উল্লেখ করা হয়েছে, তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতা নয়। তা হ'ল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। এ অর্থে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। স্পার্টা সম্বন্ধে যা সত্য, অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের বেলায়ও তা মোটামুটি সত্য।"

রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের একাত্মতার ফলে জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নাগরিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্পার্টার সংবিধানকে গণতান্ত্রিক বলা যায়; কিন্তু যখন আমরা ল্যাসেডিমনিয়ার (Lacedaemonia) সমগ্র জনসংখ্যার দিকে তাকাই, তখন একে কুলীনতন্ত্র বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নাগরিক ছাড়া সেখানে ছিল ভূমিদাসরা (Helots) এবং ছিল ভোটাধিকার বঞ্চিত 'এখানে-ওখানে বসবাসকারী লোকজন' (Perioeci); যাদের কাজ ছিল রাজস্ব দেয়া বা যুদ্ধের সময় যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা। নাগরিকরা ছিল নগরের এ ধরনের লোকদের প্রভু, এবং প্রত্যেকের ভাগে পড়ত এক একটা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য জনসংখ্যা। এ ব্যবস্থায় খুব অল্পসংখ্যক নাগরিকের হাতে রাষ্ট্রীয় এলাকায় সামরিক আধিপত্য ন্যস্ত ছিল। এর ফলে সহজেই স্পার্টায় রক্ষনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের নিয়ত উপস্থিতি এর নীতি নির্ধারণ করত। প্রত্যেক নাগরিক ছিল এক একজন সৈনিক, এবং প্রত্যেককে দশ বছর ধ'রে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। তা কিন্তু ব্যারাক জীবনের আধা-সাম্যবাদী ব্যবস্থায় কড়াকড়ি শৃঙ্খলার মধ্যে পরিশোধিত হত। নির্মম শৃঙ্খলা রক্ষার সুতীক্ষ্ণ ব্যবস্থায় স্পার্টার সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়োজিত হয়েছিল। সেখানে নাগরিক ছাড়া অন্যান্য লোকজনদের নিয়মের কঠোর

www.nagorikpathagar.org

বেড়াজালের মধ্যে রাখা হত। তাই এর গণতন্ত্র ছিল যেমন অনমনীয়, তেমনি ছিল সীমিত। স্পার্টা সামরিক-রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এর কাঠামোয় কোন সৃজনধর্মী পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সুতরাং যখন নতুন প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিল, তখন তার জীবনীশক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং দ্রুত পতনের দিকে সে এগিয়ে গিয়েছিল।

পেলোপোন্নেসাসে এথেন্স ছিল স্পার্টার মহান প্রতিদ্বন্দ্বী। এথেন্সের সংবিধান তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংবিধান থেকে কাঠামোর দিক থেকে না হলেও আত্মশক্তি ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এথেন্সও এক শহরসমষ্টি থেকে গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু এ্যাটিকার (Attica) অবশিষ্ট অংশটুকু যখন তার অধীনে আসে, তখন সকল জনসংখ্যা তার নাগরিকের মর্যাদালাভ করে। রাজধানীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে প্রত্যেকটি শহর ও গ্রাম অংশগ্রহণ করে এ্যাটিকার ছোট রাষ্ট্রটি ঐক্য ও স্বাধীনতার এক পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এটা হ'ল স্বাধীন জীবন-ব্যবস্থার এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা আর একটু বিকশিত হ'লে রোমের প্রজ্ঞার আলোকে তা ভাস্বর হ'য়ে উঠতে পারত এবং তার ফলে গ্রীস কেন, সম্ভবতঃ বিশ্ব-ইতিহাসের ধারাও পরিবর্তিত হত। এথেন্সের নাগরিকরা চারটি উপজাতির মধ্যে সীমিত ছিল এবং প্রত্যেকটি উপজাতি তিনটি সৌভ্রাতৃমণ্ডলে বিভক্ত ছিল। এই সৌভ্রাতৃমন্ডল পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এ ব্যবস্থা থেকে জানা যায়, কি প্রক্রিয়ায় আত্মীয় ভিত্তিক সংগঠন নগর-সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এসব 'ফ্রেত্রি' বা সৌভ্রাতৃমন্ডল প্রাচীন এথেন্সে আজও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা ও নাগরিকদের রেজিস্ট্রিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু কাজ-কর্ম করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ক্ষমতাগুলো ছিল বিস্তৃততর, এবং এটা জানা যায় যে, এসকল সংস্থার কাজ ক্লিসথেনিস (Cleisthenes) বহু পরিমাণে খর্ব করেন। তা'ছাড়া, এটাও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, কিভাবে নাগরিকত্বের শর্তাবলী সকল সংঘের আত্মীয়-ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে। অন্যান্য রাজার মত উপজাতি-প্রধান ও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারিতে পরিণত হন। 'ফ্রেত্রি' বা সৌভ্রাতৃমন্ডলগুলো ও আত্মীয়গোষ্ঠীর আওতা বৃদ্ধি ক'রে তাদের মধ্যে পুরোনো পরিবার ও নাগরিকদের নতুন পরিবারগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণ কুল-পরিচয় সংগঠনের আর মূলসূত্র রইল না;

www.nagorikpathagar.org

বরং এক দেবতার অর্চনাই অনেকটা কার্যকরী ঐক্যসূত্রে পরিণত হয়। প্রত্যেক দলের প্রধান সরকারী কাজ হ'ল নাগরিকত্বের অধিকারকে সংরক্ষণ করা। প্রাচীন এথেন্সের আইন ও জীবনধারা থেকে অনেক জিনিস এখনও খুঁজে পাওয়া যায়; যার মাধ্যমে আত্মীয়তা থেকে নাগরিকত্বের পরিবর্তনধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; যেমন ভাই-এর বিধবা-স্ত্রীকে ভাইয়ের প্রতিপালন করবার দায়িত্ব। অতীতে এটা ছিল প্রথাগত; কিন্তু ডেমোস্থেনিসের (Demosthenes) আমলে তা হয় আইনভিত্তিক। এ প্রসংগে এও বলা চলে যে, গ্রীসের অন্যান্য নগরের ন্যায় এথেন্সেও কুলীনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে, তা এখানে ছিল অনেকটা আত্মীয়তা ও নাগরিকত্বের মধ্যে সংগ্রামের ন্যায়। আত্মীয়বর্গের আভিজাত্য যা 'ইউপ্যাট্রিড্স্' (Eupatrids) নামে পরিচিত, তা 'সাধারণ কাজে নিয়োজিত জনসাধারণের' সাথে বিশেষ সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়। রোমের ন্যায় এথেন্সেও অভিজাত শ্রেণী (প্যাট্রিসিয়ান—Patrician) সাধারণ লোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধে তাদের কুলগত অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে; কিন্তু নগর-শাসিত সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের তাগিদে নগরের 'আত্মশক্তি' সাধারণ লোকদের পক্ষে রায় দেয়। ফলে ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাংগঠনিক গণতন্ত্রের জন্ম হয়।

এথেন্সের গণতন্ত্রের বিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমাময়। অভিজাত পরিবারগুলো ভবিষ্যতের দিকে আর না তাকিয়ে রাজতন্ত্রের নিকট থেকে ক্ষমতা সরিয়ে নেয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাজার অধিকার সংরক্ষণ করে। অভিজাত পরিষদ তখনও নগর শাসন করত। এ শাসক-শ্রেণী আকারে-প্রকারে তখনও ছিল সামন্তবাদী। পৌর-প্রতিষ্ঠানরূপে তখনও তা সংগঠিত হয় নি; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তারা এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যেখানে অভিজাত ভূ-স্বামীদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে ও কার্যালয়ে কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর কর্মীরাও সংযুক্ত হয়। এথেন্সের বাণিজ্য সম্পদ ক্রমেই বেড়ে চলে। তার বাণিজ্যপোত সুদৃশ্য মৃন্ময়-পাত্র ও অলংকৃত পাত্ররাজি, রৌপ্য ও স্বর্ণের সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র অলংকার, অলিভ তেল ও গমের ন্যায় গ্রীসভূমির উন্নত উৎপাদন ও মদের মত সভ্যতার উন্নত সামগ্রী রপ্তানী করবার সাথে সাথে সে দেশের নতুন বিলাসসামগ্রির মধ্যে নিয়ে আসত নতুন নতুন সম্পদ ও নতুন নতুন প্রভাব। খ্রীস্ট-পূর্ব সাত শতকের মাঝামাঝি সেখানে সম্পত্তির এক রকম শ্রেণীবিন্যাস সম্পন্ন হয়। এর

www.nagorikpathagar.org

ফলে প্রাচীন ব্যবস্থা ধ্বসে পড়তে শুরু করে। সামাজিক মর্যাদাভিত্তিক তিনটি শ্রেণীর বদলে সম্পত্তি ভিত্তিক তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ভূ-সম্পত্তি থেকে বছরে অর্জিত সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ শ্রেণীবিভাগ করা হ'ত—সর্বনিম্ন পাঁচশো এককে প্রথম শ্রেণী, তিনশো এককে দ্বিতীয় শ্রেণী ও দু'শো একক সম্পত্তিতে নির্ধারিত হ'ত তৃতীয় শ্রেণী। সর্বনিম্ন এককের নীচে যারা থাকত, তাদের চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা হ'ত। এরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে কর-ধার্য-প্রথাও পরিবর্তিত হয় এবং রাজনৈতিক বিশেষ অধিকার ভূ-স্বামীদের নিকট থেকে সম্পদশালীদের নিকট হস্তান্তরিত হবার পথ পরিষ্কার হয়। এর ফলে একশ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে সমাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ক্রমশঃ হস্তান্তরিত হবার পথও প্রশস্ত হয়। সম্পদের মাধ্যমে যে কেহ বিশেষ সুবিধা ভোগকারী শ্রেণীতে উন্নীত হ'তে পারত। এভাবে কৌলিন্যপ্রথা ভেঙ্গে পড়ে বংশমর্যাদা আর অলঙ্ঘনীয় রইল না।

এভাবে আমরা দেখি, খ্রীস্ট-পূর্ব সাত ও ছয় শতকের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতায় এথেন্স রাষ্ট্রের যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হ'ল ক্ষমতার পরিব্যাপ্তী; অতীতে যেসব পদ পাঁচশো একক সম্পদের অধিকারিদের বেলায় সীমিত ছিল, তা এখন নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও মুক্ত হয়। সোলোনের (Solon) আমলে জনগণের আইন-পরিষদ ও জনতার সভায় চতুর্থ শ্রেণীকেও প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তবে শাসন-পরিষদে তাদের প্রবেশাধিকার তখনও দেওয়া হয় নি। যে প্রাচীন অভিজাত পরিষদ 'রণদেবতার পর্বতে' (Hill of Mars) অবস্থিত এরিওপেগাসে অনুষ্ঠিত হত, তার পরিবর্তন করা হয় এবং এখানে শাসন বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারিদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এ পরিষদের শাসন সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় ক্ষমতার বিলোপ করা হয় ও 'আইনের অভিভাবক'-রূপে নতুন ধরনের এক অনিশ্চিত মর্যাদা এর ভাগ্যে জোটে। 'চারশো সদস্যের একটা নতুন পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে নিম্নতম শ্রেণী ব্যতীত সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। এর প্রধান কাজ ছিল আইন-পরিষদের কর্মসূচী তৈরী করা। এ পরিষদ ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে এবং কালে তা এক উল্লেখযোগ্য সংস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'ল, জনগণের বিচারালয়ের এক ব্যবস্থা সংগঠন; যেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর লোক বিচারকের ভূমিকায় কাজ করবার সুযোগ লাভ

www.nagorikpathagar.org

করতো ; কেননা বিচারকের তালিকা নির্ধারিত হ'ত ভাগ্যের দ্বারা। জনগণের বিচারক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন তাদের হাতে কোন প্রাক্তন শাসকের কাজকে 'বে-আইনী' ঘোষণার ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়। ভাগ্যের মাধ্যমে বিচারকদের নির্বাচন-ব্যবস্থা আমাদের আধুনিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে অসংগত মনে হয় ; কিন্তু তার থেকে বেশী অসংগত মনে হয়, শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভাগ্যের নীতি প্রবর্তন ; যদিও সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। ভাগ্যের দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে কোন কোন গণতান্ত্রিক মতবাদের যুক্তি-যুক্ত পূর্ণতা হিসেবে গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূলে সম্ভবতঃ আরও দু'টো মূলনীতি কাজ করেছে। সেগুলো হ'ল, প্রথম জনগণের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটানো ও দ্বিতীয়, এর ফলে কোন কোন বিষয় জনগণের সিদ্ধান্ত থেকে দেবতাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছল ; এমনি ধরনের এক সেকেলে বিশ্বাসকে আঁকড়িয়ে রাখা।

সোলোনের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা ও কুশলী-বুদ্ধিবৃত্তি, যা তাঁর সংস্কারসমূহে প্রকাশিত হয়েছে ; তা সত্ত্বেও সেখানে সংঘর্ষ ও আলোড়নের এক যুগ শুরু হয় ; যা যুগে যুগে নগর-রাষ্ট্রে অভিশাপের মত নেমে এসেছে। উপজাতি ও সৌভ্রাতৃমন্ডলে সংগঠিত আত্মীয়তার বন্ধন নাগরিকত্ব নীতির বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং এ গোলমালের সুযোগ নিয়ে 'স্বেচ্ছাচারী'-শাসকের (Tyrants) অভ্যুত্থান ঘটে। অবশ্য তা পর্যুদস্তও হয়। তখন সংস্কারক ক্লিসথেনিস অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পুরোনো উপজাতি-গুলোকে উচ্ছেদ করেন ও সৌভ্রাতৃমূলক সংঘ ও আত্মীয় বন্ধনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলেন। তিনি তাঁর নতুন উপজাতিকে এমন কৌশলের সাথে সংগঠিত করেন, যার ফলে স্থানীয় জেলা বা ডেমি (Deme) শাসনের ভিত্তিতে পরিণত হয়। তিনি প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে নগরের একটি জেলা, আভ্যন্তরীণ এলাকার একটি জেলা ও উপকূল ভাগের একটি জেলার সংযুক্তি ঘটান। সাথে সাথে তিনি বৃহৎ ভৌগলিক এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাচীন উপদলগুলোকে ভেঙ্গে দেন, এবং আত্মীয়ভিত্তিক গোষ্ঠী ভেঙ্গে দিয়ে ছোট ছোট আঞ্চলিক এলাকাগুলোকে কাজে লাগান। দেশে গণতন্ত্রায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে সেগুলোই ছিল কেন্দ্রস্বরূপ। ক্লিসথেনিস তাঁর নতুন উপজাতিগুলোর ভিত্তিতে পাঁচশ সদস্যের এক নতুন পরিষদ গ'ড়ে তোলেন। প্রত্যেক উপজাতির পঞ্চাশজন প্রতিনিধি নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়। এর

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্ব ছিল বছরের এক দশমাংশ সময়ের জন্য সরকারী কাজ পরিচালনা। এর পেছনে থাকে জনগণের আইন-সভা। তার প্রধান কাজ ছিল আইন হিসেবে কার্যকরী হবার পূর্বে পরিষদের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা।

এভাবে এথেন্সের সুনির্দিষ্ট ও আদর্শস্বরূপ সংবিধান গ'ড়ে ওঠে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম এরই মাধ্যমে জাতি, কুল, উপজাতি ও পরিবারের ন্যায় 'স্বাভাবিক' জনগোষ্ঠির উপর রাজনৈতিক স্বার্থ জয়লাভ করে। এরই মাধ্যমে ধর্ম-প্রবণতার মত নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণশীলতা পৌর সচেতনতায় এক নতুন জ্যোতিকেন্দ্র খুঁজে পায়। এরই মাধ্যমে কোন বর্ধিষ্ণু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ অনৈক্য ও ব্যবধানের সমন্বয় সাধনের পর মুক্ত ও সমান নাগরিকত্বের ধ্যান-ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। এথেন্সের ঐতিহাসিক ধারায় সংবিধানে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়; কিন্তু এর কাঠামো থাকে অপরিবর্তিত। এর ফলে বিশ্বে তা হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পরিবর্তন আনা হয়। শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তারা কেবলমাত্র ভাগ্যের দ্বারা নির্বাচিত হ'তেন এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরও এতে প্রবেশাধিকার ছিল।

অভিজাত এরিওপেগাস সংসদের নিন্দাসূচক প্রস্তাব জ্ঞাপনে ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে এবং অর্থনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমতা আনার জন্য এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে শাসক হিসেবেই হোক বা উপদেষ্টা হিসেবেই হোক বা বিচারক হিসেবেই হোক, সরকারী কাজের জন্য বেতন দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়। পেরিক্লিস বহুসংখ্যক গণ-নির্বাচিত কর্মকর্তার বেতনদানের ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত শর্ত হিসেবে স্বীকার করলেও এর অন্যান্য কতকগুলো কুফল ছিল। এথেন্সের নাগরিকরা এতদিনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। তবে অবশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা ও দেশের যুদ্ধ-জাহাজ পরিচালনার ব্যয়ভার নাগরিকদের বহন করতে হত। এভাবে সমগ্র নাগরিক-গোষ্ঠী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে ও এথেন্সে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকটি মানুষকে নাগরিকতা অধিকার দেয়া হয়। এথেন্সের রাজকীয় মর্যাদায় তা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে এবং এথেন্সও মিত্র রাষ্ট্রগুলোর রাজস্ব পেয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়। পেরিক্লিসের আমল হ'ল তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয় গৌরবের চূড়ান্ত কাল। এর পর থেকে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি বা গ্রীসের নগরগুলোর

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতির দুর্বলতা প্রকাশ হ'তে থাকে; কেননা তখন থেকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহির্শক্রর আক্রমণের মুখেও নগরগুলো স্ব-শাসনের দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে। যখন থেকে এথেন্স ও স্পার্টা আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়; তার বিশ বছরের মধ্যেই পারসিক বাহিনী এক্রোপলিসে অবস্থিত এথেন্সের মন্দিরকে পুড়িয়ে ফেলে ও তাকে অপবিত্র করে। এ সংঘর্ষ তাদের উভয়েরই পতনের পথ প্রশস্ত করে। ইতিমধ্যে বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের দ্বারা এথেনিয়াম গণতন্ত্রের কাঠামোও ভেঙ্গে পড়ে। এর মূলে ছিল যুদ্ধ বিধ্বংস জনতার অসন্তোষ। সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ঘটে বটে; কিন্তু তা হয় প্রাচীন ও নতুন সাম্রাজ্যের ছায়ায়—প্রথমে কার্থেজ সাম্রাজ্যের, পরে ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের এবং শেষে রোম সাম্রাজ্যের ছায়ায় তা পুনর্জীবিত হয়। শেষ পর্যন্ত রোমই এ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে।

তিন: সর্বাত্মক অংশীদারত্বের প্রতীকরূপে নগর

'Reflections on the Revolution in France' গ্রন্থের বিখ্যাত এক বাক্যে এডমাণ্ড বার্ক (Burke) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র হ'ল 'সকল বিজ্ঞান, সকল কলা, সকল সার্থকতায় অংশীদারী এক মহান প্রতিষ্ঠান।' এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ কথাগুলো প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের আদর্শই ব্যাখ্যা করে। গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ নগরকে বিশ্বজনীন অংশীদারত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ গণতন্ত্রের যুগে বিশেষ অধিকার ভোগকারী ও বিশিষ্ট নাগরিকরা অন্ততঃ এভাবেই তা দেখেছেন। নাগরিকত্ব ছিল একটা দায়িত্ব; এবং তা ছিল অনেকটা পেশার মত মহান কাজ। বেলোক (Beloch) এটা তুলে ধ'রেছেন যে, পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সে ছিল ত্রিশ হাজার 'নাগরিক-জনসংখ্যা' ও উনিশশো সরকারী পদ। নিয়োগ সাধারণতঃ এক বছরের জন্য হ'ত এবং পুনর্নিয়োগকে তেমন উৎসাহ দেয়া হ'ত না। সুতরাং ষোল বছরে প্রায় প্রত্যেকটি নাগরিক সরকারী কাজ-কর্মের আওতায় এসে পড়তে পারত। তা'ছাড়া, গণ-আদালতের ছিল বিরাট কার্যক্রম। এ ছাড়াও ছিল অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও পালা-পার্বন; যেখানে বহুসংখ্যক নাগরিক অংশ গ্রহণ করত। নাগরিকদের জীবন ছিল অনেকটা নগরেরই জীবন। আদর্শগতভাবে নাগরিকের নিজের মঙ্গল ছিল অনেকটা রাষ্ট্রেরই

www.nagorikpathagar.org

মঙ্গল। এথেনিয়ান শাসন-ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের দিকটা ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। যখন এথেন্স ম্যাসিডনের আক্রমণের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়; তখনও রঙ্গমঞ্চে অর্জিত অর্থ সরকারীভাবে নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করা হত; যদিও ডেমোস্থেনিসের মত ব্যক্তি একে অর্থের অপচয় ব'লে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। এটাও বড় অদ্ভুত লাগে যে, এ্যারিস্টোটলও অত্যন্ত আগ্রহভরে 'সম্পদ বন্টনের ন্যায়নিষ্ঠতা' সম্বন্ধে বিশদ অলোচনা করছেন ও উদ্বৃত্ত-সরকারী অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত, তা'র পথ নির্দেশ করেছেন।

সার্বজনীন অংশীদারত্বের রাজনৈতিক আদর্শ হেলেনীয় জীবন দর্শনের অমর সৃষ্টি হিসেবে যে খ্যাতি লাভ করেছে, তা কিন্তু এর পুরো পাওনা নয়। এথেন্সের মুক্ত পরিবেশের ফলে বেশ কিছুকাল গ্রীসের প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিল। আমরা এটাও বলতে পারি যে, গ্রীসে সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প সৃষ্টির যে জোয়ার এসেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুক্ত আলো-বাতাসের জন্য। এ সাংস্কৃতিক পরিপূর্ণতার কারণ নির্দেশ করতে চাইলে আমাদের বিশিষ্ট কোন উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখলে চলবে না; বরং আমাদের বিবেচনা করতে হবে ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন সন্ধিস্থলকে; যার প্রভাবে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এ জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন বিদেশী সাম্রাজ্যের ভীতি থেকে মুক্ত হয়েছিল; ঠিক তেমনি অন্যদিকে প্রাচীন প্রথা ও রীতি-নীতির কঠোর শৃঙ্খল থেকেও নিজেকে মুক্ত করেছিল। এরই প্রভাবে এ জনগোষ্ঠির আয়ত্বে এসেছিল উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অবকাশরঞ্জনের সুযোগ; যার প্রয়োগ-গুণে এখানে গ'ড়ে উঠেছিল সুকুমার কলার বিরাট এক জগত। তা'ছাড়া, এরই প্রভাবে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার ফলশ্রুতি হিসেবে এথেন্সে বহু সভ্যতার বিভিন্নমুখী প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। গ্রীক-জীবন-দর্শনের বিবর্তনে স্ব-শাসিত নগর ছিল অনেকটা অপরিহার্য; কিন্তু পৌর-জীবনে পরিপূর্ণ অংশীদারত্বের আকারে স্ব-শাসনের যে ব্যাখ্যা, তা কিন্তু এর বিকাশে সহায়ক ছিল না।

এথেনিয়ান স্বাধীনতার ব্যাপকতাকে আমরা বাড়িয়ে বলি। কিন্তু এমনি বিশ্বজনীন অংশীদারত্বের ভয়াবহ দিকটাও ভেবে দেখবার মত। 'অভিযুক্তকরণের' মাধ্যমে এ মারাত্মক দিকটা প্রকট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র-নায়ক, আবিষ্কারক, এমনকি শিল্পী পর্যন্ত এর ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন

www.nagorikpathagar.org

হতেন। পেরিক্লিসের আমলে কার্যকাল শেষ হ'লে যে কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে কোন নাগরিক 'বে-আইনী' কাজ-কর্মের অভিযোগ আনতে পারত। এসব অভিযোগের সমর্থনে শুধু যে সংবিধান বহির্ভূত কাজ-কর্মের প্রমাণ তুলে ধরা হ'ত তা নয়। এর সাথে সাথে আসামির কাজ-কর্ম যে অনভিপ্রেত বা অবিবেচনা-প্রসূত তা উপস্থাপিত হত; অথবা এও বলা হত যে, আসামির উদ্দেশ্য ছিল অসাধু। নিন্দা প্রস্তাবের ফলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হ'ত। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারির সামনে থাকত এ ভয়াবহ পরিণতির খড়্গ। আরও জঘণ্য মামলা আনা হ'ত 'কার্যকারিতার অযোগ্য আইন প্রণয়ন' ও 'জনগণকে প্রতারণার অভিযোগে'। সর্বশেষে নাস্তিকতা বা সততাহীনতার জন্যও অভিযোগ আনা হ'ত। এরই আওতায় এনাক্সাগোরাসের (Anaxagoras) হয়েছিল জরিমানা, এবং তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। ফিডিয়াসকে (Pheidias) কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। সক্রেটিসও এ আইনের আওতায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এমনি বিধি-নিষেধের নিগড়ে অভিযোগ আনবার বল্‌গাহীন সুযোগ ছিল। এর দৃষ্টান্ত মেলে ইরিপাইড্‌সের (Euripides , মামলায়। তাঁর অন্যতম নাটক 'হিপ্পোলিটাসের' (Hippolytus) একটি চরিত্রের সংলাপ ছিল—'আমার জিহ্বা শপথ নিল। আমার অন্তর কিন্তু শপথ নেয়নি।' এজন্য তিনি নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

সত্যি কথা বলতে কি, 'সকল শিল্প ও সকল পুণ্যে' অংশীদারত্বের নীতি রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির কদর্থের এক ভয়াবহরূপ; যদিও নগর-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল তাই। প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের চিন্তাধারার যৌক্তিকতা এখানে আমরা পাই। অবশ্য বার্ক ও রুশো-সহ তাঁদের আধুনিক অনুসারিদের এ যৌক্তিকতায় কোন দাবী নেই। নগর-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ আওতা একক রাজনৈতিক নির্দেশনায় সম্মিলিত জীবন ধারার মতবাদকে উৎসাহিত করেছে। ডিমোক্রিটাস (Democritus) সত্যই বলেছেন—'সত্য ও সততা সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন।' প্লেটো এ নীতিকে পরিপূর্ণ এক রূপ দেন। সৎ ও সত্যনিষ্ঠ শিল্প, পুণ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হ'ল এক এবং একটি মাত্র। অন্যগুলো নিছক বিচ্যুতি ও স্খলন। ক্রীটো (Crito) গ্রন্থের সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডকে এড়িয়ে যেতে অস্বীকার করেন; কেননা আইনের সাথে যে চুক্তি হয়েছে, তা তিনি কখনও ভাঙ্গতে

www.nagorikpathagar.org

রাজী হন নি। কিন্তু আসলে ধর্ম ও জনমতের বিষয়গুলো আইনের আওতার বাইরে। আলোচনার কোন অংশে কিন্তু এমন কোন আভাস নেই।

প্লেটোর স্বপ্নরাজ্যে শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত, ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে যে রাজী হবে না, তার কোন স্থান নেই। তাঁর আইনসমূহ (Laws) গ্রন্থে এ ঘোষণা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকের পরিবার ও সম্পদ হল নগরের সম্পদ। এ্যারিস্টোটল তাঁর গুরুর মতবাদে প্রচুর সন্দেহ পোষণ করলেও কিন্তু তিনি কোন বিকল্প তত্ত্ব দেন নি। 'সৎ মানুষ হওয়া ও সৎ নাগরিক হওয়া'—যেসব সময় এক নয়, সে সম্বন্ধেও তিনি সন্দেহ পোষণ করেন ; কিন্তু তাঁর নিকট নীতিশাস্ত্র ছিল রাজনৈতিক সংরক্ষণতার আর একটা দিক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, তাঁর মতে, ব্যক্তি কোন্ কোন্ বিজ্ঞান চর্চা করবে, তা নির্ধারণ করবে নগর-কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও বলেন যে, সকল প্রকার সংঘ হল রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের অংশবিশেষ।' অথচ এ সময়ের বহু পূর্ব থেকে দুর্জ্ঞেয় বিশ্বজনীন ধর্মের প্রভাবে এমনসব সংঘ গড়ে উঠছিল, যা গ্রীসের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক অ-নাগরিকও সে ধর্মের উদার মতবাদের আলোকে জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে ফিরছিল।

গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তানায়ক হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন ; কেননা গ্রীক ভাষায় আধুনিক শব্দে 'রাষ্ট্রের' কোন প্রতিশব্দ ছিল না। ছিল শুধু 'নগর' এবং 'নগর-রাষ্ট্র' ; এবং এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তাই যখনই আমরা রাষ্ট্র হিসেবে তার অনুবাদ করেছি, তখনই করেছি তার ভুল অর্থ। রাষ্ট্রের উপর নয়, বরং নগর-সম্প্রদায়ের উপরই তিনি সর্বব্যাপক কর্মতৎপরতা ও কর্তৃত্ব আরোপ করেছেন। গ্রীকদের কাছে 'আইন' শব্দটির অর্থ ছিল 'প্রথা' বা চিরাচরিত রীতিনীতি। মানুষকে রাজনৈতিক প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করার বাক্যাংশটি দ্বারা আমরা যা বুঝি, এ্যারিস্টোটল কিন্তু তা বোঝাতে চান নি। তিনি তা দিয়ে এমন মানুষদের কথা বলতে চেয়েছেন, যাদের জীবন নগরের আওতায় সার্থক হয়ে ওঠে। গ্রীক ঐতিহ্য এভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে রাষ্ট্রের সার্বজনীন অংশী-দারত্বের এক আধুনিক মতবাদকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু আসলে তা মূল চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যহীন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও আজকের বিশ্বের গ্রীক, এমন কি রোমানদের অপেক্ষাও অনেক

www.nagorikpathagar.org

বেশী পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। নগর সম্প্রদায়ের স্ব-শাসন একটা মহান কীর্তি; এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমস্যা তথা সমাজে ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় সাধনের মহান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তা ছিল একটি পদক্ষেপ মাত্র। অবশ্য রাজনৈতিক সরকারের কর্ম পরিধির সঠিক অনুধাবন না হওয়া পর্যন্ত তাই ছিল বিশিষ্ট পদক্ষেপ। রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের ব্যর্থতার ফলে এথেনিয়ান স্বাধীনতা পরিণত হয়েছিল এক ভগ্ন ও বিকৃত স্তম্ভে।

সর্বব্যাপক রাষ্ট্র—তা এর আয়তন নগরই হোক আর জাতিই হোক, আইন ও প্রথার মধ্যে কোন ব্যবধান রচনা করতে পারে না এবং পারে না বল প্রয়োগ ও স্বতঃস্ফূর্ত আইন মেনে চলার মধ্যে কোন ব্যবধান রচনা করতে। সুশৃঙ্খল অবস্থা ও সংস্কৃতি আলোচিত পরিবেশের মধ্যে যে পার্থক্য, তাও এখানে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যে ক্ষেত্রে আইনের অনধিকার চর্চা ক্ষতিকর, সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আইনের প্রয়োগ যথেষ্ট নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম হয় না। 'রাষ্ট্র সর্ব শক্তিমান'—এ মতবাদ যতদিন টিকবে, ততদিন পর্যন্ত থাকবে বিভ্রান্তি ও নিপীড়ন। সরকার সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর মতবাদের জন্যই সেখানে একটি নগর-রাষ্ট্র অন্যটির সাথে নিয়ত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল;—এও বলা চলে। এমনি মতবাদে জীবনের কোন কিছুরই নিরাপত্তা থাকেনা—না ধর্মের, না মতের; যদি না এ মতবাদে বিশ্বাসীরা সরকারের নিয়ন্ত্রণভার পায়। সুতরাং সার্বজনীন অংশীদারত্বের নীতির ফলে যে বিভিন্নতা সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে, তাই সৃষ্টি করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও বিরোধিতার এক পরিবেশ। এবং এ সবই শেষপর্যন্ত তার ধ্বংস ডেকে আনে।

পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য আমরা আরও বিস্তৃতরূপে দেখব, কিভাবে সর্বব্যাপী সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ সাংস্কৃতিক সংঘগুলোর জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। এথেন্সে নাগরিকত্বের এ নীতি পরিবারের মত মৌলিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তার কুফল রেখে গেছে ব'লে মনে হয়। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, 'গৃহের প্রতিদান'-এর মত বাক্যাংশগুলো পরবর্তীকালের গ্রীক ভাষায় বুঝিয়েছে স্বজনের গৃহত্যাগ। নগর-পরিবারকে প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিল ব'লে মনে হয়। নাগরিকত্বের মাধ্যমে গ্রীস একদিকে যেমন আত্মীয়তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি সম্প্রদায়ের পরিবার

www.nagorikpathagar.org

তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। নগর তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুরুত্ব অর্জন করার সাথে সাথেই গৃহ কাজ-কর্মের কেন্দ্র হিসেবে তার গুরুত্ব হারায়। একই প্রথা, একইরূপ নিয়ন্ত্রণ ও একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ উপজাতীয় আমলের পরিবার এবং তার সংহতি হারিয়ে ফেলল। উপজাতীয় আমলে বিবাহপ্রথা ছিল ধর্মের একটা আচারের মত ও কৌমার্যব্রত ছিল গৃহদেবতার বিরুদ্ধে পাপস্বরূপ। নিয়ত প্রজ্বলিত অগ্নি ছিল গৃহদেবতার পূজার প্রতীক।

পুরোনো ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে এল; কিন্তু নতুন ব্যবস্থা নতুনভাবে সংগঠিত হল না। বিবাহপ্রথা পৌর-অনুষ্ঠানের সাথে তার সংযোগ হারাল। জন্মের তালিকা প্রণয়ন বন্ধ হ'ল এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বা যে কোন বয়সের মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নগরের দায়িত্ব আর রইল না। নারীদের পদমর্যাদার যথেষ্ট হানি হল। 'ক্র্যাটিলাসে' (Cratylus) প্লেটো এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে এ বর্ণনা দেন যে, এথেন্সের নারীরা সেকেলে এক ভাষা ব্যবহার করত। এক নব-বিবাহিত বধু সম্পর্কে জেনোফোন (Xenophon) বলেন যে, সে যেন এক বন্য জন্তু। তার প্রভুর সাথে (অর্থাৎ স্বামীর সাথে) কথা বলবার যোগ্য করে তুলবার জন্য প্রথমে তাকে পোষ মানাতে হবে ও তাকে তালীম দিতে হবে। এথেনিয়ান সংস্কৃতির সৌষ্ঠব সম্পর্কে পেরিক্লিস তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় এ মতের সমর্থন দিয়ে বলেন যে, ভাল বা মন্দ যে কোন বিষয়েই হোক, নারীদের কোন বক্তব্য না থাকাই হ'ল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। এ ধারণা নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রাচ্যদেশীয় ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। হোমারের কাব্যে নারী-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় বা সিওসের (Ceos) সাইমনিদ্‌দের গীতিকবি বা স্যাফোর কবিতায় নারীদের যে ছবি দেখা যায়, পাঁচ শতকে এথেন্সের নারীদের অবস্থা ছিল তা থেকে অনেক আলাদা। নারীসেবা ও নারীভক্তির বহু গল্প বলেছেন হিরোডোটাস; কিন্তু গ্রীসের সমকালীন গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস, (Thucydides) তাঁর বর্ণনায় শুধুমাত্র দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর সমগ্র বিবরণীতে প্রসংগক্রমে একটি নারীর কথা বলেছেন। নগরে নারীদের থাকতে হ'ত বাড়ীর ভেতর এবং তাদের জন্য থাকত নির্দিষ্ট এক স্থান। স্পার্টার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কেননা শেষপর্যন্ত স্পার্টা একগুচ্ছ গ্রামের সমষ্টিই রয়ে যায়। তরকারী ও শাকসব্জী বিক্রী ও রুটি বিক্রির মত

www.nagorikpathagar.org

কয়েকটি নগণ্য কাজ ছাড়া নারীদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পেশা ছিল না। গ্রীসের বেশীর ভাগ নগরে নারীর ভূমিকা এতই নগণ্য ছিল যে, তাদের সম্বন্ধে আমরা তেমন কোন খবরই পাই না।

এর একটা কুফল হ'ল এই যে, বাড়ীতে বঞ্চিত হয়ে গ্রীক নাগরিকদের বাধ্য হয়ে আনন্দ ও স্ফুর্তির জন্য বাইরে যেতে হ'ত এবং তাদের সে অভাব মেটাত 'সাথী' নামে এক শ্রেণীর স্বৈরীনির দল। তাছাড়া, যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদের মধ্যে একরূপ অন্তরঙ্গতা ঘটতে দেখা যেত; যা অদ্ভূতভাবে গ্রীক-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এর তুলনা চলে স্বাভাবিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে গড়ে-ওঠা প্রেম-ভালবাসার সাথে। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, গ্রীকরা অনেক বয়সে শুধু নিয়ম পালনের জন্য বিয়ে করত। এ্যারিস্টফেন্স্ (Aristophanes) তাঁর গ্রন্থ 'সিমপোসিয়ামে' (Symposium) সত্যই বলেছেন যে, অনেকেই বিয়ে করতে বা সন্তানের জন্মদিতে আগ্রহী ছিল না। শুধু নিয়ম পালনের খাতিরেই তারা তা করত। গ্রীসের জনসংখ্যা হ্রাস, বিশেষ ক'রে পরবর্তীকালে যে ভয়ঙ্কররূপে তার জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, তার কিছুটা ইঙ্গিত এতে মেলে; খ্রীস্ট-পূর্ব পাঁচ শতকের শেষদিকে পরিবার ও নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে এক প্রকার অস্বস্তি এসব কারণে লক্ষ্য করা যায়। নগরে পারিবারিক সমস্যা সঠিক অনুধাবন হয় নি, এবং পরিবার সম্বন্ধে রক্ষণশীল এ্যারিস্টোটলের ক্ষতিকর ও অবাস্তব প্রস্তাব ও প্লেটোর অতি প্রগতিশীল প্রস্তাবের কোনটিই গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্লেটো নারীদের পুরুষের 'সাথী' বানিয়ে দিয়ে চেয়েছিলেন পরিবারের সম্পূর্ণ অবসান এবং পৌর-সাম্যবাদে তার সম্পূর্ণ অন্তর্ধান।

সর্বশেষে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বব্যাপী নাগরিকত্ব ছিল বিশ্রীভাবে সীমিত। গ্রীসের নগরের অবস্থা ছিল অনেকটা এমনি 'সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অধিবাসী', আদিবাসি বা বিদেশী এবং তার উপরে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে সীমিত ছিল নাগরিকদের চক্র। এ্যারিস্টোটল ঘোষণা করেন যে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে কোন যন্ত্রশিল্পী বা হস্তশিল্পীকে নাগরিক অধিকার দেয়া হবে না।' ক্রীতদাস প্রথা ছিল প্রাচীন নগর-সম্প্রদায়ের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। প্রচুর অবকাশ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জন্ম দিয়েছিল গ্রীক সংস্কৃতির; কিন্তু এটা ভুললে

www.nagorikpathagar.org

চলবে না যে, ক্রীতদাসপ্রথা ব্যতীত অবকাশ ও স্বাধীনতার কোনটিই সম্ভব হত না। আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের মূলধনের অভাব এবং শ্রম-সঙ্কোচক যন্ত্রপাতি ও শিল্পসংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবের জন্য দাসপ্রথা শুধু যে লাভজনক ছিল তা নয়; তা ছিল নাগরিকদের 'উন্নতজীবনের শর্তস্বরূপ।' কিন্তু এ ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। স্পার্টার মত নগরে দাসপ্রথা বিদ্রোহের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। তা' ছাড়া তারা ছিল মুক্ত শ্রমিকদের ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দী এবং এরাই তাদের সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলেছিল। এমনি ধরনের অর্থনীতিতে কোন স্বাধীন কর্মীশ্রেণীর কোন স্থান ছিল না, এবং তারা বুভুক্ষু এক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে, উৎপীড়িত এ 'মানবরূপী যন্ত্রগুলো' উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বর্বর জনসমষ্টি থেকে নিয়ত আমদানী হবার ফলে বিরাট সংখ্যায় গ্রীসের নগরগুলোকে তাদের হীন ও গর্হিত সংযোগের দ্বারা কলুষিত করে তোলে এবং গণতন্ত্রের জয়যাত্রার দিনেও মানবতা সম্বন্ধে এক অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলে। অনেকের মতে, এটি হ'ল গ্রীসের জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম মারাত্মক কারণ।[১] এ অভিযোগ সত্যিই হোক আর মিথ্যাই হোক; এটা ঠিক যে, দাসপ্রথা তার মনস্তাত্ত্বিক কারণে গ্রীসের নাগরিকদের মধ্যে একরকম একগুঁয়ে বিচ্ছিন্নতার ভাব সৃষ্টি করে এবং এর ফলে তাদের ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রের উপর দিয়ে বিপদের যে ঘনঘটা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নাগরিকরা তা আমলে আনতে পারে নি।

এখানে আমরা সকল নগর-রাষ্ট্রনীতির সাংগঠনিক সমস্যার মূল অবলোকন করি। কালক্রমে রোম এসব সমস্যার এক নতুন সমাধান দান করে, যা গ্রীসের অবাস্তব ও খাপছাড়া প্রচেষ্টা থেকে ছিল আলাদা।

চার: রোমের মহান কীর্তি

যখন গ্রীসের নগরগুলো ভেতর ও বাহির থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। তখন নব্য-ভূমধ্যসাগরীয় সম্প্রদায়গুলোয়,

১। ওপেনহাইমারের (*Oppenheimer*) '*The State*' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় ও রবার্টসনের (*Robertson*) '*Evolution of States*' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় *§ 2* দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

ম্যাগনা গ্রীসিয়ার (Magna Graecia) কয়েকটি হেলেনীয় উপনিবেশে, কার্থেজ ও রোমে রাষ্ট্রের ভাবধারা ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধছিল। তাদের মধ্যে একমাত্র রোমই রাষ্ট্রীয় কলাকৌশলের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় এবং মহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় এক নতুন ও উজ্জ্বল পরীক্ষা-নীরিক্ষা শুরু করে। তার আধিপত্যের আমলে রোমের কীর্তি সবচেয়ে মহান। তাই আধুনিক রাষ্ট্র সংগঠনে একমাত্র তারই অবদান নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।

তার ইতিহাসের সুপ্রভাতে আমরা রোমকে দেখি কয়েকটি কৃষক সম্প্রদায়ের জ্যোতিকেন্দ্ররূপে। সাতটি প্রতিরোধযোগ্য পাহাড়ের উপর অগভীর নদীকূলে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল রোম। পরিবেশের বিচিত্র প্রভাবে রোমবাসীরা কালে তাদের প্রতিবেশী শত্রুসম্প্রদায় থেকে অধিক-তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ সুদৃঢ় ক'রে তোলে। ইট্রুস্কার (Etruscaus) অধিবাসিদের সভ্যতা উন্নততর হ'লেও বা উত্তরাঞ্চল থেকে গলজাতি রোমকে পর্যুদস্ত করলেও কালে রোমই অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। রোম কোন সহজ বিজয় অর্জন করে নি। অনেক সংঘর্ষের পর রোম অন্যান্য রোমক জাতি ও স্যামনাইন জাতির উপর আদিপত্য বিস্তার করে। তার এ সুসংহত অবস্থায় ইতালির গ্রীক নগরগুলো ও তাদের অধিপতি এপিরাসের রাজা পিরহাসের (Pyrrhus) সাথে রোমের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এবারও অনেক মূল্যের বিনিময়ে রোম জয়যুক্ত হয়। কার্থেজের সাথে আর একটি জীবন-মরণ সংগ্রামে রোম লিপ্ত হয়। এতে কার্থেজ ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে রোম তার দেশীয় শক্তির সাথে সামুদ্রিক শক্তির সমন্বয় সাধন করে। আরনো (Arno) থেকে সিসিলি পর্যন্ত সমগ্র ইতালিতে এখন রোমের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হ'ল, এবং সে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু করে। এ বিস্তৃত ভূখণ্ডে তখন তার আধিপত্য ও নাগরিকত্ব এক সাথে অগ্রসর হ'তে সক্ষম হয় নি। তার পরবর্তী বিজয় ও অধিকারের ফলে আগের রাজনৈতিক সমাধান অচল হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে রোম যা করেছিল, তা হচ্ছে রাজধানিতে নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠার নীতিতে রাজনৈতিক ঐক্যঅর্জন। এ প্রচেষ্টা শুধু গ্রীসে কেন, রোমের আমল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ছিল অজ্ঞাত। সরকারের কর্মক্ষেত্র

www.nagorikpathagar.org

প্রসারিত হবার সাথে সাথে নাগরিকত্বের আওতা বিস্তৃত করাই ছিল নগর-রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধানের স্বাভাবিক পন্থা। প্রাচীন রোমের পৌর কাঠামোর ভিত্তি হ'ল 'কিউরী' পদ্ধতি। এক একটি 'কিউরীয়া' ছিল আসলে (Curia) গঠিত হ'ত কয়েকটি জনপদ বা 'জেন্ট্স্' (Gentes) সহযোগে এবং এক একটি জনপদ গঠিত হত কয়েকটি পরিবারের মিলিত সংস্থায়। 'কিউরিয়া' ছিল আসলে মূল তিনটি রোমান উপজাতির অংশ বিশেষ এবং ঐ আত্মীয়তাভিত্তিক জনপদ পরবর্তীকালে পৌর-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক 'কিউরিয়ার' ছিল কিছু কিছু ধর্মীয় ও শাসনমূলক কাজ। পূজা-অর্চনার জন্য 'কিউরিয়া'গুলো পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হ'ত; কিন্তু পৌর-পরিষদ হিসেবে তারা মিলিতভাবে অধিবেশনে বসত। সামগ্রিকভাবে এসব 'কিউরিয়া' ছিল কৌলিন্য ও বিশেষ সুবিধার ধারক ও বাহক। ধর্ম তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করে। এদের নীচে ছিল অসংগঠিত 'সাধারণ লোক' (Plebeians)। তারা কোন আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারত না, এবং সকল পৌর-অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। তা'ছাড়া, এদের সাথে ছিল ভূমিহারা কৃষক ও সহায়-সম্বলহীন মানুষ; যারা জীবিকা ও আশ্রয়ের খোঁজে শহরে ঘুরে বেড়াত। 'বিশেষ সুযোগ-ভোগকারী' পরিবারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদ' বা সেনেট। ক্ষুদ্র এ অভিজাত রষ্ট্রের শীর্ষে ছিলেন রাজা। তিনি একদিকে ছিলেন শাসক ও নৃপতি ও অন্যদিকে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত।

এ বর্ধিষ্ণু নগরের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ফলে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় ও বিভিন্ন প্রভাবে, বিশেষ ক'রে সম্পদ ও দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়ায় এ সকল অভিজাত তন্ত্রের বুনিয়াদ নড়ে ওঠে। 'সার্ভের আদম শুমারিতে' (Servian Census) সম্পদের দাবী অগ্রগণ্য হয়। এ আদম শুমারিতে জনসংখ্যাকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তা'ছাড়া, সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধাদের আর একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়। রৌপ্যমুদ্রায় চালু অর্থের পরিমাপে ভূসম্পত্তির ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়। এদেরকে শতকের এককে সংগঠিত করা হয় এবং এগুলোই হল পৌর-সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। এদেরকে এমনভাবে সুসংহত করা হয় যে, সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে থাকত অধিক সংখ্যক শতক। নতুন পরিষদে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক শতকের ছিল এক একটি ভোট। এভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে বিত্তশালিদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা হয়।

তা যাই হোক, সম্পদভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের ফলে কৌলিন্যভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে যে বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, তার বিলুপ্তি ঘটে। শতকের নতুন পরিষদে জনসাধারণেরও প্রবেশাধিকার ছিল এবং যে কেউ অর্থ উপার্জন ক'রে যে কোন পদে উন্নীত হয়ে যে কোন পদমর্যাদা লাভ করতে পারত। রোমান রাষ্ট্রে এভাবে গণতন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি-বেদনা অনুভব করা যায়। এর সূত্রপাত হয় অসন্তুষ্ট জনসাধারণের দ্বারা; কেননা তারা দেখল যে, তাদেরই পরিশ্রম ও বীরত্বে অর্জিত রাজ্যে 'বিশেষ সুবিধা ভোগকারী' (পেট্রিসিয়ান্স্) শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং ভয়ঙ্কর আইনের আওতাধীনে ঋণগ্রহীতা হিসেবে ঋণদাতাদের নিকট ক্রীতদাসরূপে তারা হস্তান্তরিত হয়েছে। তীব্র চাপের মুখে রোম পৌর-গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়। রাজতন্ত্রের পতন হ'ল এবং রোম এক প্রজাতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরিত হ'ল। এর শীর্ষে ছিলেন দু'জন প্রধান শাসক। পরে তাঁদের উপাধি হয় 'কনসাল' (Consul)। পরের বছর আইন অনুযায়ী প্রধান শাসকদের নিকট থেকে আইন পরিষদে আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর সংঘটিত হয় 'সাধারণ লোকদের প্রথম বিচ্ছিন্নতার' বিখ্যাত ঘটনাটি। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের এ আন্দোলন সমগ্র ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে 'সাধারণ লোকদের' মধ্য থেকে বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং দু'টো বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের অধিকার অলঙ্ঘনীয় ব'লে ঘোষণা করা হয় এবং তারা অন্যদের কাজে হস্তক্ষেপের অধিকারও লাভ করে। কার্যত: তা নাকচ করবার অধিকারে রূপ নেয়। এ অধিকারগুলো সমর্থনের জন্য দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন সংঘটিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এ ধরনের বিচারালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় দশে।

সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং বহু যুদ্ধের অর্থনৈতিক ফলাফলের দরুন সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। গলজাতির আক্রমণের ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ আক্রমণে পবিত্র শহর ধ্বংস হয়ে যায়। রোম ছিল দেশাভ্যন্তরীণ নগরী। এর কোন বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল না। এ নগরীর শাসন কাজ পরিচালনা করতেন ভূ-স্বামীরা; যাঁরা

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের অধিকার পেতেন ও তা থেকে প্রচুর লাভের মালিকানা পেতেন। সাধারণ নাগরিক ও দরিদ্র কৃষকরা যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হ'ত এবং বিত্তশালী ভূ-স্বামীরা তাদের ক্ষতিপূরণেও ব্যর্থ হ'ত। যুদ্ধকালে এ ধরনের সামাজিক সংঘর্ষ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও শান্তিকালে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন ক'রে অর্থনৈতিক বিসম্বাদ শুরু হত। প্রত্যেকটি বিজয়ের গৌরব নতুন ক'রে নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করত; অথচ তাদের সংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রোমের শাসকশ্রেণী অনুভব করেছিল যে, নগররাষ্ট্র শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম। তবে এর ফলে ভেতর থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'তে পারে এ অনুভূতি গ্রীকদের ছিল না। কিন্তু রোমের শাসকরা এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তাই অত্যন্ত তিক্ততা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী আভ্যন্তরীণ শক্তির নিকট অবনত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রত্যেকটি দাবী তাদের মেনে নিতে হয়েছে। 'সাধারণের' পরিষদকে স্বীকৃতি দান করা হয় এবং তার সিদ্ধান্ত সকলের উপর বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। দু'জন কনসালের মধ্যে একজনকে 'সাধারণ লোকের' প্রতিনিধি হ'তে হ'ত। শেষপর্যন্ত দুজন 'লোক গণনাকারী ও নীতি নির্ধারক উচ্চ-পদস্থ কর্মচারি'র (Censors) একজনকেও সাধারণ লোকের মধ্য হ'তে নিতে হয়েছে। এভাবে হাজারো বোঝাপড়া ও নেয়া-দেয়ার ফলে সামাজিক সংঘর্ষের অবসান হয় এবং যে নতুন সংবিধান রচিত হয়, তাতে সাধারণ লোকদের সমান অধিকার তো স্বীকৃত হয়ই; তা'ছাড়াও কিছু বেশী তাদের ভাগ্যে জোটে। গ্রীসের রাজনীতির সাথে এর পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত।

সুতরাং কয়েকশো বছরের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ফলে রোমানরা তাদের রাজনৈতিক সমস্যার প্রথম ও প্রধানটির সমাধান করতে সক্ষম হয়। এটা সত্যি এক অদ্ভুত ব্যবস্থা; কেননা সে ব্যবস্থায় ছিল দু'টি আইন পরিষদ। আইন প্রণয়নক্ষেত্রে দু'টিরই প্রায় সমান অধিকার ছিল। লক্ষ্য ও কাঠামোর দিক থেকে একটি ছিল কুলীনতান্ত্রিক এবং অন্যটি ছিল গণতান্ত্রিক। তা-ছাড়াও ছিল দশজন কর্মকর্তা; যাঁরা সমাজের নিম্নস্তরের লোকজনদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের যে কোন শাসকের যে কোন কাজকে নাকচ করবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু রোমানরা নাগরিকতার ক্ষেত্রে এমন সংহতি অর্জন করেছিল যে, বহুদিন পর্যন্ত দু'টি আইন পরিষদ অত্যন্ত সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশে কাজ করেছে। তিনশো সাতষট্টি খ্রীস্ট পূর্বাব্দের

www.nagorikpathagar.org

'লিসিনিও সেকস্‌টিয়ান' (Licinio-Sextion) আইন প্রবর্তনের পর থেকে গ্র্যাকচাই-এর (Gracchi) আমল পর্যন্ত প্রায় পৌণে তিনশো বছর পর্যন্ত রোমের সংবিধান কুলীনতন্ত্রের প্রভাবে কার্যকরী হয়েছে। ৩৬৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের দিকে সাধারণ লোকের বিজয় সূচিত হয়। রোম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে যেসূত্র সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, তা হ'ল নগরের মধ্যে নাগরিক অধিকারে পরিব্যাপ্তী। এর ফলে যে কোন শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটে। রোমের কুলীনতন্ত্র সরকারের শাসন ক্ষমতা পরিত্যাগ করেও এভাবে নিজের স্থায়িত্ব বিধান করে। অবশ্য এটাও সত্যি যে, শত শত বছরের ব্যবস্থাপনা ও 'উপজাতীয়' প্রভাবের ফলে শাসন-ব্যবস্থায় কুলীনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছিল। উপজাতীয় প্রভাবে রোম নগরে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে আইন পরিষদের তৃতীয় এক কক্ষ গড়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে এ সকল পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষের অনুপস্থিতি ও 'সাধারণ লোকদের সার্বভৌম পরিষদের' উপস্থিতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ অপেক্ষা অধিকারের সমতাই হ'ল বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

এ সময়ে রোমানরা ইতালীর ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য নগররাষ্ট্রের নীতিকে আরও বিস্তৃত করে। এক্ষেত্রেও তারা এক অপূর্ব ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে; যদিও সে সাফল্য ছিল আংশিক। তখন পর্যন্ত কোন জাতীয় ভাবধারার আবেদন গড়ে ওঠে নি। পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যই পাশ্চাত্যের জাতীয় ভাবধারা বিকাশের অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য হ'তে থাকে। রোমের অন্যান্য জাতিগুলোর সমন্বয়ে কোন রোমান জাতি গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া, যেখানে ছিল ইট্রাস্কা, স্যামনা, ভলসি, মারসি, আপুলি, লুকান ও অন্যান্য জাতের লোকজন। ইতালী বিজয়ের ফলে তারা রোম সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। বিজিত ইতালীতে উপজাতিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দের অবসান হয় নি এবং ৯০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দেও ইতালীতে যে 'সামাজিক সংঘর্ষ' সংঘটিত হয়, তাতে আটটি উপজাতির জনসংখ্যা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যখন রোমের সৈন্যবাহিনী আবার ইতালীতে বিজয়ী হয়, তখন ইতালীর সকলকে রোমের নাগরিকত্ব দান করা হয়; কেননা জুলিয়ার আইন অনুসারে (Lex Julia) ইতিমধ্যে সকল বন্ধুরাষ্ট্রকে এ গৌরবের অধিকার দেয়া হয়। বহুপূর্বে যে নীতি প্রবর্তিত হয়, এ হ'ল তারই পরিপূর্ণতা। বহু শতাব্দী ধরে রোমের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারটা ছিল সত্যিকারের

www.nagorikpathagar.org

এক রহস্যময় ব্যাপার। ইতালীর সুসংহত ভূখণ্ডে এ নীতি অত্যন্ত সহজ ও সুবিধাজনকভাবে কার্যকরী হয়। জাতি ও সভ্যতা নির্বিশেষে নাগরিক অধিকার অর্জন করা হয়। নাগরিক অধিকারকে দানের মাধ্যমে যতখুশী বিস্তৃত করা চলে; কিন্তু জাতীয়তাবোধকে সেভাবে প্রসারিত করা চলে না। এরই ফলে উত্তরাঞ্চলের গল আধিপত্য এলাকা থেকে দক্ষিণের গ্রীক নগরগুলো পর্যন্ত সমগ্র ইতালী একত্রিত হয়। সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যদি একমাত্র ইতালীতেই রোম সাম্রাজ্য সীমিত থাকত তা হ'লেও চলত; কিন্তু তা হয় নি।

রোমের নাগরিক অধিকার প্রদানের নীতি গ্রীকদের চেয়ে ছিল অনেক বেশী নমনীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। সার্বজনীন অংশীদারত্বের যে নীতির ফলে গ্রীক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভীষণভাবে সীমিত হয়ে পড়েছিল, রোমানদের নিকট নাগরিকতার অর্থ কিন্তু তা ছিল না। প্রথমদিকে অবশ্য পূর্ণ নাগরিকতা পূর্ণ মিলনের অর্থেই প্রয়োগ করা হ'ত। আদিম সমাজে তাই ছিল স্বভাবিক। কিন্তু সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর, এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক অধিকারও ছিল সগোত্রীয়দের অধিকারের জন্য মারাত্মক। কার্যতঃ কিছু কিছু ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয় সংরক্ষিত থাকলেও নাগরিকতার আওতা সীমিত হয়ে আসে এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া, অতি প্রাচীনকাল থেকেই রোমকরা 'আইনের চোখে সাম্যের' ন্যায় সামাজিক অধিকারকে 'সার্বভৌম সংস্থার সদস্য হবার' রাজনৈতিক অধিকার থেকে পৃথক ক'রে দেখেছে। তারা কয়েকটি শহরের উপর 'নির্বাচনের অধিকারের' মত জটিল সামাজিক অধিকারও প্রয়োগ করেছে। শহরগুলোর কোন কোনটি কিছু কিছু স্ব-শাসনের অধিকার ভোগ করত এবং কোন কোনটির এ অধিকার ছিল না। এরূপ সীমিত নাগরিকত্বের সাথে জড়িত ছিল রোমের সাথে বাণিজ্য করার অধিকার ও আন্তঃবিবাহের অধিকার। অন্যান্য রোমক শহরের জন্য আর এক ধরনের নাগরিকত্ব প্রবর্তন করা হয়। এই সহযোগী জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য রোমান নাগরিক মনে করা হত। তারা রোমে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন নগরবাসী হিসেবে তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা হত। এর আগেও তারা নিজ নিজ শহরে রোমের সাথে বাণিজ্য

www.nagorikpathagar.org

করবার অধিকার উপভোগ করেছে এবং রোমান আদালতের আওতাধীন ছিল। তাছাড়াও ছিল কতকগুলো মুক্ত সহযোগিদের শহর। এদের ক্ষেত্রে তাদের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন রোমের সাথে চুক্তির দ্বারা সমর্থিত হত; কিন্তু তাদের রোমান নাগরিকত্ব দেয়া হত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রোমের মুক্ত নাগরিকত্বের আওতাধীনে ইতালীকে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য সবরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। রোমক শক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমনি পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এ নাগরিকত্ব কোন কোন সময় অত্যন্ত সন্তর্পণে মঞ্জুর করা হ'ত; কোন কোন সময় আবার চাপিয়ে দেয়া হত। কিন্তু সাধারণভাবে নাগরিক অধিকারকে সবসময় বিশেষ গৌরব বলে মনে করা হ'ত। কোন বিজয়াভিযানের পর পরই নাগরিক অধিকার দিয়ে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা হত; কেননা যুদ্ধের মাধ্যমে সবসময় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কোন সফল যুদ্ধ অপেক্ষা স্থায়ী শান্তির কৌশল যে অনেক বেশী মূল্যবান, রোমের নেতৃবর্গ অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ গোপন রহস্য সার্থকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ইতালীকে পদানত ক'রে কিছুকালের জন্য তারা শক্তিমদে মত্ত হয়েছিলেন সত্যি, এবং শেষে ৯৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে 'লিসিনিও মারসিয়ান' (Licinio-Mercian Law) আইন প্রবর্তন করে রোমক সার্বভৌম সংস্থায় যে কোন অনাগরিকের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মমসেনের (Mommsen) কথায় এ আইনটি 'অবিকল সে আইনের মত, যার উপর ভিত্তি করে উত্তর আমেরিকা গ্রেটব্রিটেন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়।'[১] পাঁচ বছর পর ভয়ঙ্কর 'সামাজিক সংঘর্ষ' শুরু হয়। তারপরই রোমের সহযোগী শহরগুলোয় অত্যন্ত উদারভাবে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয় এবং ইতালীর সকল সম্প্রদায়কে পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন নাগরিক-অধিকার অর্পণ করা হয় এবং পো-প্রণালী থেকে শুরু করে আল্‌স্‌-পর্বত পর্যন্ত গন্ডে অবস্থিত সকল শহরকে রোমান জাতির অনুরূপ অধিকার দেয়া হয়।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, জুলিয়াস সিজার সে সীমার বাইরে আল্‌সের পরপারে অবস্থিত গল ও আরও দূরবর্তী অঞ্চলে অত্যন্ত উদারভাবে

১। মমসেনের *'History of Rome'* গ্রন্থের চতুর্থ পর্যায়, সপ্তম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকতার অধিকার প্রসারিত করেন। তা ছিল নতুন সাম্রাজ্যের ন্য যেন প্রস্তুতির একাংশ; যার ফলে কার্যকরী ঐক্যের সম্ভাব্য সীমার বাইরে রোমান নাগরিকত্ব সার্বভৌম গুণশূন্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ নাগরিকত্ব কিছুদিনের জন্য ইতালীর মত দেশকে সংহত করতে পারে; একটা সাম্রাজ্যকে সংহত করার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। ইতালীর সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য প্রসারিত হ'লে সাম্রাজ্যের নীতি আসলে নগররাষ্ট্রের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে উঠল এবং জুলিয়াস সিজার থেকে শুরু ক'রে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবসম্পন্ন রোমান নেতৃবর্গ সাম্রাজ্যের ধারণাকে স্ব-শাসনের ধারণা থেকে মুক্ত করতে ও রোমকে কর্তৃত্বের ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করবার জন্য ইচ্ছা ক'রে নাগরিক অধিকার প্রসারিত করেন। নগররাষ্ট্রের যৌক্তিকতা শেষ সীমায় পৌঁছে যাবার ফলে সরকারের নতুন এক ভিত্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ ছিল চরম এক সমস্যা; যার কষ্টিপাথরে রোমের রাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং কালে তা ধ্বসে পড়ে।

পাঁচ : গ্রীস ও রোমে আইনের বিবর্তন

রোমের গৌরবজনক দিক থেকে তার দুর্বল দিকের প্রতি নজর দেবার পূর্বে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, তার রাজনৈতিক সৃষ্টির; যা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবদান তার গুরুত্ব সম্পর্কে। এ হল আইনের বিশ্বজনীন বিধির প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই থাকে শাসন-ব্যবস্থার দ্বিবিধ কাঠামো; একটি হ'ল তার বিধি-বিধান ও অন্যটি হ'ল সংবিধান,—একটি যেন শাসন ব্যবস্থা এবং অন্যটি—শাসন পরিচালনার সংস্থা। প্রথমটি নীরবে ভেতর থেকে গ'ড়ে ওঠে; যদিও অন্যটির চারদিক ঘিরে গর্জন করে ঝড়ের বেগ। সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিপ্লবের মধ্যেও মৌলিক বিধি-বিধান থাকে অক্ষত; কিন্তু তাতে এরই প্রহরায় রত সংস্থা উৎপাটিত হ'তে পারে। আইনের বিধি-বিধান হ'ল রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আইন-ব্যবস্থায় এতটুকু অগ্রগতিও সংরক্ষিত হয় এবং অতীতের ছেঁড়াপাতা থেকে তাই সংগৃহীত হয় মানব জাতির পরম সম্পদ। রোমের আইন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাই হয়েছিল।

ব্যবহারবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রীসের নগরগুলো যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। হোমারের আমল থেকে [illegible] অগ্রগতি [illegible] করি।

www.nagorikpathagar.org

চিরাচরিত প্রথা ও ধর্মের সূতিকাগৃহ থেকে আইন তখনও মুক্তিলাভ করে নি। তখনকার আইন ছিল অনেকটা বিচার সিদ্ধান্তের সমষ্টি মাত্র বা নির্দেশনামা ; যা চিরাচরিত রীতিনীতি থেকে প্রয়োজনবোধে সংগৃহীত হয়েছে। এ বিচার সিদ্ধান্তগুলো তখনও আইনের আকার লাভ করে নি।[১] সেগুলো ছিল অনেকটা বিচারকের রায়ের মত।

তাছাড়া, সেগুলো ছিল উপজাতিগুলোর বিশেষ সম্পদস্বরূপ ; ছিল থেমিস (Themis) ও ডাইকের (Dike) মত দেব-দেবীর অবদান বা দেবকুল থেকে শ্রুত বাণীমণ্ডলী। গ্রীসের কুলীনতান্ত্রিক যুগ যখন ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত ; তখন দেখা যায় যে, বিচার সিদ্ধান্তের বৃহত্তর এক সমষ্টি 'অলিখিত আইনের' গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে বিরাজ করছে এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে সম্পদকে আগলিয়ে রেখেছে। সম্ভবতঃ এমনি ভয়ঙ্কর একচেটিয়া সম্পদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই লিখিত আইনের জন্ম হয়। তা যাই হোক, এটুকু আমরা জানি যে, সোলোনের আমলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চাপে পড়ে এথেন্সে আইন লিপিবদ্ধ করবার জন্য আইন প্রণেতা নিযুক্ত হয়। অতীতেও খুব সম্ভব এ নিয়মেই আইনের জন্ম হয়। এ ভাবে মহান আইন প্রণেতাদের আবির্ভাব হয় ; যেমন এথেন্সের ড্রেকো (Draco), স্পার্টার লাইকারগাস (Lycargus) অবশ্য যদি তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন) লোক্রিসের জালিকাস (Zaleucus of Locris), কাটানার চারনদাস (Charandas of Catana) এবং ক্রীটের গোরটিন (Gortyn)।

কৌলাঞ্জেসের (Coulanges) মতে,[২] সে লিখিত আইন তখনও ছিল প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে সম্প্রদায়ের চিরাচরিত প্রথার অনুবাদ মাত্র ; কেননা ধর্ম, নৈতিকতা ও আত্মীয়তার গর্ভে সে সকল প্রথা ছিল গভীরভাবে প্রোথিত। এর প্রকৃতরূপ পরিস্ফুট হবার বহু পূর্বেই আইনের জন্ম হয়। আইন মেনে চলা ছিল বেদীর অনুষ্ঠান সূচী মেনে চলা বা অন্যজনের সাথে ভাল ব্যবহার করার সামিল। এজন্য এথেন্স, স্পার্টা ও রোমে রাজাকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সীমারেখার মধ্যে কাজ চালাতে হ'ত। প্রাচীন রোমে প্রধান ধর্মযাজক ও বিচারক ছিলেন একই ব্যক্তি এবং আইনশাস্ত্র ছিল 'মানবজীবনের মঙ্গল সাধনের

১। মেইনের (*Maine*) '*Ancient Law*' গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদ।
২। '*Le Cite Antique*' গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

স্বর্গীয় বিধান মাত্র।' ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল সামাজিক ব্যবস্থার একাংশ। তাই রাষ্ট্রকে তা মেনে চলতে হ'ত ও সংরক্ষণ করতে হত।

যখন থেকে আইনের বিধি-বিধানকে কোন স্তম্ভে বা প্রস্তরফলকে লেখা শুরু হয়, তখন হতে চিরাচরিত প্রথা থেকে আইনকে উদ্ধার করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। লিখিত বিধান উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভ করতে থাকে এবং কালক্রমে প্রথাভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ এক আইন ব্যবস্থা। প্রথম অবস্থায় এগুলোকে স্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ প্রথা হিসেবেই গণ্য করা হ'ত। গ্রীক নগরগুলোতেও প্রণীত আইনের সাথে সাথে প্রথা ও ঐতিহ্য আইনের উৎস হিসেবে পরিগণিত হ'ত এবং এসকল অলিখিত বিধানের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যবহারবিদদের সংস্থা ছিল।[১] তাছাড়া আইন ও চিরাচরিত প্রথা— উভয়কেই সর্বযুগের সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য ও অপরিবর্তনীয় মনে করা হ'ত। এসব বিধানমণ্ডলীতে নতুন সংযোজন হ'ত; কিন্তু তাদের কোনরূপ পরিবর্তন হত না। এমন কি সোলোন পর্যন্ত ড্রেকোর আইনকে বিলুপ্ত না করে পুরোনো আইনের পাশাপাশি নতুন আইনকে সংস্থাপন করেন। পুরোনো আইন কালক্রমে অচল হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তথাপি মানুষের প্রতি এ আইনের আবেদন শেষ হয় না। এতে অবশ্য বিভ্রান্তিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায়, ইসাইস (Isaeus) উত্তরাধিকার প্রশ্নে দু'টি পরস্পর বিরোধী; অথচ সমানভাবে কার্যকরী আইনের জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বহু পূর্ব থেকেই আইন প্রণয়নকে সরকারের মৌলিক কাজ ব'লে মনে করা হয়। এর অর্থ অলঙ্ঘনীয় সামাজিক ব্যবস্থাকে মানুষের ইচ্ছার উপর তুলে দেয়া। সিজউইক (Sidgawick) সত্যই বলেছেন, রক্ষণশীল এ্যারিস্টটলের নিকট সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে আইন পরিষদের তেমন গুরুত্ব নেই। আধুনিক শ্রেণীবিভাগে যেমন বলা হয়, 'আইনপ্রণয়নমূলক কাজ', তিনি তা না ব'লে বলেছেন—'বিবেচনামূলক কাজ' (Deliberative) এবং আইনের পরিবর্তনকে তিনি 'কর্তৃত্বের একরকম অমান্য', ব'লে নিন্দা করেছেন।[২]

১। ভিনোগ্রেডোফের (*Vinogradofo*) *'Historical Jurisprudence'* গ্রন্থের চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

২। সিজউইকের *'Development of European Polity'* সংকলনের ১২ (বার) নং বক্তৃতা।

www.nagorikpathagar.org

তা যাই হোক, গ্রীক নগরগুলো, বিশেষ করে এথেন্স আইনের এ ধারণা পাল্টিয়ে দিয়েছে। এ পাল্টিয়ে দেয়াটা কিন্তু সহজ কাজ নয়; এটা অনেকটা একটা বিপ্লবের মত—সমাজের সামগ্রিক ব্যবস্থার ওলোটপালট। গ্রীক সোফিস্ট মতবাদীরা যে উদার নীতির প্রবর্তক—এটা মূলতঃ তাদেরই কাজ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রথা, নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধীভাব বর্তমান, তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অনুসন্ধানের স্পৃহা থেকে। অবশ্য প্রত্যেক জাতির লোক তাদের প্রথা ও নৈতিকতা বা আইনকে অলঙ্ঘনীয় অধিকার ব'লে বিশ্বাস করত। সরল হিরোডোটাসের নিকট এসব স্ব-বিরোধিতা ছিল অপূর্ব চিত্রায়িত রহস্যের অংশবিশেষ, এবং রাজা দেরিয়াসের ভোজসভার বিখ্যাত গল্পে তাঁর এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] ভোজসভায় আহুত কয়েকজন গ্রীকবাসিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন— কত অর্থের বিনিময়ে তারা তাদের মৃত পিতামাতাকে গিলে ফেলতে পারবে, এবং কয়েকজন ভারতীয়কে ডেকে তিনি তাদের ভয়বিহ্বল চোখের সামনে সুন্দরভাবে সে প্রদর্শনী সম্পন্ন করেন। গ্রীকদের মত ভারতীয়দেরকেও তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কত অর্থের বিনিময়ে তারা মৃত আত্মীয়দের পুড়িয়ে ফেলতে পারবে।

কিন্তু সোফিস্ট মতবাদীরা এসব স্ব-বিরোধিতার অন্য অর্থ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, আইন হল রীতিনীতি মাত্র—কৃত্রিম কতকগুলো জিনিস এবং প্রকৃতির সাথে অনেক সময় সামঞ্জস্যহীন ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যখন প্রাচীন চিন্তার ভিত ধ্বসে পড়ে, তখন নতুন ভিত্তি আবিষ্কার করা শক্ত এবং যেসব গ্রীক-চিন্তাবিদ সোফিস্ট মতবাদীদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও আইনের সঠিক দর্শন গড়ে তুলতে পারেন নি। রাজনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও আমরা গ্রীকদেরকে নাবিকের সাথে তুলনা করতে পারি। তারা সর্বপ্রথম ঐতিহ্যের সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ নাবিকরা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও ভয়-ভীতিহীন। নৌচালনায় তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু মৌবাম্বের গতি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ঝড়ের মধ্যে তাঁরা বিদ্রোহের ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

১। হিরোডোটাস—তিন পৃষ্ঠা—৩য়।

www.nagorikpathagar.org

আইনশাস্ত্রে গ্রীকরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে ; কিন্তু রোমানদের মত তারা কোন সুসমঞ্জস তত্ত্ব বা যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি সংগঠন করতে পারে নি। রোমক শব্দ 'আইন ব্যবস্থার' (ius) কোন প্রতিশব্দ তাদের ছিল না। অবশ্য ইংরেজি ভাষাভাষিদেরও অনুরূপ শব্দ নেই। 'আইন ব্যবস্থার' অর্থ হল সুশৃঙ্খল এক পরিবেশ এবং 'নির্দিষ্ট আইন' (Lex) এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ। তখনও তাদের আইন ছিল ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক বিধির সমষ্টি। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাজ-কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ক্ষতিপূরণ বা প্রতিবিধান সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিচার ও দণ্ডবিধির আওতাধীন সরকারী বিচারের মধ্যে যে পার্থক্য, তা তারা অনুধাবন করত ; কিন্তু বিভিন্ন মোকদ্দমার সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয় নি ও কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে, তারও সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ হয় নি। চুরির ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত নিলে বোঝা যায় যে, অনেক সময় বাদীকে ক্ষতিপূরণের কিংবা দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচারের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হত।[১] এমন অনেক কাজকর্ম ছিল যাদের ফৌজদারী প্রকৃতি স্পষ্ট, যেমন—হত্যা বা অগ্নিসংযোগ। এগুলোকেও ব্যক্তিগত বিচারের বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা হত এবং ক্ষতিগ্রস্থ বা তাদের পরিবারের লোকজনদের দ্বারা আবেদন এনে বিচার প্রার্থনা করতে হত। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে প্রচুর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার মত বিষয়গুলো যাদের ফৌজদারী প্রকৃতি রয়েছে, সেগুলোও এথেন্সে ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধন প্রতিকার আইনের পর্যায়ে পড়ত।

তাছাড়া, আইনের সার্বজনীনতা তখনও স্বীকৃত হয় নি। আইনের আশ্রয় রাজনৈতিক সুবিধা বলে বিবেচিত হত এবং শুধুমাত্র নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেই আইনের প্রয়োগ দেখা যেত ; যদিও প্রায় সব গ্রীক নগরে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কোন আগন্তুক কোন নাগরিকের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে আইনের আশ্রয় লাভ করত না। সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা আইনের আওতার বাইরে ছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য আইন প্রয়োগ করা হত। আইনগত অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল সমায়ত। কোন রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য

১। ভিনোগ্রাডোফের গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের নবম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

আইন প্রয়োগ করা হবে—এ ধারণা গ্রীকদের নিকট ছিল অজ্ঞাত। সার্বজনীন প্রাকৃতিক আইনের মতবাদ তখনও জন্মলাভ করেনি।

অন্য আর একটি দিকেও আইনের সার্বজনীনতা অসংগত বিবেচনা থেকে মুক্তিলাভ করে নি। সংকীর্ণ কুলীন গোষ্ঠী থেকে আইন বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের উপর প্রযোজ্য হ'ত। এথেন্সের বিশাল জুরীর আদালতগুলোতে বাদী বা বিবাদীদের কেহই ূল বিষয়বস্তুতে সীমিত থাকত না। সে মামলায় জয়লাভ করবার জন্য বহু রকম ভণিতার আশ্রয় গ্রহণ করত; যেমন—কেহ বলত যে, বিবাদীর বাবা ছিল একটা বদমায়েশ; বা তার মা ছিল একজন তরকারী বিক্রেতা। অনেক সময় ক্রন্দনরত স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হাজির ক'রে বিচারকের মন গলাত। রোমান আদালতেও আবেগপূর্ণ আবেদন বা বিকৃত প্রমাণ হাজির করবার নিয়ম ছিল; কিন্তু গ্রীসের প্রশিক্ষণহীন পরিষদে যেমনটি হ'ত, এক্ষেত্রে তেমন ভাবে বিচারের প্রহসন হ'ত না। ন্যায়বিচারের সূক্ষ্মতা তখনও আচ্ছন্ন ছিল অসংখ্য রাজনৈতিক অন্যায় কর্মের দ্বারা; এবং আদালতে সেগুলোরও বিচার করা হত। এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যকালে বা কার্যকাল শেষ হবার পর রাষ্ট্রনায়ক বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ পেশ করা চলত। কোন আদালতে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অনেকে তাদের রাজনৈতিক জীবনের শুভ সূচনা করত। এভাবে ন্যায়বিচারের নামে মারাত্মক দুষ্কর্মের পথ প্রশস্ত হ'ত এবং আইন ও ন্যায়বিচারের হাতিয়ার থেকে বিকৃত হ'ত রাজনীতির ভয়াবহ অস্ত্রে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, গ্রীসে আইনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হ'লেও যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের মানে বিচার করলে তাকে অনেক অপ্রতুল মনে হবে। রোমেই সর্বপ্রথম আইন সার্বজনীন বিধানে পরিণত হয়। এখানে সোফিস্টদের মতানুযায়ী প্রকৃতি ও চিরাচরিত রীতিনীতির স্ববিরোধিতার বহু ঊর্ধ্বে আইন উঠে আসে এবং সর্বপ্রথম এখানেই রাষ্ট্রীয় নির্দেশে আইন আকারে ব্যাপক ও সুসমঞ্জসরূপে বিধিবদ্ধ হয়। গ্রীসের দৃষ্টান্তের নিকট রোম অনেকাংশে ঋণী এটা সত্যি; কিন্তু রোমান জাতির অপূর্ব শক্তি এক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ লাভ ক'রে নিজের স্থায়ী অবদান রেখে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথমে রোমের আইনও ছিল চিরাচরিত প্রথা, প্রাচীন রীতিনীতি এবং ধর্মীয় নির্দেশের অবিচ্ছিন্ন সমষ্টি। আদিম সভ্যতার চরিত্রই ছিল এমনি। রোমের 'আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রামাণ্য ইতিহাস শুরু হয় বিখ্যাত 'দ্বাদশ তালিকা' (Twelve Tables) থেকে। গ্রীসের আইন-কানুন ও ইতালীর গ্রীক নগরগুলোর অনুশীলনের ফলে এ 'দ্বাদশ তালিকা' প্রণয়ন করা হয়। এখানে সংস্কারমুক্ত মনের যথেষ্ট আভাস মেলে এবং এসব কারণেই রোম তার অতুলনীয় অবদান রেখে গেছে। আইনের বিকাশের জন্য যা দরকার, তা হ'ল নমনীয়তা ও অন্তর্দৃষ্টি। প্রথা, ধর্ম ও প্রাচীন নৈতিকতার উপর নির্ভরশীলতা এর গতিরুদ্ধ করে। সর্বজনের জন্য সর্বকালের স্থায়ী ও অলঙ্ঘণীয় আইনের ধারণা স্বাভাবিকভাবে আদিম সভ্যতার পারিপার্শ্বিকতা থেকে আসে। গ্রীস এসবের বহু ঊর্ধ্বে উঠেছিল সত্যি; কিন্তু সে এর বিকল্প আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। রোম কিন্তু এ পারিপার্শ্বিকতা জয় করেছে এবং তার পরিবর্তে সার্বজনীনতার সঠিক এক নীতি উদ্ভাবন করতে পেরেছে। সে তার পবিত্র 'দ্বাদশ তালিকার' বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মীয় আচারের বন্দীদশা থেকে তার আইন ব্যবস্থাকে সে পুনরুদ্ধার করেছে।[১]

এ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রত্যাখ্যানের যে বিপ্লবী অভিপ্রায় গ্রীক সোফিস্টদের অনুপ্রাণিত করেছিল; সে পথে এ পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নি; বরং রোমানরা পর্যায়ক্রমে বিশিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বাস্তব পন্থার মাধ্যমে তা সম্ভব করেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্টটি হ'ল 'আইনগত অবাস্তবতা'। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। এমনি ছিল পোষ্যপুত্র গ্রহণের 'অবাস্তবতা'। তার ফলে আত্মীয় চক্রের বাইরে গ্রহীতা বা পোষ্যপুত্র বা কন্যা তার দাতার খাতকের কাছ থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারত। বিক্রয়ের অবাস্তবতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; কেননা এর ফলে সম্পত্তির কেনা বেচার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দূর হয়। মেইন (Maine) 'আইনগত অবাস্তবতা' (Legal Fiction) শব্দটির দ্বারা 'বিজ্ঞজনের বিশ্লেষণকে' বুঝিয়েছেন। অন্য জায়গায় এর মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রে বা কোন কাল্পনিক বিষয়ে 'দক্ষ ব্যক্তিদের' ব্যাখ্যাও প্রকাশিত

১। মুইরহেডের (*Muirhead*) '*Roman Law*' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের আমলে বিশিষ্ট ব্যবহারবিদদের সুখ্যাতির ফলে তাঁদের ব্যাখ্যা আইনের পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অগাস্টাস থেকে শুরু ক'রে সাম্রাজ্যের আগল পর্যন্ত কয়েকজন ব্যবহারবিদের ব্যাখ্যাকে পৌর-আইনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে পাঁচজন বিখ্যাত ব্যবহারবিদের ব্যাখ্যাকে আইনের বিধি-বিধান হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

'আইনগত অবাস্তবতা' ও ব্যবহারবিদগণের ব্যাখ্যার অভ্যন্তরেও অস্পষ্টভাবে ন্যায়নীতি (Equity) কাজ ক'রে চলেছিল।[১] এতে নিয়মের প্রতি তেমন মনোযোগ না দিয়ে অন্তর্নিহিত বিষয়কে বেশী বিবেচনা করা হ'ত। রোমান আইনের বিবর্তনে এ নীতিও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'দ্বাদশ তালিকায়' লিপিবদ্ধ প্রাচীন আইন গ্রীসের নগরগুলোর আইনের মত শুধু নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। বিদেশীদের জন্য আইন 'প্রতিষ্ঠিত নীতির' বিরোধী ছিল না। প্রথমে রোমের আইন ব্যবস্থা রোমান নাগরিকদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োগ করা হ'ত বলে মনে হয়। কিন্তু কালক্রমে প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি রচিত হয়। বিদেশী ও রোমান নাগরিক উভয় শ্রেণীর জন্য এটা হয় ন্যায়বিচারের সাধারণ ভিত্তি।

শেষপর্যন্ত নাগরিকদের বিধি-ব্যবস্থার প্রথাভিত্তিক জটিলতা এ আইনের মাধ্যমে কেটে যায় ও এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। এ প্রাকৃতিক আইনের অর্থ ছিল এমন এক আইন ব্যবস্থা, যা সর্বত্র সকল মানুষ মেনে চলে। বস্তুতঃ অনেক দিক দিয়ে একে 'প্রকৃতির আইনের' (Law of Nature) সাথে তুলনা করা হ'ত। গ্রীসের জ্ঞানী-গুণীরা আইন ও প্রকৃতি নিয়ে যে বিরোধী মতবাদে জর্জরিত হয়েছেন, এ আইনে সে সব ধারণার সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব হয়। প্রাকৃতিক আইনের দিকে লক্ষ্য রেখেই রোমের রাষ্ট্র-চিন্তাবিদগণ আইনের দর্শন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। নতুন ধারণার শুভ প্রভাবে পৌর-আইনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক আইনের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ হতে থাকে। এরই প্রভাবে সুপরিকল্পিত আইন প্রণয়ন যে সরকারের সঠিক কাজ, এ ধারণাও দানা বাঁধতে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপেক্ষা ক'রেও আইন

১। ব্রাইসের (*Bryce*) '*Studies in History and Jurisprudence*' গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

প্রণেতাকে তার কাজে এগিয়ে যেতে হবে এ আদর্শ ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে নতুন ব্যবস্থায় পুরোনো রীতিনীতি স্থান পেতে লাগল এবং এ দু'য়ের মিলনের ফলে 'জাস্টিনিয়ান বিধি-বিধানে' (Code of Justinian) যে চূড়ান্তরূপ সৃষ্টি হয়, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।

রোমান আইনের প্রথম মহান স্তম্ভ 'দ্বাদশ তালিকা' এবং 'প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান' (Institutes), 'সংক্ষিপ্তসার' (Digest), 'বিধানমণ্ডলী' (Code) ও গুঢ়লেখ (Novels) প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত শেষ স্তম্ভ জাস্টিনিয়ানের আইন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল তফাৎ; যদিও জাস্টিনিয়ান ছিলেন প্রাচ্যের বর্বর রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। রাষ্ট্রের সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের নিকট 'পরিবারের কর্তার' (Pater familias) অধীনে প্রাচীন পরিবারের আওতা ম্লান হয়ে যায়। আত্মীয়তার দাবী থেকে আইনগত অধিকার ও 'দায়িত্ব ভিত্তিক ব্যক্তির' ধারণা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালের পুরোহিতের নির্দেশনামার হাত থেকে আইনের বিধান এবারে মুক্ত হ'ল; যদিও ধর্মীয় আইন বহুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্পত্তির হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে সরস করা হয় ও তাদেরকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 'সমষ্টিগত-ব্যক্তিত্বের' ধারণা শুরু হয়; যদিও সে যুগে তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। আজকে শুধু আমরা সমষ্টিগত জীবনের জটিল বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারি। চুক্তির রকমফের সুস্পষ্ট ক'রে তোলা হয়। আইনের সর্বক্ষেত্র এক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর প্রধান বিভাগ যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী, সরকারী ও বেসরকারী ইত্যাদির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা হয়। পরবর্তীকালে যখন আবার সঠিক রাজনৈতিক ধারণার অনুভূতি নিয়ে পাশ্চাত্যের সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত হয়, তখন রোমের প্রদর্শিত পথে আইনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফিরে পাই এক সচল দৃষ্টান্ত ও সজীব নীতি।

ছয়ঃ নগর ও সাম্রাজ্য

প্রজাতান্ত্রিক রোম তার বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি। ক্ষমতাশালী প্রশাসক, কনসাল ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতেন। সাম্রাজ্য গড়ে' উঠলে ঐসব কর্মকর্তা পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ ক'রে বাইরে যেতেন প্রদেশপাল হিসেবে।

www.nagorikpathagar.org

তখন স্বেচ্ছাচারী এসব কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করা রোমান নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এ কাজের জন্য পরিষদগুলো তেমন যোগ্য ছিল না। সেনেটই ছিল তখন রাষ্ট্রের প্রধান শাসনবিভাগ। সেনেট গঠিত হত প্রাক্তন প্রশাসকদের দ্বারা এবং তাঁরা নিযুক্ত হ'তেন সারা জীবনের জন্য। সেনেটের কাজ ছিল প্রদেশের শাসক নির্ধারণ করা, সৈন্যবাহিনী সংগঠন করা, যুদ্ধ পরিচালনা করা ও আর্থিক বিষয় দেখাশোনা করা। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না যে, সার্বভৌম জনগণের আইন অপেক্ষা সেনেটের প্রস্তাব অধিক কার্যকরী বিবেচিত হত। নগর-রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রোমের অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থা অসংগত ও 'ব্যবহারের অযোগ্য' হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের পট-ভূমিকায় একমাত্র সেনেটই কাজের উপযোগী বিবেচিত হয়।

সেনেটের জন্য এ ছিল বড় কঠিন; অথচ বিরল সুযোগ। এক বিরাট সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিষদ তথা কর্তৃত্ব শ্রদ্ধার মহান কেন্দ্র হিসেবে সেনেটের যে নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টি দরকার ছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ তা তার ছিল না। অভিজাত পারিপার্শ্বিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেনেট রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। প্রতিনিধিত্বের ধারণা তাদের ছিল না এবং মন্থর যাতায়াত ব্যবস্থার যুগে তা তেমন কার্যকরীও হ'ত না। কিন্তু এর একমাত্র যে বিকল্প তার প্রয়োগ ক'রে সেনেট অধীনস্থ প্রদেশগুলোর দায়িত্বশীলতা নির্ধারণ করতে পারত; কিন্তু সে তাও করে নি। সেনেটের সদস্যরা নিজেরা ছিল শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সাম্রাজ্যের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাণিজ্যের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে নিজেরা হয়েছিল ক্রীতদাসের মালিক ও ঋণদাতা। ক্রীতদাসসহ বিরাট বিরাট ভূসম্পত্তির মালিকানা তাদের ছিল। মমসেন[১] সত্যই বলেছেন যে, যেদিকেই চিন্তাভাবনার স্রোত প্রবাহিত হোক না কেন, দেখা যাবে যে, আইন মানুষকে ভারবাহী জীবে পরিণত করছে। এ অবস্থায় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, যার ফলে সাম্রাজ্যের জন্য সেনেট সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে যায়। নিরাপত্তা ও সুশাসনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ রক্ষায় সেনেট ব্যর্থ হয়।

১। মমসেনের (*Mommsen*) *History of Rome*' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

নগররাষ্ট্র সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হ'ল। এ প্রক্রিয়ায় আনুগত্যের ভিত্তি বিনষ্ট হয়; কিন্তু নতুন ভিত্তি গঠিত হয় নি। রাষ্ট্র তাই আভ্যন্তরীণ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

প্রথমত: আভ্যন্তরীণ সমস্যাই চরম আকার ধারণ করে। ক্রীতদাস প্রথা নাগরিকত্বের সংহতি বিনষ্ট করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকও অধিকারচ্যুত হয়। প্রপীড়িত দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। গ্র্যাক্‌চাইদের দু:সাহসিক সংস্কার ব্যর্থ হয় এবং রোম সরকার এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি। যুদ্ধবিগ্রহের পর প্রাক্তন সৈনিকরা সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য তারা অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। দাস ব্যবসায়েও তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। তাছাড়া, নতুন সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনী সাময়িকভাবে সংগৃহীত নাগরিকদের সমষ্টি আর রইল না। সামরিক বাহিনী এখন থেকে যুদ্ধেরত পেশাদারী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় সৈনিক তার বেতন ও লুণ্ঠনের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। 'তার একমাত্র বাড়ী হল ক্যাম্প, তার একমাত্র বিদ্যা হ'ল যুদ্ধবিদ্যা আর তার একমাত্র উচ্চাকাঙ্খা হ'ল সেনাপতির পদ'।[১] রাজনৈতিক ক্ষমতা নেহাত গায়ের জোর এবং বাহিনী পরিচালনার দ্বারা নির্ধারিত হ'তে লাগল। এ ভাবে নগর রাষ্ট্রের ধারণা নিঃশেষ হয়ে এল; কিন্তু সেনেট নতুন নীতি নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। ফলে কনসাল ও সেনাপতিদের উচ্চাকাঙ্খা গৃহযুদ্ধের কারণ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। মেরিয়াস (Marius) এবং সুলার (Sulla) সংঘর্ষ নৈরাজ্যের এক যুগের সূচনা করে এবং এর অবসান ঘটে তখনই, যখন এক শক্তিশালী নেতা 'প্রজাতন্ত্রকে' সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গেচুরে ভগ্নরাষ্ট্রে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করেন। সুতরাং রোমের রাজনৈতিক উন্নয়নে যা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা অস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং রোম অতীতের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করতে শুরু করল

প্রাচীন প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তি এত দুর্বার ছিল যে, তা হঠাৎ করে একেবারে স্তিমিত হয় নি। জুলিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে

১। মমসেনের *'History of Rome'* গ্রন্থের নবম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

যখন বিজ্ঞ অক্টেভিয়ান ক্ষমতায় আসীন হন, তখনও শাসনতন্ত্রের নামে তিনি রোমের প্রধান শাসকের দায়িত্ব ও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের সহকারী কনসালেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট প্রদেশের শাসনভার সেনেট গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের গতি যে দিকে ধাবিত হচ্ছিল তা সকলের নজরে পড়ে। অক্টেভিয়ান হলেন অগাস্টাস। তিনি একদিকে যেমন প্রথম নাগরিক, অন্যদিকে তেমনি প্রধান পুরোহিত এবং দেশের জনক। মৃত্যুর পর তিনি সরকারীভাবে দেবতার আসনে উন্নীত হন। অগাস্টাসের শাসনে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারিতার সকল লক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও তা ছিল বটে। তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে সে পর্দাও সরে যায়। শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তা হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। অগাস্টাস সর্বশেষ পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। যদি তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যেতেন, তা হ'লে সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারের জটিল সমস্যার কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারত। যদি তাঁর একমাত্র কন্যা না থেকে থাকত কোন ছেলে, তবে হয়ত রোমের ইতিহাস অনেক জটিলতার হাত থেকে রেহাই পেত। অবশ্য কোন শক্তিই সাম্রাজ্যকে তার শেষ পরিণতির হাত থেকে মুক্তি দিত না। কেননা তার আভ্যন্তরীণ ঐক্যের নীতি সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল। উত্তরাধিকার প্রশ্নে কোন নির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ না দিয়ে তিনি এমন এক যুগের ক্ষেত্র রচনা করেছেন, যে যুগে সেনেটের সিদ্ধান্ত বা জনগণের ভোট অপেক্ষা সামরিক বাহিনীর হুঙ্কারই বেশী কার্যকরী হয়ে ওঠে। অগাস্টাস কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী 'কমিশিয়া' বা 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক সংস্থা' সম্রাটকে নিয়ম মোতাবেক নির্বাচিত করত এবং সেনেট তার উপর রাজকীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করত। কিন্তু এতদিনে সার্বভৌম 'কমিশিয়ার' দিনও ফুরাল। সেনেটের ক্ষমতার কিছু অংশ তখনও অবশিষ্ট ; কেননা প্রকৃতিতে সেনেট ছিল সাম্রাজ্যের একমাত্র অভিজাত পরিষদ। কিন্তু তার সংকীর্ণতা সার্বভৌম ক্ষমতায় তার অধিকারকে সীমিত ক'রে তোলে এবং সম্রাটের বিরাট প্রভুত্বের নিকট তা নেহাত খাট হয়ে যায়। সম্রাট বাহিনী পরিচালনা করতেন এবং সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রায় দু'শো বছর ধরে রোমান বিশ্ব অসম এ দু'শক্তি দিয়ে শাসিত হয়েছিল ; কিন্তু নিরোর মৃত্যুর পর পরই সামরিক বাহিনীর কাজকর্মে

৭—

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনী গলবা (Galba), অথো (otho) এবং ভিটেলিয়াসকে (Vetellius) যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। সামরিক শক্তিই রোমান বিশ্বের প্রভুদের তৈরী করেছে এবং তাদের নস্যাৎও করেছে, এবং এসব ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। রাজনৈতিক ঐক্যের সুপ্ত উৎসের অনুসন্ধান ব্যাপারে তাদের কোন যোগ্যতা ছিল না। নাগরিকত্বের প্রতি আনুগত্য ও গর্বে যে সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছিল, তার দিনও শেষ হয়ে এল এবং সৈন্য বাহিনীর খেয়াল-খুশীমত তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্য ক্ষমতার অন্তসারশূণ্য খোলসে পরিণত হয় এবং অবশেষে বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিহত ক'তে অক্ষম হয়ে পড়ে।

নিরোর মৃত্যুর পর ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার ফলে ভেসপাসিয়ান (Vespasian) সম্রাট হ'লেন, এবং তিনি নাগরিকত্ব বিস্তারের পুরোনো নীতি অনুসরণ করে ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে হাজারো বর্ধিষ্ণু পরিবারকে অভিজাত সেনেটে স্থান দিয়ে সাম্রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন! এটি ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত এক পদক্ষেপ এবং এর ফলে কিছুদিনের জন্য রোমান বিশ্বে বিচ্ছিন্নতার গতি অবরুদ্ধ হয়। সেনেট এভাবে পুনর্গঠিত হয়ে পরবর্তী সম্রাটদের বৈধ ক্ষমতা দান করে এবং তার ফলে সম্রাটরা তাঁদের ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংঘর্ষকে এড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু নতুন নতুন সদস্য গ্রহণ করে সবসময় সেনেটের কর্তৃত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়নি। অবশ্য সাম্রাজ্য জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়নি। সংকীর্ণ অর্থে, স্ব-শাসনের মূল ধারণা রোম থেকে দূরে সরে যায়। সম্রাটের ক্ষমতার কোন বৈধ ভিত্তি রইল না এবং ফলে তিনি বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারিতার লোভও সংবরণ করতে পারেন নি অথবা উচ্চাকাঙ্খী সেনাপতিদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতাকে সংহত করতেও পারেন নি।

ডোমিটিয়ানের মৃত্যুর পর এক নতুন গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তখন এসত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পর নগ্ন আকারে এ সমস্যা মাথা তুলে! রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল যে নাগরিকত্ববোধ; তাও সুযোগের অভাবে অচল হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অংশে দায়িত্বহীন ক্ষমতার বিক্ষিপ্ত জ্যোতিকেন্দ্র ভয়ঙ্কর

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। ক্ষমতা যে কোন কেন্দ্রে সব কিছুকে কেন্দ্রিভূত করতে পারে বটে; কিন্তু তখন রোম সাম্রাজ্যের আর কোন কেন্দ্র ছিল না এবং ছিল না কোন রাজধানী। এভাবে এগিয়ে আসে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার সময়, তথা দু'জন সম্রাটের আমল—তারপর চারজন সম্রাটের আমল এবং এমন কি দু'জন সম্রাটের কাল। এমনিভাবে ক্ষমতা উচ্ছেদের ফলে জনসংখ্যা, সম্পদ এবং সংস্কৃতির মানও অবনত হয়ে পড়ে। মিথ্যা আদর্শের সেবায় নিয়োজিত যে ক্ষমতা, সেও আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ এবং ফলে তা থাকে ভৃত্যস্বরূপ; কিন্তু যে ক্ষমতা কোন অনুপ্রেরণা দেয় না বা যে ক্ষমতা নিজের বিরাটত্বের প্রতিচ্ছবি ছাড়া কোন মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয়, তা শুধুমাত্র এক ধ্বংসকারী নিপীড়ক; এবং শেষ পর্যায়ে তা নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনে।

এটা বলা হয়ে থাকে যে, এক রহস্যময় ও মারাত্মক ক্ষয় রোমানদের উপর নেমে আসে।[১] কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত যে, জ্ঞাতব্যের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত আমরা আবিষ্কার করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন অজ্ঞাত বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যে কোন মহান কীর্তির বা সৃষ্টির গতির উত্থান ও পতন রয়েছে এবং তার কোন ব্যাখ্যা আমরা সঠিকভাবে দিতে পারি না। কিন্তু সমাজ জীবন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার ধারে কাছেও আমরা যাই নি। ফলে রোমের ঘটনার ন্যায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ। রোম যখন শক্তিশালী ছিল, তখন তার আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস ছিল নাগরিকত্বের ঐক্যনীতি। এ নীতির ছিল উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা; যার ফলে তা কিছু দিনের জন্য ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অজানা পরিবেশে খাপ খেতে পেরেছিল। কিন্তু কোন এক সীমারেখার পর তাকে না ভেঙ্গে আর প্রসারিত করা সম্ভব হয় নি। রোমের কল্পনা বিলাসী রাষ্ট্রনীতি সুসভ্য বিশ্বের কোন এক সাম্রাজ্যের উপযোগী রাজনৈতিক ভিত্তি রচনা করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তখনকার অর্থহীন নাগরিকত্বের পরিবর্তে রোম ঐক্যের কোন নতুন নীতি খুঁজে পায় নি এবং পায় নি প্রশাসন ও নগর-পরিষদের ঐতিহ্যের পরিবর্তে কর্তৃত্ব প্রয়োগের অন্যকোন নীতি। সুতরাং

১। ব্যালফুরের (*Balfour*) গ্রন্থ '*Decadence*'।

www.nagorikpathagar.org

বলপ্রয়োগের উপর তার নির্ভর করতে হয়েছিল এবং বলপ্রয়োগের ফলে সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

যখন রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ ব্যক্তিত্ববাদী-দর্শন ও খ্রীস্টধর্মের পরকালীন 'ধর্মরাজ্যে' আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইল। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় এসব মতবাদে এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যা অতীতে রাষ্ট্র উপেক্ষা ক'রে এসেছে। এর ফলে রাষ্ট্রের ধ্বংস আরও ত্বরান্বিত হয়। খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তনে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে বিদ্যমান যে প্রভেদ, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অবশ্য পরে তা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সে আসে প্রস্তুতির পূর্বেই এবং এসে পড়ে ভয়ঙ্কর এক সময়ে। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ফলে বাহ্যিক শক্তিগুলো সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে; কেননা এতদিন তারা তার চারদিক ঘিরে ওঁৎ পেতে ছিল। অবশেষে রোম সাম্রাজ্য অন্তসারশূন্য এক খোলসে পরিণত হয় এবং ফলে আদিম অথচ প্রকৃত আনুগত্যসম্পন্ন বর্বর বিশ্বের আক্রমণ প্রতিহত করতে রোম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেশীয় রাষ্ট্রের সংগঠন

এক : সামন্তবাদ

রোমের পতনের পর বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিম ইউরোপ থেকে 'রাষ্ট্রের' অন্তর্ধান ঘটে। প্রাচ্যদেশের বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে অনুন্নত এক সংস্কৃতি কাঠামো সংরক্ষণ করে আসছিল। ঐতিহাসিকরা তার প্রতি তেমন নজর না দিলেও সাম্রাজ্যটি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটে। রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে বলতে হয় যে, তখন নাগরিকত্বের মহান বিবর্তন মোটেই হয় নি। বিধ্বস্ত ব্যবস্থার ঐতিহ্য বর্বর বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এর পরবর্তী কয়েক শতকে আবার আদিম সমাজ থেকে রাষ্ট্রকে সংগঠন করতে হয়। এ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়; তবে আধুনিক রাষ্ট্র সংগঠনে যে যে নতুন উপাদান শেষপর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাদের আলোচনা বড়জোর এখানে হ'তে পারে।

এ যুগে দুটো স্রোতধারাকে কেন্দ্র ক'রে সমাজ দানা বাঁধে। তাদের একটি হ'ল খ্রীস্টীয় চার্চ। তার গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের জন্য রাষ্ট্র ধ্বংস হ'লেও চার্চ যুগোত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিল। মানুষের মন এতে একদিকে যেমন পায় সোয়াস্তি, অন্যদিকে তেমনি রোমের ঐতিহ্যবাহী নামের অন্তরালে নতুন আর এক ধরনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। বেনেডিক্টের (Benedict) শাসন গ্রেগোরীর (Gregrory) ক্ষমতায় পুনর্বিন্যস্ত হয়। শাসন ও ক্ষমতা একইভাবে স্থান ও কালের সকল সীমা লঙ্ঘনের দাবী রাখে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত বিশ্বে চার্চ প্রথম থেকেই সাংস্কৃতিক সার্বজনীনতার এক সূত্র নিয়ে আসে এবং নিজস্ব আওতায় ঐক্যের এক ধারণা পুনরুজ্জীবিত করে। অন্যটি হ'ল ভৌগোলিক একক বা আঞ্চলিকতার ধারণা; যা সাম্রাজ্য বিভক্ত হবার ফলে কোন যোদ্ধা বা অভিজাতের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। তার বহু উপরে ছিল বিদেশী

www.nagorikpathagar.org

রাজা। রাজা অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিলেন; যেমন—ফ্রান্ক, গর্থ, লম্বার্ড, ভান্ডাল প্রভৃতির। রাজা রাজস্ব আদায় করতেন এবং বড় রকম যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর অধীনস্থ রাজপুরুষদের। বর্বর অভিযানের আমলে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাই ছিল প্রথম প্রয়োজন এবং শক্তিশালীর কাছে আত্মসমর্পণের বিনিময়ে তা পাওয়া যেত। প্রত্যেক জেলায় ছিল জেলা প্রশাসক, এবং রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে জেলা প্রশাসক নিজের এলাকায় নিজের শক্তি কেন্দ্র সংগঠন করতেন এবং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার আশীর্বাদ উপভোগ করতেন। ক্লোভিস (Clovis) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা একটা নতুন সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু শাসক ও শাসিত দুইই ছিলেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত অজ্ঞ, ভিন্ন জাতীয় ও বহু মতবাদে বিশ্বাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে চার্লস মারটেল এবং পিপিন এবং সার্লেমেইনের (Charlemagne) অধীনে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত ঐক্যনীতির বদলে তাঁরা গ্রহণ করেন 'বিভিন্ন স্তরের এক শাসন ব্যবস্থা'। 'কাউন্ট,' 'মারকুইস্' ও 'ডিউক' প্রভৃতি উপাধির উচ্চপদস্থ অভিজাত ব্যক্তিরা রাজার কাছ থেকে শাসন কাজের মঞ্জুরী ক'রে দেশ শাসন করতেন। তার পরিবর্তে তাঁরা রাজাকে রাজস্ব দিতে, রাজার পক্ষে সামরিক কাজ পরিচালনা করতে ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাধ্য থাকতেন।

এ ভাবে সামন্তবাদের সার্থক তত্ত্ব ও তার কার্যকারিতা শুরু হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র আবার সম্প্রদায়ে অন্তর্হিত হয়। সেবা, আনুগত্য ও রাজভক্তির শর্তসাপেক্ষ কোন জায়গীরে অর্থনৈতিক অধিকার, ভূমি ও অন্যান্য বিষয়ে ন্যস্ত অধিকার সামন্তের হাতে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রভূত ক্ষমতার সমাবেশ ঘটায়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দাবী নয়, বরং প্রভুর দাবী এবং সামগ্রিক মঙ্গল নয়, বরং প্রভুর অধিকারই ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ববোধ সঞ্জীবিত করত ও এভাবে তা প্রতিপালিত হতো। সম্প্রদায় বোধ বর্জিত এ নতুন পরিবেশে উপজাতির সামরিক সংগঠন উপর থেকে দেশের উপর ন্যস্ত হ'ত। এ ব্যবস্থা স্থায়ী হবার সাথে সাথে ভূমির মালিকানাই সকল অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ভূমির মালিকানার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় আনুগত্য ও রাজভক্তি লাভের অধিকার; সামরিক সেবা ও

www.nagorikpathagar.org

রাজস্ব আদায়ের অধিকার, অভিভাবকত্ব ও বিবাহের নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং আইন প্রণয়ন ও শাসকের অধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে সরকারী পদ সংযুক্ত হয়। অন্যকথায়, সরকারী ও বে-সরকারী কাজের মধ্যে প্রভেদের অবসান ঘটে। এভাবে 'বে-সরকারী যুদ্ধ', 'বে-সরকারী মুদ্রাঙ্কন' এবং 'বে-সরকারী এখতিয়ার' প্রভৃতি গোলমেলে কথাগুলোর সৃষ্টি হয়। উচ্চতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা করপ্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করে, এবং বে-সরকারী সুযোগ-সুবিধা সরকারী অধিকারে রূপ লাভ করে। রাজা ও ব্যক্তিগত অধিকারে শাসন করতেন এবং জনসাধারণকে 'আমার জনসাধারণ' দেশকে 'আমার দেশ' বলে আখ্যায়িত করবার প্রথার জন্ম এখান থেকেই। জেনকস্ সাহেব (Mr. Jenks) সামন্ততান্ত্রিক অবস্থাকে পিতৃতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি এক অবস্থা ব'লে বর্ণনা করেন।[১] এ বর্ণনা অর্থপূর্ণ ; কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, পিতৃতান্ত্রিক অবস্থার মৌলিক উপাদান যে 'আত্মীয়তা বন্ধন' তা সামন্তবাদে অনুপস্থিত। সামন্তবাদ বরং জাতিভেদ প্রথার সূচক এক স্বতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করেছে। মালিকানা ও পদমর্যাদা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে এবং মালিকের প্রথম পুত্র বা প্রথম সন্তান তার স্থলাভিষিক্ত হ'তে থাকে। জায়গীরদারের উত্তরাধিকারী নজরানা দিয়ে নিজের অধিকার কায়েম করত। বুদ্ধিবৃত্তি ও আর্থিক ক্ষেত্রের দৈন্যের জন্য সে যুগে সমাজ এক অনমনীয়রূপ গ্রহণ করেছিল এবং তাই ছিল স্বাভাবিক। জনসংখ্যার প্রায় সবটুকুই আদিম কৃষিকাজের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। চার্চের সার্বজনীন আবেদন ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ভাঙ্গতে পারে নি। বরং চার্চ অন্যান্য সংস্থার মত নিজেই পরিণত হয় বহু স্তরের এক সামাজিক শ্রেণীতে ও এক বর্ণে। জীবনাব্যবস্থায় অধীনতা ও প্রভুত্বের দাবীর সমন্বয় ; এটাই ছিল চার্চের শিক্ষা।

ক্রমে ক্রমে এ ব্যবস্থায় ও কতকগুলো নতুন নতুন প্রবণতার জন্ম হয় এবং তার ফলে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হ'তে থাকে। ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের প্রসার হ'তে লাগল এবং গ'ড়ে উঠল বাণিজ্য প্রধান নতুন নতুন শহর। এগুলো ছিল সামন্তবাদের ঐতিহ্য বিরোধী। শিল্প-বাণিজ্যের কৌলিন্য ভূমির কৌলিন্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামন্ততন্ত্রে শিল্প-বাণিজ্যের কৌলিন্যর

১। জেনকস্ সাহেবের *'The State and The Nation'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

কোন স্থান ছিল না। শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে জার্মানী ও ইতালীতে কতকগুলো 'অবাধ নগরী' গ'ড়ে উঠল। আমরা আগেই দেখেছি কিভাবে নগর জীবন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগেও এর দৃষ্টান্ত মেলে। নগরে শিল্প-বাণিজ্যের সম্পদ ভূ-স্বামীদের ক্ষমতা ও ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিল। নগরে 'গিল্ড' নামে এক নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ঐক্য কেন্দ্র গড়ে উঠল এবং সামন্ততন্ত্রে যাদের কোন স্থান ছিল না তারা এর মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে তারা নতুন জীবনমান, নতুন নতুন প্রথা ও নতুন জীবনবোধ কায়েম করল। নগরে গণতন্ত্রের আদর্শ পেল নতুন প্রাণ। ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষককূল যা করতে পারে নি, এখন সাধারণ লোক ও হস্তশিল্পীরা এসব ক্ষেত্রে বিজয়ী হ'ল। প্রথমদিকে নতুন পরিস্থিতিতে বণিকদের সংস্থা ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্পে রত কর্মীদের সংস্থা ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠতে লাগল। ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি অনুরাগ তাদেরও কম ছিল না। কিন্তু তখন নতুন আন্দোলনের যে জোয়ার চারদিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে সব ভেসে গেল। তারাও সাথে সাথে সে ঢেউ-এ ভেসে গেল।

মধ্যযুগের মানসিকতায় ধর্মের প্রতাপ এমনি ছিল, যার তুলনা পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কিন্তু যদিও তার বিঘোষিত নীতি ছিল ঐক্য ও প্রীতির, তথাপি শেষ পর্যন্ত জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতার এক তরবারী এবং সে তরবারীই সামন্ততন্ত্রের দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে ফেলে। 'হোলি রোমান এমপায়ার' (পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) কোনদিন সম্রাট ও পোপের দাবীর সমন্বয় সাধন করতে পারে নি। এমন একদিন ছিল যখন পোপ দাবী করতেন যে, তিনি হ'লেন 'সকল সম্রাটের প্রভু।' তাঁরা তাঁর পদচুম্বন করতে বাধ্য। তিনি তাঁদেরকে যখন তখন পদচ্যুত করতে পারেন এবং তাঁদের প্রজাকে আনুগত্যের শপথ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সপ্তম গ্রেগোরী তাঁর উল্লিখিত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ হেনরীকে ক্যানোসায় নিয়ে এনে চরম অপমানের অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা করেন। সমগ্র বিশ্ব তখন দেখল কিভাবে একজন সম্রাট তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভুর সামনে বরফের উপর খালি পায়ে চলাফেরা

www.nagorikpathagar.org

ক'রে তিনদিন তিনরাত ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত করছেন। গ্রেগোরীর বিজয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; যদিও তৃতীয় ইনোসেন্টের Innocent (III) আমলে ইতালী থেকে স্পেন এবং সুইডেন থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সকল রাজাই পোপের অধীনে এসে পড়েন।

পোপদের জাগতিক ক্ষমতার মূলে ছিল ধর্মবিশ্বাসীদের সুবৃহৎ এক সম্প্রদায়ের সমর্থন। কিন্তু কালে দু'দিক থেকে এলো এর বিরুদ্ধে আক্রমণ। পোপের প্রতাপ ও ক্ষমতা ছিল অনেকটা রাজকীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার মতই। দু'শক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবিধান হল না এবং তাঁদের কর্ম পরিধির মধ্যেও কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। একদিকে যেমন যাজকদের অভিষেক ক্রিয়ায় তাঁর ভূমিকার জন্য রাজা নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, তেমনি অন্যদিকে পোপ যাজকীয় বিচারালয়ের দাবী তুলে নিজের আধিপত্য কায়েম করতে চাইতেন। 'সার্বজনীন অংশীদারত্বে' প্রত্যেকে চাইতেন নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে। তাই তার পরিণতি হয়েছিল বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য। তাছাড়া, চার্চের জাগতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে যে আঘাত আসে, তার মূলে ছিল চার্চের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। তার জাগতিক ক্ষমতা আধ্যাত্মিক নীতির সাথে ছিল বেসুরো। কোন কর্তৃত্বের আবেদনে নয়, বরং বিবেকের বিচারে যার মূল নিহিত; সংস্কারের সে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চার্চের মধ্যে বিভেদের জন্ম দেয়। চার্চের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে এবং এ বিভেদের ফলে তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সার্বজনীন দাবীও নিঃশেষ হয়ে যায়। ভাঙ্গন ধরা সামন্ততন্ত্রেও নতুন নতুন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ইউরোপের রাজন্যবর্গ এ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। চার্চের দাবী ছাড়াও সামন্তবাদ রাজার উচ্চাকাঙ্খাকে ভয়ঙ্করভাবে ব্যাহত করেছিল। রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকত শুধু বড় বড় রায়ত বা প্রজা; কিন্তু ছোট ছোট প্রজারা ভূ-স্বামীদের অধীনে থেকে পরোক্ষভাবে রাজার সেবা করত। রাজা বড় বড় ভূ-স্বামীদের নিকট থেকে সাময়িক সেবা দাবী করতে পারতেন; কিন্তু তাদের অধীনস্থদের নিকট থেকে কোনরূপ সামরিক সাহায্য দাবী করতে পারতেন না। এর ফলে বড় বড় ভূ-স্বামীদের ক্ষমতা প্রাচুর্য তাঁদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করত অবিশ্বাস, এবং রাজার নিকটও তা ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর। সাধারণ লোকেরাও

www.nagorikpathagar.org

তাদের প্রভুদের মধ্যে সংঘটিত সংগ্রামে নিঃশেষ হবার সময় চীৎকার ক'রে বলত—'দু'পক্ষই ধ্বংস হোক'—। রাজার ক্ষমতার প্রতি তারা সাগ্রহে তাকাত এবং তাঁকেই গ্রহণ করত আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার উৎসরূপে। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সবাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আশ্রয় পেতে চাইত। চার্চ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়; কেননা অনুভূতির সংহতিতে ভাঙ্গন ধরেছিল। কিন্তু এবার এল নতুন এক সংহতি, অনুভূতি এবং তার ফলে রাষ্ট্র সফলতার স্বর্ণ শিখরে উঠে এল।

এ অনুভূতি হ'ল জাতীয়তার অনুভূতি। এর ফলে নাগরিকত্বের ধারণায় এমন এক গভীরতা ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়, যা রোম ও গ্রীসে ছিল অজ্ঞাত। দেশীয় রাষ্ট্রকে সুসংহত করবার জন্য এমনি এক অনুভূতির প্রয়োজন ছিল এবং তার ফলে রাজনৈতিক বিবর্তনের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এবারে সর্বপ্রথম আমাদের আলোচনায় আমরা সুস্পষ্ট ও সৃজনশীল শক্তিরূপে পেলাম জাতীয়তাকে। সুতরাং এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটু ভেবে দেখা যাক।

দুইঃ জাতীয়তার তাৎপর্য

প্রকৃতিগতভাবে জাতীয়তা রাষ্ট্রের মতই একই সুরের ঝংকার তোলে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নাগরিকত্ব কিন্তু বিশেষ গুণের বা বিশেষ অধিকারের সূচক। জাতীয়তা অধিকার হিসেবে কিন্তু কারো উপর বর্তায় না। শ্রেণীও পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রকৃতিগতভাবে তা মানুষের অধিকারে আসে।[১] এ অর্থে জাতীয়তা অনেকটা আত্মীয়তাবোধের মত এবং আত্মীয়তা বন্ধন উপজাতির মধ্যে সংহতি নিয়ে আসতে যেভাবে কার্যকর হয়েছিল, জাতীয়তা তার চেয়ে বহুগুণে ও ব্যাপকতার ভিত্তিতে কার্যকরী হয়।

১। আইনগত অর্থে জাতীয়তার কথা বলা হচ্ছেনা। অবস্থান ও অন্যান্য আইনগত প্রয়োজন সাপেক্ষে ইংরেজ বা ফরাসী নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। তাকে জাতীয়তা নামে আখ্যায়িত করাও হয়। কিন্তু এর ফলে কেহ রাতারাতি ইংরেজ বা ফরাসী হয়ে যায় না। কোন শান্তিচুক্তি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোন গোষ্ঠীর আইনগতজাতীয়তা পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু জাতীয়তার আধ্যাত্ম সত্তার নির্ধারণ হয় বহু যুগের সাধনায়।

www.nagorikpathagar.org

এ যেন এক মুক্ত সাম্যবোধ। হাজারো ব্যবধান এতে লয় হয়ে যায়, এবং কোন বাধ্যকরী ক্ষমতা বা সমর্থনের উপর তা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং জাতিভেদের কঠোর বেড়াজাল ও সংকীর্ণ আনুগত্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং চিন্তা ও কর্মে পীড়নমূলক সার্বজনীনতার বিরুদ্ধে জাতীয়তা-বোধ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল।

জাতীয়তার পূর্ব শর্তগুলো মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠে সংস্কৃতির সাধারণ উপাদান। ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষার সাধারণ বাহন—ভাষা ও শিক্ষার সাধারণ প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা প্রভৃতির মাধ্যমে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত শক্তির অনুপস্থিতিতে তারা নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি ; কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ডতা, ঐতিহাসিক আকস্মিকতা, ভাষা ও ঐতিহ্যের ফলে বৃহৎ এক অঞ্চলে তারা সম্প্রদায়ের এক নতুন অনুভূতি গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। এসকল অঞ্চলে মানুষ দেশ বা পিতৃভূমি সম্পর্কে ভাবতে শিখল। তারা এমন এক আনুগত্য বোধে অনুপ্রাণিত হ'ল, যার পরিধি সভ্যতার দিগ-দর্শনে সংকীর্ণ ; কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকায় অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। বিজ্ঞানের সৃজনধর্মী উৎসমূলে যা কাজ করেছে, কলাকৌশলের সে অগ্রগতিই এর বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। বারুদের আবিষ্কারই হোক আর ছাপাখানার আবিষ্কারই হোক—সব আবিষ্কারের ফলে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় এবং তা বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমতঃ এসকল ক্ষমতার নতুন বাহন শক্তিশালী লোকেরা অধিকার করে ও ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু প্রয়োগের সাথে সাথে তাদের ব্যবহার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। আবিষ্কার বস্তুর দূরত্ব হরণ করে ; তা সে দূরত্ব সামাজিকই হোক আর ভৌগোলিকই হোক। এর ফলে সুযোগ-সুবিধা ছড়িয়ে পড়ে। চিরাচরিত প্রথার কঠোরতা এতে কমে আসে। অনমনীয় আইনের উপর ভিত্তি ক'রে নতুন আবিষ্কার মানুষের গড়া ব্যবধানের বিচার করে এবং যদি তা অনর্থক হয়, তবে সে তাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ও শেষ পর্যন্ত দূর করে দেয়। যে কোন বর্ধিষ্ণু সমাজে মনগড়া ব্যবধান অভিজ্ঞতার দর্শনের সাথে এঁটে উঠতে পারে না। প্রকৃতির উপর লব্ধ প্রত্যেকটি নতুন শক্তি মানুষের মধ্যেকার শক্তিকে নতুন ক'রে জাগিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন যুগে সাধারণ মানুষের জীবন ও শাসন কর্তৃপক্ষের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে যে কত ব্যবধান ছিল, তা আমরা এ যুগে ধারণা করতে পারি না।

নতুন আবিষ্কারের মাধ্যম মুক্ত না হওয়া অবধি কৃষককুলের নিকট জীবন ছিল ভূমি থেকে ন্যূনতম জীবিকার্জনের নিয়ত সংগ্রাম। তাদের নিকট সরকার ছিল স্বর্গের মতই দূরবর্তী ও অজ্ঞাত। স্বর্গ সম্বন্ধে যেমন ছিল তাদের অস্পষ্ট বিশ্বাস, সরকারের প্রতিও ছিল তেমনি এক অস্বাভাবিক ধারণা। তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত, সংস্থানহীন এবং অবহেলিত। তাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্ভরশীলতা তাদের নিকট ছিল অজানা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা ছিল রহস্যময়। যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাধারণ জীবন-ব্যবস্থায় তাদের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে সজাগ না হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নি।

যে সংহতির উপর ভিত্তি ক'রে আধুনিক রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়েছে কিভাবে তার ব্যাখ্যা হ'তে পারে? স্পেঙ্গলার (Spengler) বলেছেন: 'জাতি ভাষাভিত্তিকও নয়, রাজনৈতিক বা কুলগতও নয়; বরং আধ্যাত্মিক ঐক্যের মূর্তরূপ হ'ল জাতি', তাহলে ইংলণ্ডের সব শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধারণ-অসাধারণ লোকের এমন কোন ঐক্যবোধ রয়েছে, যার জন্য তারা ফরাসী ও জার্মান জনগণ থেকে স্বতন্ত্র।

জাতীয়তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোন সাধারণ গুণ বা বিশিষ্ট লক্ষণের খোঁজ করা নিরর্থক; ভাষা কিংবা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন প্রথা বা ধর্ম বা ভূখণ্ড বা কুলগত সচেতনতা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ, এমন কি রাজনৈতিক জীবনের ঐতিহ্যের ন্যায় মানবজাতির কোন সামাজিক সম্পদই জাতীয়তা থেকে অচ্ছেদ্য নয়। আসলে কোন দু'টি জাতি একই বস্তুগত উপাদানে নিজেদের ঐক্য খুঁজে পায় নি।[১] সুইস্ জাতির কোন সাধারণ ভাষা নেই; ইহুদীদের নেই কোন সাধারণ ভূখণ্ড। আর একই কুলের কথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হল মায়াময়। বিভ্রান্তিকর কোন সাধারণ উপাদানের খোঁজ করতে গেলেই আমাদের তার বিশিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হয় এবং এতে আমরা আরও বিভ্রান্ত হই। জাতীয়তার অধিকাংশ সংজ্ঞায় আমরা রেনানের (Renan) বিখ্যাত

১। লেখকের *'The Foundations of IV Nationality'* (*Sociolagical Review*, [illegible], *1915*) প্রবন্ধে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সংজ্ঞার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি বলেছেন: 'একই ভাষা ব্যবহার করলে বা একই মানব কুলের অন্তর্ভুক্ত হলেই জাতি গঠন হয় না; বরং অতীতে এক সাথে মহৎ কোন কাজ করবার স্মৃতি ও ভবিষ্যতে তেমনি কোন মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের অনুভূতি থেকেই জাতি প্রাণ পায়।' কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে, কারা সে ব্যক্তি যারা এক সাথে মহৎ কাজ করে জাতীয় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ? এটা একটা পরিবার বা কোন জাহাজের নাবিকরা বা বিদ্রোহী একদল লোকও করতে পারে। কিন্তু তার ফলে তারা একটা জাতিতে পরিণত হয় না। জাতীয়তা হ'ল সম্প্রদায়ের দুর্বার এক জীবনবোধ, যা কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অধিকার করে বা করতে চায়। এ অনুভূতি জাগ্রত হয় বহু কারণে; কিন্তু একবার জাগ্রত হ'লে তা হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট, দুর্বার ও বেগবান। এর অনির্বাণ প্রেরণায় জনগণ শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ, এমন কি অর্চনার গভীর প্রত্যয় নিয়ে আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন আত্মিক ঐক্যের মধ্যে জাতীয়তা হ'ল অন্যতম। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে এর প্রভাব এমন চূড়ান্ত কেন? কোন 'আত্মিক ঐক্যে' ইংলন্ডের মাতব্বর, খাতক, উকিল, খনিমজুর অন্যদেশের একই ধর্মাবলম্বী বা একই পেশার লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ অনুভব করে? এটা কি ক'রে সম্ভব যে, চিন্তা ও কাজে প্রতিদিন প্রতি ব্যাপারে হাজারো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেন এক জনগোষ্ঠী জাতীয়তার একই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্কটকালে প্রত্যেক পার্থক্য, ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্যকে ছাপিয়ে এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে?

এটাও সত্যি যে, কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিশেষ একরকম সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য; যার জন্য বিশেষ অবস্থায় একজাতির প্রতিনিধি অন্য জাতির প্রতিনিধি থেকে হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র; যেমন—একজন ফরাসী একজন জার্মান থেকে, একজন ইংরেজ একজন ফরাসী থেকে, একজন সুইডেনবাসী একজন রুশ থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয়, একজন ইংরেজ একজন স্কচ থেকে, একজন স্যাকসন একজন প্রুশ থেকে, একজন বৃটন একজন নরম্যান থেকে আরও বেশী স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তাছাড়া, এ ব্যবধান সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্ম

www.nagorikpathagar.org

ও অস্পষ্ট। এক জাতির মধ্যে তাদের যে স্বাতন্ত্র্য তা দেশপ্রেম ও আবেগ প্রবণতার দ্বারা আড়ষ্ট; কিন্তু জাতিতে জাতিতে যে স্বাতন্ত্র্য, তা হ'ল রাজনৈতিক বেড়াজালের সৃষ্টি। অসাধারণ ও কাল্পনিক প্রতিনিধিত্বের আবেশে জড়ানো। এর স্থূল দৃষ্টান্ত হ'ল মহাযুদ্ধের সময়ে ও দ্বিতীয় বিপ্লবের পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে রুশদের পরিবর্তনশীল পদমর্যাদা। এ ব্যবধান যখন বাস্তব হয়ে ওঠে, তখন তা আর বিশ্বজনীন থাকে না; বরং তা হয় আঞ্চলিক আলোকে নির্দিষ্ট ও হ্রস্ব। দেহের সৌষ্ঠব বা চিন্তাধারায় অনেক ইংরেজের সাধারণভাবে ইংরেজী বৈশিষ্ট্য নেই; কিন্তু তথাপি তারা জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতন। এসব সূক্ষ্ম সাদৃশ্য কিন্তু আধুনিক সভ্যতার চূড়ান্তরূপ নয়।

জাতীয়তার গভীরে রয়েছে মোটামুটি দু'টি মহান উপাদান। তাদের একটি হ'ল ভৌগোলিক সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা এবং অপরটি হচ্ছে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা; যার উপর ভিত্তি ক'রে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে।

সীমিত করবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সব সময়ই সীমা নির্ধারণ করে। এরূপ সীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের আগ্রহ থেকেই জন্ম নেয় শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা। রাষ্ট্রীয় সীমানায় থাকে সুশৃঙ্খল এক অবস্থা। এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এজন্য যে, রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের আওতা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। একবার ভৌগোলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে রাষ্ট্র তার সদস্যদের কার্যসীমা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমিত ক'রে দেয়। ধর্মে, বিদ্যায়, আইনে, রীতিনীতিতে পরিস্ফুট মধ্যযুগীয় সভ্যতার মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আস্তে আস্তে 'জাতীয়করণ' করা হয়। রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ-কারী প্রভাব তার বাণিজ্যনীতির মধ্যে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; কেননা এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মকে সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ যুক্তির ত্রুটিপূর্ণ দিক কিন্তু জাতীয়তা স্পৃহায় ঢাকা পড়ে যায়। বস্তুতঃ এ ধরনের নীতির জন্য অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম জাতীয় সীমরেখায় সীমিত। আধুনিককালের সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি এ ধরণের। আবার, শাসন ও আইনের নির্দিষ্ট আওতা থাকার ফলে যারা সে এলাকায় বসবাস করে তারা এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় এবং অন্য শাসন ও আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যারা বসবাস করে তারা এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রে সাধারণ শৃঙ্খলাবোধের বিবর্তন পৃথকভাবে হওয়াতে

www.nagorikpathagar.org

ভেতরে এক সাদৃশ্যবোধ ও বাইরে বৈসাদৃশ্যের জন্ম হয়। তাছাড়াও রয়েছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; যার ফলে এক রাষ্ট্রের নাগরিকরা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয় ও সাধারণ সংকট ও সাধারণ বিজয়ের মধ্যদিয়ে এবং একদিকে তীব্রতর ঘৃণা ও অন্যদিকে সীমাহীন ভালবাসার মাধ্যমে বিশেষ ভূখণ্ডের জনগণ একাত্মতা অনুভব করে।

জাতীয়তাবোধকে গৌরবান্বিত করবার অন্য প্রভাবও রয়েছে, যার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে; যা সমাজের মৌল প্রবণতাকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এটাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য অতীতের অন্ধকারে একটু হাতড়িয়ে দেখা যাক।

মানবগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য ও বিশিষ্ট অংশ হিসেবে আমরা জনগোষ্ঠী বা উপজাতিকে দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ঘুরে বেড়াতে। কোথাও তারা স্থায়ী জনপদ গড়ে তুলেছে, কোথাও বা কোন লোকালয় ধ্বংস করেছে এবং নতুন বাসভূমির জন্য আবার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। অধিকার, আক্রমণ, কোন লোকালয় পরিত্যাগ করবার নিয়ত অভিযানে তাদের ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু সমগ্র মানবগোষ্ঠীর বা মানবের কোন গোটা সম্প্রদায়ের এরূপ ঘোরাফেরা মানব ইতিহাসের বাস্তব দিক নয়। অপ্রশস্ত সমুদ্র বা মরুভূমি পার হয়ে বা প্রশস্ত কোন নদীর মোহনা অতিক্রম করা ছাড়া মানব সম্প্রদায়ের এরূপ ঘোরাফেরা অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল; কেননা পৃথিবীর আদিম, নিশ্ছিদ্র ও গভীর অরণ্যকে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য উপায়ে জয় না করে সে ভাবে ঘোরাফেরা সম্ভব ছিল না। মুক্তির অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় মানুষ গতিশীলতাও অর্জন করেছে অতি ধীরে ধীরে। আধুনিক নৃতত্ত্ব সত্যিই এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আদিম উপজাতিরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে বাস করত, যার ফলে বড় রকম কোন দেশত্যাগ সম্ভব হ'ত না। কিন্তু অনুর্বর তৃণভূমি বা উষর সমুদ্রতীরের যাযাবরদের কথা আলাদা। এ ব্যতিক্রমগুলো নিয়মকে প্রমাণ করে। মানুষ যেখানে বসবাস শুরু করে, সেখানেই স্থায়ীভাবে থাকতে চায়। দুঃসাহসী অভিযাত্রী বা বিজয়ীরা তাদের মধ্য থেকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু জনগোষ্ঠী যেখানেই অবস্থান করে -তা সে মুক্ত জায়গাই হোক, আর পাহাড়ী এলাকা বা সমুদ্রতীরই হোক।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের বিভিন্নস্থানে বসতিস্থাপন শেষ হ'লে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান বসতিস্থাপনের প্রক্রিয়ায় মিলন ও সংঘর্ষ দুইই থাকে। ব্যবসা, নিজ গোষ্ঠির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধপ্রথা এবং বিজয়—প্রভৃতি প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীকে সম্মিলিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সব গোষ্ঠী এক নামে পরিচিত হয়। গলে সিজার (Caesar) যে অবস্থা দেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানেও; তার আগেই সেখানকার লোকজন 'গলি' (Galli)—এ সাধারণ নামে পরিচিত হয়। 'একুইটানি' 'সেলটি' ও 'বেলজি' (Aequitani, Cetae, Belgae)—এ তিনটি বিখ্যাত ভৌগোলিক এলাকার লোকজন তখন এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অবশ্য তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ বন্ধন এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পর্যন্ত তারা এক হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এ উপজাতিগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল 'ইদুই (Aedui), 'সেকোয়ানী' (Sequani), হেলভেটি' (Helveti) 'নারভি (Nervii), 'আরভারনি' (Arverni), 'ত্রিবিরি (Treviri) 'কারনিউট্স্' (Carnutes) ও আরও অনেকে। এ উপজাতিগুলো এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়; যদিও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা উভয়ই ছিল। মোটের উপর সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল খুব অস্থায়ী। রোমান বিজয়ীরা সবগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিজারের গলের উপজাতিগুলোও ছিল আক্রমণ ও মিলনের ফলস্বরূপ। সীমাহীন সামাজিক সংমিশ্রনের ফলে এসব নতুন জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়। এরা ছিল তাদের কুল গৌরবে গৌরবান্বিত। অবশ্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোষ্ঠী গৌরবের এটাই ছিল সার্বজনীন রূপ। তাদের গোষ্ঠী আনুগত্যের মূল কারণ কিন্তু কুল নয়, বরং স্থান। প্রথা, ঐতিহ্য এবং কর্তৃত্ব ও আনুসঙ্গিক সৌভাগ্য এবং সাধারণ জীবন ব্যবস্থার সাম্যই ছিল তার মূল কারণ।

ইতিহাসের পাতায় আক্রমণ ও বিজয়ের যে বড় বড় স্রোতধারা আমরা লক্ষ্য করি, তাদের পেছনেও রয়েছে এমনি ধরনের বৃহৎ ঐক্য ও মিলন। এ প্রসংগে মিড্স্ ও পারসিক, গ্রীক ও ফিনিসীয়, হিব্রু ও মিসরীয়, মঙ্গোল ও তুর্কী, ইট্রুস্কান ও রোমান, ম্যাগিয়ার ও পোল, ফ্রান্স ও এলেম্যান, ম্যাকলন ও কেল্টদের কথা আমরা ভেবে দেখতে পারি। এ নামগুলো কিন্তু কোন অবিচ্ছেদ্য ও নির্ধারিত জনসমষ্টিকে বুঝায় না; বরং ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সম্মিলিত মহান কীর্তির যোগ্য

www.nagorikpathagar.org

অস্থায়ী সংমিশ্রণের ফলে যেসব জনসমষ্টি গড়ে উঠেছে, তারা তাদের প্রতিনিধিস্থানীয়। পরিবর্তনের বিরাট তালিকায় ক্ষণস্থায়ী হ'লেও অমর স্মারক চিহ্নস্বরূপ হচ্ছে ঐ নামগুলো। কোন নেতা বা স্থান বা জনসমষ্টির জন্মস্থান অথবা প্রভাবশালী কোন দল থেকে ঐ নামের জন্ম হয়েছে, এবং কোন মহান কীর্তি দ্বারা তা সমর্থিত হওয়ায় তারা কুলের গৌরবময় সংহতি নিয়ে গর্ববোধ করে। এখান থেকে হ'ল জাতীয়তার সূচনা।

যে নামে তারা পরিচিত, তার বিকৃতি থেকেই বোঝা যায় সুযোগ ও পরিবর্তনের গতিধারা। প্রাচীন 'গ্রীক' নামটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে। এক এক যুগে তারা যে নামে পরিচিত হয়েছে, তা তাদের অমর সাহিত্যে আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আশ্চর্যজনক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও 'ডোরিয়ান', 'পেলাসজিয়ান', 'ডানান', 'এচিয়ান', প্রভৃতি বিভিন্ন নামের সাথে অনুরূপ বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মিল পাওয়া যায় না।[১] অথবা পরবর্তী যুগে 'হেলেনিস' নামের সাথে বা শেষে 'গ্রীক' নামের সাথেও তাদের সংযোগ বিধান করাও খুব শক্ত; কেননা প্রাচীন যুগে এ নামগুলো দিয়ে বুঝাত সভ্যতার এক বিস্তৃতি ও গভীরতা, খ্রীস্ট যুগের প্রারম্ভে বুঝাত এক ধর্ম এবং আজকে বুঝি ছোট্ট একটা জাতি। সুতরাং আক্রমণ ও বিজয়ের যুগে যে অস্পষ্ট নামে এক জনগোষ্ঠী ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এ পরিবর্তনশীলতার জন্য সে নামে জাতীয়তার আধুনিক ধারণা আরোপ করা ঠিক নয়।

অন্যদেশে এমনি বড় ধরনের আক্রমণের ফলে নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হয়েছে নতুন নতুন সংমিশ্রণ ও রূপান্তর। আধুনিক জাতিগুলোর উপনিবেশ স্থাপনের সাথে এর কোন তুলনা চলে না; কেননা উপনিবেশ স্থাপনের বেলায় হঠাৎ ক'রে আদিম অধিবাসিরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও কলা-কৌশলে অনেক উন্নত সভ্যতার পীড়নমূলক ব্যবস্থার সংশ্রবে আসে। এক্ষেত্রে আদিবাসিরা হারিয়ে যায় এবং বিজয়ীরা কুলগতভাবে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু হুন ও মঙ্গোল, তুর্কী ও মুর, স্যাকসন ও নরম্যান জাতের লোকদের আক্রমণ যতই বর্বর ও ধ্বংসাত্মক হোক না

১। স্পেন্গলার (*Spengler*) বিশদব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর '*Untergang des Abendlandes*' গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়।

www.nagorikpathagar.org

কেন, তার ফল এমনি হয় নি। যখন প্রায় সমস্ত সম্পদ ভূমি থেকে সংগৃহীত হ'ত, তখন নিজেদের স্বার্থেই বিজয়ীরা কৃষকদের হত্যা না ক'রে ভূমিদাসে পরিণত করত ও তাদের পরিশ্রমের ফল কেড়ে নিত। শূন্যভূমির দখল হ'ত নিষ্ফল। বিজিত লোকদের যুবতী নারী তাদের কাছে কম লোভনীয় ছিল না। এক্ষেত্রে প্রকৃতির কঠোর নিয়মে তার প্রতিশোধ নেয়া হ'ত; কেননা নারীরা উপপত্নী হিসেবে বা মা হিসেবে বিজয়ীদের রক্ত ও বীর্যপূর্ণ মনোভাবকে পরিবর্তন করে ফেলত। এসব কারণে ভয়ঙ্করভাবে স্বতন্ত্র ইহুদীজাতির আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ তাদের উপদেশ দিতেন যে, যে দেশ তারা দখল করবে, সেখানে নারী বা শিশুকেও যেন রেহাই না দেয়া হয়।[১] কিন্তু তাদের অনুতাপ থেকে বোঝা যায় যে, জ্যাহ্উইর (Jahwe) কথা পর্যন্ত তারা মানতে পারে নি।

এভাবে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী ও নতুন নতুন কুলের উদয় হয় এবং হাজারো পুরোনো নাম বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায় অথবা আমেরাইট, জেবুসাইট ও আমালেকাইট-এর মত জনগোষ্ঠী অতীতের সংঘর্ষ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসে। জনবসতির বিস্তৃতি ও তাদের পারস্পরিক সংযোগের ফলে সামাজিক প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তঃবিবাহ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক সাদৃশ্যভাব গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে যে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য দেখা দেয়, তাই হয় জটিলতর এক সভ্যতার বুনিয়াদস্বরূপ। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এ ধরনের নিয়ত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরেও রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশবিভাগ। এর দৃষ্টান্ত মেলে প্রাচীন গ্রীসে, মধ্যযুগীয় জার্মানী অথবা আধুনিক কালের ইউরোপে। এসব সংঘর্ষ কিন্তু সংঘটিত হয় একই ধর্মাবলম্বী জনসমূহের মধ্যে। তারা একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ সংঘর্ষগুলো ছিল খুবই ধ্বংসাত্মক। তবে এরা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; কেননা একদিকে যেমন ছিল তা আত্মঘাতী; অন্যদিকে তেমনি ছিল সম্পদ ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। যখন হিংসাবৃত্তি চারিতার্থ হয়, তখন ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্গঠন করা ছাড়া তাদের করবার কিছুই থাকত না।

এ সত্য অনুধাবনের পক্ষে সব থেকে বড় বাধা হ'ল আধুনিক জাতীয়তাবাদের তীব্র উন্মাদনা। এর অন্যতম ভিত্তি হ'ল আধুনিক

১। দিউত (*Deut*)—২০—১৩ থেকে ১৯।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের শাসনমূলক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে বাদ দিলেও তার অন্য শর্তটি হ'ল সম্প্রদায়ের সচেতন অনুভূতি ; যা পানির মধ্যে প্রস্তরখণ্ডের মত রাষ্ট্রকে ঘিরে অচঞ্চলভাবে বর্তমান রয়েছে।

সমাজবোধ সব সময়ই অত্যন্ত সহজবোধ্য। যেসব শক্তি ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেছে এবং আজও তার মূলে শক্তি যোগান দিচ্ছে, তাদের গভীরতা জনগোষ্ঠী কোনদিন বুঝতে পারে না। তারা যে কোন একটি উপাদানকে বা সম্প্রদায়ের একটি প্রকাশকে গ্রহণ করে এবং তাকেই তার নির্ধারক বলে গণ্য করে। সবচেয়ে আদিম উপজাতিদের জন্য এটি হ'ল গোষ্ঠীগত উপাদান বা রক্তের সম্পর্ক এবং তাই হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এ সামাজিক সত্যের সহজ প্রকাশ হিসেবে বৃষকাষ্ঠ বা উপজাতির পূর্ব পুরুষের প্রতীকস্বরূপ কোন জীব-জন্তুর পূজার (Totem System) মত কোনটি এত নিসন্দেহ নয়। জীবজন্তু, পাখী বা মাছ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তুও ঐক্য-অনুভূতির মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এটা অসঙ্গত হ'লেও এত বাস্তব যে, তা বাহ্যিক আকার ধারণ করে দুর্জ্ঞেয় রূপান্তরের মাধ্যমে বোধের অগম্য হয়ে ওঠে। সাধারণ জীবন থেকে উদ্ভূত সংহতি যে সম্প্রদায়ের সত্যিকারের ভিত্তি, তা একমাত্র গ্রীসের সর্ব শ্রেষ্ঠ সত্যতাই অনুধাবন করেছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় তারা যা অনুভব করে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। রোম আইনের নির্ণায়ক নীতি নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট এবং তা ছিল বাস্তবে সাম্রাজ্যের ভেতর নিজ নিজ নগরের সদস্যদের বিস্তৃত অধিকার। এই মৃতপ্রায় কল্পসূত্র থেকে মানুষ প্রাচ্যের দিকে নজর দেয়। পাশ্চাত্যেও ধর্মবিশ্বাসের যুগ শুরু হয় এবং নাগরিকত্বের চারদিক ঘিরে রক্ষণশীলতার জন্ম হয়। প্রাচীন সভ্যতার বহু দেব-দেবীকে আসন ক'রে দেবার জন্য তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় একমাত্র সত্য প্রভুর ধর্ম 'জুডাইজ্‌ম' বা খ্রীস্ট ধর্ম বা ইসলামের আদর্শ নীতি। তারই শক্তিশালী প্রভাবে বিশ্বাসীদের চারদিক ঘিরে সমাজবোধ গ'ড়ে উঠতে লাগল। চার্চ ও সম্প্রদায় এক ও অভিন্ন হয়ে পড়ে। অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীরা সমাজচ্যুত হ'তে থাকে। ধর্মের এ আলোকে অন্য কোন আনুগত্যবোধ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল এবং সমাজের সকল সমস্যা সহজ হয়ে গেল।

পাশ্চাত্যের ধর্মবিশ্বাসে অবশেষে ভাঙ্গন ধরা শুরু হ'ল এবং অন্য আনুগত্যের দ্বারা এ ধর্মান্ধতা হ্রাস পেতে লাগল। জোবা ও সম্রাটের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে আধিপত্যের প্রশ্নে সংঘর্ষ দেখা দিল এবং এ সংঘর্ষে সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে বিজয়তিলক উঠল ভৌগলিক ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক রাজার কপালে। মানুষ এখন সাধারণ সেবা ও সাধারণ আনুগত্যে পেল এক নতুন ঐক্যবোধ। ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার ও অভূতপূর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র হ'ল সমাজের প্রাণকেন্দ্র। যে যুগের চিন্তাধারায় মানুষ স্বাভাবিকভাবে নয়; বরং প্রবর্তিত মিলনসূত্রে খুঁজে পেল সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক ঐক্য। হব্‌সের মত লেখকও এ নতুন চিন্তাসূত্রের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু এ আধিপত্যের নীচে এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের যুক্তির অভ্যন্তরেও মানুষ নিজদেরকে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, পোলিশ ও রুশ হিসেবে ভাবতে শিখেছে। এ ঐক্য অনুভূতি হ'ল জাতীয়তার অনুভূতি এবং ভিত্তি ছিল সাধারণ; অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতির অনুভূতি।

এখানে আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে, জাতীয়তাবোধ হচ্ছে অতীতের যে কোন সামাজিক ঐক্যবোধ থেকে অনেক বেশী ব্যাপক ও অনেক বেশী বাস্তব। এ ঐক্যবোধ এমন এক পর্যায়ের সামাজিক সৃষ্টি, যখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ ঐক্যবোধ এমন এক যুগের সৃষ্টি, যখন গণতন্ত্র ও সংসদের প্রতি সমাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে এবং রাজতন্ত্র হয় বিলুপ্ত হয়েছে বা তা ঐক্যের এক দৃঢ়প্রতীকে রূপলাভ করেছে। এ অনুভূতির মধ্যে রয়েছে সাম্যের এক দাবী; কেননা জাতীয়তায় কোন স্তরভেদ নেই। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকলের প্রতি জাতীয়তার এক দুর্বার আবেদন। কোন বংশের প্রতি সাধারণ আনুগত্যের মত তা বাহ্যিক নয়। আত্মোপলব্ধির দীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যতীত তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। জুলিয়ান বা কনস্ট্যান্টাইনের আমলের কোন ধর্মমতের ন্যায় তাকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না বা আদিয়াবেনের (Adiabene) রাজপুত্র যেমন তাঁর গোটা রাজ্যসহ 'জুডাইজ্‌ম' গ্রহণ করেছিলেন, একে সেভাবে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 'যেমন রাজ্য তেমন ধর্ম।' এমনি কোন সহজ সূত্র দিয়ে এর প্রয়োগ সমস্যার সমাধান হয় না। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কুলগৌরবের দাবীর মত জাতীয়তার অনুভূতি সমষ্টিগত গৌরববোধের কোন ফাঁকা বুলি নয়। তাছাড়া, প্রকৃতির দিক

www.nagorikpathagar.org

থেকে এটা সম্প্রদায় ভিত্তিক হলেও অতীতের যে কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে তা সমাজের বৃহত্তর অংশ সম্মিলন ঘটায়।

এমনি ব্যাপক, জটিল, সূক্ষ্ম; অথচ শক্তিশালী স্পৃহা একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে তার প্রকাশ খুঁজে পায়। চার্চ যেমন ধর্মীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করে, পরিবার যেমন যৌন প্রবৃত্তির প্রাথমিক প্রয়োজন মেটায়, তেমনি অন্যকোন সংঘের পক্ষে জাতীয়তাবোধের স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রই হ'ল জাতীয়তাবোধের দেহস্বরূপ, এবং এ ভয়াবহ; অথচ অবশ্যম্ভাবী প্রতীক থেকে সংঘর্ষ ও সংযোজনের এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

দুইঃ স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র

সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক ইউরোপের কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রাণ পেয়েছে। তের শতকের শেষ দিকে রোমের পতনের পর যে বর্বর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মধ্যযুগের সভ্যতা সে তুলনায় এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করে। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতকে তার এত পরিবর্তন ঘটে যে, তার ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। ঐতিহাসিকরা ভেবে দেখবেন, এ রূপান্তরে পরিবর্তনের কোন কোন শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে। বিরাট বিরাট যুদ্ধ ও তুলনাহীন মহামারীর প্রাদুর্ভাব সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। যারা বেঁচে রইল, তাদেরও মনোবল এতে ভেঙ্গে পড়ল। প্রাচীন ঐতিহ্যও প্রভাবহীন হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় নতুন নতুন সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন অনুভব করা হয় এবং অবশেষে চারিদিক ছাপিয়ে তাদের আগমন ধ্বনিও শোনা যায়। কাগজ ও ছাপাখানার মত দু'টো মহৎ আবিষ্কার—'নতুন ক'রে আবিষ্কার করা' গ্রীসের চিন্তাধারা গ্রহণের উর্বরক্ষেত্র রচনা করে, এবং গ্রীসের অনির্বাণ চিন্তাধারা মানবমনকে মুক্তির প্রাণবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে। বিজ্ঞানও ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করছিল এবং সূক্ষ্মভাবে মানবমনের অন্ধকারকে দূর করবার প্রচেষ্টায় রত ছিল। সমাজের কুলীন শ্রেণীকে নিঃশেষ করবার জন্যও বহু কারণ গজিয়ে উঠতে লাগলো। অভিজাত নাইটদের যোদ্ধা হিসাবে যে মর্যাদা ছিল, বারুদের আবিষ্কার তার অবসান ঘটায়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভূমিহীন চাষীদের ভাগ্যও উন্নীত হচ্ছিল। ইংলণ্ড ইতিপূর্বেই তার সুদীর্ঘ শিল্পোন্নয়নের আস্বাদ লাভ করে। তখন ফ্ল্যাণ্ডারসের পশমী কাপড়ের মিলের কাঁচামালের

www.nagorikpathagar.org

যোগান দেবার জন্য ভেড়া পালনের উদ্দেশ্যে অনেক চাষযোগ্য জমিকে চারণভূমিতে পরিণত করা হচ্ছিল। এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মলগ্ন সে আমলেই খোঁজ করা হয়। এর ফলে ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের মধ্যে যে ব্যবধান, তাও দ্রুত সরে যাচ্ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজা ক্রমশ: শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। সামন্ত হিসাবে তাঁর যা ক্ষতি হয়েছিল, সামন্তবিরোধী হয়ে তিনি তা পুষিয়ে নিলেন। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালেই রাজার চরমাধিকার, রাজার আদালত ও রাজার নির্দেশ সকল স্থানীয় ও সামন্ত এখতিয়ারকে হ্রাস ক'রে ফেলে।[১] আইনও ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। রোমান আইনবিদ্যা ইউরোপে পরিচিত ও পঠিত হয়ে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এ তত্ত্ব জোরদার হয়ে উঠে যে, আইন হ'ল রাজার ইচ্ছা, অভিজাত সম্প্রদায়ের আধা স্বাধীন সামরিক ব্যবস্থা, আইন পরিষদ [২], অভিষেকের শপথ নগরের স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধ্বংসে পড়তে লাগল। তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-ভূমির জন্য ইংলণ্ড বহু পূর্ব থেকেই একরকম স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এসে পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে ইউরোপের এক বৃহৎ অংশে স্বৈরতন্ত্রের নীতি জয়যুক্ত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে স্পেনে, চতুর্দশ লুই-এর অধীনে ফ্রান্সে এবং স্টুয়ার্টদের আমলে ইংলণ্ডে এ নীতি দানা বাঁধতে থাকে। জার্মানী এসব নতুন প্রভাব থেকে তখনও দূরে ছিল এবং আস্তে আস্তে বহু পরে এ পর্যায়ে

১। এ্যাডাম্সের (*Adams*) '*Origlin of the English Constitution*' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়।

২। ফ্রান্সের 'পার্লামেণ্ট' (*Parlement*) মূলতঃ ইতালীর 'পার্লামেণ্টোর' (*Parlamento*) মতছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শোনা ও তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য নাগরিকদের সাধারণ সভা। চৌদ্দশতেকের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে পার্লামেণ্ট গঠিত হ'ত প্রধানতঃ আইনজ্ঞদের নিয়ে ও তার কিছু কিছু বিভাগীয় ক্ষমতাও ছিল। প্যারিসের পার্লামেণ্ট উচ্চ আদালত হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। পার্লামেণ্ট রাজার নির্দেশ ঘোষণা করত ও আইনের প্রতি সম্মতি ও অসম্মতি জ্ঞাপন করবার সুযোগও লাভ করত। অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করবার ক্ষমতা পার্লামেণ্ট তখনও পায় নি।

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছে। কিন্তু সে সময়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবোধ রাজার অনুকূলে কাজ করেছে। রাজা ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত জাতির প্রধান। এ স্বর্গীয় অধিকারবাদের সাথে সাথে নীরব আনুগত্যের নীতিও এসে পড়ে। রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ বাধলে জনসাধারণ রাজার পক্ষ সমর্থন করত। ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে এরূপ ঘটে। অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, তাদের দৌরাত্ম্য ও উৎপীড়ন ও করের বোঝা হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে রাজাই ছিলেন তাদের শেষ ভরসাস্থল। ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অসহ্য যন্ত্রণা থেকেও রাজা জনসাধারণকে মুক্ত করেছিলেন। মানুষের এ মনোভাব যে কত কঠোর ছিল, তা বোঝা যায় ধর্ম সম্পর্কে বোসুয়েটের (Bossuet) মত আদালতের ধর্মযাজক বা হবসের মত ভীতসন্ত্রস্ত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যা বলেছেন শুধু তাই নয়, এমনকি স্পিনোজার মত আবেগহীন ও মুক্ত দার্শনিক পর্যন্ত ধর্মের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের যে কথা বলেছেন, তা বিবেচনা করলে।

কিন্তু এটা ছিল অস্থায়ী সমাধান। কিছুদিনের জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলো রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল ; কিন্তু সামন্তদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর হ'লে যখন সম্রাট জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধের জন্য আবার হৃতসর্বস্ব ও ক্ষমতাহীন সামন্তদের নিজের চার পাশে আবার আহ্বান করেন, তখনও তিনি আক্রমণের সম্মুখীন হন। তখন জাতীয়তার সার্থক শক্তিগুলো, যারা এককালে রাজার মধ্যে পেয়েছিল ঐক্যের মূর্ত-রূপ, জাতীয়তার পূর্ণ ও কার্যকরী প্রকাশ দাবী করে। সুতরাং যে সকল প্রভাবের ফলে রাজার শক্তি হয়েছিল অপ্রতিহত ; সেগুলো আরও বিস্তৃত হয়ে রাজার পতন ঘটাল বা 'শাসনতান্ত্রিক প্রধান' হিসেবে তাঁর মর্যাদা হ্রাস করে ফেলেন।

জাতীয় রাষ্ট্র এভাবে রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী হ'ল ; কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্র তার সকলগুণের অধিকার পেল না। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি একদিকে যেমন বিস্তৃত হয়, তেমনি অন্যদিকে তার কার্যপরিধি সীমিত হয়ে এল। জাতির প্রত্যেক সদস্যের কাছে জাতীয়তাবোধ এক হয়ে পড়ায় জাতীয়তা দাবী করে যেন রাষ্ট্র সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ করে, সুশৃঙ্খল করে ও তাকে আরও বিস্তৃত করে। এছাড়াও দাবী ওঠে—যে সব স্বার্থ জাতির জন্য সধারণ নয়, পারতপক্ষে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে

www.nagorikpathagar.org

যেন মুক্ত রাখা হয়। ধর্মীয় স্বার্থ এবারও হ'ল সংঘর্ষের কেন্দ্র। কাজচলাগোছের প্রথম সুত্র হয় আগ্সবার্গের 'ধর্মীয় শান্তি।' এর ফলে স্থির হয় যে, শাসক যেকোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন এবং জনগণও যেকোন ধর্মকে পছন্দ করতে পারবে। তবে কোন প্রজা কোন ধর্মমতকে পছন্দ না করলে সে দেশত্যাগের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সুযোগ প্রকাশের সে যুগে জনগণের অসীম মনোবল কোন রাজা বা সরকারের উপর তাদের 'ব্যক্তিত্বের' সমর্পনকে সহ্য করে নি। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ের বিভ্রান্তিকর ইতিহাস সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের এক ইতিহাসে পরিণত হয় এবং যেসব ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সাধারণ রাজনৈতিক তৎপরতার কোন সুযোগ সৃষ্টি করে নি, সেগুলো মুক্ত রাখার দাবী জোরদার হয়ে ওঠে।[১]

আসল সংগ্রামের ফলাফল যেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণটি কিন্তু তেমন স্পষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে জনগণের সর্বসম্মত কার্যসূচী সরকারের সঠিক নীতি ঘোষণা করেছে; বিশেষ ক'রে এসত্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, সার্বভৌম শক্তি জনগণের নিকট থেকে এসেছে। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত, ও জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ প্রথম দিকে আসল স্বাধীনতার পরিবর্তে বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। পিউরিট্যানই হোক, আর ক্যাথলিকই হোক—যখন তারা ক্ষমতা থেকে স'রে এসেছে, তখন কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবী তুলেছে; কিন্তু যখন আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছে, তখন পিছিয়ে গিয়েছে। মানুষ নমনীয় নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে খুব কম সময়ই যুদ্ধ করে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাতে বিজয়ী হয় বা পরাস্ত হয়। জাতীয় রাষ্ট্রে উদ্ভূত অন্যান্য বিরোধী মতবাদ সম্বন্ধেও তা ঘটে। শিল্পের জাগ্রত শক্তি অর্থনৈতিক জীবনে বিদেশী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয় বটে; কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে সে নীতি প্রয়োগ করতে সাহসী হয় নি। দেশ যখন শিল্পায়িত হয়ে ওঠে, তখন পশ্চাদগামী সামন্তবাদী শক্তিও স্বাধীনতার

১। এ ইতিহাস ব্যাখ্যাত হয়েছে এ্যাক্টনের (*Acton*)। *History of Freedom and other Essays* গ্রন্থে, বেরির (*Bary*) '*History of Freedom of Thought*' গ্রন্থে এবং নেভিনসনের (*Nevinson*) *Growth of Freedom* গ্রন্থে।

www.nagorikpathagar.org

পতাকাতলে সম্মিলিত হয়। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

তার সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বণ্টন ও পুনব্যাপ্তী সংঘটিত হয়। আমরা দেখেছি, অজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কৃষককুল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে কৃষককুল অভিজাত শ্রেণীর ভূমির সাথে জড়িয়ে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। গ্রামীণ শ্রমিক কিন্তু তার গ্রাম ছেড়ে যেতে পারত। ইংলণ্ডে 'স্থায়ী বসতি স্থাপনের আইন' অনুযায়ী ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ প্রথার স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, দশ পাউণ্ড পর্যন্ত বাৎসরিক আয়ের কোন সম্পত্তি নিয়ে কেহ স্থায়ীভাবে বসবাস না করলে তাকে উঠিয়ে দেয়া যাবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অর্থ ছিল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুপস্থিতি। মুদ্রা অর্থনীতির অভাবে জিনিসপত্রের মুক্ত বিনিময় ব্যাহত হয়েছে এবং এর ফলে শ্রমের গতিশীলতা মোটেই ছিল না। সুকুমার শিল্প ও হস্তশিল্প পর্যন্ত স্থানীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল এবং প্রত্যেক শহর বহিরাগত বণিক ও শিল্পীদের থেকে নিজেদের জিনিসকে সংরক্ষণ করত। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার অগ্রগতি, ব্যাপক বাজারের প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংক্রান্ত নতুন নতুন কলাকৌশল ও তার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের ফলে এসব বাধা-নিষেধ ভেঙ্গে পড়ে। স্মলার (Schmoller) বলেন: 'জার্মানী কেন, সর্বত্রই সতর ও আঠার শতকের সমগ্র আভ্যন্তরীণ ইতিহাস হ'ল শহর, জেলা বা অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতির বিরোধিতার ইতিহাস।[১] পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব যে প্রক্রিয়ায় হ্রাস পেতে থাকে, তার ফলে প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে কলাকৌশল আবিষ্কারের সে যুগে এক নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়। এ শ্রেণীর দৃষ্টিভংগী কৃষকের দৃষ্টিভংগী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতাও এদের ছিল যথেষ্ট।

এ ক্ষেত্রেও নতুন শক্তিগুলোর প্রভাবে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারিতা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পরে অবশ্য এ শক্তিগুলোই তার সে স্বৈরাচারিতা ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করে। প্রথমদিকের আবিষ্কারগুলোকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে ও

১। স্মলারের (*Schmoller*) *'The Mercantile System'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। ফ্রান্সে কলবার্টের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালে যান্ত্রিক যুগের আবিষ্কারগুলোকে রাষ্ট্র আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় নি। ক্ষমতার অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ না ক'রেও তারা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে যে ব্যবধান, অতীতে তার কিছু কিছু প্রকাশ ঘটেছে। রোমান কুলীন যোদ্ধাদের সাথে প্রাচীন রাজনৈতিক স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব, তাতেও এর দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু আধুনিক কালে দু'টোর মধ্যে যে ব্যবধান, তা তখনও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে নি। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে পৃথক করা সম্ভব হ'ত না। রোমান কুলীন যোদ্ধারা কর আদায় করতেন ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। লম্বার্ডের ব্যাঙ্ক মালিক, জেনোয়া ও দক্ষিণ জার্মানীর মহাজনরাও রাজনৈতিক আশ্রয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। সতর ও আঠার শতকের যৌথ অংশীদারী কারবারীরা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিকানা লাভ করেছিলেন। শিল্প-বিপ্লবের আগে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হয় নির্ভর করত জমির উপর, না হয় নির্ভর করত অর্থ ও বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার উপর। অবশ্য জমির মালিকানা তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সাধারণ জীবনে তখনও কোনরূপ বিলাসিতার ছোঁয়াচ লাগে নি। বাজারও ছিল অত্যন্ত সীমিত। ফলে উৎপাদক বা সাধারণ ব্যবসায়ী তার অর্থনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত না। সে সময় কোন শিল্প সংস্থা বা আর্থিক চক্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করতে বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহসী হত না। 'রাষ্ট্রের আশীর্বাদ' ছাড়া তখন কোন অর্থনৈতিক সমিতি গ'ড়ে উঠতে পারত না। অবশ্য এটাও সত্যি যে, 'উপনিবেশে' কতকগুলো 'সনন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত' কোম্পানী' প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োগ করত। কিন্তু তার মূলে ছিল মূল রাষ্ট্রের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন। মূল রাষ্ট্র এসব ক্ষেত্রে হয় ইচ্ছা করে, না হয় অবহেলা ভ'রে তাদের তেমন ক্ষমতা প্রয়োগে উৎসাহ দান করত।

www.nagorikpathagar.org

নতুন অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু রাষ্ট্রের সৃষ্টি নয়। অন্যদিকে তখনও রাষ্ট্র ভূমির মালিক শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। ফলে ভূমির সামাজিক গুরুত্ব হ্রাসকারী ও শ্রেণী সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত নীতিবিরোধী শক্তিগুলোর প্রতিরোধে সরকার বরং ছিল সচেষ্ট। কিন্তু যে বিপ্লবের ফলে হস্তচালিত উপকরণের বদলে প্রবর্তিত হয়েছে ক্ষমতা:-চালিত যন্ত্র এবং যার ফলে গৃহের পরিবর্তে শিল্পকর্মের ক্ষেত্র হয়েছে কারখানা; তাকে রোধ করবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা? যে বিপ্লব অভূতপূর্ব গতিতে ও পরিমাণে উৎপাদনের পথ ক'রে দিয়েছে, এবং কেউ কেউ তাতে হয়েছে বিপুল সম্পদের অধিকারী ও অনেকের ভাগ্যে নেমেছে দাসত্বের নতুন শৃঙ্খল। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে নগরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অনেকে পেয়েছে উন্নত জীবন মানের আশীর্বাদ। এতে অংশ লাভে আরও অনেকে আশা রাখে। তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অভাবনীয়রূপে এবং সারা দেশ জুড়ে গ'ড়ে উঠছে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার জটিল এক ঐক্যসূত্র। রাষ্ট্র এর সৃষ্টি করে নি; বরং নতুন পরিবেশের সাথে নিজকে খাপ খাওয়াতেই রাষ্ট্র ব্যস্ত। এ হ'ল এক ধর্মনিরপেক্ষ কাজ; যার সুষ্ঠু সমন্বয় আজও পুরোপুরি হয় নি।

মূলধনের সৃষ্টিকারী ক্ষমতার সাথে ভূমির ক্ষমতার সমন্বয় কিন্তু সবচেয়ে জটিল কাজ নয়; কেননা তা হ'লে পুরোনো ধনিকতন্ত্রের সাথে নতুন ধনিকতন্ত্রের পুনর্মিলন হ'তে পারত। আন্তঃবিবাহ ব্যবস্থা ও শিল্প প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ কৌলিন্যে পুরোনো উপাধিতে ভূষিত হ'তে লাগল। একটি যোগাল সৃজনশীল উদ্যম, কিন্তু অন্যটি এনে দিল মর্যাদা। সুতরাং নতুন অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে এতদিনেও পদদলিত শ্রেণীগুলোর সমঝোতার বিষয়টিই হ'ল সবচেয়ে জটিল। মূলধনের উপর কোন মজুরের নির্ভরশীলতা ভূমির উপর কৃষকের নির্ভরশীলতার মত তেমন আর গতিহীন রইল না। কোন প্রাচীন প্রথা তার স্থিতিকে আঁকড়িয়ে ছিল না। নতুন শ্রেণীটি হ'য়ে উঠল অস্থির ও গতিশীল। নতুন নতুন শ্রমিকের যোগদানের ফলে তাদের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাতে তা এক শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হল। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও তারা সচেতন হয়ে উঠল। কৃষকদের পক্ষে একত্রিত হওয়া কঠিন ছিল; কিন্তু শ্রমিকরা সম্মিলিত হবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। সত্যতার

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রভূমিতে তারা দলবদ্ধ হয়ে রইল এবং নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হ'তে লাগল। তাদের মধ্যেও বিশেষত্বশীলতা গ'ড়ে উঠল; কিন্তু সাধারণ কলাকৌশলে তাদের একাত্মতা নষ্ট হ'ল না। সম্মিলনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার পুরোনো আইন আবার জারী করল; কিন্তু তাতে তেমন ফল হ'ল না। অর্থনৈতিক কাজকর্ম সরকার অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠল। কর্মীরা তাদের নতুন অর্থনৈতিক অস্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠল এবং সম্মিলিতভাবে কাজ বন্ধ করলে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, সে সম্বন্ধেও তারা সচেতন হ'য়ে উঠল। নিম্নতম শ্রেণীর মজুরদের অবদানের যে মূল্য রয়েছে এবং সরকারের কাজ অপেক্ষা তা যে অনেকাংশে মূল্যবান, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং তাদের নতুন লক্ষ্য ও নতুন ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শ্রমিক শ্রেণী নাগরিকতার অধিকার দাবী করল ও তা অর্জনও করল। রাষ্ট্র এভাবে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেল; তবে কোন পদানত শ্রেণীর সামরিক বিদ্রোহের ফলে তা হয় নি, বরং সমাজের নতুন ভিত্তি হিসেবে যে অর্থনৈতিক শক্তি গ'ড়ে ওঠে, তার কার্যকারিতার ফলেই তা সম্ভব হ'ল। ফিশার সাহেবের মতে, (Fisher) 'ইংলণ্ডের আসল বিপ্লব ১২১৫ সনে বা ১৬৪৬ সনে বা ১৬৮৯ সনে সংঘটিত হয় নি; বরং তা হয়েছিল ১৮৩২ সনে, ১৮৬৭ সনে ও ১৮৮৪ সনে; কেননা তখন শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যায়ক্রমিকভাবে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে পরিবর্তিত হ'ল এবং জাতির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য শাসন ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী, বণিক, শ্রমিক ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।"

কিভাবে এসকল প্রভাবে রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটেছিল, তার আলোচনা সমগ্র গ্রন্থ ব্যাপী হবে। তবে প্রতিনিধিত্বের মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে এ প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত হয় তার কিছু বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই হ'ল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেকোন ঐতিহাসিক পর্যায়ে আমরা প্রতিনিধিত্বের মৌলিক রূপটি আবিষ্কার করতে পারি।[১]

১। "এ সম্পর্কে যেসব প্রমাণ মেলে, তা থেকে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো চলে আসে:

www.nagorikpathagar.org

এটা খুব সহজ পথ যে, যেখানে একজন অনেকের পক্ষে কাজ করবে, সেখানে 'সে একজনকে' বহু লোকের দ্বারা তাদের পক্ষে কাজ করতে বাছাই করা হবে। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরে জেলা বা 'ডেমির' নির্বাচনে অথবা এচিয়ান লীগের পরিষদে নগরগুলোর নির্বাচনে এর প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু প্রাচীন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে ইচ্ছা ক'রে কয়েকজনের মাধ্যমে বহুজনের ইচ্ছা প্রকাশের সংঘবদ্ধ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। রোম সাম্রাজ্যে শাসন সমস্যার মোকাবেলার জন্য প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থাই হ'ত সর্বোত্তম ; কিন্তু রোমানদের কাছে এ চিন্তা আমল পায় নি। সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায় সম্রাটের 'উত্তর সম্বলিত বিধিতে' গ'লিক পার্লামেণ্টের' এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ৪১৮ খ্রীস্টাব্দে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ও মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদের সদস্যপদ দান করার কথা ছিল; কিন্তু পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত হয় নি। আধুনিক বিশ্বের জন্য একে যেন অনাবিষ্কৃত রেখে দেয়া হয়। অনেক ঐতিহাসিক আধুনিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার জন্মসূত্র খুঁজতে গিয়ে প্রাক-সামন্ত যুগের 'টিউটানিক' বা এ্যাংলো স্যাক্সন' সমাজের 'গণ সভা' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। অনেকে আবার মধ্যযুগের শ্রেণীব্যবস্থা বা মধ্যযুগের 'রাজার পরিষদ' থেকেও প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার জন্মসূত্র বের করেন। তা যে ভাবেই তার জন্ম হোক এ ব্যবস্থা ভৌগলিক রাষ্ট্রের সাথে অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ এবং তা আধুনিক নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

(ক) রাজতন্ত্রের বৃক্ষেই প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের কুঁড়ি অঙ্কুরিত হয়।

(খ) ইংলণ্ডে প্রথমে তার বিকাশ ঘটে। এর কারণ এ নয় যে, সেখানে জনগণ বেশী মুক্ত ছিল ; বরং সেখানে রাজতন্ত্র ছিল বেশী শক্তিশালী।

(গ) এ ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সাথে সাথে চার্চের কাছ থেকে তা পেয়েছিল তার নিজস্ব রূপ ও কার্যপদ্ধতি।"

ফোর্ডের (*Ford*) '*Representative Government* গ্রন্থের প্রথম অংশ, নবম অধ্যায়।

কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মূল আমাদের খোঁজ করা উচিত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ; কেননা তা আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের বহু পূর্বেই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং একে পাওয়া যায় ফ্যারেলিনজিয়ান শাসকদের বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের মধ্যে। ইংলণ্ডে 'হেনরীর প্রধান প্রধান আইনের' মধ্যে আমরা দেখি যে, স্থানীয় আদালতে ছোট ছোট শহরগুলো পুরোহিত, নায়েব ও শ্রেষ্ঠ চারজন লোকের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য পেশ করত।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থার বিবর্তনে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় লক্ষ্য করি। রাজার পরিষদ ছিল 'বিভিন্নস্তরের' এক পরিষদ রাজকীয় কর্মকর্তা ছাড়া বড় বড় সামন্ত, ধর্মযাজক সেখানে একত্রিত হতেন। ফলে রাষ্ট্রের প্রধান দু'টি শ্রেণীর প্রতিনিধির বদলে প্রধানেরা সম্মিলিত হতেন।[১] প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠু বিকাশ শুরু হয় তখন থেকে যখন অভিজাত ও যাজকদের সাথে সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিদেরও বৈঠকে আহবান জানানো হ'ত। ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম পর্যায়ের বাস্তবরূপ দেখা যায়। "প্রত্যেক শেরিফ প্রত্যেক জেলার দু'জন অভিজাত নাইটকে, প্রত্যেক নগরের দু'জন নাগরিককে ও প্রত্যেক ছোট শহরের দু'জন শহরবাসিকে নির্বাচিত করতেন।" প্রথমে তারা পরিষদে নীচু পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে পরিষদে আসন গ্রহণ করত। তাদের কাছ থেকে প্রথমে কোন উপদেশ নেয়া হ'ত না বা তাদের সাথে কোন পরামর্শ করা হ'ত না। তারা শুনত ও প্রয়োজনের সময় নিজেদের কর্তব্য পালন করত। কিন্তু যে প্রয়োজনে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ যারা কর প্রদান করবে, তাদের সম্মতি ব্যতীত কর আদায়ের অসুবিধা প্রভৃতির জন্য ক্রমে ক্রমে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। প্রত্যেক এলাকা থেকে বিত্তশালীদের দ্বারা নির্বাচিত ধনীব্যক্তিরা রাজার কাছ থেকে হিসেব চাইতেন। চতুর্থ হেনরীর মত রাজা হিসেব দিতে অস্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত প্রয়োজনের খাতিরে রাজা হিসেব দিতে শুরু করেন।

অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় হ'লেও পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদের বিকাশ ঘটে দ্বিতীয় পর্যায়ে। সামন্তবাদের প্রভাবে কমন্স সভা ও অভিজাতদের পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়লে কমন্স সভার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংলণ্ডে যেভাবে তার অগ্রগতি হয়েছে তেমন সুস্পষ্টভাবে ও অবিচ্ছিন্নগতিতে কোথাও তা হয় নি। পার্লামেণ্ট ম্যাগনা কার্টার সামন্তবাদী নীতিকে রূপান্তরিত

১। ইংলণ্ডে কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে প্রধান প্রধান প্রজাদের নিয়ে 'ডিউরিয়া রেজিসের' বৈঠক বসত। সাধারণভাবে ঐসব প্রজাদের আমন্ত্রণ জানানো হ'ত ; যারা রাজার বিশেষ সেবায় নিয়োজিত থেকে পরিষদে আসন লাভ করেছিল। এ্যাডাম্‌সের (*Adams*) '*Origin of the English Constitution*' গ্রন্থের পরিশিষ্ট—১।

www.nagorikpathagar.org

ক'রে নির্দেশ রচনা করে যে, রাজা যে আইন প্রণয়ন করবেন, তা মেনে চলতে তিনি বাধ্য থাকবেন। রাজার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকরী করবার জন্য পার্লামেণ্ট এক উপায় উদ্ভাবন করে এবং আসলে তা রাজার দায়িত্বশীলতার রূপ নেয়। কিন্তু রাজার স্বৈরাচারিতা বৃদ্ধি করে যে শক্তিগুলো কার্যকর ছিল, তার প্রভাবে রাজা ও কমন্স সভার মধ্যে খোলাখুলিভাবে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ১৬৮৮ সনের বিপ্লবে এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বই হবে চূড়ান্ত। এভাবে প্রতিনিধিত্ব নীতির ব্যাপক বিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয় এবং কালক্রমে তা বিস্তৃত হ'তে হ'তে পার্লামেন্ট অবশেষে সমগ্র জাতির মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে।

ইংলণ্ডের বিপ্লব শাসনব্যবস্থায় এমনি শেষ অঙ্কের কোন আভাস দেয়নি। তার আদর্শ ছিল সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব। লক থেকে বার্ক পর্যন্ত এ নীতি সকল স্বাধীনতার দৃঢ় রক্ষাকবচরূপে বিবেচিত হ'ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয় কিছুদিনের জন্য তা পকেটবরো, করপোরেশন বরো, চল্লিশ শিলিং নিষ্কর ভূমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় নি। 'প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোন কর নেই'—আমেরিকায় এ নীতির নতুন ঘোষণা ব'লে কয়েকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তারা তাদের মৌলিক অধিকার ঘোষণায়, স্বাধীনতা ঘোষণায় ও নাগরিকদের সাম্যে সংবিধানে এ নীতি বাস্তবায়িত করে। এ ফ্রান্সে সংঘটিত হয় যে মহান বিপ্লব এ বিপ্লবের মৌলিক নীতি ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এ নীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে; কিন্তু তা যাই হোক—এর দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সম্পত্তি নয়; বরং ব্যক্তিত্বই হবে মৌল নীতি। আধুনিক রাষ্ট্র এ আদর্শের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ নীতির বাস্তবায়নে প্রতিনিধিত্ব নীতির ব্যাপক বিকাশ প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ বিকাশের ধারা এখনও চলেছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার গণতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট নয়; তার জন্য মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্ব-শীলতা নিশ্চিত করবার ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিনিধি

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনের অধিকারই এর জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে সাথে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি বাছাই-এর কাজও জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে এমনভাবে সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাঁড় করানো প্রয়োজন, যাতে জনমতের বিভিন্ন ধারা ও উপাদান সার্বিক ফলাফলে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠতে পারে এবং সর্বশেষে এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হ'ল প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচিত হবার পরও জনমতের গতিধারা অনুধাবন ক'রে চলতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রে এসব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেছে এবং এখন সে প্রচেষ্টা চলছে। আজকের রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব নীতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অবশ্য বৃহত্তম সমস্যাটি আমরা লক্ষ্য করি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেখানে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে প্রাচীন ঐতিহ্য আজও সার্থকভাবে চালু রয়েছে, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাকে উপেক্ষা ক'রেও প্রাচীন ধ্যানধারণা পুরোমাত্রায় আসন পাকা রেখেছে। আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুলীনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে সামঞ্জস্যহীন ব্যবধান, মহাযুদ্ধে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অবশ্য যে সকল সংবিধানে এ দু'ভিন্নমুখী প্রবণতা চরম আকার ধারণ ক'রে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, মহাযুদ্ধের প্রভাবে সে সংবিধানগুলো বিধ্বস্ত হয়। আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করে জাতীয় রাষ্ট্র এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে জাতীয়তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত পরিস্থিতির সাথেও তাকে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। এটি হ'ল নতুন ধরনের এক সমস্যা— ইতিহাসের মত যেন আদিন— রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠিত রূপের সাথে তার বাইরে ছড়িয়ে পড়া' সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা। এমনি সমস্যার সাথে এঁটে উঠতে কোনকালে কোন রাষ্ট্র পারে নি। প্রায় সব সময়ই ঐ সব শক্তির ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যদিও রাষ্ট্র হয় তাদের বুঝতে পারে নি বা বুঝতে চায় নি। উপজাতি, নগর ও সাম্রাজ্যকে পর্যায়ক্রমে যে সব সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে জাতীয় রাষ্ট্রের সামনে সে সব সমস্যা আজ সমুন্নত। পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিবর্তন নির্ভর করবে কিভাবে সে সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করবে তার উপর—তা অতীতের অন্ধ অনুকরণেই করুক বা অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান দিয়েই করুক।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্যায়

ক্ষমতা ও কাজকারবার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা

এক ঃ "যেসব বিষয় শাসকের আওতার ঊর্ধ্বে"

আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক আইনের মৌল প্রকৃতিই তার কার্যকারিতার সীমা নির্ধারণ করে। যে নিশ্চিত কাজটির জন্য আইন অপরিহার্য এবং এক আদর্শ হাতিয়ার ; তা হ'ল সামাজিক ব্যবস্থার সার্বজনীন এক কাঠামো সংগঠন করা ও তার সংরক্ষণ করা ; কেননা তার ভেতরেই অনধিকার চর্চা ও অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্খার অভিশাপ থেকে মুক্ত থেকে মানবজীবন পরিপূর্ণভাবে সার্থকতার পথ অনুসরণ করতে পারবে। আইনের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য, যেমন তার সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান, তার বাধ্যকারী দিক, তার স্থায়িত্ব ও তার বিশ্বজনীনতা—এ কাজের উপযোগী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। রাষ্ট্র যাই করুক না কেন, এগুলো তাকে করতেই হবে। কিন্তু এসব কাজ সঠিকভাবে করবার জন্য রাষ্ট্রের যে গুণের প্রয়োজন, তাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য হাজারো মঙ্গলজনক কাজ করতে অযোগ্য করে তুলেছে। জীবনের সকল কাজের জন্য কোন একটি সংস্থার উপর নির্ভর করা সত্যিই অসংগত ও অর্থহীন। কোন যন্ত্র একটি কাজ করে অত্যন্ত নিপুণভাবে। সে যন্ত্রে আরও কতকগুলো কাজ হ'তে পারে বটে ; কিন্তু সেগুলো নিপুণভাবে সম্পন্ন হবে না। কুড়াল দিয়ে আমরা পেন্সিলের শিষ কাটি না। আবার এমন কতকগুলো কাজ আছে, যা সে যন্ত্র মোটেই করতে পারবে না। যদি তা দিয়ে সেসব কাজ করার চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে ক্ষতিই হবে।

গ্রীন সত্যিই বলেছেন : যেখানে কোন কাজের যথার্থ মূল্য নির্ভর করে, প্রধানত: তার বাধাবন্ধনহীন সম্পাদনের উপর, বা যা তাকে সঞ্জীবন করে, তার সত্তার উপর, বা যেখানে কাজটি হয় স্বতঃস্ফূর্ত বা যেখানে তা হয় সুসম ব্যক্তিত্বের প্রকাশস্বরূপ—যেখানে রাষ্ট্রের কোন সংগত

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতি নেই বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাও রাষ্ট্রের থাকে না। প্রথমে যে সার্থক নীতির উল্লেখ করা হ'ল, তার চেয়ে এ নঞর্থক নীতি কোন অংশে কম জোরালো নয়। সমাজব্যবস্থা গড়া ও ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করা – এ দু'টিই হল রাষ্ট্রের মূল কাজ। একটি হ'ল সদর্থক (Positive) এবং অন্যটি হ'ল নঞর্থক (Negative) এদের যথার্থ মূল্যায়নে সক্ষম হ'লে আমরা তার কার্যপরিধি ও সীমারেখা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারব। তার কিছু অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিভক্তিকরণের জটিল সমস্যা মোকাবেলার আগে আমরা তার উল্লেখ করব। প্রথমতঃ মতবাদ নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টাই রাষ্ট্রের করা উচিত নয়—তা সে মতবাদ যাই হোক না কেন। এর দু'টো ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে, এবং তা পরীক্ষা ক'রে দেখলে এ নিয়মকে আমরা আরও স্পষ্ট ক'রে বর্ণনা করতে পারব। রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ বা তার কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে কেউ কোনরূপ উস্কানী দিলে রাষ্ট্র তাকে আইনের আওতায় আনতে পারে। এমনিভাবে উস্কানী দেয়া বা অগ্রাহ্য করার মনোভাব কিন্তু কোন মতবাদের প্রকাশ নয়। একজন নাগরিক বা একদল নাগরিক চিন্তা করতে পারে যে, কোন একটা চালু আইন ক্ষতিকর বা কর্তৃপক্ষের কোন একটা কাজ অবৈধ বা রাষ্ট্রের সংবিধান অবিবেচনাপ্রসূত ; নাগরিকরা এমন মতবাদ ঘোষণা করতে পারে।[১] শুধু তাই নয়, নাগরিকরা শান্তিপূর্ণভাবে অপর নাগরিককেও আইনটির ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে ; এমন কি আইন বা সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে দুর্বার এক গণ-আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু আইনভঙ্গের

১। যদি যুক্তিটি সঠিক হয়, তবে 'বিদ্রোহাত্মক উক্তির' অন্তর্গত কতকগুলো কাজকে অন্যায় ব'লে গণ্য করবার রাষ্ট্রীয় দাবী এ নীতির ফলে নাকচ হয়ে যায়। বস্তুতঃ আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবণতা হ'ল এ ধরনের দাবীকে পরিত্যাগ করার দিকে ; কেননা সরকার কোন পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয় কর্তৃপক্ষ নয়। যুদ্ধের সময়ে এ দাবী পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ; কারণ যুদ্ধের অশুভ পরিণতি সমাজ ব্যবস্থাকে আদিম যুগের কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায়।

জীবনের বিবর্তনের মত কতকগুলো তত্ত্বের শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করার মত কাজ এখনও আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে সম্ভব হয় ; কেননা তার জন্য দায়ী হ'ল সেখানকার সাংস্কৃতিক অবস্থা। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক বিধান সভার বিধি-বিধান কমিটির কাছে রাজনৈতিক নীতি বিরোধী ভয়ঙ্কর কয়েকটি কাজও সুস্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে উস্কানী দেয়া হ'ল মৌলিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার সামিল ; কেননা সে ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হ'ল রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য এবং তার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের ক্ষমতাও লাভ করেছে। বিদ্রোহাত্মক বাণী প্রচারক প্রত্যেক অপরাধীকে শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রের দুর্বলতার লক্ষণ। আইন মেনে চলবার মনোভাবই হ'ল আইনের পেছনে সমর্থনের স্থায়ী ও নিশ্চিত সমর্থন এবং রাষ্ট্রের শাস্তিদান এ বিষয়ে আস্থাহীনতার পরিচায়ক। তবে তার অস্তিত্বের প্রধানতম লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রে যেকোন কাজ করতে পারে—তা কেউ অস্বীকার করবে না।[১] এতে অবশ্য মত প্রকাশের স্বাধীনতাও বিঘ্নিত হয় না। আইনভঙ্গের উস্কানী না দিয়ে এরূপ মতপ্রকাশ করা অতি সহজেই সম্ভব। কোন লোক আইন মেনে চলার দায়িত্ব স্বীকার ক'রে যত খুশী তার নিন্দা করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে মতবাদকে আইনে রূপান্তরের পথে কোন সংবিধানিক বাধা নেই, সেখানে কোন লোক বা দল বলপূর্বক সরকারকে উৎখাত করার কথাও প্রচার করতে পারে। কোন উস্কানীমূলক কাজকে দমন করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে ; কেননা ঐসব উস্কানীমূলক কাজের ফলে মত প্রকাশের প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয়। এসব ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার শর্ত হিসেবে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের নিয়মকে প্রতিহত করবার জন্য অত্যন্ত বৈধভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য শেষ ভরসা হিসেবে রাষ্ট্রর হাতে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকতে হবে যেন তা সকল সময়ে আইনানুগ হ'তে পারে।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এবং যে সাহিত্য নীতিবিরোধী কোন কাজের উস্কানী দেয়, তাকে আইনতঃ নিষিদ্ধ

হয়ে উঠেছিল। এ কমিটি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে বিলকে যে শুধু প্রত্যাখ্যান করে তা নয়, বরং জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে উৎসাহ দিতে পারে এমন বই-পুস্তকের প্রকাশনাকেও অবৈধ ঘোষণা করার জন্য এক বিল পেশ করার সোপারেশ করে।

১। এটা মনে করা অবশ্য ভুল যে, প্রত্যেক আইনকে সব সময় মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের। এখানে আমরা আইন প্রণেতা ও আইন প্রয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা আলোচনা করছি। আইনের অধীনস্থ নাগরিকদের দায়িত্বের কথা বলছি না এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আমার '*Community*' গ্রন্থের তৃতীয় পর্যায় পঞ্চম অধ্যায়ে।

www.nagorikpathagar.org

করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে উস্কানী হয় প্রত্যক্ষ। কোন গঠনমূলক সোপারেশকে এ পর্যায়ে ফেলা হয় না। খোলাখুলি মত প্রকাশের বেলায় বা সাহিত্যিক মননশক্তির উদার অভিব্যক্তিকে কোনরূপ রাজনৈতিক অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয় না। কিন্তু যখন তা নির্দিষ্টভাবে আইন মেনে চলার নীতিকে আক্রমণ করে, তখনই তাকে অপরাধ ব'লে ধরা হয়। আইনকে সংরক্ষণ করবার এরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শক্তিশালী রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। কোন লেখা বা শিল্পসৃষ্টি প্রকাশিত হবার পূর্বে কোন ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেবার রাষ্ট্রীয় নীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক; কেননা তার ফলে মানুষকে বুদ্ধিহীন শিশুর পর্যায়ে ফেলা হয়। তাছাড়া, এমনি কাজকর্মের ফলে রাষ্ট্র একরকম এক নায়কতন্ত্রে পরিণত হয়; যার ফলে মুক্ত চিন্তাধারা রুদ্ধ হয়ে আসে।

কারো খ্যাতি বা মান হানিকর মতবাদের প্রশ্নেও এমনি আপত্তি উঠতে পারে। কারো মানহানিকর ব্যাপারে যা গুরুত্বপর্ণ, তা হ'ল ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্মানহানি করার প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র মত প্রকাশ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আইন নির্দিষ্ট কোন অসম্মানজনক অক্রমণের হাত থেকে নাগরিককে রক্ষা করে। অসম্মানজনক উক্তি সত্যি কি মিথ্যা, তা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হল— সে উক্তি বিশেষ কোন ক্ষতিসাধনের জন্য আক্রমণস্বরূপ। অনুরূপভাবে, যে বিষয় এখনও বিচারাধীন রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করলে তা বিচার ব্যবস্থায় অনধিকার চর্চা করার সামিল। তার উদ্দেশ্য যদি কোন সত্য উদ্ঘাটন হয়ে থাকে, তবে সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতই তা করতে পারবে।

মত প্রকাশের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার থেকে রাষ্ট্রকে আমরা বঞ্চিত করতে চাই কেন? আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র এ অধিকার উপভোগ ক'রে এসেছে। শুধুমাত্র স্বাধীনতার নামে আমাদের কথা বললে চলবে না; কেননা স্বাধীনতারও যুক্তি আছে। মত প্রকাশের ব্যাপারটা নেহাত ব্যক্তিগত— এ অজুহাতেও তাকে রাষ্ট্রের আওতার বাইরে রাখা ঠিক নয়; ব্যক্তিগত অভিমতের ব্যাপারটা জটিল, এবং মিল তাঁর প্রবন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করছেন, তা সত্ত্বেও এটা বলা চলে যে, এর উপর জোর দিলে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার' বিষয়টি এক বিভ্রান্তিতে পরিণত হয় ও তা আর সমর্থনযোগ্য থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

অভিমতকে কাজ থেকে পৃথক করা যায় ব'লে আমরা তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলতে পারিনা। আসলে কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এবং পৃথিবীতে ভ্রান্ত মতের মত ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কিছুই নেই। প্রকৃতির সত্য ঘটনার বিরোধী অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে ভ্রান্ত কুসংস্কার ভয়াবহ অভিশাপ নিয়ে আসে, এবং এদের থেকেই জন্ম হয় দুর্ভাগ্যজনক অজ্ঞতা, নিবুদ্ধিতা ও হিংসাবৃত্তি আর অভিশপ্ত শত্রুতা, ও ব্যয়বহুল উচ্চাকাঙ্খার। মতবাদের নিয়ন্ত্রণে শক্তিপ্রয়োগের যুক্তিহীনতা থেকে এর আসল কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শক্তিপ্রয়োগ বীভৎস এক বিজাতীয় সত্তা হিসেবে অনধিকার প্রবেশ করে এবং সেখানেও তা অভিমতকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা সত্যনিষ্ঠ করতে সক্ষম হয় না। চিন্তার সুষ্ঠু ক্ষেত্রেও তা কোনরূপ অনুপ্রেরণা বা নির্দেশ দানে ব্যর্থ হয় এবং ভালমন্দ উভয়ক্ষেত্রেই শক্তিপ্রয়োগ ডেকে আনে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। পাশব শক্তি অতি সহজে সত্য ও মিথ্যার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে। তাই কোন মতের সপক্ষে শক্তির আবাহন সত্যের বিরুদ্ধে নিন্দার আহ্বান ছাড়া কিছুই নয়। মতবাদকে প্রতিহত করতে পারে একমাত্র মতবাদ এবং মাত্র এভাবেই সত্য প্রকাশ হ'তে পারে। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠায় বলপ্রয়োগ হ'লে সত্যের বিজয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বলপ্রয়োগে মতবাদ স্তব্ধ হ'তে পারে; কিন্তু তার ফলে সত্য ঘোষণাকারী মুখও বন্ধ হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ হ'লে তা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ হয়ে থাকে, এবং এতে 'সত্যের প্রতি অবিচল আস্থায়' যারা সাহসী, তাদেরই ক্ষতি হয় বেশী। সুতরাং সাধারণ বিশ্বাস ছাড়াও নৈতিক সাহসের বিরুদ্ধেই এর প্রয়োগ হয় কঠোরতর। শুধু তাই কি? এতে জীবনের নীতি আক্রান্ত হয় এবং সৃজনশীল শক্তির উপর 'একরূপতা' বা ঐক্যের কঠোর চাপ হয় জয়যুক্ত। মতবাদের উপর যখন রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে নিছক বলপ্রয়োগ। যখন আইন তাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলে, তখন মানুষ স্বেচ্ছায় সে কাজ করতে পারে; কিন্তু যখন আইন মানুষকে তাদের মতের বিরুদ্ধে চিন্তা করতে বলে, তখন তারা স্বেচ্ছায় সে চিন্তা করতে পারে না। যখন আইন মানুষকে তা বিশ্বাস করতে বলে, তখন মানুষ হয়ে ওঠে ভণ্ড অথবা বিদ্রোহী। এবং নাগরিকদের মনের কাছে তার আবেদন শেষ হয়ে যায়। আইনযন্ত্র তখন তার সঠিক বৈশিষ্ট্য

www.nagorikpathagar.org

হারিয়ে ফেলে এবং আনুগত্যের ভিত্তি নড়ে ওঠে। সুতরাং যখন আইন কোন মতবাদ বা বিশ্বাসকে জোর ক'রে চালাতে চেষ্টা করে তখন সে নিজের কাছে হয়ে ওঠে মিথ্যার প্রতীক।[১]

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যা খাটে 'বিশ্বাস ভিত্তিক' আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও তা প্রয়োগ করা হয়। এখানেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দৃঢ় দু'টি 'বিশ্বাস ভিত্তিক' বিধি হ'ল ধর্ম ও নৈতিকতা। এদের সাথে আইনের সম্পর্ক বিবেচনা করলে তা বোঝা যায়।

নৈতিকতার আন্তর্নিহিত সমর্থনের সাথে রাজনৈতিক আইনের ভিত্তিকে এক ক'রে দেখা চলবেনা। আইন সঠিক—এ ভেবে সাধারণতঃ আমরা আইনকে মেনে চলি না; বরং আইনকে মেনে চলা সঠিক—এ ভেবে আমরা আইনকে মেনে চলি। তা না হ'লে প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠগণের আইন মেনে চলাটা নির্ভর করত বাধ্যবাধকতার উপর, এবং এর ফলে রাষ্ট্রে এত সংঘর্ষ হ'ত যে, তার কার্যকারিতা ভয়ঙ্করভাবে ব্যাহত হত। আইন ও সরকারের সার্বজনীন সেবার স্বীকৃতিই হ'ল রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি। এর জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ আইনকে গ্রহণ করি। এটিই হ'ল 'সাধারণ ইচ্ছার' নীতি, এবং আমাদের আনুগত্যের সকল ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে সাময়িকভাবে স্বীকার করবার সীমারেখা ছাড়িয়ে আইন মেনে চলার সুষম মনোবৃত্তি। নাগরিকদের এক অংশ যে আইনকে ভীষণ না-পছন্দ করে, তেমন আইন প্রণয়ন করে নাগরিকদের আনুগত্য বোধকে চাপের মধ্যে না ফেলাই হ'ল সরকারের পক্ষে উত্তম কাজ, এবং এজন্য রাজনৈতিক আওতার সঠিক নির্ধারণ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এটাও খুব প্রয়োজন যে, সে সহানুভূতি ও বোঝাপড়া পূর্বের বিরোধকে ছাপিয়ে উঠে ঐক্যমত ও সম্মতির প্রতিষ্ঠা করে তার প্রয়োগের মাধ্যমে 'সাধারণ ইচ্ছার' ভিত্তি যতদূর সম্ভব ব্যাপক ও গভীর হওয়া উচিত। কিন্তু কোন

১। একই যুক্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ ও সেন্সরের মাধ্যমে প্রেস ও জনমতের অন্যান্য শাখার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমকে আরও কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়। যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে জনমত সংগঠিত হয়, জনসাধারণের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা শুধু যে প্রবঞ্চনা তা নয়; এটা একটা উৎপীড়নও বটে। অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থার মত যুদ্ধের সময় এটাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সত্যি, কিন্তু অনেক স্বৈরাচারী সরকার শান্তিকালেও একে দমন করে রাখতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

শাসন ব্যবস্থা ঐক্যমত' প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, আর যদি কোন অভূতপূর্ব পরিবেশে তা হয়ই, তবে তা হবে মুক্ত ব্যক্তিত্বের বিনিময়ে। সে ঐক্যমত থেকে মুক্ত ব্যক্তিত্ববোধ অনেক মূল্যবান। যদি প্রত্যেকটি আইন ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও আদর্শের সংগতিপূর্ণ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল হয়, তবে আনুগত্যবোধ বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য।[১]

তাছাড়া, এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা যতই একমত হই না কেন, রাষ্ট্রের আইনের একটা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ হ'ল আমার ও তোমার সকলের জন্য আইন ; কিন্তু কোনক্রমেই তা আমার বা তোমার অধিকারে থাকতে পারে না। আইন আভ্যন্তরীণ হ'লেও তা তেমনিভাবে বাহ্যিক। আইনের প্রতি আমার আগ্রহ যতই হৃদয়প্রার্থী হোক না কেন, আইন তা থেকে স্বতন্ত্র। আইন কোনদিন আমার একান্ত নিজস্ব মর্মের বিধি হ'তে পারে না।

এখানেই রয়েছে নৈতিক আইন থেকে রাজনৈতিক আইনের স্বাতন্ত্র্য। নৈতিক আইন হ'ল ব্যক্তিগত হৃদয়ের আবেদন ; তার বিবেকের বিধান। বাইরে থেকে দেখ্‌লে মনে হবে, নৈতিক আইন প্রথা ও সামাজিক শিক্ষার সৃষ্টিবিধান ; কিন্তু কার্যবিধি হিসেবে তা হচ্ছে কোন দায়িত্বশীল লোকের নিজস্ব রচনা বিধান—যে বিধান তার নিজস্ব স্বাধীনতা সচেতনতায় মঙ্গলের উপায় ও উদ্দেশ্য বিচার ক'রে বাছাই করা হয়েছে। নৈতিক আবেদনের মূলে রয়েছে ব্যক্তির ন্যায় অন্যায়বোধ বা শেষ পর্যায়ে তার ভালমন্দ বোধে রূপান্তরিত হয়। এ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে সকল আনুগত্যের ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যও তার অন্তর্গত ; কিন্তু প্রত্যেকটি নৈতিক কাজ হ'ল সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির কাজকর্ম— একজন নাগরিক হিসেবে নয়, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নয় বা পরিবারের সদস্য হিসেবেও নয়। নৈতিকবিধি সবসময় এদের প্রত্যেকের ও

১। মিস ফলেট তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *'The New State and Creative Experience'* এ বলেছেন যে, বুদ্ধিদীপ্ত সহযোগিতার দ্বারা প্রত্যেকটি আইনে বিভিন্নতার বহু ঊর্ধ্বে উঠে পরিপূর্ণ স্বার্থের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তবে এটি আদর্শ মাত্র এবং এর মূল্য যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন কোনদিন না ও হতে পারে। এর মাধ্যমে আনুগত্যের শর্ত বা 'আইনের পেছনে যে সমর্থন' থাকে তা অর্জন করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

সকলের জন্য মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে এবং তা সম্ভব হয় তার সামগ্রিক মঙ্গলের সচেতনতায় তার ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা অনুধাবন করে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এ নীতিকে আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের প্রক্রিয়া বর্ণনার জন্য অত্যন্ত গভীর ও চিন্তাপ্রসূত ব'লে মনে হ'তে পারে। তা যাই হোক, যদিও আমরা অভ্যাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক সমতার নীতিতে আবদ্ধ; তথাপি আমরা নিয়ত বিকল্পের সম্মুখীন হই এবং আমাদের প্রত্যেক পছন্দে প্রচ্ছন্নভাবে বা স্পষ্টভাবে সমগ্রিক মঙ্গলের আলোকে বর্তমান থাকে আমাদের আত্মনির্ধারণ বোধ, এ পছন্দ থেকে বোঝা যায় যে, নৈতিকতা কোনরূপ অন্ধ অনুকরণ নয়।

সুতরাং নৈতিকতার আওতা ও রাজনৈতিক আইনের আওতা কোনদিন এক হ'তে পারে না। নৈতিকতা সব সময়ই হ'ল ব্যক্তিগত এবং সমগ্র বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর অনুধাবন সম্ভব। রাজনৈতিক ব্যাপারটা সামগ্রিক বিষয়ের একটা দিক মাত্র। 'রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা' সম্পর্কে অনেকে যা বলেন, তা সত্যি বিভ্রান্তিকর এবং 'ব্যক্তিগত নৈতিকতার' সাথে তার তুলনাও বিভ্রান্তিকর।[১] রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা দ্বারা যদি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের সঠিকতা বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তাকে আদিমযুগের যুক্তিহীন আনুগত্যের সাথে তুলনা করা যায়। তাছাড়া, তাকে অ-নৈতিকও বলা যায়; কেননা এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার ন্যায়-অন্যায়বোধকে কাজে না লাগিয়ে সরকার যে সব সময়ই ন্যায়ানুগ—এ সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। সে কাজ নাগরিকরা সমর্থন করুক বা নাই করুক, সরকারের প্রত্যেকটি কাজের প্রতি নিয়ত আনুগত্যের কথা যদি তা দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে, তবে সেও হ'ল এক ধরনের ব্যক্তিগত নৈতিকতা। কারণ তখন তা হয় নাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রকাশ—যে সর্বদা সব পরিস্থিতিতে আইন মেনে চলা অনেক ভাল ও সাধারণ মঙ্গলের জন্য অনেক সুবিধা-জনক। তবে ইতিহাসের অনেক মনীষীই এ ধরনের মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে, দৃঢ়প্রত্যয় ছাড়া নীতিবান না হ'লে বা কোনটা

১। এ. ই. জিমার্ন (*New Republic*—সেপ্টেম্বর, ১৯১৭) ট্রিলস্কের (*Troeltsch*) লেখা থেকে নিম্নলিখিত উক্তি তুলে ধরেন এবং বলেন যে, নৈতিকতা তিন রকমের : (ক) ব্যক্তিগত নৈতিকতা, (খ) রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা ও (গ) আন্তর্জাতিক নৈতিকতা। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'ল রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা।

www.nagorikpathagar.org

ভাল কোনটা মন্দ, এ সম্বন্ধে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে অনুপ্রাণিত না হ'লে রাষ্ট্র মানবের কাজ-কর্মের উপর তার দমনমূলক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করত না। সবশেষে এটাও বলা চলে যে, ব্যক্তিগত নৈতিকতা বাদ দিলে নৈতিকতার কোন স্থান নেই, এবং যারা চার্চ, রাষ্ট্র বা অন্য কর্তৃপক্ষের উপর ভাল-মন্দের বিচার আরোপ করে, তাদের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে; কেননা ভলমন্দের কুশলী বিচার-বিবেচনাই হ'ল নীতির প্রাণ। তা না হলে নৈতিকতার আত্মহত্যা ঘটবে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, জীবন্ত মানুষই আত্মহত্যা করে। তাই ক্লান্তিতে বা নিবুদ্ধিতায় বা শ্রদ্ধার উন্মত্ততায় নীতিবান মানুষ আত্মবিচার অন্য কর্তৃপক্ষের উপর আরোপ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক কি? আইন নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ দিতে পারে না। আইন কেবলমাত্র বাহ্যিক কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং আইন শুধু ঐ সব কাজ-কর্মের নির্দেশ দান করে, যাদের সম্পাদন রাষ্ট্রের মতে সাধারণ মঙ্গলের জন্য সুবিধানজনক। কিন্তু এ কাজগুলো কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—অবাধ বা নৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বাহ্যিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য যা দরকার; তাই হ'ল আইনের সে কাজগুলো। এ সাধারণ নীতির অবশ্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে এবং এ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখা দরকার। তবে এটা খুব স্পষ্ট যে, আইন নৈতিকতার সবটুকু স্থান জুড়ে থাকেও না, থাকতেও পারে না। সকল নৈতিক দায়িত্বকে আইনগত দায়িত্বে পরিণত করলে নৈতিকতা বিধবস্ত হয়ে পড়ে; সৌভাগ্যবশতঃ তা হয় না। নৈতিক দায়িত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পরিবর্তনশীল যে হাজারো পরিস্থিতির সংযোজন হয়, আইনের দৃষ্টি তা আগে থেকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় না। তাছাড়া, সকলের জন্য থাকতে হবে একটি মাত্র আইনগত বিধি; কিন্তু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের তাল রেখে নৈতিক বিধান বিভিন্ন হ'তে বাধ্য।

কোন জনগোষ্ঠির নৈতিক বিধানের বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত মারাত্মক কাজ। এক্ষেত্রে তার যৌক্তিকতার মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরতে হবে সন্দেহাতীত ও সর্বজনস্বীকৃতি সামাজিক সুফলের সম্ভবনা; কেননা এমনি ধরনের আইন প্রণয়নে যে জনগোষ্ঠির নৈতিক বিধান হারিয়ে যায় ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিপীড়িত হয়। 'পিউ-রিট্যানদের দ্বারা প্রণীত আইনের' ন্যাক্কারজনক দিক এখানে আমরা

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পাই। পিউরিট্যানদের দাবী ছিল—তাদের নীতিবোধ সকলের নীতিবোধে পরিণত হবে, এবং এর জন্য যদি সকল নৈতিকতার স্বতঃস্ফূর্ততা বিনষ্ট হয়, তাতেও আপত্তি নাই। কতকগুলো সংস্থা আছে, যারা তাদের সৎ; কিন্তু সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে সব সময়ই সরকারকে এমনি ধরনের পশ্চাদপদ কার্যনীতি গ্রহণে চাপ দিচ্ছে। তারা জুয়াখেলা বন্ধ করতে চায়। তারা ব্যভিচার ও অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্বন্ধের বিরুদ্ধে আইন দাবী করে।[১] কিন্তু তারা দেখে না যে, যেসব কাজকে তারা নীতিগর্হিত কাজ ব'লে গণ্য করছে, সেগুলো রাজনৈতিক আইন প্রণয়নের আওতাভুক্ত নয়। তারা নাট্যশালা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 'সেন্সর' দাবী করে এবং চায় যে, পূর্বাহ্নে কোন কর্মকর্তা ঠিক ক'রে দিক সমগ্রজাতি কি কি পড়বে, কোন্ কোন্ বিষয়ে চিন্তা করবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস দেখবে বা উপভোগ করবে।

দমনমূলক নৈতিক আইন প্রণয়নের প্রতি যে ঝোঁক, তা প্রধানতঃ প্রেরণা লাভ করেছে কয়েক রকমের ধর্মীয় সংস্থার কাছ থেকে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা তাদের নিজস্ব নৈতিকতাকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে চান। এ মনোভাব পর্যালোচনা করলে চিন্তাক্ষেত্রে দু'রকম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এটা অবশ্য চার্চের ন্যায়সংগত দাবী যে, তাঁর সদস্যরা ধর্মের বিধান অনুযায়ী কতকগুলো কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করবে। ধর্মতত্ত্বের সাথে সংগতি

১। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে অণ্টারিও ও কুইবেকের ব্যাপটিস্ট অধিবেশনে সামাজিক সেবা কমিটির দ্বারা উপস্থাপিত 'সংস্কার কর্মসূচীর' বিষয়টি দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁদের আঠারটি সোপারেশের মধ্যে নয়টির ক্ষেত্রে নৈতিকতার নামে আইনগত সংরক্ষণ দাবী করা হয়। দাবীগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে কানাডায় সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ।
(খ) ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ভিত্তিক জুয়ার অবসান।
(গ) মদ্যজাতীয় পানীয়ের ব্যবসা রহিতকরণ।
(ঘ) বেশ্যাবৃত্তির অবসান ঘটানো।
(ঙ) ব্যভিচারকে অন্যায় ব'লে ঘোষণাকরণ।
(চ) দ্রুত ও অবিবেচনাপ্রসূত বিবাহ বন্ধ।
(ছ) আপত্তিকর সাহিত্যের প্রচারে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ।
(জ) নাট্যশালায় প্রাদেশিক পর্যায়ে 'সেন্সর' প্রবর্তন।
(ঞ) স্নানাগার ও নৃত্যশালায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

www.nagorikpathagar.org

না রেখে কারো চার্চের সদস্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু রাষ্ট্র প্রত্যাহার বা গ্রহণের এমন সহজ বিকল্প দেয় না এবং এমনি ধরণের অনমনীয় ব্যাপার বা সার্বজনীনতার শর্ত রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করবে, যার বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তেমন দানা বাঁধবে না। তাছাড়া, চার্চের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত এক বন্ধন সদস্যদের তার রীতিনীতি মেনে চলতে অনুপ্রেরণা যোগায়। বিশেষ ধর্মতত্ত্ব ও আরাধনার পদ্ধতি বাদ দিলেও সামাজিক ঐতিহ্যও অন্যান্য বিচার-বিবেচনায় মানুষ বিশেষ চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। ধর্মনীতির মধ্যে মত পার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা যথেষ্ট সংখ্যক লোক তার বিস্তারিত ও কঠোরতর ব্যাখ্যা দাবী করে না। এ প্রসংগে আমেরিকার মেথোডিস্ট চার্চের অসুবিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাস খেলা, থিয়েটার দেখা ও অন্যান্য কতকগুলো সামাজিক আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারী নির্দেশের ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে দেখা হয়, কতকগুলো পরিবর্তন আনা হয় ও ব্যাপক নীতিরগুলোর প্রয়োগকে ব্যক্তিগত বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু এখানেই রয়েছে বিভ্রান্তির মূল; কেননা চার্চ প্রতিষ্ঠানের মত সংস্থার নিকট থেকে এ ধরনের রাজনৈতিক আইন প্রণয়নের দাবীর পেছনে থাকে এক রকম ভুল ধারণা ও তার নিজস্ব দায়িত্ব পরিত্যাগ করবার মনোভাব। এ যেন ব্যর্থতার এক স্বীকৃতি। চার্চ নিজস্ব নৈতিক ক্ষমতাবলে সদস্যদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে বলপ্রয়োগে তা সম্পন্ন করবার জন্য রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করে।

চিরাচরিত রীতিনীতির পরিধির দিকে নজর দিলে আমরা রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের সীমারেখা সম্বন্ধেও বুঝতে পারি। সমাজের সর্বক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতিনীতি বা প্রথা জন্মলাভ করে। এসব স্বাভাবিক সৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে বিশ্বাসের ভিত্তি ও জীবন পদ্ধতি। প্রথা সমাজে দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধিলাভ করলে তারাই নতুন কোন জীবন পদ্ধতিকে প্রতিহত করে; কিন্তু জন্মসূত্রে তারা স্বতঃস্ফূর্ত। সংঘবদ্ধ করবার জন্য মর্জি মাফিক তাদের জন্ম হয় না এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার ফলেও তাদের জন্ম হয় না। প্রথার জন্মদানে রাষ্ট্রের প্রভাব খুব অল্পই, এবং রাষ্ট্র তা ধ্বংসও করতে পারে না। তবে যে পরিবেশে কোন প্রথার জন্ম হয়েছে, সে পরিবেশকে

www.nagorikpathagar.org

নিয়ন্ত্রিত ক'রে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র প্রথাকে প্রভাবিত করতে পারে। সাম্রাজ্যের নিয়ম হিসেবে এটাকে বরাবরই মেনে বলা হয় যে, কোন বিজিত রাজ্যে অনুগত জনগোষ্ঠির প্রথা পরিবর্তন করা চলবে না। এটাও ঠিক যে, কোন রাষ্ট্র তার নিজস্ব নাগরিকদের চিরাচরিত রীতিনীতিকে আইন ক'রে বিনষ্ট করে না। মহামতি পিটারের মত স্বৈরাচারী শাসক তাঁর দরবারের লোকদের নিজের দেশের প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে হুকুম দিতে পেরেছিলেন বিদেশী চালচলন রপ্ত করতে। বিশেষ ক'রে দাড়ী কামিয়ে ফেলতে ও পশ্চিম ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে, এবং তাঁর দরবার ও শাসকের যে হুকুম তামিল করেছিল—তা সত্য। কিন্তু তা সম্ভব হয় সে প্রথার প্রভাবেই ; কেননা রাজার হুকুম মানাও ছিল সে দেশের রাজ-দরবারের প্রথা। কিন্তু তিনি জনসাধারণের উপর বিদেশী জীবন যাত্রা চাপিয়ে দিতে পারেন নি ; যদিও সে ব্যবস্থার বাহ্যিক দিক তাঁর দরবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করে। এখানে যেকোন স্বৈরাচারীর ক্ষমতার সীমা শেষ হয়ে যায়। প্রথার সমর্থনের উপর তাঁর ক্ষমতা এমন ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল যে, শাসন করতে হ'লে তাঁকে প্রথার অভিভাবক হ'তে হবে এবং ভৃত্যও হতে হবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় আইন ও প্রথার মধ্যে বিরোধ অতি সহজে বেধে যায় ; কেননা প্রথার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র হচ্ছে খুব অস্থায়ী ও খুব কম সমজাতিক। সংখ্যাগুরুর শাসন প্রথার ক্ষমতা সম্পর্কে খুব সচেতন, এবং সংখ্যালঘু যেসব প্রথা মেনে চলে, সংখ্যাগুরু সেসব প্রথাকে রহিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা হ'ল সংখ্যালঘুর প্রথা আইনের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করে। যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশ সংশোধনীর পূর্বে মদ্যপান ছিল সংখ্যালঘুর প্রথা। ফলে এ প্রথাকে দমন করবার জন্য আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। কিন্তু আইনকে উপেক্ষা করেও প্রথা টিকে থাকে ও তার চারদিক ঘিরে আইন অমান্যকারী এক ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে ; যা সরকারের আসন পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। প্রথা যখন আক্রান্ত হয়, তখন সে আইনকে আক্রমণ করে। যে আইন সে প্রথার বিরোধিতা করে নির্দিষ্ট সে আইনকেই তা আক্রমণ করে না ; বরং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ — আইন মেনে চলার মানসিকতা —সাধারণ ইচ্ছার ঐক্য — তাও আক্রমণের সম্মুখীন হয়। শুধুমাত্র গভীর প্রয়োজন ও মারাত্মক পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ প্রথার উপর আইনের প্রয়োগ করা যেতে

www.nagorikpathagar.org

পারে, এবং গুরুতর রোগেই শুধু ভয়ঙ্কর ঔষধ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে একথা পরিষ্কার যে, সামাজিক প্রথার বৃহৎ অংশই হ'ল আইনের আওতার বাইরে। রাষ্ট্র তাদের সৃষ্টিও করে না, তাদের ধবংসও করে না।

কম গুরুত্বপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল রীতি বা ফ্যাশনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব আরও অল্প। ফ্রেডারিক উইলিয়ম তাঁর প্রজাদের সুতী কাপড় পরতে বারণ করতে পেরেছিলেন, পোশাকের ঢং বা ধরন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোন নির্দেশ দিতে পারেন নি। রাজা নিজে বিশেষ রীতি অনুসরণ করে একধরনের ফ্যাশন চালু করতে পারেন; কিন্তু কোন নির্দেশ দিয়ে তিনি তা করতে পারেন না। এখানেও আমরা রাষ্ট্রের এক অদ্ভুত সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাই। প্যারিস, লণ্ডন বা নিউইয়র্কের কোন অজ্ঞাত কোটারির ফ্যাশন-নির্দেশ কোন লোক আগ্রহভরে অনুসরণ করবে; কিন্তু রাষ্ট্র কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের আভাষ দিলে তাকে ভয়াবহ অত্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হবে, এবং এর ফলে বিপ্লবও হতে পারে।

সাধারণভাবে সমগ্র জীবন্ত সংস্কৃতি হ'ল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে; যদিও তাই হচ্ছে একটা জাতি বা বিশেষ কোন যুগের মর্মবাণীর প্রকাশ। রাষ্ট্র সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়। তাছাড়াও, রাষ্ট্রের করণীয় আরও কিছু রয়েছে। রাষ্ট্র জীবনের সুশৃঙ্খল এক ব্যবস্থা তৈরী করে; যদিও তার সৃষ্টি করতে রাষ্ট্র অক্ষম। সংস্কৃতি হ'ল সম্প্রদায়ের কীর্তি, এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে সঞ্জীবিত করে, আর সে শক্তি রাজনৈতিক আইনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, ধর্ম, প্রথা ও রীতি বা ফ্যাশনের মেলায়। চিন্তা ও জীবন ধারার হাজারো প্রকাশে, সন্তুষ্টি সীমাহীন অনুধাবনে যা সাধারণের সমতলভূমিতে বা সৌন্দর্য ও সত্যের উচ্চ উপত্যকায় জীবনকে দেয় তার নতুন মাধুর্য ও জীবিকায় আনে সার্থকতা, প্রেম ও স্নেহের মুক্ত পরশে এবং প্রাত্যহিক আনন্দ ও বেদনার, প্রতিদিনের ধূসর অভিজ্ঞতায় রুটি রুজির সন্ধানে, এমন কি ক্ষমতা ও মর্যাদা বিজয়ের উচ্চাকাঙ্খায় – সর্বক্ষেত্রে একটা জাতি বা 'সভ্যতা' নিজ পথে অগ্রসর হয় এবং অজানা প্রভাবের পুলকে সচকিত হয়ে ওঠে। এসবক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রণের অতি অল্পই সুযোগ লাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

এসব পার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে ; তবে আজ পর্যন্ত আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ-কর্মে তা বাস্তবায়িত হয় নি। অবশেষে এদের একটি সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ; কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোন সংঘের যদি সীমিত কার্যাবলী থাকে এবং যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে জীবনের কোন কোন দিক থেকে থাকে, তবে সে সংঘ যত মহানই হোক না কেন, জীবনের ঐসব দিককে বিভ্রান্ত করে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়। যে সংঘ অন্য কাজকর্ম করে তার উপরও কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা উচিত নয়। কর্তৃত্বের সাথে কার্যাবলীর সম্পর্ক থাকা উচিত। একদিক থেকে রাষ্ট্র সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে ক্ষমতা তার কার্যাবলীর সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাষ্ট্রে প্রত্যেক সংঘ ও প্রত্যেক ব্যক্তির উপর 'জীবন ও মৃত্যুর' ক্ষমতা প্রয়োগ করে ; কেননা যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সীমাহীন ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে। এ ক্ষমতার অধিকার ক্রমশঃ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জোর পূর্বক কোন রাজনৈতিক বিবাদ মীমাংসার অধিকার রাষ্ট্র দাবী করে। এ কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্র অন্যান্য স্বার্থের উপর তার রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিপত্তি বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। বিবাদের গুরুত্ব না ভেবেও রাষ্ট্র এমন অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম, যার ব্যবহার একমাত্র চরম মুহূর্তে বা শেষ পর্যায়ে হ'তে পারে। এটা আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে, সে অস্ত্রের ব্যবহারে যে যৌক্তিকতা প্রয়োজন, সে তেমনি প্রয়োজনের সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্র বিপদের সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রধান নিন্দাবাদের কারণ হ'ল তার নিয়ত প্রয়োগ।

রাষ্ট্র যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সে পরিবার, সাংস্কৃতিক জীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ লক্ষ্যের উপর বিশেষ এক রাজনৈতিক লক্ষ্য তুলে ধরে। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র পরিবারকে ভেঙ্গে ফেলে, বিজ্ঞান ও কলার সগোত্রীয়তা বিনষ্ট করে, চার্চকে হতবুদ্ধি ক'রে তোলে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে ধ্বংস করে, সব রকম সাংস্কৃতিক প্রভাবকে দমন করে এবং রক্তক্ষয়, ডাকাতি, মিথ্যা ও হত্যার নৈতিকতা গ'ড়ে তোলে ; যা সদস্যদের মধ্যে যেমন কার্যকরী হয়, শত্রুদের বেলায়ও তার প্রয়োগ হয়। যার উপর ভিত্তি ক'রে সমাজ গড়ে উঠেছে, এসব হ'ল তার সম্পূর্ণ বিরোধী। এক্ষেত্রে আমরা একথা জিজ্ঞেস করতে পারি—লক্ষ্যের সাথে পন্থার সংগতি আছে কি ? রাষ্ট্রের

www.nagorikpathagar.org

হাতে সম্প্রদায়ের তুলে দেয়া এত ভয়ঙ্কর, এত অসম, এত চরম পন্থার সাথে রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের কোন সংগতি আছে কি? নাগরিকত্ব মানুষের সমগ্র জীবন নয়, বা মানবের সমগ্র দায়িত্ব এর মধ্যে নিহিত নেই। পরিবার, সম্প্রদায় ও তার নিজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের হাতে এমন ক্ষমতা দেয়া হবে কেন, যে ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র নির্দেশ দিতে পারে যে, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ ও চরম?

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, তার ফলে এ প্রশ্ন উঠেছে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার কৃষককুলের সাথে জার্মানীর কৃষকদের কোন বিরোধ ছিল না, বা এক দেশের হস্তশিল্পীদের সাথে অন্য দেশের হস্তশিল্পীদের কোন রকম বিরোধ ছিল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কোনরূপ জাতীয় অভিযোগ ছিল না। ওসব দেশের বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও শিক্ষকদের মধ্যেও কোনরূপ দ্বন্দ্ব ছিলনা। সে সকল দেশের গৃহিণী ও মায়েদের মধ্যেও কোনরূপ ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। অথচ যুদ্ধের ফলে তারা সবাই ধ্বংসের অভিশাপের সামনাসামনি এসে দাঁড়ান। ইউরোপের সরকারগুলো এ বিষয়ে জড়িত ছিল সত্যি, এবং সেরাজেভোতে কয়েকজন হতভাগ্য হত্যাকারীর দুষ্কর্মের ফলে বিশ্ব অস্ত্র তুলে নেয়। সে দুষ্কর্মের পেছনে কোন হীন চক্রান্ত ছিল কি না, তা বিবেচনার দরকার নেই অথবা সে পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জাতীয় পরিণতির বা আড়ম্বরপূর্ণ দাবী কতটুকু আন্তরিকতা পূর্ণ ছিল, তাও এখানে গৌণ। আসল কথা হ'ল—যখন সে দুঃখের দিনের শুরু হয়, তখন বিভিন্ন জাতি যা জানে নি, তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রত্যেকটি জাতি সগর্বে যেন সকলকে ডেকে বলল: তুমি যে কৃষক, তুমি যে শ্রমিক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী বা মা—সে কথা ভুলে যাও। শুধু মনে রাখ যে, তুমি নাগরিক। তোমার উপর অন্য যে যে দাবী আছে, তার কথা ভুলে যাও; কারণ আমার দাবীর সাথে কোনটিরই তুলনা চলে না।

যেখানে লক্ষ্যপন্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, সেখানে এমনি ফলই ফলে। আধুনিক যুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শকে আকাশচুম্বী ক'রে চালাই করা হয়; যাতে এর জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তার সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, আর অবশ্যম্ভাবীরূপে যখন সে লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তখন তেমনি আকাশচুম্বী হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যতদিন পর্যন্ত সীমিত রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেয়া হবে বা যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রকে জাতি

www.nagorikpathagar.org

বা সম্প্রদায়ের সাথে এক পর্যায়ে ফেলা হবে, ততদিন এমনি অবস্থা চলতে থাকবে। অন্যপক্ষে, যদি তার সীমিত বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি বৃদ্ধি পায় এবং এটা যদি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা হয় যে, রাষ্ট্র হ'ল সমাজের এক নির্দিষ্ট সংগঠন মাত্র; তবে সমাজ অতি সহজে রাষ্ট্রের বাহ্যিক ক্ষমতাকে সীমিত করবার পথ পাবে; যেমন ক'রে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে তা করে ফেলেছে। এভাবে স্বৈরাচারেরর পরিত্যক্ত প্রবণতার প্রভাবে জীবনের যে মারাত্মক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তার পথ রুদ্ধ হতে পারে।

দুই: রাষ্ট্র ও অন্যান্য মহান সংঘ

মানুষ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মের সীমাবদ্ধতা অনুভব ক'রে নেহাত প্রয়োজন বশে অন্যান্য সংঘ গড়ে তোলে এবং তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র যে কাজ করে না বা যা করবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের নেই, তেমনি সাধারণ স্বার্থ অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়। তাদের পন্থা ও কর্মপদ্ধতি রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। স্বাভাবিক কারণে রাষ্ট্র সামাজিক কাঠামোতে নিজের অবস্থা ঠিকমত বুঝতে না পেরে বা সম্প্রদায় ও নিজের মধ্যে সঠিক-ভাবে পার্থক্য নির্দেশ করতে না পেরে এসব সংঘের উপর কর্তৃত্ব দাবী করে অথবা নিজের 'দৈবত্বের' বিরুদ্ধে সংঘগুলোকে ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার মনে করে তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হয়। পর্যুদস্ত রাজতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের স্বৈরাচারী দাবীর প্রতিধ্বনি করে বিপ্লবী ফ্রান্সের চরমপন্থী গণতন্ত্র ঘোষণা করে যে, 'আমার পাশে অন্য কোন সংঘের স্থান নেই।' কিন্তু পরবর্তী শতকে সর্বত্র গ'ড়ে উঠল 'অর্থনৈতিক সংহতি' চার্চ ও রাষ্ট্র থেকে কার্যতঃ আলাদা হয়ে পড়ল এবং বর্তমান বিশ্বে যে হাজারো রকম সমৃদ্ধ সংঘের কার্যকারিতা দেখা যায়, তারও শুভ সূচনা হ'ল। এর ফলে সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের যে দ্রুত পটভূমি রচিত হ'ল ও সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া শুরু হ'ল তাকে উপেক্ষা করে কে? আজকে মহান সংঘগুলো রাষ্ট্রের অংশও নয়, তার অধীনস্থও নয়। রাষ্ট্রের মত তারা নিজেদের অধিকারের আলোকেই প্রতিষ্ঠিত। তারা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা হ'ল তাদের নিজেরই ক্ষমতা। পরিবার রাষ্ট্রের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলে—যে ছেলেমেয়েরা 'রাষ্ট্রে শুধু জন্ম গ্রহণ করে' মাত্র। অন্য বিষয়ে তারা পরিবারের উপর নির্ভরশীল। ট্রেড ইউনিয়ন যে আনুগত্য লাভ করে, তা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের

www.nagorikpathagar.org

মতও নয়, বা তার বিরোধীও নয়। অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন সংঘগুলোও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কাটিয়ে উঠেছে। এখন তারা রাষ্ট্রের ভৃত্য নয়, বরং ক্রমে ক্রমে প্রভুত্বের আসনে অগ্রসর হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা বা রাজনৈতিক নির্দেশনা ব্যতীত সাংস্কৃতিক সংঘগুলোও নিজেদের স্বার্থ অনুসরণ করবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অসংখ্য সংঘ ও সংস্থার কর্মচঞ্চল এ বিশ্বে রাষ্ট্রকে নিজের যোগ্যস্থান খুঁজে নিতে হবে।

এটা বলা হয়ে থাকে যে, এসব 'ঐচ্ছিক সংঘ' অত্যন্ত অস্থায়ী, এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক কাঠামোয় তারা আবার পুনর্গঠিত হতে পারে। এ সম্পর্কে আহ্রিং (Ihering)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ: "রাষ্ট্রের নিকট অজ্ঞাত এসব নতুন লক্ষ্যের উপর ভিত্তি ক'রে সংঘ নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতা স্বত্তা বজায় রেখেছে। কালক্রমে তারা আরও শক্তি সঞ্চয় করে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর তারা ফেটে প'ড়ে ঢাকনীটাকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সবগুলো সঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষা আগে কি ছিল? একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপর এটা কি হয়? সংঘের কাজ। এখন কি পর্যায়ে আছে? রাষ্ট্রের কাজে পরিণত হয়েছে। দরিদ্রদের সেবা আগে কি অবস্থায় ছিল? একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপর তা কি হয়? সংঘের কাজ। বর্তমানে তা কি পর্যায়ে আছে? রাষ্ট্রের কাজে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি, সংঘ, রাষ্ট্র সামাজিক লক্ষ্যের পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর এভাবে হয়েছে।[১]

পূর্বেই আমরা দেখিছি যে, এর বিকাশ ধারা আহ্রিং প্রদর্শিত পথের ঠিক উল্টো ছিল। সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির প্রকাশ হয়েছে সর্বশেষে, প্রথমে নয়। শিক্ষার মত, দরিদ্রদের সেবা প্রথমে ছিল 'আত্মীয় গোষ্ঠী' বা 'সম্প্রদায়ের দায়িত্ব'। 'আত্মীয়-গোষ্ঠীর' ঐক্যবোধ ভেঙ্গে পড়লে এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও তার অপ্রচুর হয়ে পড়ে। পরে এর একাংশ রাষ্ট্র তুলে নেয় ও অন্য এক অংশ চার্চের হাতে গিয়ে পড়ে। এসব বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ ঐচ্ছিক সংঘও গ'ড়ে উঠে। দান ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংঘ গ'ড়ে ওঠে। রাষ্ট্র ; ও চার্চের সাথে সম্পর্কশূন্য শিক্ষা-সংঘও গ'ড়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে উচ্চতর শিক্ষা,

১। *'Zwech am Recht'* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড অষ্টম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাগত পদ্ধতির অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘের জন্ম হয়েছে। বর্তমান অবস্থা প্রায় নিম্নরূপ। অনেক দেশেই দরিদ্র সেবার আইনগুলোর মাধ্যমে দরিদ্রদের সাধারণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে রাষ্ট্র তবে এখনও এক ব্যাপক ক্ষেত্র ন্যস্ত রয়েছে ঐচ্ছিক সংস্থাগুলোর হাতে। সম্ভবতঃ এসব দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের স্কন্ধেই তুলে নেবে। এতে 'আহ্‌রিং-এর অভিমতের আংশিক সমর্থন মিলবে।' তবে অন্যান্য স্বার্থের ক্ষেত্র যেখানে অনেক ঐচ্ছিক সংঘ গ'ড়ে উঠেছে, এ মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষার কথাই ধরা যাক। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার ও বিশেষ এক পর্যায় পর্যন্ত সে উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র শিক্ষাক্ষেত্রে ঐচ্ছিক সংস্থাগুলোর স্বাধীন কার্যকারিতার দিকেই নজর দিয়েছে।[১] এ দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্রে এক স্বাধীন ব্যবস্থার সোপারেশ করে এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ বিষয়ক যেসব সমস্যা রয়েছে, তাদের সমাধানেও এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রদ। এটাও অসম্ভব ব'লে মনে হয় যে, ঐচ্ছি সংঘগুলো শিক্ষার সমগ্র বিষয়টি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে। তা যদি কোন দিন সম্ভব হয়ই, তবে তা সম্প্রদায়ে শিক্ষার অভিযানে সুক্ষ্মতর ও উৎকৃষ্টতর সম্ভাবনা ব্যর্থতার আভাস বহন করবে। নীতির দ্বারা রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। এসব সংঘের স্বাধীন ভূমিকা ঐতিহাসিক দিক থেকে সমর্থিত হয়েছে। তাই পরিবার, চার্চ ও অর্থনৈতিক সংঘগুলোর বিবর্তন সম্বন্ধে ভেবে দেখা যেতে পারে এবং আহ্‌রিং প্রদত্ত ব্যাখ্যায় এদের গুরুত্বহীনতার যে ছবি ফুটে ওঠে, তা দূর হবে।

১। ওরিগণের জনগণ এক আইন প্রণয়ন করে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুলের আওতাধীনে নিয়ে আসেন এবং এ বিষয়ে অন্য কোন সংস্থার অধিকারকে রহিত করে আইন তৈরী করে। কিন্তু সে আইনটি রাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা বিধিবহির্ভূত ব'লে ঘোষিত হয় এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট তাকে সমর্থন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তম পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নিশ্চয়ই এর থেকে কম কঠোর ও দমনমূলক পদ্ধতি দলীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কুফল দূর করতে পারত। বিভিন্ন সংঘের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলোর প্রধান অসুবিধা হ'ল এই যে, তাদের কোন কোনটি ধর্মীয় সংস্থার প্রচার অভিযানের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হ'তে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও তেমন বৈশিষ্ট্য গ'ড়ে উঠতে পারে, এবং এর একমাত্র প্রতিকার হ'চ্ছে শিক্ষার মধ্যে নিহিত ধীরগতিতে তার প্রতিকার বিধান।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্র ও অন্যান্য মহান সংঘের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও কাজকর্ম সম্বন্ধে বা যে ঐতিহাসিক বিবর্তনে তাদের জন্ম হয়েছে ও আমাদের সংঘমূলক জীবনের জটিলতা সৃষ্টি করেছে তারও সূত্র সেখানে তেমন মেলেনা। তার অনুসন্ধান এখানে শুরু করলে সে আলোচনা এগ্রন্থের সবটুকু হ্রাস ক'রে ফেলবে। তাই রাষ্ট্র সম্পর্কে সার্থক অনুধাবনের জন্য প্রধান দুটি সম্পর্কের আলোচনা এখানে করলেই যথেষ্ট হবে। অবশ্য এর সাথে এসে যাবে কিভাবে অনুরূপ নীতি সংঘের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। এ অংশে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য রাষ্ট্র ও চার্চের বিশেষ সম্পর্কে আলোচনা করব, এবং পরবর্তী এক অধ্যায়ে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মত জটিল অথচ জরুরী সমস্যা আলোচনার ইচ্ছা রইল।

রাষ্ট্রের জন্মের বহু পূর্বে, এমন কি চার্চের ও জন্মের বহু পূর্বে ধর্ম বিদ্যমান ছিল। সর্বপ্রথম ধর্ম ছিল মানসিক এক পরিবেশের মত যা প্রত্যেক সমাজকে করেছিল আচ্ছন্ন। পাহাড়ের গায়ে গাঢ় তুষারের মত ধর্ম জড়িয়ে ছিল জীবনের সব বৈশিষ্ট্য ও ঘটনা বৈচিত্র্যকে ও যৌন ও জন্মের তত্ত্বকে, বসন্ত ও শস্য কাটার অভিজ্ঞতাকে মৃত্যু ও মহামারীর চারদিক ঘিরে, এদের অনুসরণকারী আলো ও আঁধারকে জড়িয়ে, অকস্মাৎ প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশকে ও গোষ্ঠির রীতিনীতি এবং গোষ্ঠিপতির কর্তৃত্বকে কেন্দ্র ক'রে। ধর্ম ছিল পবিত্রতা ও ভীতি এবং হর্ষোচ্ছ্বাস ও আতঙ্কের এক পরিব্যস্ত অনুভূতি। উপাসনা, নৃত্য ও অনুষ্ঠানে এবং উৎসর্গ ও বিধিনিষেধের বন্ধনে এর প্রকাশ ঘটেছে, কেননা হোঁচট খাওয়া মানুষের মন তার ক্ষমতার সংকীর্ণ সীমানার ওপারে সর্বত্রই তখন অজানার বিপজ্জনক তীরে গিয়ে পৌঁছেছে। অজানার ব্যাখ্যা তখন বিদ্যার রূপ পেয়েছে এবং মানুষের অসহায়তার গোপন তত্ত্ব হয়েছে ক্ষমতা। পুরোহিতের জন্ম হল এবং তাঁর কর্তৃত্ব হয়ে উঠল অবিসম্পাদিত, কেননা কোন মানুষই তার উৎসের সন্ধান পায় নি বা তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। অনেক সময় পুরোহিত ও প্রধান হয়েছেন একই ব্যক্তি। আবার অনেক সময় একই অবিচ্ছিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে তাঁরা ছিলেন দু'টি শক্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্মকর্তারা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের অধীন থাকতেন। আবার কোন কোন জায়গায়

www.nagorikpathagar.org

পুরোহিতের ক্ষমতাই ছিল প্রভূত্বব্যঞ্জক। প্রথমটি দেখা গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে এবং দ্বিতীয়টির প্রকাশ ঘটে প্রাচীন ইজিপ্টে।

এ অবস্থা সীমাহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ পর্যায়ে এসে পোঁছেছে। কোন কোন সময় আমদানী হয়ে ও দেশের মাটি থেকে গজিয়ে ওঠা নতুন 'নেতরকারী' ধর্মের আগমনে এ অবস্থা পীড়িত হয়েছে, কেননা তার ফলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয়—রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐক্য আক্রান্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যে এমনি ভীষণ আক্রমণ হেনেছিল খৃষ্ট ধর্ম। নীচু স্তরের মানুষদের জন্য খৃষ্ট ধর্ম ঘোষণা করেছিল 'পরকালের আর এক সাম্রাজ্য' যেখানে তারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে থাকতে পারবে। এমনি সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্যসূত্র ভেতর থেকে ধ্বংসে পড়েছিল এবং সাধারণের ধর্ম তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত খ্রীস্ট ধর্ম যেখানে সরকারী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কার্যবিধি সম্বলিত দুটি সংঘ—রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীরণ এভাবে আর এক যুগ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। ফিগিস সত্যি বলেছেন যে, মধ্যযুগে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যবধান দুটি সংঘের মধ্যে যে ব্যবধান তার মত ছিল না, বরং তা ছিল একই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি ক্ষমতা হিসেবে স্বতন্ত্র। চার্চ ও রাষ্ট্র তখনও সংঘে রূপ নেয়নি যেখানে একই সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে উভয়ের কার্যপরিধি পরিব্যাপ্ত হ'তে পারত। বরং তারা ছিল দুটি কর্তৃত্ব—একটির শীর্ষে রয়েছেন পোপ ও অন্যটির শীর্ষে সম্রাট। তাদেরকে দুটি তরবারীর ন্যায়ও মনে করা যেতে পারে—একটি হ'ল আধ্যাত্মিক এবং অন্যটি জাগতিক, বা তাদেরকে বলা যায় দুটি স্তরীভূত কর্তৃপক্ষ—একদিকে যাজকবৃন্দ ও অন্যদিকে শাসকশ্রেণী। অনেক সময় তাদেরকে একই দেশের দুটি শ্রেণী হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। আজকে যেমন আমরা এর সমাধান দিতে পারি তখন তার তেমন কোন সহজ সমাধান ছিল না। ভিন্ন প্রকৃতির অথচ সমান দাবীর দু'শক্তির মধ্যে ছিল অস্বস্তিকর এক সমন্বয়। ইয়াশ্‌নিয়ান ও আর্মেনিয়ান জাতি এমন এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল যেমন কারো কোন দাবী ছিল না। নিজের আওতায় নয়, বরং অপরের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে চেয়েছিল প্রভুত্ব। রাজনৈতিক সরকারকে তার নিজস্ব শাসন বিভাগে পরিণত করতে চেয়েছিলেন যাজক শ্রেণী। সরকার ও চার্চের প্রধান হ'তে চাইত। এদিক থেকে বলা যায় যে, 'হোলি রোমান

www.nagorikpathagar.org

এম্পায়ার' (পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) ছিল মিথ্যাদাবীর এক বোঝাপড়া ও অর্থহীন এক সমাধান স্বরূপ। যখন রাষ্ট্রের স্বৈরাচারিতা পশ্চিম ইউরোপ জয়যুক্ত হয় তখন সে বোঝাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর মূলেল ছিল একটির হাতে অন্যটির মিথ্যা দাবীর পরাজয়। রাজার নেতৃত্বে চার্চের প্রতিষ্ঠা হ'ল। একটি সংঘের স্ব-শাসনের চাইতেও এ হ'ল অনেক নীচু। এখন থেকে দুটি তরবারীই রাষ্ট্রের হাতে শোভা পেতে লাগল।

রেনেসাঁ একনায়কত্ববাদ নতুন এক অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। এর ফলে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আচরণ না করলে তা হোত বিদ্রোহ। অধর্মাচরণ ব'লে তা গণ্য করা হ'ত না। ধর্মকে জাতীয়করণ করা হ'ল এবং 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের' মধ্যযুগীয় আদর্শে আশীর্বাদ-পুষ্ট জাতিকে পরিচালিত করা জাতীয় দেবতার হিব্রু আদর্শে পরিণত হ'ল। সৌভাগ্যবশতঃ বহু ধর্মের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয়ভাব প্রকাশিত হবার ফলে বিশিষ্ট কোন জাতি ও কোন ধর্মের সাথে একাত্মবোধ গ'ড়ে ওঠেনি। ক্রমবর্ধমান ধর্মনীতির প্রতি অবিশ্বাসীদের ঘিরে বা অপ্রতিষ্ঠিত ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে রাজনৈতিকদল গ'ড়ে উঠতে লাগল এবং ফলে ধর্মের আধিপত্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের 'প্রেসবাইটেরিয়ান', 'ইনডিপেনডেন্ট', 'হাইচার্চ পাইটর' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের ক্ষমতার জন্য 'আধা-রাজনৈতিক' ও 'আধা-ধর্মীয় ভিত্তিতে' আংশিক সহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য এ সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুসারী বা বিরোধী মতকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে। ইংলণ্ডে 'ধর্মমত বিরোধীদের সহ্য করা হত, রোমান ক্যাথলিক, 'এ্যানাব্যাপটিষ্ট', ইহুদী ও 'কোয়েকারদের' সহ্য করা হ'ত না, যদিও অবশ্য নাস্তিক ও অবিশ্বাসীরা ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক অভিশপ্ত।

ধর্ম সহিষ্ণুতার বিকাশধারা ছিল অত্যন্ত মন্থর। অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত চার্চের সম্মান ও সংহতির জন্য সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য সহিষ্ণুতার মনোভাব ব্যাহত হয়। প্রতিষ্ঠানের অনুসারীরা তখনও ধর্মমতকে রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে ও রাজনৈতিক সংবিধানের প্রয়োজনীয় এক উপাদান হিসেবে গণ্য করত। বস্তুত বার্ক তাকে 'তাঁদের সমগ্র সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন যার

www.nagorikpathagar.org

সাথে তাদের রয়েছে অচ্ছেদ্য এক বন্ধন।' ইংলণ্ডে 'টেষ্ট ও করপোরেশন' আইনগুলো নাগরিকত্বের সাথে ধর্মের বন্ধনকে সমর্থন করে। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের 'ধর্মমত সহিষ্ণুতা আইন' অবশ্য চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠায় আরও একধাপ অগ্রসর হয়, কেননা এক্ষেত্রে আনুগত্যের শপথ ও প্রাধান্যের স্বীকৃতিই ছিল একমাত্র মানদণ্ড।

কিন্তু এ শপথগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রকাশ ছিল না, কেননা তাদের মধ্যেও কিছু কিছু ধর্মীয় উপাদান নিহিত থাকতেন। 'নাস্তিকরা তখনও ছিল আইনের আওতা বহির্ভূত। রাষ্ট্রের 'নৈতিক ধর্মীয়' ঐক্যের মূলে ছিল ধর্মমত সহিষ্ণুতা, এবং প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুসারীরা যেমন তা মেনে চলত, তেমনি মানত ভিন্ন মতাবলম্বীরা। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছিল শুধু উপাসনার পদ্ধতিও চার্চ ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র ক'রে। এ প্রসংগে এটাও বলা চলে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছিল একদিকে যেমন ধর্মমত অসহিষ্ণুতার ফলে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রের স্বৈরাচারিতার জন্য। রুশো বলেছেন—যাদেরকে আমরা মহাপাতক ব'লে জানি তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করা অসম্ভব।'

স্বাধীনতা আপন আলোকে প্রকাশিত হবার পূর্বে ধর্মীয়ভাব এবং রাষ্ট্রীয় মতবাদে প্রচুর পরিবর্তন সূচীত হয়েছিল। অন্য কথায়, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুসমঞ্জস পার্থক্য হবার পরেই স্বাধীনতা আপন মহিমায় প্রকাশিত হয়। এর মূলে দুটি প্রভাব কাজ করেছে। তাদের একটি হ'ল ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এক নতুন ও ব্যক্তিগত গভীর ধর্মভাবের উদয়। তাঁদের নিকট ধর্মের মর্মবাণী ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মত। ফলে তাদের নিকট চার্চ হয়ে ওঠে সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্মিলিত বিশ্বাসীদের এক সংঘ স্বরূপ। বহু ধর্মমতে বিশ্বাসী জনগণের সম্প্রদায়ে এ মতবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত চার্চে ও প্রভাব বিস্তার করে প্রচুর। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত চার্চের নিকট ভিন্ন মতাবলম্বীদের বহু মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু চার্চের এ সংঘমূলক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে তাঁদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার সমাধানের উপায় খুঁজে পেলেন। ইংরেজ রোমান ক্যাথিলিকরাও এ অবস্থাকে মেনে নেয় কারণ তারাও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের চার্চের যে কোন দাবী অস্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে জার্মানীতেও রাষ্ট্র তার এলাকার বাইরের কোন কর্তৃত্বের দাবী মানতে অস্বীকার করে। ফলে সেখানেও ক্যাথলিকরা চার্চকে সংঘের পর্যায়ে

www.nagorikpathagar.org

নামিয়ে নিয়ে ভাবতে শুরু করে। ক্যাথলিক উইণ্ডথষ্ট প্রেসবাইটেরিয়ান নক্সের ভাষায় যথাযথক্ষেত্রে ধর্মের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন।

আর একটি প্রভাব যা চার্চকে সংঘের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করে তা ছিল ভিন্ন চরিত্রের। এটা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার তথা জনগণের উপর ধর্মীয় প্রভাবের হ্রাস। যখন বহু সংখ্যক নাগরিক নিজদেরকে কোন চার্চের সাথে এক ক'রে আর ভাবল না তখন চার্চ যে নাগরিকত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ বা ধর্ম যে রাষ্ট্রের অংশ স্বরূপ—এ দাবীর গুরুত্ব কমে এল। এভাবে কার্যতঃ চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং রাষ্ট্র যে একসাথে বিশ্বজনীন ও সীমিত হ'তে পারে তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। রাষ্ট্র হ'ল বিশ্বজনীন এ অর্থে যে, তার ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন হ'ল বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্র সীমিত হ'ল এ অর্থে যে সকল মানবীয় স্বার্থের নির্দেশনায় রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকরী রইল না। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতায় চার্চের স্বতন্ত্র প্রথম আঘাত হানল। রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার জন্য দরকার ছিল সার্বজনীন এক ধর্মের। ফরাসী বিপ্লবের স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্রেও এর আলোক দেখা যায়, কেননা এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ধর্মের আইন রচনা করা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সংঘের সঠিক মতবাদ গ'ড়ে না ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাবজনীন ধর্মও নিজেকে হারিয়ে ফেলে অথবা তা অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়।

আমাদের বতমান সভ্যতায় চার্চ ও রাষ্ট্রের সঠিক স্থান নির্ধারিত হয়েছে। স্ট্যান হোপের কথা সত্য হয়েছে। তিনি বলেছেন—এমন এক সময় ছিল যখন ভিন্ন মতাবলম্বী ও ক্যাথলিকরা আশীর্বাদ রূপে ধর্মমত সহিষ্ণুতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আজকে তারা তাকে অধিকার হিসেবে চান। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তাকে তারা অপমান সূচক মনে ক'রে ঘৃণা করবে।' প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধানে এটা ঘোষণা করা হয়, বা সর্বত্র এটা মনে রাখা হয় যে, নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ধর্মের জন্য বা ধর্মহীনতার জন্য কেহ কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম পালন করতে বা যে কোন উপাসনা সম্পন্ন করতে পারবে। ইংলণ্ডের মত কোন কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত চার্চের অবশিষ্টাংশ এখনও নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত চার্চের উচ্চপদস্থ যাজকগণের নিয়োগ আজও সরকারের মর্জির উপর নিভরশীল, এবং এর ফলে তারা দ্বিতীয় কক্ষে আসনও লাভ করেন। তাছাড়াও রয়েছে পুরোনো দিনের ঈশ্বর নিন্দা প্রতিরোধ আইন' এবং 'বিশ্রামদিন সংক্রান্ত আইন' যা আজও কার্যকরী রয়েছে। কানাডায় এ আইন এখনও পালিত হয়।[১] এসব উদাহরণ প্রাচীন ব্যবহার অবশিষ্টাংশ মাত্র, এবং আধুনিক রাষ্ট্রের সাধারণ প্রবণতার সাথে এদের তেমন মিল নেই। আধুনিক অবস্থার প্রাচীনতম স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের বেলজিয়াম সংবিধানে। এমনি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল— 'যে কোন ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানে, বা এজন্য ছুটির দিন হিসেবে মেনে চলবার জন্য কোন লোককে বাধ্য করা হবে না।' তাছাড়াও বলা হয় যে, "যে কোন ধর্মের কোন কর্মকতা নিয়োগে বা কোন কর্মকর্তার অভিষেক অনুষ্ঠানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না"।[১]

চার্চের স্ব-নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র রয়েছে এবং তা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র—এ নীতি একবার গৃহীত হলেও এখনও তাদের সীমারেখা নির্ধারণের সূক্ষ্মতর সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। চার্চের পক্ষে এটা স্পষ্ট যে, বা কোন অনিচ্ছুক লোকের উপর ধর্মনীতির প্রয়োগকে ঘৃণা করে, অথবা যে কোন পরিস্থিতিতে কোন সদস্যের উপর জোর-

---

১। সাতদিনের মধ্যে একটিকে বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত করা বা রবিবারকে সবচেয়ে সুবিধাজনক দিন হিসেবে পছন্দ করাটাই কিন্তু 'বিশ্রামগ্রহণ সম্বন্ধীয় আইনের সবটুকু নয়। সামাজিক প্রয়োজনবোধ বা ধর্মীয় বিশ্বাস কিভাবে আইনপ্রণয়নকে প্রভাবিত করে এটা তার উপর নির্ভর করে। কানাডায় এমনি একটি আইন প্রেরণা লাভ করেছে 'চতুর্থ নির্দেশ' (*Fourth Commandment*) থেকে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন থেকে তা উদ্ভূত হয়নি। যে কঠোর ভাবে তার প্রয়োগ হয় তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'প্রভুর দিনের সহযোগী' (*Lord Der Alliance*) নামে যে কতকগুলো আইন আছে তাই এসব আইনকে সংরক্ষণ করে। এ মনোভাব রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আর এক ধর্মমতবাদের অনুসারীরা রবিবারের বদলে শনিবারের এক অংশকে ছুটির দিন হিসেবে মেনে চলে, যদিও একই রাষ্ট্রের নাগরিক তারা।

১। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের ১৫ ও ১৬ নং ধারা।

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগ নীতিকে বা কোন রাজনৈতিক অধিকার অপহরণকে বা অন্য কোন শাস্তিকে ঘৃণা করে, তবে ধর্মমত প্রত্যাখানের শাস্তিস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চার্চের কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেয়া হয় বা কোন পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয় বা অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তা হ'লে আপত্তির কিছু থাকে না। কিন্তু চার্চ অনেক দেশে শিক্ষা, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ইচ্ছাপত্র ও অন্যান্য বিষয়ে একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছে ও এটা পর্যন্ত তা বজায় রেখেছে, যদিও এসব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। তবে যেহেতু নিজের সদস্যদের সম্পর্কে চার্চের অধিকার রয়েছে, তাই অন্য চার্চের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দানের ক্ষেত্রে কোন চার্চের বিশেষ অধিকার থাকা উচিত নয়। বিবাহ অনুষ্ঠান ও একটা ভাল দৃষ্টান্ত। চার্চ তার নিজের সদস্যদের ক্ষেত্রে বিবাহ উৎসবের প্রয়োজন অনুভব করে, কিন্তু এ বিষয়ে বিবাহ-চুক্তির পৌর-শর্তাবলী ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোন দায়িত্ব থাকা উচিত নয়। সুতরাং বিবাহ চুক্তির শর্ত হিসেবে আচার অনুষ্ঠান পরিচালনার কোনরূপ দায়িত্ব চার্চের থাকা উচিত নয়, যদিও তার সদস্য হিসেবে তাদের নিকট থেকে চার্চ যে কোন আচার অনুষ্ঠানও দাবী করতে পারে। চার্চ তার সদস্যপদের শর্ত হিসেবে বিবাহের কতকগুলো নিয়ম নিষিদ্ধ করতে পারে। তবে সেগুলো কোন ক্রমে যেন বিবাহের বৈধতা অস্বীকার না করে বা তা নাকচ না করে দেয়, কেননা রাষ্ট্র সেগুলো দাবী করতে পারে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের মধ্যে চার্চ সামাজিক ক্ষেত্রে এমন নিয়ম কানুন শেখাতে পারে বা প্রচার করতে পারে যা শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতির জন্য তা সমর্থন করে না। অন্যদিকে, চার্চ যদি ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনিচ্ছুক সদস্যদের অংশের উপর কোন নীতি চাপিয়ে দেবার জন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন আইন করে তবে চার্চ তার সীমা লঙ্ঘন করবে। সামাজিক নীতির ভিত্তিতে অবশ্য চার্চ যে দাবী পেশ করতে পারে যদি সে নীতির সাথে সংখ্যাগুরু একমত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকা উচিত তা ফিগিস ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দর ভাবে।[১] চার্চ তার সদস্যপদের শর্ত হিসেবে যে কোন সদস্যের বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনগত অধিকার অস্বীকার করতে পারে, তবে যারা চার্চের সে নীতিতে বিশ্বাসী

১। '*Churches in the Modern State*' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

নয় তাদের ক্ষেত্রে চার্চ কোনক্রমে সে অধিকার প্রত্যাখ্যানের কথা বলতে পারে না। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের 'ইংলিশ এ্যাক্ট' রহিতকরণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যাজকদের প্রতি বলেন: "তাঁরা সোজাভাবে এ দাবী তুলেছেন যে, চার্চের নীতিতে যারা বিশ্বাস করে না তাদের উপর ও চার্চের নীতিবোধ চাপিয়ে দেয়া হোক পিউরিট্যান বা মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চার্চের এসব দাবী নীতিগতভাবে প্রয়োগ যোগ্য হ'লেও কার্যত: তা হবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য জন নক্সের প্রস্তাবের মত অবাস্তব।'

শিক্ষাক্ষেত্রে আরও জটিল সমস্যার আমরা সম্মুখীন হই। কতকগুলো ব্যাপারের জন্য। এ সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি হ'ল চার্চ পরিচালিত কতকগুলো স্কুল ও কলেজের অবস্থিতি, দ্বিতীয়টি হ'ল অনেক রাষ্ট্রে স্কুলে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে বাইবেল পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্তি, তৃতীয় হ'ল—প্রাথমিক শিক্ষার নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা বা অংশত: ধর্মীয় শিক্ষার সাথে এক ক'রে দেখা হয় ও অংশত যা ধর্মীয় শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং সর্বশেষটি হ'ল— ইতিহাসের মত কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে ধর্মীয় প্রভাবের গতিধারা পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট প্রভাব গড়ে। এসবদিকে রাষ্ট্রের জন্য যা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ও যা রাষ্ট্রের প্রকৃতির সাথে একান্ত সংগতিপূর্ণ তা হ'ল রাষ্ট্রীয় শিক্ষায়তনে ছাত্রদের ধর্মীয় নির্দেশকে সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা। যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে অবশ্য এনীতিই গৃহীত হয়েছে যদিও দু'দেশে ধর্মীয় নীতি বিকাশের ধারা হ'ল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে রাষ্ট্রের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন ও সংগতি নয়, তবে তা ছাত্রের অভিভাবক ও চার্চের উপর দেওয়াই ভাল। আধুনিক সম্প্রদায় কোনরূপ সর্বজন স্বীকৃত ধর্মীয় নীতি দেখা যায় না, আর যদি তা থেকেও থাকে, তবে এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন অধিকার বা দায়িত্ব নেই। শিক্ষক নির্বাচনেও শিক্ষকের বিশিষ্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাহীনতা প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। যে সব শিক্ষায়তন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের উচিত নয় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ নজর দেয়া। রাষ্ট্র যা করতে পারে তা হলে সে সকল শিক্ষায়তনে শিক্ষার যথার্থমান বজায় আছে কি না তা দেখা।

www.nagorikpathagar.org

এক কথায়, সঠিক নীতি গ্রহণ করলে রাষ্ট্র চার্চের উপর তার সঠিক ধর্মীয় কাজকর্ম ছেড়ে দেবে, কিন্তু পৌর বা রাজনৈতিক প্রকৃতির কোন পদের নিয়ন্ত্রণভার তার হাতে তুলে দেবে না। সম্প্রদায়ের কোন বিধি বা সরকারের কোন আইন চার্চ ভঙ্গ করলে অন্য কোন অন্যায়কারীর মত চার্চের ও বিহিত করা উচিত। 'মরমন' চার্চের আগের রীতি এখানে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিধিবিধানের মধ্যে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ থেকে গৃহীত কোন নির্দেশ বা উপদেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় বা জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরের কোন নীতিও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। ক্লাব বা ব্যবসায়ী সংঘ বা শিল্প সংক্রান্ত কোন কলেজের মত অন্যান্য সমিতির সাথে রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক চার্চের সাথেও থাকবে তেমনি সম্পর্ক। এদের সামগ্রিক যে প্রভাব রয়েছে তার ফলে তারা সমাজের সাধারণ ব্যবস্থার অধীনে এসে পড়বে। তারা চুক্তি করে ও সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে। চার্চের কোন সম্পত্তিদানের বিষয় থাকলে বাহ্যিক দিক দিয়ে তাও রাষ্ট্রের আওতাধীন এসে যায়। রাষ্ট্রকে তখন সে ধর্মের বিষয়ে অভিভাবকত্ব করতে হয়, অবশ্য তখন রাষ্ট্র তাঁকে ধর্ম হিসেবে দেখে না, বরং দেখে অর্পণের শর্ত হিসেবে। যখন সম্পত্তির হস্তান্তর বিষয়ে চার্চের অভ্যন্তরে কোন দ্বিমত দেখা দেয় তখন সাধারণ মালিকানায় বিভিন্ন দাবীকারের স্বত্ব নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রকে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। আবার যদি দুটি চার্চের মিলন হয় এবং একটি বা উভয় চার্চেরই কোন সংখ্যালঘু দল চার্চের মতবাদের সঠিক রক্ষক হিসেবে দাবী জানালে রাষ্ট্রকে তখন যে মতবাদের পর্যালোচনা করতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রেও রাষ্ট্র তাকে তত্ত্বের পর্যালোচনা হিসেবে না নিয়ে তাকে দাতব্য-কর্মের শর্ত হিসাবে গ্রহণ করে। যখন চার্চ বিপর্যস্ত হয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতি বা অপপ্রয়োগ ব্যতীত তার সম্পদকে জনহিতকর কাজে অর্পন করতে পারবে না এমনি কোন চরম অবস্থার উৎপত্তি হ'লে রাষ্ট্র তার সীমালঙ্ঘন না করেই চার্চকে তার উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রত্যর্পণ করতে হুকুম দিতে পারে, কেননা সে সম্পদ সম্প্রদায়ের জীবন ব্যবস্থা থেকেই অর্জন করা হয়েছে। কোন চার্চে আবার দ্বিধাবিভক্তি ঘটলেও রাষ্ট্র চার্চের সম্পদকে ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে পারে। যখন স্কটল্যাণ্ডের ফ্রি চার্চের সংখ্যালঘু অংশ ইউনাইটেড প্রেস্‌বাইটেরিয়ান চার্চের সাথে সংযুক্তির প্রশ্নে সংখ্যাগুরুর সাথে একমত হয়নি, বা যখন কানাডার প্রেসবাইটেরিয়ান

www.nagorikpathagar.org

চার্চের একাংশ অন্য দুটো প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্থার সাথে একত্রিত হবার প্রশ্নে অন্য অংশের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে তখন এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব ঘটনা বিচারবিভাগের উপর কঠিন এক দায়িত্ব ন্যস্ত করে।[১] কোন একটি বিশেষ চার্চের পরিচিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও হ'তে পারে এবং সেজন্য রাষ্ট্রকে তার তত্ত্ব ও সংবিধান পরীক্ষা করতেও হ'তে পারে। তখন রাষ্ট্রকে ধর্মতত্ত্বের বিবর্তন ও সে তত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যুক্তিযুক্ত পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। এর ফলে সে দাতব্য বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণে তার অধিকার বিনষ্ট হয়েছে। চার্চ সংস্থার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সদস্যদের পক্ষে এ সম্পত্তিগুলোর জিম্মাদার হিসেবে এতদিন কাজ করছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়ের আওতার বাইরে থেকে যায়। এখানে রাষ্ট্রকে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে 'কোন সমিতির অধিকার' নির্ধারণের সাধারণ নীতিগুলো প্রয়োগ করতে হয় এমন এক বিষয়ে যেখানে এ অধিকার নির্দিষ্ট ধর্মীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করার উপর নির্ভর করবে। এ সব বিষয়ে রাষ্ট্রের সমস্যা হল কোন সমিতির পরিচয় বা তার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের সমস্যা। যে সকল ধর্মীয় প্রশ্নে দাবীদারের মতপার্থক্য হয় তার সাথে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকে না।

নির্দিষ্ট কাজকর্মের বিভক্তিকরণ ছাড়াও রাষ্ট্রের আর একটি সমস্যা এখানে দেখা দেয় যার বিচার বিবেচনার ফলে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র হ'ল একটি সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী সংগঠন। রাষ্ট্র সুশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টির জন্য রয়েছে, কারণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাই হ'ল জীবনের সকল সম্ভাবনার ভিত্তি পত্তনের জন্য উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলা এখানে প্রাসঙ্গিক। একটা গভীর প্রত্যয়, একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগী ও একটা জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রয়োজন। ব্যাপক ভিত্তিতে তা প্রভাব বিস্তার করবে। যদি তার জীবনের মৌখিক বিষয়গুলো সম্পর্কে রাষ্ট্র চার্চকে ছেড়ে দেয় তবে কি চার্চও তেমনিভাবে রাষ্ট্রকে

১। বিখ্যাত 'ফ্রি চার্চ মামলায়' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের আপীল মামলায় লর্ড সভার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে এ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এ মামলায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ফ্রি চার্চ কোন মতবাদ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে সক্ষম হবে না। এ কঠোর নীতির ফলে চার্চের মধ্যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা বড় শক্ত হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশতঃ পরবর্তী আইন প্রণয়নের ফলে এর ফলাফল পরিবর্তিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

ছেড়ে দেবে? এক অর্থে তা সম্ভব নয়, কেননা স্বেচ্ছাকৃত প্রবণতা ব্যতীত এমন কোন জীবনবোধ নেই যার প্রতি মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে। অন্য অর্থে তাই কিন্তু হওয়া উচিত। এখানে শুধু ধরা বাঁধা সীমারেখার প্রশ্নই জড়িত নয়, বরং রয়েছে এক বিবেচনার প্রশ্ন বা একটা সাংস্কৃতিক সংঘকে তার মূল্যবোধ ও সেবার কার্যপদ্ধতি সংরক্ষণে সাহায্য করবে। অবশ্য এ গুণটিও হ্রাস পেতে থাকে যখন কোন চার্চ একটা রাজনৈতিক দলের সংযুক্ত হয়ে পড়ে বা তার প্রচারবেদীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'তে দেয়।

অবশ্য কোন ধর্মমত অনুসরণ করলে তার অনুসারীরা কোন কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থন করে, কিন্তু তখন তারা তা করে নাগরিক হিসেবে, চার্চের অনুসারী রূপে নয়। চার্চেরও উচিত তাদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া, কোন রাজনৈতিক দলের বিঘোষিত কোন নীতিকে সমর্থন নয় যদিও তা তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্মীয় নীতি অনুসারে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে প্রেম হ'ল বহু মূল্যবান। সুতরাং তাদের উচিত দিল ভার্সাই সন্ধিচুক্তিকে নিন্দা না ক'রে প্রতিহিংসার মনোভাবকে নিন্দা করা। তা না হ'লে, অতীতে যেমনটি হয়েছে, চার্চ রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ছটফট করবে এবং তার ফলে তাদের নৈতিক কাজকর্মের বিকৃতি ঘটবে। অপর পক্ষে, জাতীয় জীবনের কোন সঙ্কটের ফলে যদি চার্চ তাদের নীতি থেকে বিচ্যুত হয় তবে তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করবে! মহাযুদ্ধের সময় প্রায় সকল দেশেই চার্চ তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় নীতি পরিত্যাগ করে ও তাদের ধর্মকে জাতীয়তার অন্ধ উন্মাদনায় রূপান্তরিত হয়ে পৌর সংগঠনের আকার ধারণ করে।

চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে তুলে ধরবার জন্য নয়, বরং যে পরিস্থিতিতে একটা মহান সংঘের স্বায়ত্বশাসনের পরিবেশ নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য। যে সব সংঘের কাজকর্ম হ'ল সাংস্কৃতিক বিকাশ তাদের বেলায়ও এটা বেশ খাটে। তবে যেহেতু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও অনুরূপ বিষয় ধর্মের ন্যায় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়নি এবং ধর্মের ন্যায় এরা তত বেশী

www.nagorikpathagar.org

অসুবিধার ভেতর দিয়ে মুক্তিলাভ করেনি। তাই এদের তেমন দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের ছাত্রদের জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরিবার। পরিবার হ'ল আয়তনে সবচেয়ে সীমিত এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী। সাথে সাথে এটি হ'ল সবচেয়ে বেশী আন্তরিকতাপূর্ণ এবং স্বার্থ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সবচেয়ে ব্যাপক। যে কোন আকারে পরিবার হ'ল সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে রয়েছে সব চেয়ে কম নিয়মনিষ্ঠ সংগঠন এবং সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা। এদিক দিয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের ফলে এর বিকাশ ও জীবনধারা খুবই কম প্রভাবিত হয়েছে। খ্যাতনামা দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র প্লেটো রাজনৈতিক ও পৌর প্রতিষ্ঠানে পরিবারের অন্তর্ভুক্তির সোপারেশ করেন। অবশ্য যে ধরণের কাজের জন্য তার প্রকৃতি এর ঠিক উল্টো। পরিবারের বাহ্যিক পরিবেশের উপর রাষ্ট্র কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে, যেমন 'এক স্বামী এক স্ত্রী' ধরণের সংগঠন সগোত্রতার সীমারেখা নির্ধরণ ক'রে বিশেষ এক পর্যায়ে বিবাদ নিষিদ্ধকরণ, বিবাদ বিচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তরাধিকার প্রশ্নে কিছু কিছু শর্ত আরোপ। কয়েকটি রাষ্ট্রে বিবাদের শর্ত হিসেবে স্বাস্থ্যরক্ষার কিছু কিছু প্রয়োজনের উপরও জোর দেয়া হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে শিশুদের সংরক্ষণ ও যত্ন এবং প্রায় সম্ভাব্য বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা প্রতিও নজর দেয়া হয়েছে। যেখানে পরিবার শিশুদের প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় সেখানে রাষ্ট্র সাধারণতঃ কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের পরিবর্ত হিসেবে তাদেরকে গণ্য করা হয় না। এটাও সর্বসম্মত এক নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে যে, রাষ্ট্র এসব শিশুদের যত্ন নেবার সময় পারত পক্ষে তাদের কাছে পারিবারিক জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করবে, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যারাক বা বৃহৎ কোন অনাথ আশ্রমে না রেখে সযত্ন তত্বাবধানে তাদেরকে বাড়ীতে রাখবে। হাসপাতাল, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা, জীবন বীমা পরিকল্পনা ও অন্যান্য অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকে রাষ্ট্র ঐসব দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে চাচ্ছে যা অতীতে 'আত্মীয়গোষ্ঠী' দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতিতে ঐ সব 'আত্মীয়গোষ্ঠী' আজ নিশ্চিহ্ন প্রায়। কিন্তু পরিবার তার মৌলিক কার্যাবলীর প্রায় সবগুলোই

www.nagorikpathagar.org

সম্পন্ন করে বলেছে, এবং 'আত্মীয়তার' সাথে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও বৃহত্তর সমাজে হস্তান্তরিত বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের ভার লাঘব হওয়ায় আজকাল পরিবারের আর তেমন বোঝাও নেই। রাষ্ট্র এসব কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে বা নিজ হাতে তুলে নেবে এমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া, এটাও লক্ষ্য করবার মত বিষয় যে, সম্প্রদায়ের চলতি প্রবণতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে, তবে সেগুলো বাঁধনহারা বিভিন্ন পথে ধাবিত হতে থাকবে এবং তার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সুতরাং চার্চ ও পরিবারের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে আমরা সাধারণভাবে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রত্যেকটি মহান সংঘের এক আভ্যন্তরীণ জীবন রয়েছে এবং তা রাষ্ট্রের ন্যায় মোটামুটি স্বায়ত্বশাসিত। রাষ্ট্র শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক গুণাবলী এবং চুক্তি ও সম্পত্তির মত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে সামাজিক ব্যবস্থার সঠিক স্বরূপ বিকাশ লাভ করতে পারে ও অক্ষত থাকে; কেননা তারই মধ্যে সকলকে থাকতে হবে। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কার্যকলাপ কি, তার আলোচনায় এ সবই আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে।

তিন: রাষ্ট্রের কার্যকলাপ:

সার্থক দার্শনিকই শুধু নয়, বরং সব মানুষই বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রের কতকগুলো যুক্তিযুক্ত করণীয় রয়েছে। তাছাড়া, সকলে এটাও বিশ্বাস করেন যে, কতকগুলো কাজ থেকে রাষ্ট্রের বিরত থাকা উচিত। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের ব্যাপারে কখন তার হস্তক্ষেপ করা উচিত ও কখন উচিত নয়, এ যেমন নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর; তেমনি রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী লোকেরা জনগণের বিষয়টি রাষ্ট্রের বিচার-বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে ছেড়েই ক্ষান্ত। সীমিত রাষ্ট্রের মতবাদে অবশ্য আমরা এ ব্যবধানের এক নিশ্চিত ভিত্তি পেতে পারি। সম্প্রদায়ের একটি অংগ হিসেবে রাষ্ট্র যা করতে পারে, রাষ্ট্রের তাই করা উচিত। আসলে রাষ্ট্র কোন্ কোন্ সেবা দিতে পারে, তার তাই দেয়া উচিত। আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তাতেই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় আওতার কার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্বের অধ্যায়ে এ আলোচনা হয়েছে এবং রাজনীতি বহির্ভূত সংগঠনগুলোর ঐতিহাসিক

—১১

www.nagorikpathagar.org

বিকাশের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং বেশী ভূমিকা না করেই আমরা রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট কার্যকলাপ কি, তার আলোচনায় আসতে পারি।

এভাবে নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের আওতার অন্তর্ভুক্ত হ'ল সংক্ষেপে সামাজিক জীবনের বাহ্যিক অবস্থা, যা মানবের ইপ্সিত লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বজনীন প্রকৃতির। রাষ্ট্রকে সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় একটা সংস্থারূপে যদি আমরা তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করি এবং তাকে দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতার প্রতীকরূপে গণ্য না ক'রে যদি রাষ্ট্রকে 'সেবার একরূপ' হিসেবে দেখি, তা'হলে তার সেবাদানের দক্ষতার সীমারেখা নিয়ে কিছু কিছু মত-পার্থক্য হ'তে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ও সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের বৈধতা নিয়ে আলোচনা না ক'রে বরং রাজনৈতিক পদ্ধতির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিয়ে ও কি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কি কি ফল পাওয়া যাবে, এ প্রশ্নে রয়েছে তাদের মতবিরোধ; কিন্তু ফলাফলের বাঞ্ছনীয়তা নিয়ে তেমন কোন বিরোধ নেই। রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে আমরা নির্দিষ্ট রূপে পেশ করতে পারি; কেননা যাঁরা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখেন, তাঁরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামান না; বরং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সীমারেখা নিয়েই তাদের মাথা ব্যথা।

ঐতিহ্যগত দিক থেকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক রয়েছে, এবং শৃঙ্খলা রক্ষা হ'ল রাষ্ট্রের একটা মৌলিক দায়িত্ব। নিজের সীমানার মধ্যে সার্বজনীন এক সুশৃঙ্খল অবস্থা বজায় রাখা রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট এক কাজ এবং সব যুগে সব আমলে তাই হয়েছে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ। কি গণতন্ত্রে, কি স্বৈরতন্ত্রে, কি সাম্রাজ্যে, কি যুক্তরাষ্ট্রে, সর্বরূপে দেখা যায় রাষ্ট্র এ কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু সুশৃঙ্খল অবস্থার অবয়ব সর্বদা প্রভাবশালী উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে জীবজন্তুর খোঁয়াড়ে থাকে এক রকম শৃঙ্খলা, জেলখানায় থাকে আরেক রকম, সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাবোধ ভিন্ন, শিক্ষায়তনে থাকে অন্য ধরনের শৃংখলা ব্যবস্থা। আবার শ্রেণীবিশিষ্ট রাষ্ট্রে থাকে এক রকম শৃংখলা ও গণতন্ত্রে থাকে আর এক রকম ব্যবস্থা। দমনমূলক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সেবামূলক রাষ্ট্রের ধারণায় আমরা চলে এলে শৃংখলাবোধের মতবাদ পরিবর্তন হ'তে থাকে। আধিপত্যের শর্ত হিসেবে শৃঙ্খলাবোধ তখন সাধারণ মঙ্গলের শর্তে রূপলাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শৃংখলা রক্ষাই হ'ল রাষ্ট্রের প্রথম কাজ। নিঃসন্দেহে সামাজিক ব্যবস্থার বৃহত্তর এক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র কোন কাজ করে না। যেমন—প্রথার ক্ষেত্রে, বা নৈতিকতার ক্ষেত্রে, বা ব্যবসায়ের রীতিনীতির ক্ষেত্রে বা বিশেষ সংঘের ব্যবস্থাপনায়। রাষ্ট্র যে জীবনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, তা হ'ল সার্বজনীন সুসমঞ্জস শৃঙ্খলাবোধ যা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। অথবা যা এত প্রয়োজনীয় যে, সম্প্রদায় রাষ্ট্রকে তা কার্যকর করতে ক্ষমতা দিয়েছে। এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হ'ল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমানির্ধারণ; যেসব অধিকার ও দায়িত্ব কার্যকর বলে স্বীকৃত হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠাও স্পষ্ট বিধিবদ্ধকরণ। তাছাড়া, সমাজে স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যেসব প্রথাগত বিধি রয়েছে, সেগুলোকে এক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত করাই হবে বাঞ্ছনীয়। মানুষ যাতে একে অপরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে বাস করতে পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা, সুন্দরভাবে গণসংযোগ পরিচালনা করা, যাতে সকলের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস যেন তাদের যথাযথ স্থানে সঠিক দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষে এ সব কাজ সম্পাদনের জন্য বলপ্রয়োগের মাত্রা যেন ক'মে আসে, সে উদ্দেশ্যে সব কিছুকে নিজের দায়িত্বে টেনে নেয়াই হ'ল প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। সভ্যতা যন্ত্রের প্রদেশপাল হ'ল রাষ্ট্র।

কিন্তু এ অর্থে বোধগম্য শৃঙ্খলা হচ্ছে, এক বৃহত্তর দায়িত্বের অংশ বিশেষ। সম্প্রদায়ের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের যৌক্তিকতা হ'ল, সে কতটুকু সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটায়। শৃঙ্খলার রক্ষার জন্যই শৃঙ্খলা অর্থপূর্ণ হয় না; বরং তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি সে শৃঙ্খলা 'সংরক্ষণ', 'স্থায়িত্ব বিধান' ও 'বিকাশের' জন্য প্রযোজ্য হয়। আইন ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিহিত যে সার্বজনীন উদ্বেগ তাদের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে, এ শব্দ কটির মধ্যে পূর্ণ ব্যাখ্যা ব্যতীত 'শৃঙ্খলা' হ'ল ভয়ঙ্কর এক শব্দ। তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার অর্থ হ'ল রাষ্ট্রকে 'পুলিশী সংগঠনে' রূপান্তরিত করা এবং তখন রাষ্ট্র ও প্রদর্শনীর জন্য বন্য পশুদের খোঁয়াড়ের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। যে শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের সেবায় নিয়োজিত হবে, তাকে হ'তে হবে সম্প্রদায়ের আদর্শের অনুসারী ও জীবনাদর্শে

www.nagorikpathagar.org

সীমিত, এবং বিশেষ ক'রে তাকে 'ন্যায়বিচার' ও 'স্বাধীনতার' আদর্শে প্রসারিত হতে হবে। শৃঙ্খলাবোধের আসল রাজনৈতিক ধারণা সংরক্ষণের ধারণায় রূপান্তরিত হ'তে হবে. এটা হ'ল রাষ্ট্রের এক বিরাট দায়িত্ব এবং তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য এটা এখনও অনেকাংশে অপূর্ণ রয়ে গেছে। শক্তিশালীদের পরিবর্তে দুর্বলদের রক্ষা করাই হয়েছে মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের আধুনিক ব্যাখ্যা। এ রক্ষাব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সর্বনিম্ন জীবনমান প্রতিষ্ঠায় রূপ পাচ্ছে; কেননা তার ফলে স্বাস্থ্য ও ভদ্রতার প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে সম্প্রদায়ের কোন সদস্য বঞ্চিত হয় না; যদিও তার কারণ কোন আকস্মিকতায় বা দুর্ভাগ্যে বা কারো ক্ষমতায় নিহিত থাকে। এটাও ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হচ্ছে যে, মানুষ পরিবার ও জনগোষ্ঠির সাথে এমনভাবে আবদ্ধ যে, যে কোনটির দারিদ্র্যে বা অধঃপতনে সামগ্রিকভাবে সকলে বিপদে পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্র তার সদস্যদের আগ্রহ দায়িত্ববোধকে ধ্বংস না ক'রে সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। এদিকে রাষ্ট্র কতখানি যেতে পারে এবং কোন পর্যায়ে সর্বনিম্নমান প্রতিষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে অবশ্যি মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ নীতি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে এবং আধুনিক রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন পথে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এটাও ঠিক যে, আধুনিক সরকারের ভূমিকা পূর্বের সরকারের ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যেমন শৃঙ্খলাবোধের মতবাদ সংরক্ষণের মতবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল, তেমনি সংরক্ষণের মতবাদ ব্যাপক ব্যাখ্যায় স্থায়িত্ব বিধান বিকাশের ধারণায় রূপ নিয়েছে। তার সম্পদপ্রাচুর্য ও বিশ্বজনীন আওতা নিয়ে রাষ্ট্র ভবিষ্যতের জন্য যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে, কোন আংশিক সংগঠন তা করতে পারে না। যে সকল স্বার্থপর লক্ষ্য বর্তমানের সুবিধার আশায় প্রকৃতির বৃহত্তর আশীর্বাদকে বিনষ্ট করতে পারে, রাষ্ট্র তার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বিরাট সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে এবং তা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিয়ে আসবে শুভদিন। তার ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের যথাযোগ্য দূরদৃষ্টি নিয়ে রাষ্ট্র ব্যক্তির নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যহীন কর্মকে এমন নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার অভাবে সৃষ্টি হ'তে পারে এলোমেলো, পরিকল্পনাহীন ও ঠাসাঠাসি নগরীর এবং কদর্য ও অপরিচ্ছন্ন জনপদের। শিল্পের অগ্রগতির ফলে যে সকল সৌন্দর্যকেন্দ্র ধ্বংসের মুখে

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে আসছে, রাষ্ট্র সেসব বনভূমি, হ্রদ ও পাহাড়ের অনিন্দ্যসুন্দর কেন্দ্রগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারে ও তাদের উন্নতির পথ প্রশস্থ করতে পারে। পানিসেচ ব্যবস্থার সম্ভাবনাময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাষ্ট্র চালাতে পারে, ভূমির যথাযোগ্য ব্যবহার ও বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর উন্নত সৃষ্টির পথ রচনা করতে পারে এবং পঙ্গপাল ও কীটপতঙ্গ দমন ক'রে ও অন্যান্য বহু তাৎপর্যপূর্ণ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে কৃষিকাজের বিকাশ সাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্য দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্য ক'রে রাষ্ট্র শিল্পপতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে পারে। মুদ্রা, ঋণ ও নিজের ব্যয়ভারের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের তীব্রতাও হ্রাস করতে পারে। তাছাড়া, অসংখ্য উপায়ে রাষ্ট্র দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে পারে এবং সরকারের পক্ষে তা ন্যায়সঙ্গতও হয়; যদি সে সমগ্রের বিনিময়ে লাভবান হবার চেষ্টা না করে।

এসব কাজ কোন ব্যক্তি বা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্র অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তার সেবামূলক শাখা-প্রশাখার সাথে সংগতি রেখেও তা সম্পন্ন হ'তে পারে। অবশ্য সরকারের জনহিতকর মনোভাবের অভাবে বা বুদ্ধির অভাবে রাষ্ট্র এসব কাজে ব্যর্থ হ'তে পারে বা এসব কাজে ভুল করতে পারে; কিন্তু কোন রাজনৈতিক নীতি রাষ্ট্রকে জাতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করা থেকে বিরত রাখে না এবং যে কোন সংঘ অপেক্ষা রাষ্ট্র মূলতঃ এসব কাজের জন্য বেশী উপযুক্ত বিবেচিত হয়। এর আগে যে নীতির কথা বলা হ'ল, একমাত্র তার প্রতিবন্ধক হ'ল আইন-প্রণেতাদের যোগ্যতা ও শাসনবিভাগীয় কাজকর্ম। যদি তারা অজ্ঞ ও অযোগ্য হয়, বিশেষ স্বার্থের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে, তা'হলে সবচেয়ে মূল্যবান সেবা সীমিতকরণে বা বিভ্রান্তির মাধ্যমে সম্প্রদায়কে প্রচুর মূল্য দিতে হয়। তারা যত বেশী যোগ্য হবে বৈধভাবে ততবেশী কাজ করতে পারবে।

এসব দায়িত্ব প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বহু উর্ধ্বেও বিস্তৃত হ'তে পারে। মানবিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের স্থায়িত্ববিধান এবং বিকাশ রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে

www.nagorikpathagar.org

যেন মানবিক আচরণের মৌলিক প্রেরণা কোনক্রমে ব্যাহত না হয় মানবীয়গুণের সঞ্জীবন ও বিশ্বজনীন সেবার কতকগুলো মৌলিক শত রয়েছে, যার প্রয়োজন অনুভব করে প্রত্যেক মানুষ। এদের মধ্যে প্রথমা হ'ল শিক্ষা ; শিক্ষা সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে এবং প্রভূ উন্নতি সাধন করেছে। অতীতে এ কাজটি পরিবারের হাতে এবং প তা 'গিল্ড' ও চার্চের মত বিশেষ সংঘের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে বিকশি হয়। অবশ্য এখনও পরিবার শিক্ষাদানের এক সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং করেও যাবে; কিন্তু সুসভ্য সম্প্রদায়ে সার্থক জীবনের জন যে নিয়ত প্রশিক্ষণ দরকার, তার জন্য পরিবার অযোগ্য। রাষ্ট্র অত্যা সঙ্গতরূপেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের পক্ষে এ কাজ করা সঙ্গত কেননা চার্চের ন্যায় এর কোন বিশেষ লক্ষ্য নেই। তাছাড়া, রাষ্ট্রে সার্বজনীন প্রকৃতির জন্য সে সবাইকে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করে। তার সম্পদ প্রাচুর্যের জন্যও রাষ্ট্র এ মহান অভিযা পরিচালনায় সক্ষম এবং এর 'মুনাফা' অদৃশ্যভাবে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর বর্তায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যা সত্য, একই কারণে সাংস্কৃতিক জীবনের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অভিযানে মানুষ অনাবিষ্কৃত মহান সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলে। এসব বিষয়ে মতপার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে ; কিন্তু সাংস্কৃতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়েও মহান সৃষ্টির উৎসমূল যে স্বাধীনতা, তাকে কোনরূপে ব্যাহত না ক'রে রাষ্ট্র যা করতে পারে, তার তাই করা উচিত। আমরা বরাবর বলে এসেছি যে, বাহ্যিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কাজ করতে হয়। তার সাথে সাথে এটাও বলব যে, সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের জন্য বাহ্যিক পদ্ধতিকেও অত্যন্ত কার্যকরী পথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কবি ও দার্শনিকদের যেমন প্রয়োজন এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের, তেমনি প্রয়োজন যে কাঠের কাজ করে বা যে লোহা নিয়ে কারবার করে, তার জন্যও। 'রাষ্ট্র পরিচালক ও প্রেরিত পুরুষের জন্যও রয়েছে এর প্রয়োজন'। তার হাতে যে অস্ত্র রয়েছে তাই রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। কিভাবে এসব অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত, এ অনুধাবনের ব্যাপকতায় কিন্তু কোন

www.nagorikpathagar.org

সীমাবদ্ধতা নেই। কাজের বিভিন্নতার জন্য কিন্তু প্রয়োজন প্রত্যেকের প্রকৃতির ঐক্য ও সংগঠন। তা না হ'লে সে ভালভাবে কাজ করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের বিভক্তিকরণের জন্য অবশ্য এটা দরকার যে, সরকার সম্প্রদায়ের জীবনকে সুন্দরভাবে অনুধাবন করবে; কেননা বিশিষ্ট পথে সরকারকে তারই সেবা ক'রে যেতে হবে। রাষ্ট্র হল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়া, এবং জীবনের জন্যই তার অস্তিত্ব। সামগ্রিক জীবনের গভীর ও ব্যাপক অনুধাবন ব্যতীত মহত্তম এ প্রক্রিয়ারও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না।

'শৃঙ্খলা', 'সংরক্ষণ', 'স্থায়িত্ববিধান', ও 'বিকাশ সাধন' এ শিরোনামায় এক তালিকায় আমরা এখন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরতে পারি। এ শ্রেণীবিভাগ একটি অপরটির সাথে এমনভাবে জড়িত যে, কোন্ নির্দিষ্ট কাজ কোন্ ভাগে পড়বে, তা শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপের ব্যাপার। রাষ্ট্রের সকল স্পষ্ট কার্যকলাপের পূর্ণ শ্রেণীবিভাগ করবার জন্য এ তালিকা যথেষ্ট নয়; তবে এর প্রধান প্রধান বিভাগগুলো তুলে ধরবার জন্য তা যথেষ্ট হবে। আপাততঃ আমরা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের আন্তর্জাতিক দিককে বাদ দিয়েছি। রাষ্ট্রের সদস্যদের জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অনুধাবন করতে হবে। একটি পরিচালিত হয় তার সীমানার মধ্যে ও অন্যটি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রের এ দু'ধরনের কাজ সম্পর্কে আমাদের সাবধান হ'তে হবে।

এভাবে দেখলে রাষ্ট্রের অবস্থা চিন্তায় ও কর্মক্ষেত্রে অনেকটা অযৌক্তিক হয়ে ওঠে; কেননা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য হয় জনকল্যাণ; কিন্তু বাহিরের ব্যাপারে তার লক্ষ্য হয়ে পড়ে শক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ। এ দু'য়ের মধ্যে আসল তফাৎ শুধুমাত্র প্রকৃতিগত নয়; বরং তা হ'ল দৃষ্টিভংগীর ব্যাপার। এর মূল কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অস্ত্র—রাজনৈতিক আইন এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অস্ত্রে রূপায়িত হয় নি। এ রূপায়ণ ঘটলে দৃষ্টিভংগীর তফাৎও দূর হয়ে যায়। এ বিষয়ে আলোচনা পরে হবে।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের কার্যকলাপ

(আভ্যন্তরীণ বিষয়)

১ শৃঙ্খলা	২ সংরক্ষণ	৩ স্থায়িত্ববিধান ও বিকাশ বিধান
(ক) রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এলাকা ও সীমারেখা নির্ধারণ — স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়। যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ।	পুলিশী কাজকর্ম সম্পাদন, জীবন ও সম্পত্তির নিরপত্তা বিধান।	দৈহিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও নিয়ন্ত্রণ, যেমন-- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন, বাসগৃহের ব্যবস্থা, পেশাগত ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে অবকাশরঞ্জনের পরিবেশ সৃষ্টি।
হিসাব-নিকাশ, পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণের একক ও মান নির্ধারণ প্রভৃতি।		প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্ববিধান ও তাদের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অর্জন।
		শহর এলাকা ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধনকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ।
(খ) সামাজিক কাঠামো :		
রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্র নির্ধারণ :	রাজনৈতিক পর্যায়ে কর্তৃত্বের নির্দেশনা ও সংরক্ষণ।	শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার প্রতিষ্ঠা বিকাশ সাধন।

www.nagorikpathagar.org

(১) আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়।		
(৬) কার্যকরণ ভিত্তিতে রাজনৈতিক কাজকর্মের বিভাগ ও সমন্বয়।		
নাগরিকত্ব ও বাসস্থানের সাধারণ অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ।	রাজনৈতিক পর্যায়ে অধিকার ও কর্তব্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকরকরণ।	সুযোগের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি সাধন।
ব্যক্তি ও সংঘের বিশেষ বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব নির্দেশ, যেমন:	ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার রাজনৈতিক তাৎপর্য।	জাতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহায়তা ও সর্বসম্মত সাংস্কৃতিক লক্ষ্য অর্জন।
(১) পরিবার সংঘের মধ্যে বিবাহচুক্তির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। (২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুদ্রানিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক চুক্তির কার্যকরকরণ ইত্যাদি। (৩) সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে পেশাগত পদমর্যাদা নির্ধারণ, রেজিস্ট্রেশন, অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি।	এর অন্তর্ভুক্ত হ'ল বিশেষ বিশেষ সংঘের হস্তক্ষেপ থেকে সম্প্রদায় সংরক্ষণ করা, যেমন: একচেটিয়া ব্যবসায় চক্র বা অসম প্রতিযোগিতা, তাছাড়াও কুলগত, ধর্মীয় ও দলগত চাপের মুখে ও অর্থনৈতিক বিসম্বাদের মাধ্যমে সমাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ করা।	সাধারণ স্বার্থে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যিক ও আর্থিক উন্নতি বিধান।

www.nagorikpathagar.org

জনসংখ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য সামাজিক ঘটনা সংক্রান্ত সামাজিক তথ্য সরবরাহ, পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও গ্রন্থণা প্রভৃতি।	মজুরীহার, চাকুরী, সন্তান প্রতিপালন, দারিদ্র প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র সম্প্রদায়ের নিম্নতম সুষ্ঠু জীবন-যাত্রার মানের নিশ্চয়তা বিধান। সামাজিক ভরাডুবির প্রতিরোধ ও এবিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি রাখা।	গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র এত বিশাল যে, তার সর্বাত্মক শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা বড় কঠিন। রাষ্ট্রের যে কাজের তালিকা আমরা তুলে ধরেছি, তা বৃহত্তম যে কোন সংঘের পক্ষে সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং সরকারে যেসব ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের পক্ষে অনুধাবন করা নেহাত শক্ত। তাছাড়া, যে ক্ষেত্র তার নয়, সে ক্ষেত্রে নাক গলাতে গেলে কোন ক্রমেই তার নিজস্ব কাজকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। যে যে কাজ তার করা উচিত নয়, সেসব কাজে রাষ্ট্র উদ্যোগী হলে তার আওতাভুক্ত কাজের ব্যাপারে নিশ্চয়ই সে ব্যর্থ হবে। ফলে যে শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ, তাও বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে। ইতিহাস ধারায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমানের ভূমিকা গায়ে পড়ে নিতে গিয়ে ভয়াবহ কুফল ডেকে এনেছে। আজকে অবশ্য সে অবস্থার উন্নতি হয়েছে; তথাপি দুষ্ট ক্ষতের কিছু কিছু লক্ষণ আজও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, আজও কতকগুলো রাষ্ট্র অত্যন্ত হাস্যকরভাবে বিবর্তন-বাদের শিক্ষাকে নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছে; অথচ বেকার ব্যক্তিদের হতাশার অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছে এবং তাদের কোন বিহিত করে নি। এমনও কতকগুলো রাষ্ট্র দেখা যায়, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞানকে চেপে রেখেছে ও অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট থেকে তাকে ঢেকে রেখেছে; অথচ মিল ফ্যাক্টরী ও তুলাক্ষেত্রে তাদের শিশুদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছে। কতকগুলো রাষ্ট্র এমনও আছে, যেখানে অসুখী

www.nagorikpathagar.org

দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারছে না; অথচ কে না জানে যে, এসব ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করলে তা সে সফলই হোক, আর ব্যর্থই হোক, অমিল আরও জটিল আকার ধারণ করে। কোন কোন রাষ্ট্রে পত্র-পত্রিকার উপর কড়া সেন্সর আরোপ করা হয় ও ইচ্ছা ক'রেই শিক্ষাকে জাতীয় প্রচারণায় অবনমিত করা হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই রয়েছে যুদ্ধ পরিচালনা মন্ত্রণালয়; কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে স্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রণালয় পর্যন্ত নেই। সর্বাত্মক শক্তিমত্তা আসলে অনুপযুক্ততার নামান্তর। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণতর হয় এবং যে যে বিষয়ে কোন কর্মসম্পাদন করতে সে অযোগ্য, এসব অসম্ভব ও অভিশপ্ত উদ্যোগ থেকে রাষ্ট্র যতই সরে আসে, সে তার সঠিক কাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে তত বেশী অবহিত হয় এবং সম্পাদনে সে ততবেশী কৃতসংকল্প ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্তৃত্বের অবস্থান

এক: জনগণের ইচ্ছা

যখন দর্শনের উচ্চতম শিখর থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতার মাটিতে আমরা নেমে আসি, তখন রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ভিন্নরূপ দেখতে পাই। যখন রুশো, হেগেল ও বোসাঙ্কেটের মত চিন্তাবিদদের কাছ থেকে আমরা মাইকেলস্[১] বা অস্টোগোরস্কির[২] দিকে দৃষ্টি ফেরায়, তখন মনে হয় ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছি; কেননা সেখানে রয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব কার্যকারিতার প্রদর্শনী। যে প্রকৃতইচ্ছা সর্বভৌম সিদ্ধান্তে তার ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে, সে গণইচ্ছা এক সংকীর্ণ সংখ্যালঘুর নিরস আধিপত্য ও স্বার্থপরতায় দ্রবীভূত হয়ে পড়ে ও সংগঠন ও নেতৃত্বের বাস্তব শর্তগুলো সে জন্য ব্যবহার করতে থাকে। সংঘের স্বাধীনতার পেছনে নিয়ন্ত্রণের মনস্তাত্বিক প্রয়োজন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের পরিবর্তে অজ্ঞতা ও স্থবিরতার পটভূমিতে আমরা ব্যক্তিগত কোন্দল ও স্বার্থপরতা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ ও কলহের এক ভয়াবহ রূপ আবিষ্কার করি। জনগণের কাজ করার পরিবর্তে—আমরা লক্ষ্য করি, জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা রাজনৈতিক 'যন্ত্রকে' হস্তগত করেছে। দুর্জ্ঞেয় এক দেবতারূপে জনগণকে খাড়া ক'রে এক নতুন ধনিকতন্ত্রের পুরোহিতরা তার নামে সংগ্রাম করছে ও শাসন করে চলেছে।

গণইচ্ছাটা কি? প্রথমত: কি এর নির্দেশ? অত্যন্ত অসাধারণ পরিস্থিতিতে 'গণ উদ্যোগ', 'গণনির্দেশ' কার্যকরী হয়; কিন্তু তাছাড়া জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই কাজ করে। সে মুহূর্তেও অবশ্য তাদের পছন্দ সীমিত হয়ে পড়ে। যাদেরকে তারা মনোনীত করে না, তাদের একজনকেই নির্বাচিত করতে হয়। নির্বাচনের বেশীর

১। মাইকেল্‌সের (*Michels*) '*Political Parties* গ্রন্থ।

২। অস্টোগোরস্কির (*Ostogorski*) '*Democracy and the organi—sation of Political Parties* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

ভাগই দলীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করে। মনোনীত ব্যক্তি ও অন্যান্য দলের মধ্যে' যেটুকু বাকী থাকে, রাজনৈতিক দল সেটুকুই জনগণের কাছে ছেড়ে দেয়। 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীর অনেক অসুবিধা হয় এবং প্রায়ই তা আসল বিষয়টুকু গোলমাল ক'রে ফেলে। দলীয় মনোনয়নের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন খুব কমই হয়। এ মনোনয়ন নির্ধারিত হয় তার গুণপনা ও সংগঠনের আর্থিক বিচার বিবেচনা, পরিচিত পরিবার গোষ্ঠির পদমর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ, মনোনীত প্রার্থীর দলীয় নির্দেশ মেনে চলার আগ্রহ ও দল নিয়ন্ত্রণকারী আভ্যন্তরীণ চক্রের উচ্চাকাঙ্খার বহুবিধ বিবেচনার ভিত্তিতে। মনোনয়ন দানের বিষয় সম্বন্ধে জনগণের তেমন কোন আগ্রহ থাকে না এবং তারা কিছু জানেও না। উত্তর আমেরিকার মত কয়েকটি দেশে অবশ্য প্রার্থীদের কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হয়, যেমন কোন এলাকায় বিশেষ সময় পর্যন্ত বাস করতে হবে বা সে অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। গ্রেট বৃটেনের মত কোন কোন দেশে দলীয় সংগঠন তার বিশ্বস্ত অনুগামীদের কোন আঞ্চলিক স্বার্থ উপেক্ষা ক'রেও পুরস্কারস্বরূপ তাদের মনোনয়ন দান করতে পারে।

যেসব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাদের মনোনয়নে দলের আভ্যন্তরীণ চক্রের প্রভাব থাকে সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া নির্বাচনের সময় যেসব নীতি তুলে ধরা হয়, সেসবও নির্ধারণ করে দলীয় চক্র। ঐ সবের প্রভাবও কম নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে এগুলো হয় প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। দলের কর্মসূচীতে উৎপাদক সংঘ নিয়ে ভূমিসংস্কারজনিত স্বার্থ, এবং ট্রেড ইউনিয়ন তার সমর্থনের মূল্য হিসেবে টেনে আনে কঠোর এক শ্রমনীতি ; যে কোন একটা রাজনৈতিক দল তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাপক এক স্বার্থচক্রের আবেদন সৃষ্টি করতে চায়। এভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে রাজনৈতিক লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক সংঘগুলো দলকে এপথে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে বোঝাপড়া করা, প্রয়োজন বোধে এড়িয়ে যাবার সমস্যা প্রভৃতির মধ্যেও নেমে আসতে হয়। যখন দলীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা দলের কর্মসূচী নির্ধারিত হয় তখন তা অন্ততঃ দু'রকম চাপের মুখে এক তীর্যক আকার ধারণ করে। কিন্তু গণইচ্ছা আসলে যা করে তা হ'ল সামগ্রিকভাবে এদের স্বীকৃতি না হয় প্রত্যাখ্যান।

www.nagorikpathagar.org

একবার যখন কর্মসূচী প্রণীত হয় তখন নতুন নতুন স্বার্থ এর সাথে যুক্ত হ'তে থাকে। আবেদন ও প্রতি-আবেদনের পর্যায়ে তখন এসে পড়ে। দলীয় মুখপত্র কোন পত্রিকা তখন তার প্ররোচণা ও নিন্দাবাদের হাতিয়ার প্রয়োগ করতে থাকে। আসলে এটি হ'ল সংবাদ আদান-প্রদান ও প্রচারণার প্রকৃষ্ট হাতিয়ার। নির্বাচন ও তাৎপর্য আরোপের ক্ষেত্রে এর রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা। শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলো এভাবেই কাজ হাসিল করে; কিন্তু নিকৃষ্ট পত্রিকাগুলো নিজেদের মতামতের সমর্থনে যা পায় এবং বিভিন্ন কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে তার সদ্ব্যবহার করে। পরিস্থিতির সঠিক গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য তাদের বিচারে বসতে হয় এবং উত্থাপিত সকল প্রশ্নের মধ্যে থেকে বাছাই করতে হয়। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে তা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। প্ররোচণার জন্য বহু সংস্থাকে কাজে লাগান হয়; কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনের জন্য খুব কম সংস্থার সাহায্য পাওয়া যায়। পত্র-পত্রিকার ভূমিকা কিন্তু জনমতের প্রচার নয়; বরং জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাকে ব্যবহার করা। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের মাধ্যমে গণইচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয় এবং এসব স্বার্থের বেশীর ভাগই জনগণের নয়। কিন্তু জনগণের নামে তা পরিচালিত হয়।

এভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিজয়ী দলের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় উপবিষ্ট হয়। বহু দল বর্তমান থাকায় ও নির্বাচনী প্রথার ত্রুটির জন্য আসলে তাঁরা সমগ্র ভোটের অর্ধেকের কমেও নির্বাচিত হ'তে পারেন। সংখ্যাগুরুর ভোটে তারা নির্বাচিত হ'লেও সে সংখ্যাগুরুর হয় অনিশ্চিত ও অস্থায়ী। তাছাড়াও, যে খেয়ালীপনায় 'জনগণের ইচ্ছা' নির্ধারিত হয়, তা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার সাথে আন্দোলিত হ'তে থাকে। জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার জন্যও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহু নতুন নতুন প্রভাবে প্রভাবিত হ'তে হয়। শাসনচক্রের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও নিজস্ব প্রভাব। স্থায়ী কর্মচারীদের মাধ্যমে সরকারকে কাজ করতে হয়। তাঁরা শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ভালভাবে বোঝেন এবং তাদের পেশাদারী মনোভাব দলীয় নেতাদের উৎসাহ ও নীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ক্ষমতার ব্যাপারটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শাসনযন্ত্রের প্রভাবে 'বড়ত্ব' এক ভাব সৃষ্টি হয় এবং প্রতিনিধিদের নীতির

www.nagorikpathagar.org

জন্য তা খুব বিজ্ঞপনক। নেতৃবর্গ একটা বিশিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্য গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আবার, যে পথে ক্ষমতা অর্জন করা হয়, সে পথে ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। নীতি প্রচার করা সহজ হ'লেও তাদেরকে বাস্তবায়িত করা খুব কঠিন। সুযোগ-সুবিধা প্রলোভন সৃষ্টি করে। সরকার বা দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চাকাঙ্খার বিরুদ্ধে সংহতি আনয়নের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বোঝাপড়া ও সমঝোতার। যেসব ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নি, সেখানে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তাছাড়া, বিজয়ের পরমুহূর্তের উল্লাস কেটে গেলে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা কি ছিল, তা নির্ধারণও শক্ত হয়ে ওঠে। তারা কি কোন দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ? তারা কি কোন নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ? তাদের ভয়, না তাদের আশা সরকার সৃষ্টি করেছিল ? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার সাথে কি সম্পর্ক ?

তা'হলে সরকার পরিচালনায় জনমতের প্রকাশ কিভাবে বোঝা যাবে? গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যাক, এটা কি বাস্তব না শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি ? বাস্তবে যেসব গুরুতর অসুবিধা ও ত্রুটি দেখা যায়, তাও তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এটা আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব যে, যে সংহতি ও নিশ্চয়তা গণতন্ত্রের সমর্থকরা তার উপর আরোপ করতে চায়, তা না থাকলেও 'চূড়ান্ত সার্বভৌম' আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকারিতায় নিয়ত বর্তমান।

ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে বাহির থেকে দেখে হ্যানস্ ডেলব্রুক সত্য বলেছেন যে, "নির্বাচন জনগণকে নিজদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে না ; বরং নির্বাচনের পরে শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল জনগণের ইচ্ছার সাথে সংযোগ রেখে কাজ পরিচালনা করে"।[১] রাজনৈতিক দল না থাকলে গণতন্ত্র অকেজো হয়ে পড়ত। সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায় এবং তাই শাসিতদের উপেক্ষা ক'রে চলতে চায় না। সরকারপক্ষ সব সময় সচেতন যে বিরোধী দল, তার ত্রুটি দেখিয়ে জনগণের নিকট আবেদন করতে সদা প্রস্তুত। সুতরাং সরকার তার সমর্থকদের প্রচলিত অনুভূতি মেনে চলতে চেষ্টা করবে এবং তাদের

১। হ্যান্স ডেলব্রুক (*Hans Delbruck*) তাঁর '*Government adn the will of the People*' গ্রন্থের (ইংরাজিতে অনূদিত ৫৯) পৃষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে যে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া বা মনোভাব সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য করবে। নিজেদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য সরকার এমনভাবে কাজ করবে যেন জনমত তাকে গদীতে স্থিতিশীল থাকতে সমর্থন করে। এ ইচ্ছা কিন্তু কোন বিশেষ আইন প্রণয়নের পক্ষের বা বিপক্ষের ইচ্ছা নয়; বরং তা একটা নির্দিষ্ট সরকারের পক্ষে সাধারণ অনুভূতি।

জনমত ও প্রকাশের বিভিন্ন প্রভাব ও মনোভাবের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তারও উল্লেখ করা উচিত। যে মতের উপর সরকার নির্ভরশীল, তা গণতান্ত্রিক হ'তে পারে; যদিও তার সৃষ্টির মূলে থাকতে পারে ধনিকতান্ত্রিক প্রভাব। এটাও হ'তে পারে যে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু সংবাদ আদান-প্রদানেরও সোপারেশের পথঘাট নিয়ন্ত্রণ ক'রে সংখ্যাগুরুকে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে। কোন নেতার সিদ্ধান্তে হাজারো মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন দিতে পারে। কিন্তু যদি নেতার মর্যাদা বিনষ্ট হ'ত তবে তারাই তার বিরোধিতা করতে এগিয়ে যেত।[১] জনসাধারণের ইচ্ছা খুব কম ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। এটা অত্যন্ত অপরিণত ও নিষ্ক্রীয়। বিস্তারিত সংগঠনের প্রক্রিয়ায় একে তুলে ধরতে হবে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্য এসব সংগঠন একদিকে যেমন প্রকাশ করবে, তেমনি অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণও করবে। রুশোর মত আমরা যদি গণতন্ত্রের ভিত্তি খুঁজতে যাই, তবে কোনদিনই তার সন্ধান পাব না; কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সংগঠন, এমন কি অধিবেশন পর্যন্ত জনমতকে বিভ্রান্ত করে। জনমতই হ'ল গণতন্ত্রের ভিত্তি—তার সততা নয়। এর সততার পরিমাপ করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। শিক্ষার অগ্রগতি হ'লে ও বুদ্ধিবৃত্তি বাড়লে নিশ্চয়ই জনগণের ইচ্ছা আরও স্পষ্ট, আরও শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ লাভ করবে। 'মতে' গুণই হ'ল 'জনের' গুণপনা।

১। বহু রাষ্ট্রনায়ক আবিষ্কার করছেন যে, এক পর্যায়ের পর নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণা জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। জোসেফ চ্যাম্বারলিন সংরক্ষণ নীতির পক্ষে তাঁর সংখ্যাগুরু দলকে রাজী করাতে পারেন নি। গ্ল্যাডস্টোন ও আইরিশ হোম রুলের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন নীতি প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকা দ্বারা সমর্থিত হ'লেও তা জনগণ প্রত্যাখান করে।

www.nagorikpathagar.org

যার পরিমাপ আমরা করতে পারি, তা হ'ল তার পরিমাণ; তার গুণ-পনার বিচার করা সম্ভব নয়। অবশ্য এদিক দিয়ে সম্প্রতি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি সর্বত্র ভোটাধিকারের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং কার্যতঃ অনেক দেশেই সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুইডেন ও অস্ট্রিয়ায় এবং সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত প্রুশিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবার যে নিয়ম ছিল, তারও অবসান হয়। সমান সংখ্যক জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্র সংগঠনের নিয়মও প্রবর্তিত হয়। নির্বাচনে যাতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হ'তে পারে, এজন্য প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। তাছাড়াও যে ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তা হ'ল 'এক ব্যক্তির এক ভোট' ব্যবস্থা এবং সম্পত্তি, শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে নির্বাচনের অধিকার তুলে দেবার ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত হয়ে উঠছে।

সমগ্র জনসংখ্যার ভোটাধিকার ভিত্তিতে সরকার নির্বাচিত হওয়া উচিত। তবে নির্বাচনের আমলে জনগণ যে আগের চেয়ে বেশী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তা কিন্তু এতে বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে বরং দেখা যায় যে, নতুন ধরনের লোক এতে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে মতপার্থক্য বেশী বৃদ্ধি পায়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে প্রায় ভাঙ্গন ধরবার ফলে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে সংবিধান যত বেশী গণতান্ত্রিক হয়, নির্বাচকের মত তত বেশী প্রকাশিত হয় এবং নীতির ক্ষেত্রে সেখানে ততবেশী অনৈক্য দেখা দেয়। চূড়ান্ত সার্বভৌম ফলে আরও বেশী অনিশ্চিত ও অস্থায়ী হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে সাধারণ ইচ্ছা আরও শক্তিশালী হয়। যেখানে ভোটাধিকার বঞ্চিত ব্যক্তির সংখ্যা যত কম, সেখানে বিপ্লবের আশঙ্কা তত কম। আসলে প্রত্যেকটি গণবিপ্লবের মূলে থাকে, সরকার গঠন করা বা তাকে পতন ঘটানোর জন্য যে ক্ষমতা রয়েছে, শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে ক্ষমতায় জনগণের অংশ গ্রহণের পন্থার অভাব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসংখ্যার প্রত্যেক ভাগই সাধারণ ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে। তার সে কাজের দ্বারা প্রত্যেক ভোটার এ নীতিই ঘোষণা করে যে, সংখ্যাগুরু যে নির্দেশ দেবে, রাষ্ট্রীয় নীতি

১২—

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে তারা তা গ্রহণ করবে। অবশ্য তার পরেও তার নিজস্ব নীতির জন্য তার অধিকার অক্ষম থাকে। সরকার গঠন আর তেমন এক শ্রেণীর কাজ থাকে না, যার বাইরে তার অবস্থিতি। প্রত্যেক সাধারণ অধিকার ও সাধারণ দায়িত্ব সে অংশীদার হয়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ কমে আসে।

আমাদের এটা আবার জোর দিয়ে বলা দরকার যে, সাধারণ ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছা নয়। জনগণের ইচ্ছা হ'ল চূড়ান্ত সার্বভৌম। তা কিন্তু জনসংখ্যার বিজয়ী অংশের ইচ্ছা। সংগ্রাম ও বিরোধিতার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। সঙ্কটের চরম মুহূর্তেই তা শুধু রাজনীতির দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ওঠে। কিন্তু যারা বিজয়ী হয় ও যারা পরাস্ত হয়, তারাও সাধারণ ইচ্ছায় সম্মিলিত হয়। এ ইচ্ছা কোন নীতির জন্য নয়; বরং তা হ'ল রাষ্ট্রের জন্য ইচ্ছা। এ হ'ল রাষ্ট্রীয় সদস্যপদের ও আন্তরিক সম্মিলনের ইচ্ছা। এ ইচ্ছার মাধ্যমে কোন নাগরিক রাষ্ট্রের গভীর তাৎপর্য, সেবা, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার সাথে একাত্মতা অনুভব করে। মানুষের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য থেকে এ হল গভীরতর ও অধিক শক্তিশালী। এ যেন শ্রদ্ধার এক গভীর সমুদ্র। রাজনীতি উপরিভাগে যে তরঙ্গ আন্দোলিত করে, তার কাছে তা অজানা ও অজ্ঞাত। যে ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সব কিছু নির্ধারিত ও নিশ্চিত, তাকেই আসলে এ ইচ্ছা পরিচালিত করে। এর জন্য এ পরিবর্তনশীল প্রান্তিক সার্বভৌম বা জনগণের ইচ্ছা এমন এক আধিপত্য লাভ করেছে, যা অনেক বেশী স্থির।

যখন কুসংস্কার ও আবেগের ঝঞ্ঝায় আহত জনগণের ইচ্ছার স্থিতিহীনতা সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি, তখন আমাদের এটা বোঝা উচিত যে, যে সব শক্তি একে আন্দলিত করে, তারাই নীচের ভিত্তিকে আরও মজবুত ক'রে তোলে। প্ররোচণার সংস্থাগুলো কুসংস্কারকে যতই কাজে লাগাক না কেন বা সত্যকে যতই বিকৃত করুক না কেন, আসলে তারাও সাধারণ ইচ্ছাকে ব্যাপক ভিত্তিক করে। দল, পত্র-পত্রিকা ও নেতা নিয়ত জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে তাদের পছন্দের প্রয়োজনীয়তার কথা বয়ে আনে। মানুষের মনে যেসব বিকল্প রয়েছে, তারা তাদের আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরে। সাধারণ ইচ্ছা এভাবে আরও শক্তিশালী ও বাস্তব হয়ে ওঠে। তাছাড়া, এর কাজকর্ম তার জ্ঞানালোকের শর্তস্বরূপ। এসবের মাধ্যমে জনসাধারণ আরও সমালোচনামুখর এবং আরও প্রাজ্ঞ

www.nagorikpathagar.org

হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ তারা অনেকটা স্বার্থহীনও হয়ে পড়ে। তা যাইহোক, সাধারণ ইচ্ছার কার্যকলাপের জন্য 'সকল লোককে সকল সময়ের জন্য বোকা বানানো সম্ভব হয় না। প্রচারের মোকাবেলা করে সমালোচনা। জনসাধারণের ইচ্ছা শুধুমাত্র যে যোগ্যতা অনুসারে সরকার সংগঠন করে তা নয়; বরং যেমন সরকার সে চায়, তেমন সরকারও সংগঠন করে।

দুইঃ প্রতিনিধিত্ব ও দায়িত্ব

যেসকল রাষ্ট্রে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর থাকে, সেখানে সরকারের ক্ষমতার সাথে দায়িত্ববোধ সংযুক্ত হয়। 'জনগণের ইচ্ছার' বা চূড়ান্ত সার্বভৌমের কোন শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকে না; কেননা তা শেষ আবেদনের ক্ষমতা হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সে সৃষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। যা সে সৃষ্টি করে, তাকে সে ধ্বংসও করতে পারে। সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এটিই হ'ল আসল ভিত্তি। অবশ্য গ্রীক গণতন্ত্রে অশোভন পন্থায় যেমন অতীতের কাজকর্মের জন্য তার বিচার করা হ'ত; এক্ষেত্রে অতীতের কাজকর্মের জন্য কোন বিচার হয় না। তবে কর্তৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে সার্থকতা দান করতে পারে বা তাকে প্রতিহত করতে পারে। সরকারী পদের কার্যকাল সীমিত করে ও অল্প সময়ের মধ্যে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দায়িত্বের শর্ত নির্ধারণ ক'রে দেয়। অন্যগুলো নির্ভর করে নিজেদের সচেতনতা ও গণচেতনার উপর।

দায়িত্বশীল সরকারের অর্থই হ'ল এই, যতদিন পর্যন্ত তা সংখ্যাগুরুর (বা নির্বাচিত সদস্যদের বৃহত্তম দলের) সমর্থন লাভ করবে, ততদিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হবে। এ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। এর জন্য অবশ্য এটাও প্রয়োজন নয় যে, সরকার সংখ্যাগুরুর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে। তবে সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। চূড়ান্ত সার্বভৌম সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। সরকারের প্রতি তা যেন এক অন্ধ আস্থা স্থাপন করে এবং তার পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। একটা অংশীদারী কারবারের ডাইরেক্টরদের প্রতি অংশীদারদের যে আস্থা এযেন অনেকটা তাই। অংশীদাররা স্বীকার করেন যে, প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ করার তাদের সময়ও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। তারা

www.nagorikpathagar.org

ডাইরেক্টরদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেই খুশী। তাদের কাজে ও যোগ্যতায় তারা খুশী হ'লে বছর বছর তাদের নিয়োগ করে তাদের কাজের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমনি আস্থাভাজন খুব কমই দেখা যায়। অদ্ভুত মনে হ'লেও গণতন্ত্রের বিকৃতরূপই মোটামুটি দেখা যায়; যেমন— দক্ষিণ আমেরিকার সম্প্রদায়গুলোয় নেতার শাসনে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কোন বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারটা অপরের হাতে ন্যস্ত করে না। রাজনীতি তাদের জীবনের অনেক স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল। ক্ষমতার প্রলোভন এত বেশী যে, তা কোন লোকের বিচার-বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া যায় না; চূড়ান্ত সার্বভৌম নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমতা হস্তান্তরে খুশী হয় না। প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্রে তা দিক নির্দেশ করতে চায় ও সরকারের কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে চায়। যাদের কর্মসূচী গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত সার্বভৌম, তাদেরকে ক্ষমতায় উপবিষ্ট করে এবং যাদের অতীত কার্যকলাপকে বা ভবিষ্যতের কর্মসূচীকে তা সমর্থন করে না, চূড়ান্ত সার্বভৌম তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

কিভাবে এ দায়িত্ব আরও নিশ্চিত করা যায়, তার আলোচনা পরে হবে। এখানে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র বিকল্প হ'ল প্রতিনিধিত্ব। হস্তান্তরের মধ্যে ব্যক্তির নির্বাচন জড়িত থকে; কিন্তু প্রতিনিধিত্বের মধ্যে থাকে কর্মসূচীর নির্বাচন। হস্তান্তরের সার্থক রূপায়ণে যখন ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেছিল, তখন কার্যকাল ও ক্ষমতা প্রয়োগের কোনরূপ শর্তের দ্বারা তা সীমিত হয় নি। প্রতিনিধিত্বের মধ্যে নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ই থাকে। হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় শাসিতদের সম্মতি; কিন্তু প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজন হয় তাদের ইচ্ছার সার্থক রূপায়ণ। এখানে আমরা কতকগুলো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হই—প্রতিনিধি কাদের? তাঁরা কিসের প্রতিনিধিত্ব করেন? তাঁরা কি সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, না আপন আপন নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন? নির্বাচনে তাঁদেরকে সাহায্য করেছে যা, তা কি তাঁদের দল, না বিশেষ কোন স্বার্থ? তা যাই হোক, তাঁরা কি মুখপাত্র হিসেবে নির্দেশ পালন করবার জন্য

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচিত হয়েছেন, না জিম্মাদার হিসেবে শুধু নির্বাচকমণ্ডলীর আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রতিপালন ঘটাবেন ?

লক্ষ্যের সাথে পদ্ধতির যে সম্পর্ক, তা বিবেচনা করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে। কোন গণভোটে বা গণনির্দেশে যে মত বা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজকর্মের পটভূমি তা থেকে স্বতন্ত্র। গণভোট বা গণনির্দেশে একটা বিশেষ ব্যাপারকে অন্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র করা হয়। তখন জানান হয় কোন প্রস্তাবিত আইনের উপর, না হয় কোন শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচীতে বা কোন মিতাচার প্রস্তাবে বা সামাজিক বীমার কোন কর্মসূচীতে মত প্রকাশ করে। অভিপ্রায় যাই হোক, এতে তা নির্ধরিত হয় এবং রায় হয় অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সাধারণ কোন নীতির ভিত্তিতে ; যা সে সমর্থন করে। নির্বাচক যে নীতির প্রতি তার সমর্থন জ্ঞাপন করে। কোন নির্দিষ্ট নীতির ক্ষেত্রে সে তখন মত প্রকাশ করে না। কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছাড়া সাধারণ একজন প্রতিনিধি কোন ঘটনা, কোন আন্দোলন বা কোন দলের সাথে সংযুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর সমগ্র ধারার সাথে সংযুক্ত থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘটনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিষয়ে সে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ করতে থাকে। দলীয় আনুগত্যের প্রশ্নও দেখা দিতে পারে, এবং তখন সে নিজ মতের বিরুদ্ধেও দলীয় নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করে। এসব সমস্যার ক্ষেত্রে নৈতিকতার সাধারণ যে সমাধান রয়েছে, তাও উল্লেখযোগ্য এবং তা হল সমগ্র ঘটনায় অধিকমূল্যবান বলে তার কাছে যা মনে হবে তাই করা। তবে যে সাধারণ নীতির সমর্থনে সে নির্বাচিত হয়েছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তার পদত্যাগ করা উচিত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি মুখপাত্রের মত নির্দেশ নিয়ে আইন পরিষদ যায় না ; যেমনটি দেখা যেত মধ্যযুগীয় নগরীর মুখপাত্রদের বেলায়। মাঝে মাঝে প্রতিনিধিদের এভাবে বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হয়। এর চরম দৃষ্টান্ত মেলে অস্ট্রেলিয়ার লেবার দলের সদস্যদের বেলায় ; যেখানে সকল সদস্যকে আইন প্রণয়ন কর্মসূচীতে সমর্থন করবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রতিনিধিদের এভাবে দলীয় ভৃত্যে পরিণত করবার নিয়মকে ন্যায়সংগতভাবে অপছন্দ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষেত্রেও এ বিবেচনা খাটে। পরিষদ যে আইন প্রণয়ন করে, তাদের প্রত্যেকটির বেলায় জনসাধারণের নিকট থেকে 'নির্দেশ' লাভের ব্যাপারটা অত্যন্ত অবাস্তব। প্রতিনিধিত্বের বাস্তব অবস্থা এ সম্ভাবনাকে দূর করে এবং এসব ক্ষেত্রে পরিষদ যে কোন উদ্যোগ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলগুলো জনসমূহের সামনে বহু সমস্যা তুলে ধরে। এদের মধ্যে অবশ্যই একটি সমস্যাই সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কোন দল ক্ষমতায় এলে আমাদের এরূপ মনে করতে হবে যে, চূড়ান্ত সার্বভৌম তার কর্মসূচীর সাধারণ নীতিগুলো গ্রহণ করেছে। নির্বাচিত সরকারের বহু আইন প্রণয়ন করতে হয়। যদি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে জনগণের কাছ থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশ নিয়ে সরকার কাজ করতে চায়, তবে সে তার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। গণনির্বাচিত সরকার যেসব আইন প্রণয়ন করে, যদি গণভোটের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে জনমত যাচাই করা হত, তবে তার অধিকাংশই প্রত্যাহার করতে হত। সুইজারল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে নতুন করধার্যের প্রস্তাবে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। অনুরূপভাবে এটাও বলা চলে যে, জার্মানীতে 'বৃদ্ধ ও অক্ষমদের বীমা' আইনটি জনগণের জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপানো করা হয়। গণভোটে দিলে নিশ্চয়ই এটি প্রণীত হত না।[১] কিন্তু এসব আইন প্রণীত হয়ে গেলে তাদের স্থায়িত্বের জন্য প্রচুর জনসমর্থন পাওয়া যায়।[২]

নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিদের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সাথে মোটামুটিভাবে তুলনা চলে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সাথে। জনগণের ইচ্ছা নির্দেশদান করে। অন্যকথায়

১। ডেলব্রুক—উল্লিখিত গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায়।

২। যখন কোন সামাজিক গোষ্ঠীর উপকারার্থে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তাদের ভোট হারাবার ভয়ে কোন দল সে আইনকে বাতিল করতে সাহসী হয় না। অনুরূপভাবে সংখ্যালঘুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য জনমতের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে আইন প্রণীত হতে পারে। এখানে জনমতের যে অভিপ্রায় তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা চলে; সংখ্যাগুরু তাদের বিশেষ কোন স্বার্থের জন্য কোন আইনকে পছন্দ না করেও তা প্রণয়ন করে। কিন্তু তথাপি এটা বলতে হবে যে, এটাও হ'ল সংখ্যাগুরুর অভিমত।

www.nagorikpathagar.org

যেসব বিকল্প রয়েছে, তাদের কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, তা নির্ধারিত হয় জনগণের ইচ্ছার উপর। কতগুলো সাধারণ স্বার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক নাগরিকের ভাববার বিষয় এবং ভোটদানের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে সে মত প্রকাশ করে। কতকগুলো ঐক্যবোধ ও মতপার্থক্য থাকে, যাদের ভিত্তিতে দলের মধ্যে পার্থক্য গ'ড়ে ওঠে। নাগরিকরা তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে যথাযোগ্য আইন প্রণয়ন করে সেসব সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করা অবশ্য অন্য ব্যাপার। কাজ করতে হলে কাজের পরিবেশে যেতে হবে। শাসন করতে হ'লেও শাসন বিভাগীয় সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে হবে। যখন কোন সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, তখন জনগণকে এ নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, সাদরে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিনিধিত্ব হ'ল শুরু এবং অবশিষ্ট টুকু হ'ল দায়িত্ব। প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়ায় সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হ'লে এতে দায়িত্ববোধকে নিশ্চিত করা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'ল প্রতিনিধিত্বের সাথে দায়িত্বের সমন্বয় সাধন। কেবিনেট পদ্ধতির মাধ্যমে বৃটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যৌথদায়িত্বের প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় যাঁরা আইন পরিষদের নেতৃবর্গ, তাঁরাই হ'লেন শাসন বিভাগের প্রধান। শাসনবিভাগ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থেকে এক যৌথ-একক সৃষ্টি করে। অন্যকথায়, তাঁদের কার্যকাল আইন পরিষদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং আইন পরিষদের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। এ দায়িত্ব যৌথ, এবং আংশিকভাবে তা পরোক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব কিন্তু প্রত্যক্ষ। শাসন বিভাগের প্রধানরা প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কংগ্রেস বা আইন পরিষদের সদস্যগণও জনসাধারণ কর্তৃক পৃথকভাবে নির্বাচিত হন। শাসন বিভাগের ব্যাপারে এটা বলা যায় যে, জনগণের প্রতি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পরোক্ষ দায়িত্ব অপেক্ষা কম কার্যকরী হয়। সরকারের কার্যকলাপ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে যেমনভাবে সমন্বিত হয়, কেবিনেট পদ্ধতিতে তেমনভাবে হয় না। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের যে পৃথক পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে। এক্ষেত্রে ঐক্য খুঁজতে হবে দলের মধ্যে,—সরকারের মধ্যে নয়। সুতরাং এভাবে দলীয় সংগঠন শক্তিশালী হয়; কিন্তু তা হয় দায়িত্বশীলতার বিনিময়ে। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায়

www.nagorikpathagar.org

যে তিক্ত দলীয় সংঘর্ষ উপস্থিত হ'তে পারে, তার ফলে দলীয় সদস্যরা দলের নেতাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।[১] তারা সরকারের কোন কেলেঙ্কারীকে ঢেকে রাখে অথবা উপেক্ষা করে; কিন্তু অন্যদেশে সে-সব ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পতন হ'তে পারত।[২] তাছাড়া, দলীয় সংগঠনের ক্ষমতার জন্যও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য সরকার প্রত্যক্ষ-ভাবে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক জানতে পারে।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা সরকারের জ্যোতিকেন্দ্রে পরিণত হয়। তা কোথায় থাকে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হ'ল, তাকে কার্যকর করা। এ পরিস্থিতির অসুবিধা হ'ল, আইন পরিষদের উপর কেবিনেটের প্রচুর প্রভাব। নিয়োগ ব্যবস্থার উপর তার নিয়ন্ত্রণের জন্য ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য এবং ইংলণ্ডের মত দেশে কেবিনেটের মতানুযায়ী না চললে আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা—ইত্যাদির মাধ্যমে তার সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অবশ্য এ সব কারণে কোন কোন দেশে এর বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে; যেমন—আইরিশ ফ্রি স্টেটে কেবিনেট আইন-পরিষদ ভাঙ্গতে পারে না। এ শাসন ব্যবস্থার বড় ত্রুটি হ'ল, জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল স্থানীয় স্বার্থের দ্বারা দলীয় রাজনীতি পরিচালিত হয়। ফ্রান্স ও ইতালীতে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান, তার ফলে দেখা যায়, কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রতিনিধি ও নির্বাচক-মণ্ডলীর উপর তাদের বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয় নীতি-বোধ বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের দায়িত্বশীলতা অর্জনের কোন পন্থা সার্থক হয় না। কিন্তু যদি রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জনমত অনেক বেশী কার্যকরী হয়; যদি সরকারের মধ্যে দায়িত্বশীলতার একটিমাত্র কেন্দ্র থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মিলনে এ লক্ষ্য অর্জিত হয়।

শাসন বিভাগীয় কাজকর্মের বৈশিষ্ট্যে এর কারণ নিহিত রয়েছে। মিল উত্তম শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, "কোন শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তার গণনির্বাচনে নির্বাচিত হওয়া

১। গুডনাউ-এর (*Good-now*) '*Politics and Administration* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়।

২। 'টিপট ডোম'—কেলেঙ্কারী একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

www.nagorikpathagar.org

উচিত নয়"।[১] তিনি বলেন যে, এসব দায়িত্বশীলবাদের জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন, তা প্রশিক্ষণবিহীন জনগণ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। যখন অসংগত সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার উপর তাঁদের নিয়োগ নির্ভর করে, তখন যোগ্যলোকও এগিয়ে আসতে চায় না। এ ছাড়া, জনপ্রিয়তার সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের যোগ্যতা নির্ধারিত হয় না; মিল যথার্থই বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট 'হয়ে থাকেন একজন অখ্যাত ব্যক্তি; না হয় রাজনীতি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।' তা যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, যেখানে দক্ষ কাজ পরিচালনার প্রয়োজন আছে, তা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জনগণের জ্ঞানও থাকে না, কোন সুযোগও নেই। রাষ্ট্রীয় কাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও ব্যাপকতার জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচুর বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে, এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এটা একটা সাধারণ অভিযোগ যে, এখানে কাজকর্ম সুনিপুণভাবে সম্পন্ন হয় না; কেন না গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থার শর্ত সম্পর্কে হয় উদাসীন থাকে, না হয় অজ্ঞ হয়ে থাকে। প্রশাসকের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে এ প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে, এবং যদি শাসনবিভাগ অদক্ষ ও ভিন্নমুখী জনগণের কাছে দায়ী থাকে, তবেও নিয়মনিষ্ঠ দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দক্ষতা ও নিপুণতার জন্য শাসন ব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; তবে জনগণের ভোটের উপর তাদের নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয় বা রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনায় তাদের নিয়োগ হওয়াও ঠিক নয়; অথচ দলীয় সৌভাগ্যের জোয়ার-ভাটার উপর তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীল হওয়াও উচিত নয়। এককথায় তাঁরা প্রতিনিধি নন, এবং প্রত্যক্ষভাবে জনগণের উপর তাঁরা নির্ভরশীল হ'তেও পারেন না। সাথে সাথে স্থায়ী কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবার জন্য ব্যবস্থাও থাকা উচিত। তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করে। বিভিন্ন পথ ও মতের বহু অভিজ্ঞতার জন্য তাদের পরামর্শও বহু মূল্যবান। যেসব রাজনৈতিক প্রস্তাব তাদের সমর্থন পায়, সেগুলো সুন্দরভাবে কাজে পরিণত হয় এবং তাদের অসমর্থিত

১। মিলের '*Representative Government* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তাবের ভাগ্য মন্দ। রাজনৈতিক পদের অস্থায়ী শাসনকর্তা তাদের বিচার-বুদ্ধির উপর অনেকাংশে নির্ভর করেন। কোন সরকারী বিভাগের রাজনৈতিক প্রধান 'নিজের বিভাগের' সাথে পরামর্শ না ক'রে কোন কিছু বলেন না। বিভাগের ঐতিহ্য ও সরকারের ক্ষমতা যোগায় এবং জনমতকে প্রতিরোধ করবার জন্য এক পেশাদারী ও অসহিষ্ণু রক্ষণশীলতায় তা পর্যবসিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। বৈদেশিক বিভাগের মত বিভাগগুলোতে ঐ আশঙ্কা আরও বেশী রয়েছে; কেননা প্রণীত আইনকে কাজে লাগাবার কাজে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় না; বরং বিভাগীয় নীতি নির্ধারণে তাদের প্রচুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং এমন পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়, যেখানে জনগণের চোখে খুব কমই পড়তে হয়।[১]

এ স্থায়ী ও পেশাদারী কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কার্যকরী পন্থা হচ্ছে বিভাগের অস্থায়ী ও রাজনৈতিক বিভাগীয় প্রধানের মারফতে প্রভাব বিস্তার। অভিজ্ঞদের উপর অজ্ঞদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার এটা নয়। লক্ষ্য ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পার্থক্যের উপর এটা প্রতিষ্ঠিত। স্থায়ী কর্মকর্তারা হল সরকারের অংশবিশেষ এবং প্রত্যেক বিভাগের ন্যায় এখানেও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বজায় রাখতে হবে। একজন সত্যিকারের নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের নিজে ব্যবহৃত না হয়ে জানতে হবে, কিভাবে সরকারী বিভাগগুলো পরিচালিত হয়।[২] লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে একে অধিক কার্যকরী করা যায় এবং কিভাবে তার শক্তি ও দুর্বলতা খুঁজে বার করা যায়; তাও তাঁকে জানতে হবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে সাধারণ পরিচালকমণ্ডলী বা ডাইরেক্টরেটের নিকট কিভাবে বিভাগীয় দক্ষ কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল করা যায়, সে ব্যাপারে এ দূরদৃষ্টি

১। মারসেল প্রাউস্ট (*Mancel prouṡt*) তাঁর *'A. L.' Ombre des Teunes Filles en Fleurs* শীর্ষক উপন্যাসে সরকারের 'না-সূচক' পদ্ধতিগত সংরক্ষণশীল মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রত্যেক সরকারের বেলায় এ খাটে এবং সরকারের প্রত্যেক বিভাগ, বিশেষ করে এর বৈদেশিক বিভাগ এতে বেশী করে প্রভাবিত হয়।

২। বেগহট (*Bagehot*) তাঁর *English Constitution* গ্রন্থে সুন্দরভাবে এর আলোচনা করেছেন। লাউয়েল (*Lowell*) তাঁর *Public opinion and Popular government* গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত মৌলিক বলে স্বীকৃত হয়। এটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরও বেশী জরুরী; কেননা এর কাজ যে কোনটির কাজের চেয়ে বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাহারা দক্ষ ব্যক্তিদের গুণপনাকে বিচার করবার যোগ্যতা সাধারণ লোকদের না থাকলেও সুশিক্ষা পেলে ও স্বার্থের উর্ধ্বে উঠলে তারাও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে সক্ষম হয়। সংসদীয় সরকার বা কেবিনেট পদ্ধতির সরকারের যতই অসুবিধা থাক না কেন, তার রয়েছে এক সংহতির তাৎপর্য; যার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে লক্ষ্য ও উপায়ের সমন্বয় সাধিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা কোন দুর্জ্ঞেয় ঐক্য নয়; এ সত্য আমরা স্পষ্টভাবে না বুঝতে পারলে আমরা সঠিকভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সমস্যাবলী অনুধাবন করতে পারি না। রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাকে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার খুব জোর অসম্পূর্ণ ও সীমিত এক সংহতি বলে গ্রহণ করতে হবে। যে ইংলণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া তাদের বিভিন্নতা ও বহুত্ববাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, বা যে ইংলণ্ড-জার্মানী বা রাশিয়া আমাদের কল্পনায় বেঁচে আছে, সে ইংলণ্ড-জার্মানী বা রাশিয়া কিন্তু সন্ধিস্থাপন করে না বা ঋণ গ্রহণ করে না বা আইনও প্রণয়ন করে না। জাতীয়তার গভীরে যত ঐক্য থাক না কেন, কোন এককেন্দ্রিক ইচ্ছার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে না; একটা জাতি সাধারণ ঐক্যবোধে সম্মিলিত অর্থাৎ এ হল এমন এক অনুভূতি যা প্রত্যেক সদস্য একে অন্যের সাথে অনুভব করে। জাতীয় বিজয় বা দুর্যোগের কোন ঘটনায় এ অভিজ্ঞতার দ্যোতনা প্রকাশিত হয়; সাধারণ প্রথা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তার সম্মিলন ঘটে; যেমন ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের দু'টি উপভোগ করে বা আমেরিকায় চতুর্থ জুলাই উদযাপন করা হয়। কোন বিরাট দুর্যোগের সময় প্রেম বা ঘৃণার প্রচলিত প্রবল অনুভূতির মাধ্যমে এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণ কোন ঘটনায়ও এর প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এমন পরিবেশেও রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট কাজকে সত্যিকারের জাতির কোন কাজ বলে চালানো সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে কোন ইচছা সংবদ্ধ হয় তখনই তা সীমিত হয়ে ওঠে—তা সে যতই প্রতিনিধিত্বমূলক হোক না কেন। রাষ্ট্রের ইচ্ছা,—ইচ্ছার সংহতি ছাড়া কিছুই নয়। তা সংহত ও সীমিত হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে,

www.nagorikpathagar.org

যখন তা থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে এবং সমগ্র রাষ্ট্র তাকে স্বীকার করে নেয়।

ইচ্ছার সংগঠনকে প্রত্যেক সংহতি, ঐক্যবোধ ও প্রচলিত অভিমতের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই হল গণতান্ত্রিক আদর্শের্যের অংশ বিশেষ। বহু বাধা-বিপত্তি সত্বেও এ প্রক্রিয়া সম্প্রতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রগতি লাভ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে ইচ্ছার এ সংগঠনের ভিত্তি ছিল এক শ্রেণীর নিকট অন্য শ্রেণীর অধীনতা বা অনুগত্য বোধ। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে সকল শ্রেণীর ইছা এক সাধারণ সংগঠনের রূপ লাভ করেছে; এর জন্য একটা নতুন কাঠামোর প্রয়োজন অনুভব করা হয় এবং তার রূপরেখা এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর দু'টো মৌলিক নীতি হল প্রতিনিধিত্ব এবং দায়িত্ব। প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে কাজকর্মের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং দায়িত্ববোধ পন্থা অধিকার করে। এ দুটো নীতির আরও বিকাশ আবশ্যক। বিচার ব্যবস্থাকে আপাততঃ বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে নিম্নলিখিত উপায়ে 'ইচ্ছার' সমস্ত সংগঠিত করতে হবে:

(ক) স্থায়ী কর্মকর্তাদের প্রধানের নিকট অধীনস্থ শাসন বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দের স্থায়িত্বশীলতা।

(খ) প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট স্থায়ী কর্মকর্তাদের প্রধানদের দায়িত্বশীলতা।

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কেবিনেট মন্ত্রীদের নিকট প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্বশীলতা।

(ঘ) সংসদ বা পার্লামেন্টের নিকট কেবিনেটের দায়িত্বশীলতা।

(ঙ) জনগণের নিকট সংসদের দায়িত্বশীলতা।

তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্ক অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পর্যায়ে তাঁদের সমন্বয়ের সমস্য রয়েছে এবং তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনা; অবশ্য এগুলো হল এমন বিশিষ্ট প্রকৃতির যে, সাধারণ অনুশীলনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কিন্তু সাধারণ ব্যবস্থায় 'জনগণের ইচ্ছার' সঠিক অনুধাবনে এইটেই হচেছ সবচেয়ে সুবিধাজনক। এটাও নির্ভর করে অবশ্য 'জনগণের শ্রেষ্ঠত্বের উপর'।

www.nagorikpathagar.org

তিনঃ কর্তৃত্ব ও বিপ্লব

যখন কোন নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জোর ক'রে উৎখাত করা হয় বা যখন কোন সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নতুন একনীতি ঘোষণা করে, তখন তাকে আমরা বলি বিপ্লব। কোন রাজার বা প্রেসিডেন্টের বা প্রধান মন্ত্রীর হত্যাকাণ্ডে বিপ্লব ঘটেনা, যদি তা ব্যক্তিগত আকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য সংঘটিত হয়, অথবা যদি তা কোন হতাশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং যদি তারা কোন বিকল্প সরকার গঠনের আশা পোষণ না করে। বিপ্লব রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর এক দ্বিধাবিভক্তির পরিচয় বহন করে। এতে রাজনৈতিক ইচ্ছার এক অসুস্থ অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বা কর্তৃত্বের সাধারণ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কোন ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দু'দিক থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এতে সরকার সব সময় বলপ্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, যে কোন ভাবে তা তার কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুক না কেন, এর আধিপত্যের মূল সুর তাকে ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করে। কিন্তু প্রত্যেকটি ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাকে 'ইচ্ছা' থেকে স্বতন্ত্র করা যায়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্মিলন ঘটে। ধনিকতন্ত্রকে অবশ্য এমন এক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়, যা তার নিজস্ব নয়। এতে থাকে এক সামরিকবাহিনী, যা নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত নয়; বরং তা গঠিত হয় বাহিনী প্রধানের সাথে শৃঙ্খলাবোধে আবদ্ধ অধীনস্থ প্রজাদের সমবায়ে। এর আনুগত্য কোন রকম পৌর-আনুগত্য নয়। এটা একটা কারণ থেকে অন্য কারণে বা এক নেতা থেকে অন্য নেতার কাছে হস্তান্তরিত হ'তে পারে। ধনিকতন্ত্রে কোনরূপ বিবেদ দেখা দিলে, যে নেতা বা যে উপদল সামরিকবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

এ ধরনের বিপ্লব খুব সাধারণ, কিন্তু যেসব বিপ্লবে সমগ্র জনগোষ্ঠি সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদের তুলনায় এদের গুরুত্ব খুব কম। এগুলোও ধনিক-তান্ত্রিক দেশে সংঘটিত হয় ও পরে রূপান্তর ঘটায়। এক্ষেত্রে সেগুলো হয় অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতদের বিপ্লব এবং নাগরিকত্বের অধিকার দাবীর ভিত্তিতে তা সংঘটিত হয়। বলপ্রয়োগের ফলে প্রতিরোধের

www.nagorikpathagar.org

মনোভাব গ'ড়ে ওঠে এবং কোন রাষ্ট্রীয় সংকট দেখা দিলে বিপ্লব ঘটতে পারে। যুদ্ধের মাধ্যমে প্রায়ই এ সুযোগ আসে। অত্যাচারের মাত্রাধিক্য ও কোন কোন সময়ে জনগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য করে। কোন কোন সময় আবার শিক্ষাবিস্তারের ফলে ক্ষমতা পূর্ব সমর্থন ভেঙ্গে পড়ে। প্রভুত্বব্যঞ্জক ধর্ম বা রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার মানে এসব ঘটনা জড়িত থাকতে পারে। কোন কোন সময় নতুন অর্থনৈতিক শক্তি বিকাশের ফলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে ওঠে ও তার ফলে অত্যাচারিতদের মধ্যে ক্ষমতার নতুন সচেতনতা দেখা দেয়। কোন কোন সময় এককভাবে, আবার কোন কোন সময় সম্মিলিতভাবে এসব প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে সাম্প্রতিককালে আমাদের সভ্যতা থেকে কার্যতঃ ধনিকতন্ত্রের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যকে নির্বাসিত করেছে। রূপান্তরের কিছু অংশ সুশৃঙ্খলভাবে ঘটেছে এবং ক্ষমতার নতুন দাবীর নিকট ধনিকতন্ত্র আত্ম-সমর্পণ করেছে; কিন্তু সকল দেশেই তা বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

অতীতের বেশীর ভাগ বিপ্লবই ঘটেছে হয় ধনিকতন্ত্রের অভ্যন্তরে বা তার বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধ ঘটনায় জনগণ 'বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগকারীদের' সহায়তায় সফলকাম হয়েছে। প্রাচীন ধনিকতন্ত্রেও ক্রীতদাস বা ভূমিদাসদের বিদ্রোহ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। জার্মানীতে ষোল শতকের কৃষক বিদ্রোহের ঘটনাগুলোও ব্যর্থ হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবও কোন নিম্নশ্রেণীর বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয় নি। নৈরাজ্য কোনরূপ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ বিপ্লব তারা সংঘটিত করেনি। রাশিয়ার সর্বহারাদের বিপ্লবও হ'চ্ছে একটি শ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবের ফলস্বরূপ। সর্বহারাদের গণ-আন্দোলন কোন নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কোনদিন সক্ষম হয় নি। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছোট একটা গোষ্ঠী জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে; কিন্তু গণ-অসন্তোষ নিজে কিছুই করতে পারে না।

যেমন কোন অথবা চালকের কাছ থেকে ছুটে যাওয়া ঘোড়াকে যেকোন শক্তিশালী লোক কবজা করতে পারে; তেমনি কোন সঙ্কট কালে বা কোন স্থিতিহীন অবস্থায় সংঘবদ্ধ ও 'ক্ষমতার অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত' অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়। 'জোর ক'রে ক্ষমতা দখলের' মূলে রয়েছে কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যেমন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার প্রতি গণ-অসন্তোষ, এমনি সংকটকালে মানুষের শক্তের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

অনুরক্ত হবার মানসিকতা, নৈরাশ্য থেকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠির আশ্রয় অনেক শ্রেয়—এ অনুভূতি, রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষের প্রতি মানুষের ভয় ও সাথে সাথে বৈধ ক্ষমতা দখলের ভয়ঙ্কর কোন ষড়যন্ত্রের অবস্থিতি ইত্যাদি। তাই যুদ্ধকালে বলপ্রয়োগে বা বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকার অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব একনায়কতন্ত্র গ'ড়ে উঠেছে, যেমন—রাশিয়ার সোভিয়েট সরকার, ইতালীর ফ্যাসিস্ট সরকার বা স্পেনের সামরিক শাসন প্রভৃতি; সেগুলোও দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। পরিস্থিতি যতই স্থিতিহীন হয়, এমনি ওলোট পালটের সম্ভাবনা ততই বেশী হয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এসব ঘটনা হল অস্বাভাবিক প্রকৃতির। রোমানরা সঠিকভাবেই সংকট কালের উপযোগী অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে একনায়কতন্ত্রকে গ্রহণ করতেন এবং সংকট অতিক্রম ক'রে তাঁরা তাকে পরিহার করতেন। আইন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, অথবা সম্পূর্ণভাবে তার বিলোপ সাধন হয়।

সাধারণ ইচ্ছাই হ'ল সরকারের একমাত্র স্থায়ী ভিত্তি। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লব খুব কমই দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিপ্লব অত্যন্ত অশুভও। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন সংকটের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিরোধ করবার জন্য সত্যই খুব মজবুত। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে লয়েড জর্জ ও ক্লেমেন্‌সুর আধা-শাসনতান্ত্রিক, অস্থায়ী ও সর্বজন স্বীকৃত আধিপত্য কায়েম হয়েছিল বটে; কিন্তু রাশিয়া ও জার্মানীতে ঘটেছিল রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। বিপ্লবের ফলে সাধারণ ইচ্ছা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে। পার্থক্য চরম পর্যায়ে পৌঁছে ও সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে ওঠে। সাধারণ অবস্থায় যে ঐক্যবোধ বিভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যেও মিলনসূত্র রচনা করে তা আর থাকে না। বিভক্তকারী সূত্রটি সাধারণ ঐতিহ্য, সাধারণ শৃঙ্খলাবোধ ও সমগ্রের প্রতি আনুগত্য থেকে অনেক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। বিপ্লবের অর্থ হ'ল রাষ্ট্রের সাময়িক ধ্বংস। এর ফলে সাধারণ ইচ্ছার বিভক্তিকরণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। বিপদ কেটে গেলে রাষ্ট্র আবার নতুন করে গড়তে হয়। কিন্তু কোন সার্থক বিপ্লবে রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়তে হয় না। সাধারণ ইচছা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব হয় না; তাই বিপ্লবের পর প্রায় দেখা যায় পুনর্বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব এবং যতদিন পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

না অনুগত্য বা সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন তা চলতে থাকে।

কতগুলো বিষয় আছে, যা গণতান্ত্রিক দেশেও বিপ্লবের কালোছায়া বিস্তার করতে পারে। এগুলো প্রধানতঃ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকৃতির উপর প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। অতীতে ধর্মীয় বিভেদের ফলে অনেক রাষ্ট্র পর্যুদস্ত হয়েছে। এর কারণ অবশ্য এ বলা যায় যে, একই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে বিভিন্ন ধর্ম পাশাপাশি ব্যর্থ করতে পারে না; বরং কতৃত্ব নিজের সীমা নির্ধারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। এটাও গুরুত্ব-পূর্ণ যে, স্যালিসবারির জন ও মেনিগোল্ডের মত বিপ্লববাদীরা 'মানুষের মধ্যে চুক্তি' ও 'ঈশ্বরের সাথে চুক্তির পার্থক্যের' উপর বিপ্লবের অধি-কারকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'ঈশ্বরের সাথে চুক্তিকে' রাষ্ট্রের দাবীর উপর স্থান দেন। মোটের উপর এ দুয়ের মধ্যে সামাঞ্জস্যবিধান করা খুব শক্ত; বিশেষ করে ঐ সময়ে যখন চার্চ ও রাষ্ট্রের উপর দাবী রাখত। কিন্তু ধর্মীয় বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে এটা ছিল নিষ্প্রয়োজন; কেননা সেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকৃত রূপ ও সামাজিক ঐক্যের শর্তাবলী স্বীকৃত হ'ত।

কিন্তু বিপ্লবের কুলগত কারণের দিকে তাকালে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা চিত্র দেখতে পাই। ধর্মমতের বিভিন্নতার ফলে তিক্ত গভীর মতভেদ দেখা দিতে পারে; কিন্তু জাতিগত বা কুলগত দ্বন্দ্বে বা তিক্ততা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি হয় ধর্মীয় সংঘাতে তেমনটি দেখা যায় না। কোন কুল সচেতন জনগোষ্ঠী স্ব-শাসন আদায়ে বদ্ধপরিকর হ'লে বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হ'লে তখন সাধারণ জীবন ব্যবস্থা মোচড় খেয়ে ওঠে। এমন কোন মতবিরোধ এমন তীব্র স্থিতিহীনতা সৃষ্টি করে না, এর ফলে সাধারণ ইচ্ছা অকেজো হয়ে পড়ে। ঐক্যের যে কোন ভিত্তিকে তখন সে অস্বীকার করে। কোন নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট স্বার্থকে কেন্দ্র করে এ মতবিরোধ গড়ে ওঠে নি; বরং এর মূল সাধারণ জীবন ব্যবস্থার গভীরে নিহিত রয়েছে। জাতীয়তাবোধ হচেছ এক সামঞ্জস্যবিহীন মানবিক অনুভূতি। এর লক্ষ্য হ'ল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কোন সংসদ তার

www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধিদের আসন দেয়া ; তবে তারা স্থায়ী বিরোধী দলে পরিণত হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী কার্যসূচীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর কোন আবেদন তাদের নিকট থাকেনা। তারা যা চায় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন কিছুর প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী কোন জনগোষ্ঠির মনোভাব হয় বিপ্লবাত্মক। বিজয় গৌরবের প্রতিফলই এই, বিজয়ী কোনদিন শান্তিতে থাকতে পারে না। তার একমাত্র সমাধান হ'ল—তাদের দাবীকে মেনে নেয়া। সাম্প্রতিককালে আইরিনা জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। এ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠির যদি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে থাকে, তবে তো রাজনৈতিক সমাধান আরও সোজা হয়ে উঠবে। যেখানে তা অন্যান্য জনগোষ্ঠির সাথে অচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত ; সেখানে ক্রমে ক্রমে মিলন ঘটাবার প্রচেষ্টাই হবে শান্তির পথ।

তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিপ্লব আনতে পারে, তা হ'ল অর্থনৈতিক স্বার্থ। অনেক ধনিকতন্ত্রে সরকার ও ভূমির মালিকানা একত্রিত হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে জনগণের উপর খাজনা ও করের দ্বিবিধ বোঝা অসহ্য হয়ে ওঠতে পারে। এমনি অর্থনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আধুনিক রাষ্ট্রের বিবর্তনে এক বিরাট শক্তিরূপে কাজ করছে এবং রোমের সমগ্র ইতিহাসে এ গতিধারা লক্ষ্য করা যায়। করের বোঝায় ব্যতিব্যস্ত ভূমির মালিক তখন ভূমিহীন কৃষকদের সাথে একজোট হয়ে যায়। নতুন শিল্পযুগের পূর্ব পর্যন্ত শাসকশ্রেণী ছিল ভূমির মালিক। ফলে তাদের এমনি দ্বিবিধ প্রতাপের ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ক্ষমতার বিভাগ হবার পরই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু যে শক্তি এ বিভাগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে তার ফলে নতুন আর এক বিভাগ সৃষ্টি হয়। এটি হ'ল মূলধন ও শ্রমের মধ্যে বিভাগ। উৎপাদনের উপাদানের নতুন মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ, তার ফলে সৃষ্টি হয় অনেক তিক্ততা ও বিপ্লবাত্মক অনুভূতি। সরকারের উপর মূলধনের বিরাট প্রভাব রয়েছে এ বিশ্বাসই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট হবে যে, নিয়ন্ত্রণ হ'ল আংশিক এবং একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম। মূলধন ও শ্রমের মধ্যে যে তীব্র মৌলিক বিরোধ

www.nagorikpathagar.org

দেখা দিয়েছে, ভূমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের তুলনায় তা তেমন ব্যাপক ও গভীর নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বার্থ হয় অনেক ধরনের ও পর্যায়ের। সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনরূপ বিরোধ থাকে না। বিপ্লবের আশঙ্কাও কমে যায়; কেননা শুধুমাত্র তারাই এতে উদ্বুদ্ধ হয়, যারা নতুন ব্যবস্থায় নিজেদেরকে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারে নি বা দমনমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। শুধুমাত্র এদের কাছেই 'শ্রেণী সংগ্রামের' আবেদন থাকে। চাকুরীদান, জীবন বীমা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ ও অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্র বিপ্লবের মূলকে উৎপাদন করতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শ্রমিকদের হাতে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে, তারা সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের অভিযোগ দূর করতে পারে।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, বিপ্লবের আশঙ্কার বিরুদ্ধে ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেকাংশে নিরাপদ। সাধারণ ইচ্ছা এখন পর্যন্ত অনেক অপূর্ণ ও অনুন্নত এটা ঠিক; কিন্তু তা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে কালক্রমে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করতে পারবে তাও ঠিক। এ কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যে বিরোধ তা নয়; বরং তা হ'ল অনেকটা পরিচালক ও তার প্রতিনিধির মধ্যে অবস্থিত ঐক্যের মত।

মানুষের জীবনে সর্বদা ও সর্বত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে। যা পরিবর্তিত হয় তা কর্তৃত্ব নয়; বরং কর্তৃত্বের আকার ও প্রকার। কোন আদিম নৈরাজ্য থেকে কর্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করেনি, বরং আদিম কর্তৃত্বই বিশিষ্ট দিকে বিবর্তিত হয়েছে এবং আধুনিক রাষ্ট্রে তার আদর্শবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে।

নিম্নলিখিতভাবে আমরা এ প্রক্রিয়ার মূলকথা বর্ণনা করতে পারি। কর্তৃত্ব নিজের অধিকারে বেঁচে নেই বা প্রয়োগকারী তার স্বভাবগত ও মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কারো নিকট থেকে আনুগত্য দাবী করতে পারে না। এর সাথে অনুগতদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। কর্তৃত্ব হ'ল এক হস্তান্তরিত ও গৃহীত বস্তু এবং যাদের উপর তার প্রয়োগ হয়, তারাই রয়েছে এর মূলে। এর যৌক্তিকতা হ'চ্ছে সাধারণ মঙ্গল। কোন অধিকার বা কারো দুর্জ্ঞেয় ঐশ্বরিক দাবীর ফলে এর জন্ম হয় নি। এর মধ্যে যতটুকু রয়েছে ভয়, তার চেয়ে বেশী রয়েছে আশা। এর মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

যে পরিমাণ রয়েছে বলপ্রয়োগ বা প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা বা নির্দেশ দান, তার চেয়ে বেশী রয়েছে বিধি-বিধানের প্রয়োগ। আনুগত্যের হাতিয়ার না ব'লে একে সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলাই শ্রেয়ঃ। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে যা দেখা যায়, কর্তৃত্বে তা দেখা যায় না ; যদিও তার সীমারেখা রয়েছে। ভৃত্য যা পালন করতে পারে প্রভু তাই আদেশ করেন ; কিন্তু সরকার শাসিতদের হিতচিন্তায় ব্যাপৃত থেকে এ বিষয়ে অনেক বেশী মুক্ত থাকে। ঐতিহ্য ও চিরাচরিত রীতিনীতি, দায়িত্ব আদায়কারী জনমত ও লিখিত সংবিধানে নিহিত রয়েছে এর সীমারেখা ; সুতরাং কোন কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় না। কাজের উপর কর্তৃত্বের প্রয়োগ হয় ; কিন্তু চিন্তাধারা ও মতামতের উপর এর কোন প্রয়োগ নেই।[১]

ব্যক্তিগত নির্দেশের পরিবর্তে কর্তৃত্বের নির্দেশ আসে বিধিবদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিক আকারে। এখন আর কর্তৃত্ব স্বৈরাচারী ও অঘোষিত নির্দেশের প্রতি সাধারণ আনুগত্য দাবী করে না। একপক্ষীয় না হয়ে এটা হয়েছে পারস্পরিক। কর্তৃপক্ষও নিজের বিধানের অনুগত থাকে এবং যাদের প্রতি তা প্রযোজ্য হয়, তাদের থেকেই তা উদ্ভূত হয়। সর্বশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির ইপ্সিত লক্ষ্যের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের সাথে নিজের সম্পর্ক অনুধাবন করতে তা শেখে এবং সে দাবী যত প্রবল হয় তার অনুধাবনও তত গভীর হয়।

এভাবে কর্তৃত্ব নির্ধারিত ও সীমিত হয় এবং নিজেও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে কর্তৃত্বের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবের কারণগুলো দূর হয়ে যায়।

১। হেগেলীয় দর্শনের কয়েকজন চিন্তাবিদ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রত্যাহারকে স্বীকার করেন ; কিন্তু উল্লিখিত নীতির প্রত্যাহারকে স্বীকার করেন না। ড: বোসাঙ্কেট লেখকের কাছে এক চিঠিতে বলেন : 'শিল্পকলা ও ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কই ধরা যাক, এগুলো হ'ল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে। কোন যুগে রাষ্ট্র এসব সমস্যার সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবে, তা সত্যই ভয়াবহ এক ব্যাপার। তবে যদি রাষ্ট্র এদেরকে নিজের আওতার বাইরে রেখে দেয়, তবেও তো চলে। কতক শর্তে ও উত্তম জীবনের স্বার্থে রাষ্ট্র তাদেরকে ছেড়ে দেয়।'

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

শক্তি ও সার্বভৌম

এক : চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে বলপ্রয়োগ

বলপ্রয়োগের সাথে রাষ্ট্রের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উৎপত্তি মূলে, ক্রমবিকাশে, সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ শুধুমাত্র শেষ ভরসাস্থলই নয়; তা রাষ্ট্রের আদিম নীতিও বটে। বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট অস্ত্রমাত্রই নয়; তার প্রাণ প্রদীপতুল্য। বোসাঙ্কেটের কথায়, 'রাষ্ট্র সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমালোচনা হিসেবে মূলতঃ শক্তিরই নামান্তর'।[১] হিংসাত্মক কাজকর্মের মধ্যে সূচিত হয়ে রাষ্ট্র শক্তিরূপে প্রাণ পেয়েছে। একজন লেখক বলেছেন : 'সুষ্ঠু সমাজবিজ্ঞানের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রেণী সংগঠন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণ থেকে জন্ম নেয় নি। এ হ'ল রক্তক্ষয়ী বিজয়াভিযান ও আধিপত্যের ফলশ্রুতি।[২] প্রাচীন দার্শনিক সত্যই অনুমান করেছিলেন যে, 'সংঘাত হ'ল সকল বস্তুর জনক' এবং তারই প্রথম সন্তান রাষ্ট্রজনকের যোগ্যতম উত্তরাধিকার লাভ ক'রে প্রকাশ লাভ করেছে।

সিবেল ও ট্রিট্স্কের মত লেখকগণ তত্ত্বটির আলোচনা খোলাখুলিভাবে করেছেন। আরও কিছুসংখ্যক লেখক একে সুদৃশ্যবেশে সাজিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে তত্ত্বটি হয়ে উঠেছে বিভ্রান্তিকর; কেননা তাতে আংশিক সত্যও নিহিত রয়েছে। বাস্তবধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে, এ তত্ত্ব ঐতিহাসিক ধারা, উন্নয়নমুখী সকল সামাজিক অবস্থা ও মানবিক উদ্যমের সকল উৎসের ভুল ব্যাখ্যা দান করেছে। তা'ছাড়া, এতে বলপ্রয়োগের সার্থকতা অত্যন্ত ফলাও ক'রে চিত্রিত করা হয়েছে।

১। বোসাঙ্কেটের (*Bosanquet*) '*Philosophical Theory of the State*' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়।

২। ওপেনহাইমারের (*Oppenheimer*) '*The State*' গ্রন্থের ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

আমরা এর আগে দেখিয়ে দেব যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব বলপ্রয়োগের ফলে হয় নি; যদিও তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে 'শক্তি' এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।[১] শক্তি কোন কিছুর সম্মিলন ঘটায় না। শক্তির ঐক্যের পরিবর্তন মাত্র। ক্ষমতার শাসনে ঐক্যের আশীর্বাদ মেলে না যা এতে কোন উন্নয়ন বা অগ্রগতি সাধিত হয় না। কোন কোন সময় বুদ্ধির ভৃত্যরূপে শক্তি ঐক্যের পথ রচনা করে ঠিক; কিন্তু তার জন্য বেশী কৃতিত্ব প্রভুর; ভৃত্যের নয়। সাধারণ ইচ্ছার আনুগত্য করা না হ'লে 'শক্তি' বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যে তত্ত্ব সামাজিক জীবনের উৎপত্তিকে বলপ্রয়োগের উপর আরোপ করে, তার যথার্থ সার্থকতা হ'ল এই যে, মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে বলপ্রয়োগের অসারতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন বা পরিহার করতে শেখে। পেছনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে, শক্তি এককালে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করত; কিন্তু এখন আর তার সে সুদিন নেই। 'সে সুন্দর প্রাচীন নিয়ম, সে সহজ সরল পরিকল্পনা' আজ গুরুতর দোষে দুষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া ও তা আঁকড়িয়ে থাকা—যারা নিয়েছে আর যারা তার প্রতিরোধ করেছে, উভয়েই শক্তির অপচয় ঘটায়; কেননা ঐ শক্তি সহযোগিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ কোন মহতি প্রচেষ্টায় অনেক বেশী লাভজনকভাবে কাজে লাগাতে পারত। জংলীগাছে যেমন ফল ধরে তেমনি ক'রে যদি পৃথিবী মানুষের আকাঙ্খিত দ্রব্য উৎপন্ন ক'রে যেতে পারত, তবে জোর দখল মানুষের সফলতার সাথে অত্যন্ত বেসুরো ঠেকত। কিন্তু মানুষের কাম্য বস্তুর বৃহত্তর অংশ নির্ভর করে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও সার্থক পরিকল্পনার উপর। তাই বলপ্রয়োগের অবসান জ্ঞানী-গুণীদের নিকট অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মনে হয়।[২] মানুষ কালে বলপ্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে; আর এর এক বিরাট অংশ পরিহার করে। অবশ্য বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে লজ্জিত হয়ে বা অধিকতর বিবেকবান হয়ে মানুষ তা নিশ্চয়ই করে নি। এর মূল কারণ হ'ল, মানুষ তার অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান থেকে সামাজজীবনের সুফল, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সুষম ফল সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে।

১। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়।

২। ঐ

www.nagorikpathagar.org

সমাজের মধ্যে শুধুমাত্র অপ্রকৃতিস্থ ও নির্বোধরাই বলপ্রয়োগে তাদে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। পাশবিক বল তেমন কোন পুরস্কার পায় না। কোন রূঢ় ব্যক্তি শক্তিগর্বে তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে। দৈহিক পরিশ্রমের নিম্নতম পর্যায়ে শক্তি মুষ্টিভিক্ষাও পেতে পারে; কিন্তু মানবিক সম্পদের মধ্যে এটি সব থেকে কম পুরস্কার পায়। শক্তি বুদ্ধির নগণ্যতম ভৃত্য। একে শৃঙ্খলিত রাখা হয়; কেননা দুর্ভাগ্যক্রমে তা মুক্তি পেলে জীবন ও জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় ও মানবের মুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজ-কারবার থেকে উদ্ভূত সুযোগ ও সন্তুষ্টিকে পদদলিত করে। এ অনাহুত; তাই এ দুঃখ ও ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাই তাকে শৃঙ্খলিত রাখা হয়। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনদিন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তবে শক্তি শুধু যে পার্থিব মঙ্গলকে ধ্বংস করে তা নয়; সাথে সাথে সাংস্কৃতিক জীবনবোধ, সত্যের সারবস্তু, মনের ক্রিয়া ও চিন্তার উদারতাও বিধ্বস্ত হয়।

তাই কি আমরা বলতে পারি যে, আমাদের প্রকৃতির সে ভয়ঙ্কর ও আদিম প্রবৃত্তিগুলোর উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা রাষ্ট্রকে দাঁড় করাই; যার সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলপ্রয়োগের প্রভাব এড়িয়ে চলি। যেমন ক'রে প্রাচীন হিব্রুরা প্রতীকের মাধ্যমে তাদের পাপ ও গ্লানিকে কোন ব্যক্তি বা দেবতার উপর চাপিয়ে দিত? আমরা কি নিজেদেরকে নিজেদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য শক্তিকে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ ক'রে যাথার্থ প্রভু সৃষ্টি করতে একে অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হই? এমনি ধারণা আবার বিষয়টিকে অহেতুক সহজতর ক'রে তোলে; যদিও তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বলপ্রয়োগের ব্যাপারকে অত্যধিক বাড়িয়ে প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা আত্মরক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করি না। সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার তাদের বলপ্রয়োগের সামাজিক স্বীকৃতি মাত্র নয়। বাধ্যকরণ ক্ষমতা রাষ্ট্রের পরিচায়ক বটে; কিন্তু তা রাষ্ট্রের সারকথা নয়। সূক্ষ্মতর ও অধিকতর অপ্রতিরোধ্য অন্যান্য অনেক প্রভাব সমাজে বিদ্যমান; যা আমাদের বাধা দেয় ও সংযত করে।

শাস্তির বিধান দিয়ে আইন চৌর্যবৃত্তি ও হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে। কিন্তু শাস্তির ভয়েই যে আমরা অধিকাংশ চুরি করি না বা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত

www.nagorikpathagar.org

হই না, তা নয়। আমাদের সাথে সাথে সামাজিক প্রবণতাগুলোর জন্ম হয়, যা হ'ল অতীত ঐতিহ্য—দিগন্তবিহীন অতীত; যা এখন আমাদের জীবনের টানাপোড়েন। শিক্ষা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগুলো আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে যখন আমরা সাথে সাথে অনুভব করি সমাজের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা ও এদের সুযোগ-সুবিধার কথা। আমাদের সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আভ্যন্তরীণ শুভচেতনা দমন ক'রে থাকে অথবা আমাদের চারদিকে যে সমাজ, তারই জনমতের বৃহত্তর নিন্দাবাদ তা নিয়ন্ত্রণ করে। নেহাত অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে তারা সীমা লঙ্ঘন করে এবং বলপ্রয়োগের আওতায় এসে পড়ে। বলপ্রয়োগের ভিত্তিও হ'ল সমাজের বিচার-বুদ্ধি। জনগণ আইনের পেছনে এসে না দাঁড়ালে সে শক্তিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য অনেক প্রথা ও সামাজিক রীতি-নীতি আছে, যার পেছনে কোন আইনের সমর্থন নেই; অথচ তারাও পূর্ণ আনুগত্য লাভ করে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেমন জীবন ব্যবস্থার বিরোধী কতকগুলো প্রবণতা থাকে, সমাজে তেমনি থাকে কতকগুলো লোক; যারা সামাজিক জীবনবোধকে থোড়াই পরোয়া করে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করতে হয়। যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের এমনি মতিগতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হ'ল সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রেই প্রলোভন হয়ে ওঠে দুর্বার। এটাও বলা প্রয়োজন যে, এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থাও হচ্ছে সব চেয়ে বেশী ত্রুটিপূর্ণ। সুযোগ-সুবিধার ভয়ঙ্কর অসাম্য ও প্রয়োজনের ভীষণ তাগিদ—মূলত: এ দুটোর জন্যই এখানে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যার যে অংশ প্রতিনিয়ত দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত নয়, তারা সাধারণত: সম্পত্তির নিয়ম-কানুন ভাঙ্গে না। দারিদ্রযন্ত্রণায় কাতর জনসংখ্যার বিরাট অংশ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়; যদিও তাদের জৈবিক প্রয়োজন পর্যন্ত আইন মেটাতে পারে না; কেননা তারা সমাজের ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ। যে সমাজ অনাহার ও আশ্রয়হীনতার মত দু'টি অভিশাপ থেকে মুক্ত, সেখানে বল-প্রয়োগের সুযোগ এত কমে যায় যে, কারো চোখে রাষ্ট্রের পুলিশী কাজ ধরা দেয় না। যেখানে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে অনুভব করা হয়, সেখানে বুঝতে হবে—অসুস্থতার লক্ষণ বর্তমান।

www.nagorikpathagar.org

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সাধারণভাবে সংখ্যালঘুকে ভয় দেখিয়ে তাদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে না। সংখ্যালঘু তাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়; কেননা সে সমাজিক দৃষ্টিভংগী তাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে। যখন তাদের সে সম্মতি অন্য কোন সর্বসম্মত বিধির বিরোধী হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্রের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রের পক্ষে তার নিয়মনিষ্ঠ বলপ্রয়োগের নীতি প্রত্যাহার করা হবে জ্ঞানীর কাজ; যদি না অন্যকোন বিশেষ সুবিধার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করা হয়। সাধারণ ইচ্ছা ভঙ্গ করলে চূড়ান্ত সার্বভৌম বিপদের সম্মুখীন হয়। "১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে পার্লামেন্টের এক আইনের সার্বভৌমত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল আলাস্টার। ঐ আইনে আয়ারল্যাণ্ডকে স্ব-শাসন দান করা হয়। বিবেকের নামে সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। তার চারদিক ঘিরে আবেগ ও ব্যক্তিত্বের যে কোন আলো-আঁধারী বিরাজ করুক না কেন; মোট কথা দাঁড়ায় এই, একটা বে-আইনীভাবে সংঘটিত বিরোধী দলের দৃঢ়প্রত্যয়ের সামনে আইন-পরিষদ ও মন্ত্রিমণ্ডলী উভয়ই অসহায় হয়ে পড়েছিল। নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে যাঁরা আন্দোলন করেন, তাঁরাও আট বছরের উপর দেশের সাধারণ আইন-কানুনকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হন। আজকে খুব কম লোকই সে উপেক্ষার কারণ সম্বন্ধে সন্দেহই পোষণ করেন। সে আন্দোলনের পেছনে ছিল শক্তিশালী এক নৈতিক সমর্থন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের সামরিক আইনকে যারা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তারাও রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের অসারতা ও তার অসহায়তা প্রমাণ করেছে।[১] সাধারণ অবস্থায় যা আনুগত্য নির্ধারণ করে, এসব দৃষ্টান্ত তা থেকে স্বতন্ত্র। যে রাষ্ট্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠিকে অনুগত করবার জন্য বারে বারে বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করে, তার ভাগ্য মন্দ; কেননা এ অবস্থায় বিপ্লব দেখা দিতে পারে।

কিন্তু রাষ্ট্র যে এক ক্ষমতা, এ মতবাদের সমর্থকরা; এর উত্তরে বলবেন যে, রাষ্ট্রের আসল রূপ তার সদস্যদের সম্পর্কে প্রকাশিত হয় না; বরং তা প্রকাশিত হয় অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঐক্যে। যখন রাষ্ট্র তার পূর্ণ সংহতি নিয়ে কাজ করে এবং যখন তার অভ্যন্তরে কোন বিভেদ থাকে না, তখন রাষ্ট্র সত্যিই ক্ষমতার স্বরূপে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি হিসেবে নাগরিকরা যে ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত থাকে, রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তারা

১। লাস্কির (*Laski*) '*Anthority in the Modern State*' গ্রন্থের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

সে শক্তিরূপী দানবের প্রচণ্ডতায় অংশীদার হন। রাজনীতির বাস্তবতায় তা ধরা পড়ে; তখন রাষ্ট্র কোন বিজয়াভিযানে বা কোন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার দুর্বার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, বা 'লৌহ বা স্বর্ণ আহরণের' জন্য যুদ্ধে নেমেছে বা ভদ্রবেশে অথচ দৃঢ়ভাবে দেশীয় শক্তি ও সামুদ্রিক শক্তির কুটনীতির খেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য এটাও খুব সাদামাটা বাস্তবতা এবং ঘটনার সাথে এখানেও দেখা যায় অসংগতি। আধুনিক বিশ্বে অন্যের উপর বলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করবার জন্য কোন রাষ্ট্রই তেমন শক্তিশালী নয়; কেননা তা হ'লে অন্য রাষ্ট্রগুলো জোট বেঁধে তা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তি পৃথিবীর অনুন্নত অংশে কোন দখল কায়েম করতে সফল হয় বটে; কিন্তু এখানেও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্বের দাবীদার; যদিও তার কোন হাতিয়ার থাকে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ'ল কোন জাতির উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ মাত্র। অন্য ক্ষেত্রের মত এখানেও এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, সব রকম শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে জনগণের চরিত্রবল এবং তাদের সুপরিচালিত মনোবল। সাদাচোখে তাই মনে হয় ক্ষমতা, এবং লোকেরা ভুল ক'রে একে কারণ বলে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু আসলে তাই যদি শক্তির কারণ হ'ত, তবে সংখ্যাই সর্বত্র ক্ষমতার পরিচায়ক হত; কিন্তু জনগণের বল তার সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি পায় না। বিরাট এলাকার মালিকানা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি না ও করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী লেখক শিলী (*Seeley*) এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভারত-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি না করে বরং তার দায়িত্ব বাড়িয়ে তুলেছিল। যেখানে রয়েছে সহযোগিতা, সংহতি ও সাধারণ লক্ষ্য; সেখানেই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এগুলো যত বৃদ্ধি পায়, বলপ্রয়োগ ততই নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং তাতে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে।

আধুনিক রাষ্ট্র প্রধানতঃ যে শক্তি প্রয়োগে বিস্তার লাভ করেছে, তা ও বলা চলে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয়িত হয়েছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার ফলে কোন পক্ষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ তো হয় নি; বরং উভয়পক্ষই সীমাহীন ধ্বংস তাণ্ডবে মেতে ওঠে। সম্প্রসারণের মূলে রয়েছে প্রধানতঃ সৃজনশীল শক্তি।

www.nagorikpathagar.org

কোনরূপে ধ্বংসাত্মক শক্তির ফল তা নয়। সতর শতকে ইংলণ্ডের সম্প্রসারণ মূলতঃ ছিল সমাজের সম্প্রসারণ; রাষ্ট্রের নয়। রাষ্ট্রের চাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে গিয়ে সমাজ সম্প্রসারিত হয় এবং যখন ফ্রান্সের সাথে সংঘর্ষ ও কানাডা বিজয়ের পর রাষ্ট্র সম্প্রসারণশীল সমাজকে অনুসরণ করতে ও পুনঃ চাপ প্রয়োগে এগিয়ে আসে, তখন সে চাপকে প্রতিরোধ করবার জন্য তথা সাম্রাজ্যকে প্রতিরোধ করবার জন্য নতুন রাষ্ট্রগুলোর এক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আর একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় যা নামমাত্র ছিল সাম্রাজ্য; কিন্তু তার রাজকীয় দাবী এমনভাবে সীমিত হয়ে পড়ে যে, মূল রাষ্ট্র শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান-সূচক প্রেসিডেণ্ট পদবী লাভেই সন্তুষ্ট থাকে এবং যুদ্ধের সময় ঐসব রাষ্ট্রের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েই খুশী হয়। কিন্তু যেহেতু বাস্তব সম্প্রসারণ হয় সামাজিক; তাই এটা ছিল প্রধানতঃ শান্তিপূর্ণ। স্প্যানিশ, ডাচ, ফরাসী বা জার্মান সমাজকে উৎখাত করে বা তাদেরকে বাদ দিয়ে ইংরেজ সমাজের সম্প্রসারণ হয় নি। নৌবহরের পরাজয়, ক্রমওয়েলের বিলম্বিত (স্পেন বিরোধী) ধর্মযুদ্ধ এবং জেঙ্কিসের কানের যুদ্ধ'—কোনটিই মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন সভ্যতার বিস্তারকে প্রতিহত করতে পারে নি; অথবা যদি মণ্টকাম কুইবেকে উল্ফকে পরাজিত করত, তবে মিসিসিপির জলাভূমি ও ম্যানিটোবার প্রেইরী অঞ্চলে ফরাসী অভিযাত্রীরা দখল কায়েম করত, এ ভেবেও লাভ নেই।[১]

ইংলণ্ডের সম্প্রসারণ ও আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের মূলে শক্তির প্রভাবকে মূল হিসেবে ধরলে দু'টো মৌলিক উপাদানের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসে। একটি হ'ল তার অবস্থান ও সম্পদের অর্থনৈতিক সুবিধা। সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিগুলো নিয়ত নীরবে কর্মরত থেকে ইংলণ্ডকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থের নতুন এক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিল। আর একটি হ'ল সেখানকার জনগণের চরিত্রবল। সাহসিকতা ও দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে এবং তাদের গভীর দূরদৃষ্টি ও শ্রমের মাধ্যমে তারা সে সুবিধাজনক অবস্থাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। শক্তি হচ্ছে পরিমাণগত; অমার্জিত যান্ত্রিক এক পদ্ধতি বিশেষ; কিন্তু চরিত্র হচ্ছে গুণবাচক এবং এরই উপর নির্ভর করে

১। কনরেড গিলের (*Conrad Gill*)। *'National Power and Prosperity'* গ্রন্থে আনউইনের (*Unwin*) ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

সফল সৃষ্টি ও সফল অগ্রগতি। শেষপর্যায়ে যে নির্বুদ্ধিতা শক্তির উপর নির্ভরশীল, তার বিরুদ্ধে চরিত্রকে বল প্রয়োগ করতে হয়।

শক্তি আমাদের শুধুমাত্র শক্তির হাত থেকে রেহাই দেয়। মানুষ তরবারীর প্রশংসা করে; কেননা তা তরবারীর উপর জয়মাল্য বয়ে আনে বা পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। প্রত্যেক দেশে সামরিক বাহিনী নিয়ে গাঁথা রচিত হয়; কেননা তাই আমাদের রক্ষা করে; এক দেশ অন্যের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে যে বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতা তুলে ধরে কোন একটি রাষ্ট্রের ঘটনা যেন তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে ফেলে। পরে যখন যোগ-বিয়োগে সব কাটাকাটি হয়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের হেফাজতে যে অবশিষ্টটুকু থাকে, তা তার বিরাট ব্যয়ভারের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্যই মনে হয়। এর মধ্যে জাতীয়তার মতাদর্শের জন্য ক্ষমতার আদর্শকে সমুন্নত করে তোলা হয়েছে এবং এতে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে; তার ফলে বিভিন্ন জাতি হতবুদ্ধি ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, এতে সরকার ক্ষমতার মনস্তত্ত্বে খুব কম নির্ভরশীল। যারা ক্ষমতাপ্রয়োগ করে তারা তাকে অনেক বড় ক'রে দেখে। ক্ষমতা অপ্রতিহত ও দায়িত্বহীন হ'লে তো কথায় নেই। ধনিকতন্ত্রে শাসকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এক মনোভাব গ'ড়ে ওঠে এবং শাসন কার্যে তাদের দক্ষতা বা আন্তরিকতার সাথে এ শ্রেষ্ঠত্বের কোন সম্পর্ক থাকে না। শাসকরা হ'ল প্রভু এবং শাসিতরা হ'ল তাদের ভৃত্য। কোন কিছুর কারণ সন্ধান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কর্তৃত্বের উৎস সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং দাসত্বের মূলে সমর্থন যোগাবে ক্ষমতা। এ দৃষ্টিভংগীর সাথে সুর মিলিয়ে ধনিকতন্ত্র জনগণের মধ্যে জাতীয় ক্ষমতার ভ্রান্ত ধারণা বড় ক'রে তু'লে ধরবে; যাতে মনস্তাত্বিক দিক থেকে তাদের নিজের আনুগত্য নিশ্চিত থাকে। অপর দিকে, গণতন্ত্রে কর্তৃত্বকে মনে করা হয় এক জিম্মা বা ন্যস্ত দায়িত্ব রূপে। গণতন্ত্রে শাসক হয় এক সাথে প্রভু ও ভৃত্য, এবং তাই ক্ষমতার প্রলোভন থেকে শাসক মুক্ত থাকে। সাধারণ স্বার্থ, সাধারণ মঙ্গল শুধু যে সরকারের আদর্শের লক্ষ্যে পরিণত হয় তাই নয়। তা সরকারের যৌক্তিকতাও প্রমাণ করে। বলপ্রয়োগের কর্মক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ে;

www.nagorikpathagar.org

কারণ তখন শক্তিকে শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় না; বরং তার বিচার হয় সমাজে তার উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। সে মূল্যায়ন তখনও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে; কিন্তু তা অনেক বেশী সত্যানুসারী হয়।

শক্তির কার্যকারিতার বিচার-বিবেচনায় এখনও প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয় নি। বলপ্রয়োগের অত্যন্ত সীমিত কার্যকারিতা থাকা সত্বেও তা রাষ্ট্রের সারবস্তু হ'তে পারে। ফলে শক্তির গৌরবকে হীনপ্রভ করে দেখতে গিয়ে রাষ্ট্রকেই আমরা হীনপ্রভ করে দেখি। ডুগে একথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেন যে, শক্তি হ'ল রাষ্ট্রের প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তিনি এও বলেন যে, নীতি হিসাবে বলপ্রয়োগের সার্বজনীন প্রয়োগ হ'তে পারে না। [১]

এটাও সত্য যে, এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে দুর্দমনীয় ক্ষমতার ব্যঞ্জনা নেই; রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল তাই। এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যার অভ্যন্তরে অন্যকোন সংঘ বাধ্যকরী ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। অবশ্য এমন রাষ্ট্রেরও কোন সন্ধান মেলে না যেখানে অন্তহীন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। কিন্তু বলপ্রয়োগের ফলে কোন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি বা কোন লুণ্ঠনকারী দস্যুজাহাজ বা বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। শক্তি থাকতেই হবে এবং তা হবে দুর্বার; কিন্তু সে শক্তি হবে প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত ও সর্বসম্মত। বল প্রয়োগ রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি নয়, বরং রাষ্ট্র হ'ল এক সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা; যেখানে সবরকম সামাজিক কাজকর্ম বিকশিত হয়ে ওঠে। এ জীবন ব্যবস্থার একটা শর্ত হ'ল, তাকে সংরক্ষণ করবার জন্য এক শক্তি যা কোন ওলোট পালট বা বিশৃঙ্খলাকে প্রতিহত করবে এবং যখনই এ সৌধে কোন ভাঙ্গন দেখা দেবে তখনই তার প্রতিকার করবে বা তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এ সৌধকেও অত্যন্ত শক্তিশালী হ'তে হবে; কেননা তা না হ'লে কোনরূপ সংস্কারেও তা টিকবে না। রাষ্ট্রের আওতায় যে সার্বজনীনতা বিরাজ করে, তার জন্যই বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র যা করে তা এ জ্ঞান নিয়ে করা উচিত যে, তা যেন কেও অমান্য না করে। সাধারণ ইচ্ছার উপর আনুগত্য নির্ভর করে। কোনরূপ

১। ডুগের (*Duguit*) *'Traite de Droit Constitutional'* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

লঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করবার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন; কিন্তু একটা মৌলিক সম্মতি আছে ব'লেই বলপ্রয়োগ সম্ভব হয়। সম্মতিই হ'ল নিয়ম; বলপ্রয়োগ ব্যতিক্রম মাত্র।

রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীনে ক্ষমতা হ'ল এক মহামূল্যবান সম্পদ; কারণ একটা স্থায়ী ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা এবং সতত: সঞ্চরমান ও অনিশ্চিত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ জন্যই সম্প্রদায় রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা ও তার প্রয়োগ অধিকার তুলে দিয়েছে। সাধারণ ইচ্ছা অনুসারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব রয়েছে, এ অধিকার তারই অনুসিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সম্প্রদায় সাধারণভাবে সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয় নি; বরং তুলে দিয়েছে আইন সংরক্ষক হিসাবে সরকারের হাতে। রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল আইন রচনা করা। এ সৃষ্টি কিন্তু প্রয়োগ অধিকার থেকে অনেক ব্যাপক। সামাজিক সংগঠনের জন্য এ হ'ল এক বিরাট কাজ। রাষ্ট্র যেহেতু এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাই পাশে রেখেছে শক্তির হাতিয়ার। কিন্তু তার লক্ষ্য হ'ল, কোন বিঘ্ন বা আক্রমণকে প্রতিহত করা। হাতিয়ারটি হ'ল তার অধিকারের মানদণ্ড; কিন্তু তার প্রয়োগ হচ্ছে ফলাফল মাত্র; তার মহত্তর কাজের ফলশ্রুতি। যে সৌধ রাষ্ট্র নির্মাণ করে নিয়ত সে তার প্রহরায় রত; কিন্তু এ প্রহরা হ'ল সৌধের জন্য এবং এটিই হ'ল রাষ্ট্রের মহত্তম সৃষ্টি।

দুই: বিশ্ব শক্তিরূপে বিখ্যাত রাষ্ট্রচক্র

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি বৃহৎ রাষ্ট্র একক সূর্যের মত নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করত। সম্ভবত: তাদের চারিদিক ঘিরে থাকত উপগ্রহমণ্ডলী; কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের সহযোগে তারা নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করত না। সাধারণত: এক এক সভ্যতার এক একটি রাষ্ট্রেই আধিপত্যের আলো বিকিরণ করেছে। সে আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অন্য কোন রাষ্ট্রের উদয় হ'লে আমরণ সংগ্রামে তারা লিপ্ত হ'ত এবং শেষপর্যন্ত টিকত একটিই। রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে সংঘর্ষ এ তারই নমুনা। আধুনিক বিশ্বের প্রারম্ভে একই পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম হ'লে এ অবস্থা কেটে যায়। কোন একটির পরম প্রতাপের ফলে তাদের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের অবসান কোনদিন হয় নি কিছু দিনের জন্য স্পেন চারিদিকে আলো ক'রে জ্বলে উঠল। ফ্রান্স কিছু দিনের মত মহাদেশের প্রভাবশালী

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল; এমন কি ইংলণ্ডও তার সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করল। কিন্তু যতই ভীতির অবতারণা করুক না কেন, কোন একটি অন্যগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারল না। ক্ষমতার উৎসও অত্যন্ত ব্যাপক এবং সাধারণ সভ্যতার পরিব্যাপ্তিও ছিল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ।

এসব প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের অসংখ্য খণ্ডের মধ্য দিয়ে একটির সাথে অন্যটির সম্পর্কের নতুন এক মতবাদ গ'ড়ে উঠল। বাহ্যিক শক্তির মানদণ্ডে এ মতবাদ তখনও সম্পৃক্ত; কিন্তু সে চক্রে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছিল। প্রথম অবস্থায় এগুলোই ছিল ইউরোপের প্রধান শক্তি; প্রভুত্বের নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নেপোলিয়ন যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তারপর 'পাঁচ প্রধান' (আজকের ভাষায় বলতে গেলে তাই হবে সঙ্গত) অস্বস্তিকর এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খা উপেক্ষাকারী আপোষ রক্ষায় নির্ভরশীল ছিল এ মৈত্রীবন্ধন। উনিশ শতকে যখন এর আবেদন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যখন জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয় ও সম্মিলিত ইতালীর জন্ম হয় এবং সর্বোপরি পৃথিবীর অনুন্নত অংশে মালিকানা কায়েম করার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়, তখন বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যে অস্বস্তিকর মৈত্রীজোট গড়ে উঠেছিল তার অবসান ঘটে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে 'ক্ষমতার ভারসাম্য' রক্ষার জন্য নতুন নতুন অস্থায়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা জোটের সৃষ্টি করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের অবস্থা ছিল ঠিক এমনি।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ইউরোপের শক্তিগুলো 'বিশ্বশক্তিতে' রূপান্তরিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতা সমগ্র বিশ্বের কন্দরে কন্দরে প্রবেশ করে। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য পাঁচটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের অন্যান্য অংশ অধিকার কায়েম করা ছাড়াও ফ্রান্স আফ্রিকার এক বিরাট ভূখণ্ড দখলে নিয়ে আসে। ইউরোপীয় সভ্যতার লুটের মাল ভাগ ক'রে নিতে জার্মানীও খেলায় নেমে আসে; যদিও অনেক দেরীতে। রাশিয়া দুটো মহাদেশ ছেয়ে ফেলে। মূলে ও বৈশিষ্ট্যে ইউরোপীয়; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নীতি পরিত্যাগ করে 'বিশ্বব্যবস্থার' সমস্যায় অংশীদার হ'তে ছুটে এল। সর্বশেষে, এশিয়ার রাষ্ট্র জাপান ও ইউরোপের অর্থনৈতিক সভ্যতা অনুসরণ করে ও তার সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বশক্তির আর একজন দাবীদার হয়ে উঠল।

www.nagorikpathagar.org

এসব পরবর্তী রূপান্তরের ফলাফল বিবেচনা করার আগে ইউরোপের নিজস্ব 'ক্ষমতাদর্শের' কার্যকারিতা সম্পর্কে ভেবে দেখা যাক। প্রত্যেক রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত চরম সার্বভৌমের ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির স্বার্থ যতই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত থাক না কেন, 'ক্ষমতা জোট' ছাড়া বিশেষ কিছু আশা করা যেত না। কিন্তু ক্ষমতার মালিকদের মধ্যে এরূপ বোঝাপড়া ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। প্রচলিতবাদ, মর্যাদার স্বীকৃতি ও স্থিতি মেনে নিয়েই তাদের মধ্যে এরূপ মৈত্রী গঠিত হ'ত। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেকটি নতুন দাবীতে তা ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা দেখা দিত ও তাতে পারস্পরিক ইচ্ছা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ত। তারা অধিবেশনে বসত, কিন্তু প্রত্যেকের হাত থাকত তরবারীর বাঁটের উপর এবং আগেই হোক আর পরেই হোক, তরবারী উন্মুক্ত হতই। ঘটনার গুরুত্ব তেমন আমলে আনা হ'ত না। অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিনিধি বিরোধিতার সম্মুখীন হ'লে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে যে মূল্য দিতে হয়, সে তার বিচার করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। লক্ষ্যের সাথে পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য থাকে না। অন্যান্য সংস্থা ও দায়িত্বহীন ক্ষমতার মধ্যে এই হ'ল তফাৎ। শক্তি শক্তিছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নোয়ায় না—তা এ পথে যতই সাংস্কৃতিক ও পার্থিব লাভ বিনষ্ট হোক না কেন, আত্মিক বিবেচনাই এখানে প্রাধান্য পায়। সর্ববোধ মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং সম্মানবোধকে আবাহণ করা হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার গৌরব ও মর্যাদাবোধে জার্মান উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ ক্ষমতার মালিকানা যাদের হাতে, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আভাষ ইঙ্গিতে এ মনোভাব আরও জোরদার হয়ে ওঠে। যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা হ'ল অনিয়ন্ত্রিত; সেখানে জাগণের প্রকৃত স্বার্থ শাসকদের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এটাই হ'ল ক্ষমতার মনস্তত্ত্ব, এবং এর প্রভাবে সঠিক কোন সংগঠনের পরিবর্তে গড়ে ওঠে অস্থায়ী এক 'ক্ষমতা জোট'। ইউরোপের মৈত্রী চুক্তির দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে ক্ষমতা কোন দায়িত্ব বোধে আবদ্ধ নয় সেখানে তার এমন বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে ইতিহাসে এমনি হাজারো দৃষ্টান্ত মেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে সম্মিলিত কর্মসূচীর জন্য ও কেন্দ্রীয় নির্দেশনার জন্য মিত্রপক্ষের মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলেছিল, তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। জেনারেল ডয়েস (Dawes) বলেন:

www.nagorikpathagar.org

'যুদ্ধকালেই হোক আর শান্তিকালেই হোক, মিত্রপক্ষের সাধারণ নীতি নির্ধারণের অসুবিধাগুলো কোন দেশেই সাধারণ নাগরিকরা অনুধাবন করতে পারে না। সংকটকালে মিত্রপক্ষের নীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক কোন চুক্তি গ'ড়ে তুলতে লাগত প্রচুর সময়। যে যে বাধা-বিপত্তিকে প্রথমে ভেঙ্গেচুরে দিতে হবে, তাও তারা বুঝত না। এসব বাধা-বিপত্তি গ'ড়ে উঠত জাতীয় গৌরববোধ থেকে ও মিত্র পক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তার গর্ববোধ ও স্বার্থপরতা থেকে। তাদের ক্ষমতা ব্যাহত হ'ত সমন্বয় সাধনের জন্য প্রণীত যে কোন আইনের ও সকল দেশের জাতীয়তাবাদী বক্তাদের নিয়ত ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে।[১] এমনি দুর্দিনেও ক্ষমতার ঈর্ষার মুখে সাধারণ বিষয়ের গুরুত্ব কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াত না।

কিন্তু ক্ষমতা হচ্ছে মারাত্মক ও ভয়াবহ এক জিনিস। যখন ক্ষমতা জোট ভেঙ্গে যায় তখন একে অন্যের সাথে জোট বাঁধতে এগিয়ে আসে। কিন্তু সকলের সাথে জোট বাঁধবার কোনরূপ প্রচেষ্টা কেহ করে নি বরং ক্ষমতার সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সকলে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কো এশিয়া' যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বাহ্যিক ইতিহাসে দেখা যায়, নিয়ত পরিবর্তনশীল সম্পর্কে এক অদ্ভূত চিত্র। ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখাটাই ছিল তখন মূল উদ্দেশ্য। তাদের পুরোনো চুক্তি নতুন করে ঢালাই করা হ'লেও তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ইতালী ও অষ্ট্রিয়া সহযোগে জার্মানী এক নতুন চুক্তি সম্পন্ন করে। তাই বিখ্যাত 'তিন এর মৈত্রী' বা 'ট্রিপল এ্যালাইন্স' নামে পরিচিত। রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইংলণ্ড উপনিবেশিক দাবীতে তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে ঝগড়া করার পর জার্মানীর নৌ-শক্তির অগ্রগতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পুরোনো শত্রুর সাথে আর একটা নতুন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং 'শক্তিসাম্য' ইউরোপের তিনটি বৃহৎ শক্তিকে তিনটি শক্তিজোটে আবদ্ধ করে এবং রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, সাইবেরিয়া ও তুর্কীর মত ছোট ছোট শক্তিগুলো এক এক দলে ভীড়ে যায়। সাথে সাথে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই নিজ নিজ সামরিক নৌশক্তি বৃদ্ধি করতে উঠে পড়ে লেগে যায়; কেননা কেহ সে 'শক্তি সাম্যের' উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। প্রত্যেকেই অন্যদের বিরুদ্ধে নিজের স্থিতির নিশ্চয়তাবিধানে মনোযোগী হয় এবং ফলে সকলেই সে পথ অনুসরণ করতে থাকে।

১। জেনারেল ডয়েসের (*Dawes*) ১৯২৪ সনের ১৪ই জানুয়ারীর বক্তৃতা।

www.nagorikpathagar.org

আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা হ'ল একই জিনিসের বৈদেশিক আভ্যন্তরীণ দুটি দিক। ফলে প্রত্যেকের শক্তিবৃদ্ধিতে সকলেরই অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর ইতিহাস হ'ল নিজেদের সীমিত লক্ষ্য অর্জনে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতার কাহিনী। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের এ হেন ব্যর্থতার মূলে ছিল আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকে বৈদেশিক বিষয়ের বিচ্ছিন্নতা এবং এরূপ বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের প্রাচীন মতবাদের কুফলে। সৃষ্টি হ'ল বেশ কতগুলো গোপন চুক্তি ও রণ-কৌশলগত কতকগুলো সন্ধি। কোন অদৃশ্যহাতের ইঙ্গিতে রাষ্ট্রগুলো যেন পরিচালিত হ'ত। রাশিয়া পরিচালিত হয়েছে সাজোনোফ (Sazonoff) ও ইশ্বলস্কির (Iswolsky) মত কূটনীতিবিদদের চালে। অষ্ট্রিয়ার ভীতি প্রদর্শনের নীতির পেছনে ছিলেন বার্চটোল্ডের (Berchtold) মত নীতিবিশারদ। জার্মানীর কাজ-কর্মের অভ্যন্তরে ছিল ভন তিরপিজ (Tirpitz) ও লুডেন ডর্ফের (Luden dorff) মত লোকের হাত। শেষপর্যন্ত তা এক পরভূত উচ্চাকাঙ্খা, ছিন্নভিন্ন উচ্চাশাও ব্যর্থ প্রয়াসের এক গ্লানিময় ছবিতে পরিণত হয়। কেও কারও কাছে মাথা নোয়াবে না ; কেননা অহঙ্কার ও ভীতির কালো ছায়ায় সকলে মন স্থির করে ফেলেছে। এভাবে শেষ কালে এক হতভাগ্য হত্যাকারীর খড়গ বলকান রাষ্ট্রে ধ্বংস, মিথ্যা ও ঘৃণার এক হিমবাহের পথকে পিচ্ছিল ক'রে তোলে। আকাশে বাতাসে মহৎ আদর্শের আবেদন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'লেও তখন আসলে মানুষের সমগ্র সভ্যতা ভীতচকিত হয়ে ওঠে।

"তিনটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বেসামরিক নেতৃবর্গ ভীতিতে অন্ধ এবং উপদেশ বাণীতে বধির হয়ে উঠেছিল। যখন চরম মুহূর্ত এগিয়ে এল তখনও কেও বিশ্বকে এ ধ্বংসের আগুন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না। কারো সম্বন্ধে অবশ্য এ অভিযোগ আনা যায় না যে, তারা ইচ্ছা ক'রে এ ধ্বংস স্রোতের ধারাকে প্রবাহিত করেছে ; তথাপি এটা বলা চলে যে, তখন তারা যে পথ বেছে নিয়েছিল তা ছিল মৃত্যু-গহবরের পথ—ধ্বংসের পথ। মহাযুদ্ধের সীমাহীন মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

ঐসব নোংরা পরিচালককে নিন্দাবাদ দিলেই চলবে না, এর জন্য নিন্দাবাদের যোগ্য হচ্ছে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যবাদী পরিবেশও। তারা এ পরিস্থিতিতে কাজ করলেও তার গতিরুদ্ধ করবার জন্য তেমন কিছুই করেন নি।"[১]

ইতিহাসের এ আলোকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মতবাদে যে ভয়ঙ্কর ত্রুটি বিরাজ করত, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ক্ষমতার দম্ভ সরকারের হাতিয়ারাকে রূপান্তরিত করেছিল 'মানুষের এক প্রভুতে।' ক্ষমতাসীনদের অভিপ্রায়, তাদের অহঙ্কার ও মর্যাদাবোধ জাতির আসল স্বার্থের উপরে স্থান লাভ করেছিল। ফলে রাষ্ট্র এক লোকোত্তর রূপ পরিগ্রহ করে এবং জনগণের মঙ্গলকে ছাড়িয়ে নিজের ক্ষমতাদম্ভে এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এ ছিল যেন এক 'দেবতা' বা প্রতিমূর্তি। মানুষকে তার সেবা করতে হত এবং তারজন্য সব কিছু বিসর্জনও দিতে হ'ত। মানুষ তার গৌরবের ভক্তে পরিণত হয়েছিল, এবং সে গৌরব যেন তাদের বাইরে ও ঊর্ধ্বে এক নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ছিল। তারা তার সম্মানের ভৃত্যে পরিণত হয় এবং সে সম্মানও যেন ছিল তাদের নিজের জীবন থেকে মহত্তর কিছু। সাধারণ ইচ্ছা ক্ষমতাচক্রের এমনি 'অসাধারণ রাষ্ট্র জীবকে' সচেতন করতেও নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়। এর ফল হ'ল, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র শাসকচক্র আদর্শে বিভ্রান্ত হয়ে এমনসব প্রতিশ্রুতি দান করত, যার ফলে বৈদেশিক রাজনীতির ভয়ঙ্কর খেলায় সমগ্র রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ত। 'শক্তি রাষ্ট্র' হ'ল মূলত গণতন্ত্র বিরোধী; যদিও তা নিজের নৈতিকতায় সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। এ কাজে যখন সে সক্ষম হয়, তখন সে তার নিজের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। জনগণ থেকে বিছিন্ন এক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র একাজ সম্পন্ন করে এবং নিজের প্রণীত নীতিতে শুধুমাত্র তাদের সম্মতি আদায় করে। কিন্তু চূড়ান্ত সার্বভৌমরূপে জনগণ কোন সময়ই রাষ্ট্রের নীতিতে মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

তাছাড়া, 'প্রকৃত রাজনীতির' অভ্যন্তরে যে ক্ষমতার মতবাদ রয়েছে তা ভ্রান্ত। রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা বলপ্রয়োগের কাজকর্মে কোনভাবে প্রকাশিত হয় না। শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রের এ মৌল ক্ষমতা প্রকাশিত হয়

১। গুচের (Gooch) *'History of Modern Europe'—1878–1919,* গ্রন্থের ষোল অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

জনগণের চরিত্রে ও তাদের বুদ্ধিমত্তায়। যা সুপ্ত থাকে তা ক্ষমতা নয়। বিরোধী কোন শক্তির দ্বন্দ্বে শুধুমাত্র এর প্রকাশ ঘটতে পারে। সাধারণভাবে জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে এর বিকাশ ঘটে। স্পেনের শক্তি হ্রাস পেয়েছে; কারণ এ অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তির বিকাশ এইখানে অবরুদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃতির জয় যাত্রায় সে অন্য রাষ্ট্রের সাথে চলতে অসমর্থ হয়েছে। এবং তার বাণিজ্য সম্পদও হ্রাস পেয়েছে। এমন অবস্থায় তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সে কোন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে নি। ইংলেণ্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ তার জনগণের ক্ষমতা বলে সে তার ভৌগলিক অবস্থানের ও তার খনিজ সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং সে আমলে এ দুটোরই নতুন মূল্যবোধ দেখা দেয়। ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিজয়াভিজানের ফলে তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব আসে নি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তিমূল হ'ল তার অধিবাসিদের দুঃসাহসিক অভিযান ও সৃজনশীল শক্তি; যার ফলে তারা নতুন মহাদেশের বিশাল সম্পদরাজির সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এসব কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তার স্থান হয়েছে শীর্ষস্থানীয়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, সে কোন বড় রকম দ্বন্দ্বেও অবতীর্ণ হয় নি। জার্মানীর ক্ষমতা তার শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি ও তার জনগণের গভীর অনুশীলনের উপর নির্ভশীল ছিল। জার্মানীর সামরিক নেতাদের 'ঝকঝকে অস্ত্র' বা 'বজ্রমুষ্ঠিতে' তার ক্ষমতা নিহিত ছিল না। অন্যপক্ষে, এ ক্ষমতা তার সামরিক বাহিনীর ভয়ঙ্কর বিপর্যয়কে এড়িয়েও স্থায়ী হয় ও তাকে বিজয়ীদের বাহ্যিক শক্তি দিয়েও স্থায়ীভাবে দমিয়ে রাখা যায় নি। অসম সাহসিক উদ্যম ও অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টির তুলনায় বলপ্রয়োগের সৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অস্থায়ী এবং অত্যন্ত অনিশ্চিত; বুদ্ধিমানেরা একে চরম পথ বলে গ্রহণ করে। সৎপথে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করে। নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্য কোন বিকল্প না পেলে তারা এমনি ধ্বংসাত্মক পথ অনুসরণ করে। যতদিন পর্যন্ত কোথাও অনিয়ন্ত্রিত শক্তি থাকবে, সেখানে তাকে প্রতিহত করার জন্য শক্তি থাকবেই।

বলপ্রয়োগে তেমন কিছু সৃষ্টি নাও হতে পারে; কিন্তু তা সব কিছুকে ধ্বংস করতে পারে। সব আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সে পদদলিত করতে পারে। বলপ্রয়োগ দুর্গকে যেমন ধুলায় মিশিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিতে পারে, তেমনি পারে ধর্ম-মন্দিরকেও গুঁড়িয়ে দিতে; এ সভ্যতার দেহকে যেমন ধ্বংস করতে পারে তেমনি পারে সংস্কৃতির আত্মাকে বিনষ্ট করতে। তার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে, 'শুধুমাত্র হীন প্রকৃতির ও অত্যন্ত অস্থায়ী সুযোগ-সুবিধা; কারণ কোন অর্থপূর্ণ অগ্রগতি শক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বল-প্রয়োগের এ ত্রুটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে; কেননা তার ফলে যে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার সাথে বল প্রয়োগ শুধু যে বেসুরো ঠেকছে তাই নয়; তার ফলে জাগতিক উন্নতি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক বিশেষত্ব-শীলতার মত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে; আর তার জন্য দরকার আরও সহযোগিতার। জনমত থেকে আজ ক্রীতদাস প্রথার অবসান হয়েছে। তা যে মানবতার প্রতি জঘণ্য অপরাধ ও অপমানসূচক শুধু তাই নয়; আজকের দিনের পরিস্থিতিতে ক্রীতদাস প্রথা ব্যয়বহুল ও অমিতব্যয়ী এক প্রতিষ্ঠান। উপনিবেশে স্পেনের দমন মূলক নীতির ফলে সেখানে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। মেক্সিকো ও পেরুর প্রতি তার যে আচরণ, তাতে শেষ পর্যন্ত স্পেনের নিজের অবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। রোম তার উপনিবেশগুলোয় দিয়েছিল তার নিজস্ব আইন ব্যবস্থা ও নাগরিক অধিকার; কিন্তু স্পেন তার 'জোরের রাজত্ব' ছাড়া সেখানে কিছুই দেয় নি। তাই তার সাম্রাজ্য হয় ক্ষণস্থায়ী। আধুনিক জগতে সাম্রাজ্যকে ঐচ্ছিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে এবং বিশ্ব শক্তিকে টিকে থাকতে হ'লে ক্রমশঃ বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করতে হবে। নিয়ন্ত্রণবিহীন দমন নীতির ফলে উৎপত্তি হয় একচেটিয়া অধিকার, সুবিধাদান ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের প্রতিপালন করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের চূড়ান্তরূপ ফরাসী সাম্রাজ্যের মত না হয়ে বরং হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত। ফ্রান্স তার আফ্রিকার ভূখণ্ডে কঠোরভাবে একচেটিয়া অধিকার চালিয়ে এসেছে; কিন্তু বৃটেন এক মুক্ত কমনওয়েলথ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে সহযোগিতার এক পরিবেশ সৃষ্টি করে টিকে রয়েছে।[১]

১। এ উক্তিতে সাম্রাজ্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, যদি তা কোন পরিপূর্ণ অবস্থায় রূপ লাভ করে। আফ্রিকার উপনিবেশে শাসন সংক্রান্ত যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তার মোকাবেলার জন্য ফ্রান্স যে দক্ষতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকে ছোট ক'রে দেখাবার কোন প্রচেষ্টা এখানেই নেই।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের স্বার্থ এত বিভিন্ন, এত জটিল ও এত বেশী পারস্পরিক নির্ভরশীল যে, শক্তি ভিত্তিক কোন শাসন ব্যবস্থায় বিরাট দস্যু দলের একত্রিকরণের ন্যায় সকল স্বার্থের সম্মিলনে সে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বিশ্ব শক্তির যে বৈশিষ্ট্য ও আওতা—অর্থাৎ বহুজাতি অধ্যুষিত, রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্বার্থের একত্রিকরণের মতবাদ—যা আধিপত্য ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকরী করা হবে, তা একান্ত অবাস্তব। বিশ্বশক্তি সূচনার অর্থ হ'ল জাতীয় রাষ্ট্রের বহুজাতিক রাষ্ট্র রূপায়ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রয়েছে বহু জাতির লোক। তাদের মধ্যে রয়েছে সভ্যতা ও দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রচুর অমিল, ও অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য স্বার্থেও রয়েছে বিভিন্নতা। যুক্তরাষ্ট্রও হ'ল একটা মহাদেশ ব্যাপী বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। তারা ক্ষমতার ক্ষুদ্রগণ্ডী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত হয়ে এখানে মিলিত হয়েছে এবং এ মিলনেও তাদের আদিম যুগের আধিপত্য হারিয়ে আসতে হয়েছে। ফ্রান্স ও ইতালীর মত ভূমধ্য সাগরীয় ক্ষমতাগুলোও তাদের নাগরিকত্বে বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন জাতির লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। মোট কথা, কোন রাষ্ট্রকে সার্বিকভাবে বিশ্বরাষ্ট্র রূপে বর্ণনা করা হলে সেখানে রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ ব্যাপকধর্মী হয়ে ওঠে, এবং বলপ্রয়োগের অসারতাও সেখানে প্রমাণিত হয় ততবেশী। বিশ্বরাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ইংলণ্ডের কথাই বলা যাক। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইংলণ্ড হ'ল ইউরোপীয় রাষ্ট্র ; কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্র অন্য অংশে অবস্থিত কানাডার সাথেও সে সংযুক্ত ; যদিও কানাডা ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সংস্কৃতির পর্যায় যুক্তরাষ্ট্রেরই অংশবিশেষ। তেমনি ইংলণ্ড এশিয়ায় অবস্থিত ভারতের সাথে যুক্ত—যে ভারত হ'ল প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রভূমি। বিশ্ব শক্তির পর্যায়ে উন্নীত রাষ্ট্র ও সভ্যতার এ প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য যে, এখানে বলপ্রয়োগের রাজনীতি অর্থহীন। বিশ্ব শক্তির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে এ লক্ষণ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এমত অবস্থায় বাহ্যিক শক্তি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয় না ; কারণ উল্লিখিত কারণ নির্দেশে এটা স্পষ্ট যে, হয় তেমন লক্ষ্য নেই, বা থাকলেও তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থহীন। তাছাড়াও বাহ্যিক শক্তি কোন মহৎ ধর্মযুদ্ধ বা বিরাট কোন অভিযানের শর্ত হিসেবে বা রাষ্ট্রীয় এলাকার বাইরে আইন ও শৃংখলার হাতিয়ার হিসেবে, অথবা কোন পার্থিব সম্পদ হস্তগত করার জন্য অস্ত্র

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে ব্যবহার হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে বিদেশী শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এর কিছু প্রয়োজন আছে। এ অর্থেও তা তার কবল থেকে মুক্তির এক ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক পরিবর্ত হয়ে পড়ে।

তিন : যুদ্ধে রাজনৈতিক বিবর্তন :

এক সামাজিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য আর এক সমাজিক গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োগই হ'ল যুদ্ধ। গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও আন্তঃগোষ্ঠী অনৈক্যের ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্ভব হয়। যুদ্ধের ফলে সমাজের এক অংশ অন্য অংশ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের সুস্পষ্ট স্বার্থের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে।

যুদ্ধের সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করা হ'লে বলা যায় যে, সামগ্রিক অগ্রগতির এক নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাথে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। এর সাথে সংযুক্ত থাকে এমন এক মানসিকতা, যা সামাজিক স্বার্থকে কঠোরভাবে 'নিজস্ব' ও 'স্বতন্ত্র' ক'রে দেখে। কোন অজ্ঞাত প্রারম্ভ থেকে যুদ্ধের বিবর্তন বহুদূর এগিয়ে গেলে মানুষ এক পর্যায়ে তার সাথে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য যে পর্যায়ে সে বিবর্তনের মূল সুর ক্রমেই নেতিয়ে পড়তে থাকে। যুদ্ধকে আমরা যে-ভাবে জানি, তা কিন্তু আদিম যুগের সাথে সংযুক্ত ছিল না। তখন পৃথক পৃথক পরিবারগোষ্ঠী অনিশ্চিতভাবে জীবন সংগ্রামে রত ছিল। যুদ্ধের 'দেবতা' হ'ল মানুষের এক বয়োকনিষ্ঠ 'দেবতা' এবং আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজও তার কোন স্থান নেই। তাদের মধ্যে ছিল বিছিন্ন খণ্ড, সংঘর্ষ ও আক্রমণ বা সম্পদ লুন্ঠন বা নারী অপহরণ; কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুদ্ধ যেখানে এক সৈন্যবাহিনী আর এক বাহিনীর মোকাবেলা করছে—তা ছিল তখন অজ্ঞাত। যখন তার জন্ম হয় তখনও তার গুরুত্ব তেমন ছিল না; কিন্তু উন্নত ও সভ্য সম্প্রদায়ে তার আবেদন অনেক বেড়ে যায়।

"অনেক ক্ষেত্রে অসভ্য জাতির যুদ্ধবিগ্রহ কোন বিপজ্জনক খেলা-ধুলা অপেক্ষা বেশী খারাপ ছিল না। ব্রিটিশ নিউগিনির ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জে যে কোন বড় সংঘর্ষে যেখানে কয়েক হাজার যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করত সেখানে জন ছয়েকের বেশী মরত না এবং তাতে ডজন খানেক লোকের বেশী আহত হ'ত না। নিউগিনির পূর্ব প্রান্তে যেখানে নরমাংস ভক্ষণ ও 'মস্তক শিকার' প্রচলিত ছিল, সেখানে স্থানীয় লোকেরা রাত্রিকালে

www.nagorikpathagar.org

আক্রমণ রচনা করত ও বিনা কারণে হত্যা করত এবং নারী ও শিশুরাও রেহাই পেতো না। কিন্তু যখন এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালনো হয় তখন বোঝা যায় যে, এটা ছিল এক রকম দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক অভিযান। এতে কিন্তু তেমন কোন ফলও ফলত না, দেখা যেত জন ছয়েকের মত মানুষ মারা গেছে। মারাত্মক তেমন খুনোখুনি হ'ত না। দুর্বল সম্প্রদায়গুলো দুর্ভেদ্য স্থানে সাধারণতঃ উঁচু এলাকায় বাস করত এবং এসবের জন্য অধিবাসিরা সমুদ্র তীরের দিকে কড়া নজর রাখত।"[১]

সমাজ যখন তার আদিম সংহতি ছেড়ে ধনিকতান্ত্রিক কাঠামোতে পা দেয় তখন থেকে যুদ্ধ একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার—একটা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের এক ব্যবস্থা এবং এটা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয় নি। কর্তৃত্ব এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রচনা করে এবং যুদ্ধ হয় তা অর্জনের পন্থা বিশেষ। বিশেষ করে এতে ক্রীতদাস প্রথা শুরু হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্রীতদাস বন্দী করা। যুদ্ধের মাধ্যমে ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ বা অন্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন এমন কি স্থায়ীভাবে রাজস্ব আদায় পর্যন্ত উপজাতীয় সামরিক নেতাদের লক্ষ্য বস্তু ছিল না। আদিম যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিছিন্ন সম্প্রদায়ে বসবাস করত এবং একটি অন্যটি থেকে পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল বা মরুভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। তখন এসব সম্ভবও ছিল না। যুদ্ধ ছিল হত্যাকাণ্ড ও লুটপাঠের অভিযান এবং বিজয়ী যোদ্ধারা ঘরে ফিরে আসত বিজয় গৌরবে লুটের মাল নিয়ে। একত্রে বসবাস করবার সময় মাঝে মাঝে উপজাতির পুরুষদের লক্ষ্যহীণ ক্ষমতা এভাবে প্রকাশ পেত। অবশ্য কোন কোন চরম মুহূর্তে তারা অন্যের জীবিকার সংস্থান কেড়ে নেয়ার জন্যও চেষ্টা করেছে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে। এরূপ যুদ্ধে ছোট ছোট সম্প্রদায়ের বিছিন্নতা ভেঙ্গে' যায় নি অথবা তাদের বৈশিষ্ট্যও তাতে তেমন পরিবর্তিত হয় নি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে, সংযোগ বৃদ্ধি পেতে পেতে এবং সংগঠন গড়ে ওঠার সাথে সাথে এমন এক পর্যায় এসে গেল যখন যুদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের হাতিয়ার ও উৎসে পরিণত হয়। সামরিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে সামাজিক ব্যবস্থাও ধনিকতান্ত্রিক কাঠামোতে গ'ড়ে উঠতে লাগল। এ

১। বি, ম্যালিনোস্কির (*B. Malinowski*) '*Economiea*' প্রবন্ধ—১৯২২ খ্রীস্টাব্দ।

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণী ব্যাপক ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্খা, সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও রাজস্ব দানকারী অধীন রাজ্যের স্থানীয় আনুগত্য লাভের জন্য সম্প্রদায়ের সম্পদকে সংহত করতে ও কাজে লাগাতেও শিখল। প্রামাণ্য ইতিহাসের সকল পাতা ভ'রে রয়েছে যেন সাম্রাজ্যের আমল; যদিও তা মানবজাতির ইতিহাসের কিঞ্চিং অংশমাত্র। দু' রকম অবস্থার যে কোনটিতে একটা জাতি অন্যকে পর্যুদস্ত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এদের একটি হ'ল যুদ্ধ প্রিয় যাযাবর সম্প্রদায় কোন শান্তিপূর্ণ সভ্য দেশের এক প্রান্তে বাস করে ও সম্ভবতঃ তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্ত ক'রে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিজয়ীর বেশে তার সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এভাবে ডোরিয়ানরা (*Dorians*) টাইরিন্‌স্ ও মাইসিনির সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করে এবং এভাবেই তুর্কী ও তাতাররা এশিয়া ও ইউরোপের সুসভ্য জাতিগুলোকে পর্যুদস্ত করে। অন্যটি হ'ল, কোন শক্তিশালী দেশ তার সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বা নতুন কোন আবিষ্কারের ফলে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত সভ্যতায় ও বিছিন্ন এলাকায় নিজেদের শাসন চাপিয়ে দেয়। রোমান সভ্যতা ও আধুনিক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী জাতীগুলো এভাবে নিজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়ী ও বিজেতাদের মধ্যে জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য এবং এর ফলে সেখানে এক ধরনের ধনিকতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যখন বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে থাকে যুদ্ধ কৌশলের কোন নতুন আবিষ্কার, যেমন ম্যাসিডনের পদাতিক ব্যুহ বা রোমের অশ্বরোহী-বাহিনী তখন কোন যোগ্য নিতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানকার সামরিক বাহিনী বিশ্বজয়ের স্বপ্নও দেখতে থাকে। এমনি সুখ-স্বপ্ন ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে সে যুগকেও ছাড়িয়ে যায় এবং অহেতুক ও রক্তক্ষয়ী সে প্রচেষ্টা অনুপ্রেরণা দিতে থাকে। নিপোলিয়ন সম্পূর্ণ আলাদা এক যুগে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীতি তখনও সমর্থিত হ'ত। সভ্যতার তারতম্য ব্যতীত এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর সম্রাজ্যবাদী উচ্চাশা সফল হয়েছিল সাধারণ সভ্যতার ক্রমবর্ধমান আওতার বাইরে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে।

সাম্রাজ্যের যুগে রাষ্ট্র লাভ করেছিল চরম সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতে, এটাই হ'ল তার আসল পরিচয়। ক্ষমতা-প্রবণতার প্রভাবে রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট এক আকার ধারণ করে। প্রথমতঃ, তার সংহতি বজায় রেখে

www.nagorikpathagar.org

কোন সম্প্রদায়ে একটির বেশী ক্ষমতাকেন্দ্র থাকতে পারে না, এবং রাষ্ট্র ভেতর ও বাইরে বলপ্রয়োগের একক অধিকার নিজের হাতে তুলে নেয়। এতে রাষ্ট্রের সংগঠন শক্তিশালী হয় ও তার ধনিকতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যও পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। যুদ্ধ বরাবরই ধনিকতন্ত্রকে সমর্থন করে এসেছে। শুধুমাত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্যই নয়; ধনিকতন্ত্র আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের জন্য তৈরী রাষ্ট্রে থাকে আনুগত্যের এক অদ্ভুত শৃঙ্খলাবোধ 'বাধ্যতা' ও 'কর্তব্যের' এক ঐতিহ্য ও শাসক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের এক মৌলিক শিক্ষা। এর ফলে শাসক শ্রেণী বহুজনের স্বার্থের কথা আমলে নাও আনতে পারে। এ মনোভাব অবশ্য চলতে পারে যদি রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী ও শাসিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ব্যবধান বর্তমান থাকে। সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের কাহিনীর গোড়ার কথাটিই এই। যেসব আধুনিক প্রভাবে সংস্কৃতির ভিত্তি আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং এর মান আরও উন্নত হয় তা সাম্রাজ্যের জন্য প্রতিকূল। যুদ্ধ ও গণতন্ত্র ভিন্ন সামাজিক পর্যায়ের দু'টি বস্তু।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রতির ফলে ক্ষমতা ও সংস্কৃতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সামরিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যোদ্ধাদেরও বিশেষ করে সামরিকবাহিনীর অভিজাত শাখা অশ্বারোহীবাহিনীর মর্যাদা কার্যতঃ লোপ পেয়েছে। ক্রেসির তীরন্দাজরা যে বিপ্লবের সূচনা করে মেশিনগানের যুগে তা সম্পূর্ণ হয়। বস্তুধর্মী ও বিজ্ঞানের কঠোর সমতার প্রভাবে যুদ্ধের নিয়ম-কানুন এখন আর ধনিকতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ে। পুরোনো অর্থে অভিজাত সঙ্গীসহ 'যুদ্ধের আনন্দ ভোগী যোদ্ধার' দিন এখন ফুরিয়েছে এবং সাথে সাথে বিচিত্র অস্ত্র নির্মাণকারী হস্তশিল্পী বা বিচিত্র বেশে অশ্বসজ্জাকারী শিল্পীরও মৃত্যু ঘটেছে।

এরূপ বিরাট রূপান্তরের পূর্বেও সামরিক শক্তি ছিল অনেকটা দু'ধারী অস্ত্রের মত এবং তা এর প্রয়োগকারী শাসকের জন্যও বিপদ ডেকে আনত। প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর ইতিহাসেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জয় ও পরাজয় উভয়ই ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থার শৃঙ্খলার পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি করত এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাদের অবদান নেহাত কম হ'ত না। তাই দেখা যায়, সালামিসের নাবিকদের বিজয় এথেন্সে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্থ করে এবং ইগোমপটামীর নাবিকদের পরাজয় আবার তার ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেয়। আমাদের সাম্প্রতিক

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত এত বেশী পাওয়া যায় যে, এর আর উদাহরণ প্রয়োজন নেই। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, সামরিক শক্তি ধনিকতন্ত্রকে তার সামাজিক শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয় এবং তার মধ্যে আরও স্বৈরাচারিতা সৃষ্টি করে; যদিও তা হয় অত্যন্ত অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। ধনিকতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর জন্য সেখানে তার ইচ্ছার হাতিয়াররূপে এক স্থায়ী সামরিকবাহিনী গ'ড়ে উঠে। কিন্তু একবার তা প্রতিষ্ঠিত হ'লে সামরিক-বাহিনী পরিচালনার ব্যক্তিগত দিক ও সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক জীবন থেকে সামরিকবাহিনীর বিচ্ছিন্নতা সামরিকবাহিনীকে সামগ্রিকভাবে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার না ক'রে তখন সামরিক নেতাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হ'তে থাকে। শ্রেণী সংগঠনের চরিত্রগুণে এরূপ বাহিনীর জন্ম হয়; কিন্তু সামরিক সংগঠনের চরিত্রগুণে তার নিয়ন্ত্রণভার পড়ে গিয়ে সামরিক নেতাদের হাতে এবং এ দু'য়ের মিলন সাধারণভাবে কোন দিন হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্বাচিত হয় এ প্রশ্নের উত্তরের উপর—সামরিকবাহিনী কাকে মেনে চলবে? এ সংকটের অদ্ভুত শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত মেলে ইংলিশ মিউটিনি আইনে (ইংলণ্ডের বিদ্রোহ দমনমূলক আইনে)। পেশাদারী সৈন্যের বিচ্ছিন্নতাকে ভয় পেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার নিয়ন্ত্রণ ভার ও তার অস্তিত্বকে নিজের হাতে তুলে নেয়। এর নিশ্চয়তাবিধানের জন্য নিয়ম করা হয় যে, সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত আইনকে বছর বছর পুনর্গঠন করা হবে।

যদি সামরিকবাহিনী বেতনভুক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হয় বা যদি সাধারণ জোয়ানরা পেশাদারী সৈনিক হয়, তবে এ বিপদের সম্ভাবনা থাকে অত্যন্ত বেশী। প্রথম দিকে সরকারের আহবানে প্রত্যেকবার সৈন্য সংগ্রহ করা হত; কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সাম্রাজ্য বিস্তৃত এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন পেশাদারী সামরিকবাহিনীর সৃষ্টি হয়। এ বাহিনীকে তখন দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে রত থাকতে হ'ত ও বহুদূরেও তাদের অভিযান পরি-চালনা করতে হ'ত এবং তাদের উপর নিয়ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হ'ত। প্রাচীনকালের ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ বিদেশী ও কোন কোন সময় 'বর্বরদের' নিয়ে সংগঠিত বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী 'হেলেনিক বিশ্বে' এক অধপতনের সৃষ্টি করে। মেরিয়াস রোমের সৈন্যবাহিনীকে পেশাদারী ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করেন এবং তাই অনেক বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এক নায়কতন্ত্রের লক্ষ্যে

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে যায়। 'অত্যাচারীর যে এক বেতনভুক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন, তা অনেকটা রাজনীতির স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হয়। নতুন এক নায়কতন্ত্রের পন্থা হিসেবে আধুনিক বিশ্বে নেপোলিয়নও এক পেশাদারী সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগান। কিন্তু তখন ধনিকতান্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে এবং তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুতরাং আমরা যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যখন যুদ্ধের রাজনৈতিক পুরস্কার হয়ে উঠেছে অত্যন্ত অনিশ্চিত ও অমূলক; যদিও তার ব্যয় হয়ে ওঠে আকাশচুম্বী। তার ফলে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিও গড়ে ওঠে। এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী হ'ল আংশিকভাবে জাতীয়তাবাদের বিস্তার, যা ছিল সম্রাজ্যের প্রাচীন আদর্শের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক, এবং আংশিক ভাবে দায়ী হচ্ছে সাধারণ সভ্যতায় জাতীয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভশীলতা। তার একটি ফল হয় নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের বিপুল অস্ত্রসজ্জা। যদিও সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেল পেশাদার সৈন্যবাহিনী; তথাপি বাধ্যতামূলকভাবে জনগণের মধ্যে থেকে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থার মাধ্যমে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হ'তে লাগল। এ ভাবে 'সশস্ত্র সম্প্রদায়ের' নীতিতে সভ্যতা ফিরে এলো। এখন 'সশস্ত্র জাতিতে' তা রূপ পরিগ্রহ করছে। শিল্প সংক্রান্ত নতুন কলাকৌশল ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে এরূপ 'সামরিক প্রস্তুতির' সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে যেন সমগ্র জনশক্তিকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করা যায়, তার ব্যবস্থা এতে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ল। দীর্ঘ আওতার গোলন্দাজবাহিনীও বোমা নিক্ষেপের জন্য বিমান-বাহিনীর মত নতুন নতুন ব্যবস্থা ও সমানভাবে সমগ্র জাতিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্রসজ্জা ও প্রতিযোগিতামূলক মৈত্রীচুক্তি শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধের বিভীষিকার চরম পর্যায়ে পৌঁছে। আসলে তা ছিল অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ বর্জিত ভয়াল এক সংগ্রাম; যেখানে একটার পর একটা জাতি জড়িয়ে পড়েছে যদিও মূল বিষয় তাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে যায়। এ সংগ্রাম তাদের স্বার্থের সাথেও সংগতিপূর্ণ ছিল না। উদ্দেশ্য ও পন্থার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে এতবড় করুণ এবং অসম ব্যবধান মানুষ তার ইতিহাসে আর কোন দিন দেখে নি। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক স্বার্থ এমনভাবে জড়িত ছিল যে, সে যুদ্ধ কোন স্থানে সীমিত থাকে নি। বিশ্বের সকল বৃহৎ জাতিই তাতে জড়িয়ে পড়ে। এর কারণ অবশ্য এটা ছিল না যে, বিশেষ এক বিষয়ে তাদের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান ছিল; বরং তারা একই ব্যবস্থার ঐক্যসূত্রে ছিল আবদ্ধ। ধ্বংস ও রক্তক্ষয় ছাড়া কোন বিষয়েই তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না; ভাইকাউন্ট গ্রের (*Gray*) কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, "যারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাদের সবার উপরেই যুদ্ধের বিজয় সূচিত হয়।'

এ ঘটনার গুরুত্ব হচ্ছে, যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-হীন ও অসংগত এক প্রতিষ্ঠান।[১] এটা অবশ্য সম্ভব যে, যুদ্ধের কলাকৌশ-লের অভিনব আবিষ্কার, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকের ব্যবহার, বিষাক্ত গ্যাস ও ধ্বংসের হাজারো অজ্ঞাত কৌশলের প্রয়োগ এবং এরোপ্লেন ও বিভিন্ন

১। যে যে যুক্তিগুলোয় দাবী করা হয় যে, আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যুদ্ধের এক প্রেরণাদায়ক ভূমিকা রয়েছে বা তার মঙ্গলজনক প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সেসব যুক্তিকে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আমরা মনে করি নি; কেননা রাষ্ট্র ও সমাজ সংক্রান্ত সেসব মতবাদকে আমাদের এ আলোচনায় আমরা খণ্ডন করেছি। শুধু আমরা মনস্তাত্ত্বিক যে যুক্তির উল্লেখ করতে পারি যে যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ আধুনিক জাতিগুলোর ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, 'মহাযুদ্ধে ফরাসী ও ইতালী জাতি নিসন্দেহে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ইংলণ্ডও একমাত্র আইরিশ জাতি ছাড়া অন্যান্য সহযোগীদের সাথে গভীরভাবে ঐক্যবোধ অনুভব করছে; কারণ একই মহান লক্ষ্যে সহযোগিতা দিয়ে তাদের মধ্যে যে একত্বতা গড়ে উঠিছে তা অন্য কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্ভব হত না। বহু যুগের শান্তিপূর্ণ শিল্প বিস্তারও সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও তা করতে পারে নি। (ম্যকডোগালের গ্রন্থ *The GrouP Mind*,-এর দশম অধ্যায়।) তবে এটা বলা ভাল যে, এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। সাময়িক-ভাবে যুদ্ধ মিলন ঘটায় বটে; কিন্তু তা বিছিন্নও করে। স্থায়ী ঐক্য নির্ভর করে স্থায়ী সাধারণ স্বার্থের উপর এবং এগুলো বর্তমান না থাকলে যুদ্ধ তা সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া আমরা সভ্যতার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে জাতীয় ঐক্য বড় কথা নয়; বরং জাতিতে জাতিতে ঐক্যই হল পরম কাম্য। যুদ্ধ এর গতি রুদ্ধ করে। যুদ্ধের ফলাফলে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি'; বরং তারপর তারা আগের চাইতেও বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

ধরনের আকাশযানের সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা যুদ্ধবিগ্রহে এমন নিয়ন্ত্রণ-বিহীন মৃত্যুর কালোছায়া বয়ে আনবে, যার ফলে মানুষ আতঙ্কে এ থেকে বিরত থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে এটা হোক বা না হোক সভ্যতার অগ্রগতি অনুরূপ এক প্রয়োজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে এটা ঠিক। প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্রসজ্জার অবসান ও আন্তর্জাতিক বিবাদের বিচার-বিভাগীয় মীমাংসার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা যতটুকু এ আদর্শের প্রতিষ্ঠানিক প্রকাশ, তার থেকে বেশী হচ্ছে বাস্তবের সাথে যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠানটির সামঞ্জস্যবিধান। দেরীতে হলেও এ প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য। জাতীয় যুদ্ধের কাল শেষ হয়েছে এ অনুমান কিন্তু ভিত্তিহীন কল্পনাবিলাস নয়; বরং এটা হচ্ছে একটা যুক্তিযুক্ত অনুমান যে মানুষ কালক্রমে তার প্রয়োজনের সাথে প্রতিষ্ঠানের সংগতি বিধানে সক্ষম হবে। ভবিষ্যত সভ্যতা কোন অভিশাপ নিয়ে আসবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারে না; কিন্তু বর্তমান সভ্যতার প্রয়োজন কি, এর বিচার বিবেচনা করা সঙ্গত। কত শীঘ্র এবং কোন্ শর্তে আমরা এর দাবী মেটাব তা এখনও বিশ্বাসের বিষয়।

সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে অর্থনৈতিক যুক্তির সারবত্তাও মিথ্যা প্রমাণিত করেছে যে, যুদ্ধ বাড়তি জনসংখ্যা কমিয়ে সকলকে জীবিকার্জনের আওতায় নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে আধুনিক সভ্যতায় যুদ্ধ যে পরিমাণ জীবিকার সংস্থান নষ্ট করে তার থেকে অনেক কম পরিমাণ জনক্ষয় হয়। মহাযুদ্ধের পর জীবন যাত্রার নিম্নমান তারই সাক্ষ্য বহন করে। কথা প্রসংগে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজকাল কোন জাতির মধ্যে অনৈক্যের প্রধানতম কারণ হল জীবন যাত্রার নিম্নমান।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

আইন ও শৃংখলা

এক : আইনের প্রকৃতি

ব্যাপক অর্থে সর্বত্রই আইনের রাজত্ব। যেখানে জীবন আছে সেখানে রয়েছে জীবনের সার্বজনীন আইন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্য রয়েছে তার রকম ফের। এ বৃহৎ জীবন ব্যবস্থার মধ্যে বহু ক্রমের ও বহু ধরনের আইন রয়েছে। আইনের সে বিশাল ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের আওতার বাইরে। মানুষের ইচ্ছার সাথে কোন সম্বন্ধ না রেখে তা অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয়রূপে কর্মরত।[১] সমাজ আরেক ধরনের আইন সৃষ্টি করেছে। সে হ'ল আর এক ধরনের জীবন ব্যবস্থা। এখানে সমাজের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এ ব্যবস্থায় নিহিত রয়েছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও লঙ্ঘনের সম্ভাবনা। এ সামাজিক আইনের প্রকাশ ঘটে প্রথায়, ঐতিহ্যে, রীতি-নীতিতে ও হাজারো বিধিনিষেধের নিগড়ে। তারই একাংশ বৃহৎ আকারে রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থারূপে পুনরায় সমর্থিত হয়েছে এবং কার্যকরী রয়েছে।

রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যেও দু'রকম আইন দেখা যায়। রাষ্ট্রকে পরিচালিত করবার জন্য রয়েছে এক রকম আইন এবং অন্যরকম আইন দিয়ে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করে। প্রথমটি হ'ল সাংবিধানিক আইন, এবং দ্বিতীয়টিকে আমরা সুবিধার জন্য বলতে পারি সাধারণ আইন; প্রথমটি একাংশ 'লিখিত সংবিধান'রূপে বিধিবদ্ধ হ'তে পারে। সাধারণ আইন থেকে তার পার্থক্য নির্দেশ করা হয় এবং সাধারণভাবে তাকে আইন পরিষদের সাধারণ ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়। এর প্রকৃতি ও অনুমোদন অন্য আইনের প্রকৃতি ও অনুমোদন থেকে স্বতন্ত্র। ইংলণ্ডে সাংবিধানিক আইন, আইন প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতিতে প্রণীত হ'লেও তা প্রণীত হয় আইন পরিষদ বা সাধারণতঃ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং আইন পরিষদের ইচ্ছার ঊর্ধ্বে যে ইচ্ছা বিদ্যমান সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদেরকে সে দিকে নিয়ে চলে। (সার্বভৌম ক্ষমতার

১। গ্রন্থকারের '*Community*' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় আমরা এর যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।) এ সাংবিধানিক আইন অনেকাংশে অলিখিত, এবং এর অন্তর্ভুক্ত থাকে বিধি-বিধান, দৃষ্টান্ত, ঐতিহ্য, এবং সংবিধানের মর্মকথা। যে চূড়ান্ত সার্বভৌমের কাছ থেকে আইন পরিষদ ক্ষমতা লাভ করে তাকে উল্লঙ্ঘন না করে কোন আইন পরিষদ এগুলোকে লঙ্ঘণ করতে সাহসী হয় না। কোন সংকট কালও বিপ্লব ব্যতীত এখানে রয়েছে যথেষ্ট অনুমোদন। একদিকে সামাজিক সংহতি ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কাজ-কর্মের অন্তর্দৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে সাংবিধানিক আইনের বিকাশ ঘটেছে, এবং তার ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র একদিকে যেমন সীমিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রের কাজ-কর্ম ও অভিজ্ঞতাকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়ে তা সীমিত করেছে। কিন্তু অন্যদিকে তার আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে; কেননা আইনের বিধি-বিধানে এটা নির্দিষ্ট হয়েছে যে, প্রথমতঃ কোন রকম বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা কোন রকম পদমর্যাদার জন্য কেও, এমন কি সরকারও সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকবে না, এবং দ্বিতীয়তঃ আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব এমন এক সাধারণ জীবন ব্যবস্থা গঠন করবে যেখানে সকলের কোন কান মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে এবং তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা হবে সার্বজনীন এবং সবশেষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য না করে আইন কার্যকরী হবে।

এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র সাংবিধানিক আইনের অনুমোদন দিতে পারে না; যেভাবে সে সাধারণ আইনকে অনুমোদন করে। সাংবিধানিক আইন হল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের আইন। সাংবিধানিক আইনের কোন কোন ধারাকে রাষ্ট্রীয় আদালতের আওতায় আনা হয়; কিন্তু অন্যগুলোকে তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আনা সম্ভব নয়। আদালতের কার্যবিধিও সংবিধানের অংশ বিশেষ। তাছাড়া, চিরাচরিত রীতিনীতি, প্রথা, বোঝাপড়া, অভ্যাস ও কার্য পদ্ধতির আকারে রয়েছে এক বিধি-বিধানমণ্ডলী; যেগুলো কার্যকরী করা কোন আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না।[১] এদের মধ্যে রয়েছে কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা সার্বভৌমের কাজকর্মও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আদালত সব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা দেয় ও তাদেরকে কার্যকরী করে। রাষ্ট্রের সংস্থাগুলো এসব সাধারণ আইনকে কাজে লাগায়।

১। ডাইসির (*Dicey*) '*Low of th3 Constitution*' গ্রন্থের ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং আইনের সঠিক প্রকৃতি পেতে হ'লে আইন পরিষদের দিকে আমাদের নজর দিলে চলবে না; যদিও আইন পরিষদই হ'ল আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তার জন্য প্রয়োজন আদালতের দিকে দৃষ্টি দেয়া; কেননা তাদের উৎস যাই থাক না কেন, সকল সাধারণ আইন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা ঠিক যে, আধুনিক রাষ্ট্রে আইন পরিষদ সাধারণ আইনের অন্যান্য উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং তার প্রণীত আইনের মাধ্যমে সমগ্র বিধানমণ্ডলীতে তাদের অবদান সতত সীমিত বা পরিবর্ধন করে চলেছে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রেই আইন-বহির দ্বারা চূড়ান্ত-ভাবে অধিক্ষেত্র নির্ধারিত হয় না, এমন কি বিস্তারিত সংহিতাসার সত্ত্বেও ফ্রান্সে তা হয় নি।

আমরা এখানে সাধারণ আইন নিয়ে আলোচনা করব যে, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তার সদস্যদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে ও তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্রের অধিবাসী বা নাগরিকদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী যে কোন বিধি-বিধান যা রাজনৈতিক আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যাতও কার্যকরী হয়, তাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আইনকে তার আকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট করতে হবে; তার বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়। আইনের আকৃতির সাথে অসংগত কোন নৈতিক ও ঐতিহাসিক ধারণা আরোপ করলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশে কোন আদের্শ প্রতিফলনের প্রচেষ্টা থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তাই হ'ল সবচেয়ে জটিল। যেখানে আদর্শকে বাস্তবতার পর্যায়ে আনবার চেষ্টা হয় বা যেখানে বাস্তবতাকে হীন ব'লে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা সেখানে এক ভয়ানক ফাঁপরে পড়ি। ব্ল্যাকস্টোনের সুপরিচিত সংজ্ঞা এ ধরনের। তিনি বলেন: 'আইন হ'ল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা নির্দেশিত সামাজিক আচরণের ঐসব বিধি-বিধান, যা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[১] যেসব প্রাচীন নীতি রাজনৈতিক আইনকে 'যুক্তির বিধি' বা 'ঈশ্বরের ইচ্ছার' মানবিক রূপান্তর ব'লে বর্ণনা করেছে, ব্ল্যাকস্টোনের এ সংজ্ঞা অনেকটা তেমনি বিভ্রান্তিকর ও অভ্রান্ত 'সাধারণ ইচ্ছা'রূপে রুশো সার্ব-ভৌমের যে সংজ্ঞা দান করেন, এটাও তেমনি বিভ্রান্তিসূচক। রুশোর

১। ব্ল্যাকস্টোনের (*Blackstone*)। *Commenlaris*—৪৪ পৃষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

মত বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে বা ব্ল্যাকস্টোনের মত বাস্তবতায় পরিপূর্ণ তার গুণ আরোপ করলে আমরা কখনই রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দান করতে পারব না। আদর্শবাদের উজ্জ্বল আলোকে বাস্তবতার বর্ণনা করা খুব আকর্ষণীয় ও মঙ্গলজনক কাজ বটে; কিন্তু দুটোকে এক করে দেখা হ'ল অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার এবং তার ফলে নৈতিকতার বিকৃতিতে বিজ্ঞানকে খুলিয়ে ফেলা হয়।

একে আমরা ন্যায়ই বলি আর অন্যায়ই বলি —আইন হ'ল আইন। তা না হ'লে একই জিনিস কারো কাছে হবে আইন আর কারো কাছে হবে অন্যকিছু বা এক সময়ে হবে আইন এবং অন্যসময়ে হবে আইন বিরোধী। তা অনেকের স্বার্থেই লাগুক বা কয়েকজনের স্বার্থের উপযোগী হোক—এটা হ'ল আইন। এতে স্বাধীনতা বিস্তৃত হোক আর সঙ্কুচিত হোক—আইন একই। স্যাববাটারিয়ান আইনের মত তা ধর্মীয় নীতি হ'তে উদ্ভূত হতে পারে বা মানুষের সাম্যনীতি থেকে তা আসতে পারে বা সামাজিক মঙ্গলের বাস্তব বিবেচনা হ'তে আসতে পারে; কিন্তু তা যেখান থেকেই আসুক না কেন—আইন আইনই।

এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জন্য অন্যান্যদের চেয়ে ইংরেজি ভাষাভাষিদের অজুহাত হচ্ছে খুব কম। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি—'Droit', 'Recht', 'Diritto' 'Derecho' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে সামগ্রিকভাবে আইনের সঠিক প্রকাশ করেছে এবং রোমানরা 'Ius' শব্দটির মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আইনকে প্রকাশ করবার মত আমাদের তেমন শব্দ নেই। কিন্তু তা হলেও এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐসব শব্দের মধ্যে যে নৈতিক গুরুত্ব বা অধিকারের ধারণা রয়েছে তাতে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। কিন্তু 'আইন' (Low) শব্দটি হল বস্তুধর্মী ও নৈতিকতার দিক থেকে নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক ব্যাপারটাই শুধু তাতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অতি সহজে আমরা নৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক আইনের মধ্যে যে পূর্ব-নির্ধারিত ঐক্যসূত্র রয়েছে তাকে পরিত্যাগ করতে পারি। আইনের রূপ বর্তমানে কি, তার প্রতি নজর না দিয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি, আইন কেমন হওয়া উচিত? প্রথম থেকে এ প্রতিষ্ঠানে কোন্ কোন্ আদর্শ বর্তমান ছিল তার ধারেকাছে না গিয়েও আমরা আইনের প্রবর্তনে ও পরিবর্তনে আদর্শের প্রভাব কিরূপ হতে পারে তা অতি সহজে দেখাতে পারি।

১৫—

www.nagorikpathagar.org

আইনের সংজ্ঞা থেকে আর একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তা হল আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অপেক্ষা সংকীর্ণ কোন নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব; যার উপর আইন নির্ভর করে। যে উৎস থেকে আইন উদ্ভূত হয় তার সাথেও এ বিভ্রান্তির যোগ আছে। তাই আইনকে রাজা বা সম্রাটের ইচ্ছার প্রকাশ বলেও চালানো হয় এবং আদর্শের সাথে আইনের মূল ধারণাকে ঘুলিয়ে ফেলা হয়। অনেক সময় আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলেও ঘোষণা করা হয়; তা সে সার্বভৌম সম্রাটই হোক আর সংসদই হোক অথবা জনগণই হোক; কিন্তু আসলে আইনসমষ্টির এক বড় অংশ সম্বন্ধে কোন সার্বভৌম শক্তি বা তাদের সমগ্র চক্র কোন নির্দেশ দেয়নি। অস্টিনের মতবাদ অর্থাৎ অধীনস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশই হ'ল আইন, এটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর; কেননা এতে আইনের দুটি বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ তার সার্বজনীন প্রকৃতি ও নিয়মনিষ্ঠ-গঠন স্বীকৃতি লাভ করে নি।

এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার-বিবেচনায় আমাদের ফিরে আসা যাক। এ গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে তাদের আলোচনা হয়েছে; কেননা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে তা প্রচুর আলোকপাত করে। এখন দেখা যাক, কিভাবে তারা নিজেরাই রাষ্ট্রদেহের প্রকৃতি প্রতিফলিত করে। বস্তুত: আইন কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে সেগুলো কোন আদর্শ নীতি নয়। তারা প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও কাঠামোর প্রয়োজনীয় প্রতি-ক্রিয়া মাত্র।

অ্যারিস্টটল এবং রোমান ব্যবহারবিদদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় সকল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আইনের সার্বজনীনতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু আইন কি এবং আইন কেমন হওয়া উচিত, তথা আইনের যে বিশ্বজনীনতা রয়েছে এবং অন্য কোন বিশ্ব-জনীনরূপে এর থাকা উচিত কি না, সে সম্পর্কে আবার আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই। সংসদে পাশ করা আইনকে বাদ দিলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অন্যান্য সব আইন সাধারণ নীতি ও তাদের প্রয়োগ-সংক্রান্ত বিধি-বিধান। বিচারকের পূর্ব সিদ্ধান্ত যা কমন ল' বা চিরাচরিত রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত, শুধুমাত্র অনুরূপ পরিস্থিতিতে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। যে আইন প্রথার ব্যাখ্যাদান করে তা সাধারণ রীতিনীতি থেকে উদ্ভূত

www.nagorikpathagar.org

সাধারণ নীতি মাত্র। যে আইন দেওয়ানী আইনরূপে মৌলিক গবেষণা থেকে পুনর্গঠিত হয়, তাও ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়নীতি বা সমতানীতি হ'ল সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সার্বজনীন। তা অনেকটা 'যুক্তির বিধির' মত। তা হ'লে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে আর কি থাকল? এ হ'ল সরকারী আইন যা অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি করে। বিস্তারিতভাবে সৃষ্ট এক কর্তৃত্বের মাধ্যমে এ আইন কার্যকরী হয়। এ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে আইন বিধিবদ্ধ করে, পূর্বের আইনের সাথে নতুন আইনের সম্বন্ধ নির্ণয় করে, নির্দেশিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র সরকারীভাবে তা ঘোষণা করে। আইন প্রণয়নের বিধি হ'ল একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মৌলিক উপাদান এবং আইনের যে সার্বজনীন প্রকৃতি থাকতে হবে—এ তার নিশ্চয়তা বিধান করে।

এর সাথে সাথে এটাও বলা হয়ে থাকে যে, আইন প্রণয়নে যে সাধারণত্ব নিশ্চিত হয়; তাছাড়াও অন্যপথে আইনের সার্বজনীনতা থাকা উচিত। অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে, আইন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—তা সে শ্রেণী ব্যক্তিরই হোক বা কাজ-কর্মেরই হোক। অস্টিনের মত কেউ কেউ আবার নির্দেশিত বা নিষিদ্ধ আইনের ক্ষেত্রে সাধারণত্বকে সীমিত রেখেই খুশী। তাঁরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ সার্বজনীনতার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি।[১] ডুগের[২] মত অনেকে আবার এ দাবী করেন যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রযোজ্য হ'লে আইন মূলতঃ বে-আইনী হয়ে পড়ে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত ফরাসী আইন এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। এ আইনে রাজপরিবারের প্রধানকে ক্ষমতা গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তা যাই হোক, আইন পরিষদ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রণীত যেকোন বিধিকে আইন বলে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। তারপর আমরা তার উপর কোন আদর্শ-গত বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পারি, যা এক এক জনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। আইন প্রয়োগের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণকারীর

১। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানে অস্টিন আইনকে সীমিত করেছেন তা অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের মাধ্যমে; সার্বভৌমের ক্ষমতার মাধ্যমে নয়। এ নীতির সার্থক রূপায়ণ তার সার্বভৌম মতবাদকে পর্যন্ত নিঃশেষ ক'রে দিতে পারত।

২। ডুগের (*Duguit*) *'Traite de Droit Constitutionnel'* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক বিধিকে আইন বলে স্বীকার করাই ভাল। এভাবে যেসকল আইন রাজনৈতিক নীতির অনুসারী ও যেসব এ নীতির অনুসারী নয়, তাদের মধ্যে আমরা পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি। তবে এ প্রসংগে ডুগের দৃষ্টান্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-বর্গের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ শুধু যে সম্ভব তা নয়; তা সঠিকও। লর্ড চ্যান্সেলার বা প্রাক্তন রাজকীয় পরিবারের প্রধানের মত একজনও এক রাজনৈতিক শ্রেণী সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট এবং স্বেচ্ছাচারী নির্বাচনের কোন স্থান এতে নেই। রাষ্ট্রের স্বার্থে একজনকেও যদি এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনকে আইন নামে আখ্যায়িত করতে বাধা কোথায়? ডুগ যে অর্থে সার্বজনীনতার ব্যবহার দেখিয়েছেন, সে অর্থেও তা হয় রাজনৈতিক পদমর্যদার ব্যাপার; কোন সংখ্যার ব্যাপার তা নয়। কর ধার্য বা সামাজিক আইন সংক্রান্ত কোন কোন ধরনের আইনে এটা অত্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলা হয়, তা জনগোষ্ঠীর কোন কোন অংশের উপর প্রযোজ্য হবে। এসব ক্ষেত্রের নির্দিষ্টকরণ কিন্তু সাধারণ নীতির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়। রাজমিস্ত্রী, ঠিকাদার কর্মী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে আয়কর আইনে যে নির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ থাকে, তা সাধারণত্বের আদর্শ বিরোধী হলেও তাকে আইন বলতেই হবে। অন্যপক্ষে, যে আয়কর আইনে বিভিন্ন আয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধানের ভিত্তিতে কোন নির্দেশ থাকে বা বিবাহিত ও অবিবাহিত-দের মধ্যে অবস্থিত পার্থক্যের মত কোন ব্যবধান থাকলে নিয়ম-মাফিক তা অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না; কিন্তু সে কারণে তাকে আইন বলে অস্বীকার করবার জো নেই।

যখন সার্বজনীনতাকে আমরা মাত্র একটা ঘটনা হিসেবে না নিয়ে একটা আদর্শ হিসেবে গণ্য করি, তখন তার উর্ধ্বে কোন কিছু সম্বন্ধেও ভাবি। তখন আমরা সাম্যনীতি বা ন্যায়পরায়ণতাকে চিন্তা করি। ব্যক্তি বা কাজকর্ম সম্পর্কে খেয়াল-খুশীমত বা পছন্দসই বা খাপছাড়াভাবে নেয়ার যে মনোভাব রয়েছে, এ নীতি তার বিরোধী। এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, যারা কাজকর্ম বা দক্ষতার মানদণ্ডে একই মানের, তাদের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহার করতে হবে এবং যারা ভিন্ন মানের, তাদের ক্ষেত্রে অন্য আর এক রকম ব্যবহার করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। সাধারণত্ব ছাড়াও এ নীতির জন্য আরও কিছু দরকার। সাধারণত্বের নীতি ন্যায়পরায়ণতার ধারণার বিরোধী হ'তে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, বলা যেতে পারে, যে আইনে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একই পরিমাণ কর ধার্য করা হয়, তা অন্যায়। ন্যায়নীতির জন্য যা দরকার, তা হল সাধারণত্বের বিষয়বস্তু; তার আকার প্রকার নয়। এ আকার আইনের এক বিশিষ্ট গুণ; কেননা যে পদ্ধতিতে আইন জন্ম নেয় তা এমন সার্বজনীন যে, আইন শুধুমাত্র সাধারণ পরিবেশের বা নির্দিষ্ট পরিবেশের সাধারণ অবস্থায় কার্যকরী হয়।

বেন্থাম ও অস্টিনের উৎসাহে আইন ও আদর্শের মধ্যে যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার আবরণ উন্মোচন করলে এ ঘটনা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আইন হল আদেশদানের ঠিক বিপরীত; কেননা আদেশ-দাতা ও গ্রহীতাকে বিচ্ছিন্ন করে, সর্বদা তাদের পদমর্যদার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে এবং কখনও কখনও তাদের স্বার্থকেও পৃথক করে দেয়। কিন্তু আইন মিলন ঘটায়; কেননা আইনপ্রণেতা ও যাদের জন্য তা প্রণীত হয়, আইন সবার উপর প্রযোজ্য। যখন কোন সামরিক অফিসার বা কোন নিয়োগ-কর্তা তাদের অধীনস্থ কারো উপর আদেশ জারী করেন, তখন সে আদেশ তাঁদের নিজেদেরকে মানতে হয় না। তাছাড়া, আদেশ হচ্ছে শাসন বিভাগীয় নির্দেশ; আইন প্রণয়নের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যেসব ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট নিয়ম নেই, সেসব ক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য আদেশের প্রয়োজন। এ হল প্রয়োগের এক পদ্ধতি; প্রণয়নের কোন বিধি নয়। আদেশ-নির্দেশের তুলনায় আইন হচ্ছে স্থায়ী। প্রত্যেকটি নতুন আইনকে প্রচলিত আইন ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে দিতে হবে ও খাপ খাওয়াতে হবে যেন কোন স্ববিরোধিতা তাতে না থাকে। আইন ও আদেশের বিভ্রান্তি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করতে পারে। চরম স্বৈরাচারী রাষ্ট্রেও আদেশ-নির্দেশ আইনের মুখ্য ক্ষেত্রকে অক্ষত রাখে; নইলে রাষ্ট্রে নৈরাজ্যবাদ দেখা দেয়। আইন ও আদেশ স্বতন্ত্র হলে রাষ্ট্রে আইনের শাসন সম্ভব হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের, বিশেষ করে প্রগতিশীল রাষ্ট্রের লক্ষণ হল আইনের শাসন প্রবর্তন যেন মধ্যযুগীয় যাজকশ্রেণীর মত কোন শ্রেণী বা সম্রাটের মত কোন ব্যক্তি তার কর্তৃত্বের বাইরে থাকতে না পারেন।

www.nagorikpathagar.org

অন্যপক্ষে আইনের সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমিত থাকে না। আদিম সম্প্রদায়ে উপজাতীয় ও গোষ্ঠিজীবনে প্রথাভিত্তিক আইন ছিল আত্মীয়তার রক্ষাকবচ। এ আইন কিন্তু কোন আগন্তুকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'ত না। হেলেনিসের নগর-সম্প্রদায়ে আইন শুধুমাত্র নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'ত। রোমও সে পথ অনুসরণ করে এবং নিজস্ব নাগরিকদের জন্য সামাজিক আইন প্রবর্তন করলেও বিদেশী ও অ-নাগরিকদের জন্য আরএক রকম আইন প্রবর্তন করে। বাইজানটাইন সভ্যতায় আইন শুধুমাত্র গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীদের আশ্রয় দান করত। ইউরোপের মধ্যযোগীয় সভ্যতায়ও অনুরূপ পৃথকীকরণ করা হ'ত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র তেমন সীমারেখা প্রবর্তনে অস্বীকার করে। এ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক নীতিবোধের ক্রমশঃ বৃদ্ধি, ন্যায় বিচার ও শৃঙ্খলার প্রকৃত বিশ্বজনীনতার স্বীকৃতি, কাজকর্ম, সেবা বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার ধারণা আইনের রূপান্তরে সাহায্য করেছে এবং তার ফলে আইনের সাধারনত্ব ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাথে মিলিত হয়েছে, যা অতীতে সংকীর্ণতার গহ্বরে সুপ্ত ছিল।

এ নিয়ে পরে আলোচনা হবে। এখন সাধারণ আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ তার প্রকৃতি ও সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। কোন কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্ভূত সকল নিয়মই আদেশসূচক অর্থাৎ তারা ইচ্ছার প্রতি আদিষ্ট হয়। তারা এক রকম কাজের নির্দেশ দেয় ও তাদের সম্পাদন দাবী করে। তারা সাথে সাথে এক সমর্থনও নিয়ে আসে। রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলীর মধ্যে প্রধান তফাৎ হ'ল কর্তৃত্বের সমর্থন। প্রথার অনুসরণ করলে তা খুব সুবিধাজনক হয় এবং তা জীবনকে সুখী ও সরল ক'রে তোলে এবং সামাজিকতা ও সংহতির উপর তার শুভ প্রতিক্রিয়া হয়। কোন রীতি অনুসরণ করলে মানুষের মধ্যে সামাজিক সৃজনশীলতার এক অনুভূতি জাগ্রত হয়। ক্লাবের নিয়ম-কানুন সভ্যদের মনে একাত্মতার ভাব জাগ্রত করে। আমরা তা মেনে চলি; কেননা তাকে আমরা পছন্দ করি। এসব ব্যাপারে যে সমর্থন রয়েছে তার মাধ্যমে আমরা বিশিষ্ট এক সামাজিক সন্তুষ্টি লাভ করি। যদি না মানি, তবে তার অস্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। অন্য ব্যাপারে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের সাথে জড়িয়ে পড়ি, তা সে বিষয় অর্থনৈতিক হোক আর সাংস্কৃতিকই হোক; কিন্তু নিজেদের স্বার্থে আমরা তার নিয়ম-কানুন মেনে চলি।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য ঐতিহ্য, অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তি অন্তরঙ্গতাবোধকে সংরক্ষণ করে। এদের বিলুপ্তি আমাদের জীবনকে এমন দরিদ্র ক'রে দেয়, যার জন্য সাধারণতঃ এসব নিয়ম-কানুন না মেনে সেগুলো হারাবার কথা আমরা চিন্তা করি না। এদের পেছনে যে সমর্থন, তা আরও শক্ত হয়ে ওঠে; কেননা তাদের সদস্যপদ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি সেসব সংঘের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় তা হ'লে ইচ্ছা ক'রে সে-গুলোকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। নিয়ম মানবার প্রবণতা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাষ্ট্রের আইনের ক্ষেত্রে তা অন্যরূপ। সে আইন মানা না মানা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আইনের যে সার্বজনীনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তা হ'ল এর অন্যদিক। শৃঙ্খলাবোধকে নিশ্চিত করবার জন্য এমন কতকগুলো ব্যবস্থা আছে, যা মেনে চলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কতকগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেককে মেনে চলতে হয়। এ ব্যবস্থা ও দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলে নেয়। এদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রাষ্ট্র অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে। অন্য সমর্থনগুলো হচ্ছে শর্তাধীন; কিন্তু বল প্রয়োগের ব্যবস্থা শর্তহীন। প্রয়োগ করবার শেষ শর্ত এ আইনের ক্ষমতাধীন।

রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য সামাজিক বিধানের মধ্যে যে মৌল পার্থক্য, তা কয়েকটি মতবাদে ঢাকা পড়ে যায়। এসব মতবাদে আইনকে বলা হয়ে থাকে 'স্বাভাবিক' বা 'চিরন্তন' অধিকারের আইন বা 'যুক্তির বিধান' বা স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা। আমাদের নৈতিক আদর্শ আমাদের আইন নির্ধারণ করে, একথা বলার অর্থ হ'ল আমরা সেসব আদর্শ মনে মনে পোষণ করি। সকল আদর্শই হচ্ছে বাস্তব অবস্থার উন্নত চিত্রায়ণ; কিন্তু কতকগুলো কারণে আমরা নৈতিক বিধান ও রাজনৈতিক আইনকে এক ক'রে দেখতে পারি না। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক আইন হ'ল বস্তুধর্মী; সবার জন্য এক এবং নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট। কিন্তু নৈতিক বিধান হ'ল আত্মিক, পরিবর্তনশীল এবং আভ্যন্তরীণ দায়িত্ববোধের মত। এর মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় এবং তা সব সৃজনশীল প্রভাবে সাড়া জাগায়। রাষ্ট্রের সকল সদস্য সকল সময়ে সব রকমে সমান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক আইনকে এক স্তরে আনা

www.nagorikpathagar.org

যায় না। দ্বিতীয়তঃ, আইনশৃঙ্খলা, জীবনব্যবস্থা ও ন্যায়নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণের সুবিধার জন্য আইন আচরণ বিধি প্রণয়ন করে এবং সব সময় তা নৈতিক পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়।[১] আইন আছে ব'লেই এসব বিষয়ে নৈতিক দিক বর্তমান রয়েছে। যদি আইন নির্দেশ দেয় যে, গাড়ীর চালকদের ডাইনে (অথবা বামে) চলতে হবে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, ডাইনে চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আইন পাশ হয়ে গেলে তাকে অমান্য করা যেমন নীতিবিরোধী, তেমনি বে-আইনী। কিন্তু এটা হ'ল উদ্ভূত ত্রুটি। এটা নিষেধ বিধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের বিধানের মূল গুণ হচ্ছে, আইন যাই হোক না কেন, নীতিবোধ মেনে চলতেই হবে এবং এ নীতিবোধের সাথে আইনের সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। সবশেষে এমন কতকগুলো নৈতিক বিধান রয়েছে, যা সামাজের অন্ততঃ অধিকাংশই গ্রহণ করে। কিন্তু সেগুলোকে কোন রাজনৈতিক আইনে বিধিবদ্ধ করা যায় না বা করা উচিতও নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'স্বাভাবিক স্নেহের' প্রেরণায় পরিবার-চক্রের মধ্যে কতকগুলো দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।' কোন বাহ্যিক আইন এগুলোর নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম নয়। সুযোগকে কাজে লাগাবার বা অমিতাচার পরিহার করার বা কর্ম-কুশলতার মান বজায় রাখার বা পরিশ্রমের এমন কতকগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা কোন আইন কার্যকরী করতে পারে না। তাই এদের নিয়ন্ত্রণভার আইনের গ্রহণ করাও উচিত নয়। দৈনন্দিন জীবনের পরিস্থিতিতে এমন কতকগুলো বিকল্প এসে যায়, যাদের উপর আমাদের জীবনের মূল্যবোধ নির্ভর করে। এদের ক্ষেত্রে আইনের বাহ্যিক চাপ কার্যকরী হ'লেও তা করা উচিত নয়; কেননা তা হ'লে আমরা বিভ্রান্ত হ'তে পারি বা উত্তেজিত হ'তে পারি। এ বিষয়ে পরে আলোচনা হবে। এ ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট যে, নৈতিক বিধানের ক্ষেত্র আইনের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় আইনের রয়েছে উপযুক্ত ও অদ্ভুত সমর্থন। যেখানে এ সমর্থন প্রয়োগ করা যায় না বা তা প্রয়োগের পর ব্যর্থ হয়; তখন বুঝতে হবে যে, আইন কোন এক অজানা ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা ক'রে এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

১। এর সার্থক আলোচনার জন্য পাউন্ডের (*Pound*) '*Low and Morals*' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

এটা ঠিক যে, কয়েক ধরনের সাধারণ আইন আছে, যাদের কোন প্রয়োগাত্মক গুণ নেই। প্রথম দৃষ্টিতে অন্তত: তাই মনে হয়; যেমন অনুমতিদান বা অধিকারদান সংক্রান্ত আইন। ঘোষণামূলক আইন যার ব্যাখ্যা দেয় আইন-পরিষদ বা কোন প্রত্যাহার আইনও এ পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে সেগুলোকে ব্যতিক্রম মনে হ'লেও সেগুলোও সাধারণ নিয়মের অধীনে এসে যায়। কোন ব্যাখ্যা দিতে হ'লে রাজনৈতিক পরিবেশ নির্ধারিত হয় এবং এ অর্থে তার নির্দেশ দেবার গুণও রয়েছে ধরতে হবে। কোন সমিতিকে সনদ দানের বা কোন মিউনিসিপ্যালিটির উপর কর আরোপের ক্ষমতা দানের মত আইনগুলোরও নির্দেশক বৈশিষ্ট্য আছে; কেননা ক্ষমতা আরোপিত প্রতিষ্ঠানগুলো এতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তারা যে বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করলো, সে সম্পর্কে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়। কোন প্রত্যাহার আইনেরও এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে; কেননা এর ফলে প্রচলিত আইনকে বাতিল করা হয়। বাতিল করার কর্তৃত্বে যথেষ্ট নির্দেশমূলক গুণ রয়েছে। বাধ্যকরী প্রক্রিয়ার এটা একটা প্রয়োজনীয় অংশ। রাজনৈতিক আইনের সমগ্রটাই হচ্ছে বাধ্যকরী এক ব্যবস্থা এবং তার সার্থকতা কোন ব্যক্তির বিবেচনা বা বিবেকের উপর নির্ভর করে না। এটা গণতন্ত্রে যেমন খাটে স্বৈরতন্ত্রেও তেমনি খাটে। আইনের বাধ্যকরী ক্ষমতা শেষ পর্যায়ে শাসক বা সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়; তা হ'ল রাষ্ট্রের প্রয়োগাত্মক ক্ষমতা—তার অস্তিত্বের শর্তস্বরূপ, এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য সংঘের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও মর্যাদার নির্ণায়ক। অবশ্য এ থেকে এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, আইনের প্রতি আনুগত্যের মূলে রয়েছে রাষ্ট্রের বাধ্যকরী ক্ষমতা বা হবসের কথায়: আইন অমান্যের পরিণামের জন্য ভীতি। কিন্তু আসল কথা হ'চ্ছে বাধ্যকরণের উপাদান ব্যতীত আইনের অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতার নিশ্চয়তা-বিধান সম্ভব হয় না। আইন যেহেতু সার্বজনীন; তাই এর বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, যেহেতু আইন নির্দেশের দিক দিয়ে বাহ্যিক; তাই তা বাধ্যতামূলক হ'তে পারে।

দুই: আইনের প্রশাসন

কান্টের বিখ্যাত সূত্র অনুযায়ী নীতিশাস্ত্রে একটি মাত্র 'সুস্পষ্ট আদেশসূচক করণীয় রয়েছে। তার বর্ণনা নিম্নরূপ: যে নীতিতে সার্থক

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, শুধুমাত্র সে নীতি অনুসারে কাজ করলে তাই হবে বিশ্বজনীন আইন'। আমার জন্য যা ভাল, একই পরিস্থিতিতে অন্য সকলের জন্যও তা ভাল; এর এমনি ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। আইনের যৌক্তিকতা অনুরূপ ধরনের পরিবেশে টেনে নিয়ে যায়। তার মূল কথা হচ্ছে, আমার জন্য যা আইন বা যা অধিকার কিংবা দায়িত্ব, তা অন্য নাগরিকদের বেলায়ও আইন বা অধিকার, এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা অন্য কারণে কেও কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় না বা কোন অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় না। এ নীতিই আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন।

সরকারের পক্ষে কোন স্বৈরাচারী কাজ এবং বিশেষ ক'রে শাসন বিভাগের পক্ষে কোন স্বৈরাচারী কাজ আইনের শাসনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিহীন। আইন-বহির্ভূত কোন পদ্ধতিতে কোন প্রশাসক কোন নাগরিককে আটক করতে পারলে বা তাকে কোনরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারলে আইনের শাসন ব্যাহত হয়। এমনি পরিস্থিতিতে জীবনব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং সকলের জন্য তা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে; কিন্তু আসলে এদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই আইন বর্তমান রয়েছে। এরূপ স্বেচ্ছাচারী কাজ আইনের স্বার্থবিরোধী। ডাইসি বলেন, সাম্প্রতিক-কালে অনেক রাষ্ট্রই এ অর্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এসেছে। ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এখন সাধারণভাবে সর্বত্রই সরকারের মৌলনীতি হিসেবে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে; এ স্বীকৃতির ফলে আমরা সরকারকে সমাজের একটা অংগ বা সংস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। সরকার এখন আর রাষ্ট্রের প্রভু নয়; বরং তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করবার জন্য ক্ষমতা লাভ করেছে।

এ থেকে এটাও অনুমান করা হয় যে, সরকার যে আইন প্রণয়ন করে এবং যে আইনকে সংরক্ষণ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের উভয়েরই নিয়ন্ত্রণাধীনে সে থাকবে। এটাও হ'ল আইনের শাসনের একটা অংশ বিশেষ। 'শাসনবিভাগীয় আইনের' বিশেষ বিচারালয় থাকতেও পারে, না থাকলেও চলে। যাহোক, সরকারের দায়িত্ব শাসিতদের দায়িত্ব থেকে স্বতন্ত্র, এবং তার কার্যকলাপও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত মানদণ্ডে এর বিচার

www.nagorikpathagar.org

হ'তে হবে। তাছাড়াও, সরকারের এমন কতগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা রাজনৈতিক আইনের সাধারণ সমর্থনের সাহায্যে কার্যকরী করা যায় না। তথাপি সরকারের যে অন্য সমর্থন আছে তার মাধ্যমেই সরকারকে সাধারণ শাসনের আওতায় আনা সম্ভব।

আইনের শাসনের দু'টি দিক রয়েছে এবং কোন দিনই এদের যথার্থ পার্থক্য নির্দেশ করা হয় নি। জন্ম, পদমর্যাদা, সম্পদ বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কোন দুষ্কর্মের আইনগত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে থাকলে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়; কেননা অনুরূপ অপরাধে আর পাঁচজন আইনের আওতায় এসে পড়ে। এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত আর একটি শর্ত হ'ল, যদি কোন ধরনের আচরণ আইনের আওতায় আসে, তবে কুল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অনুরূপ আচরণ আইনের আওতায় আনা উচিত। অন্যকথায়, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় কোন ব্যতিক্রম থাকা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন কর্মচারীর অবহেলা'র জন্য কোন ক্ষতি হ'লে আমি যদি বেসরকারী রেল কম্পানীর নিকট থেকে আইনগত ক্ষতি পূরণ পেতে পারি, তবে অনুরূপ অবস্থায় তেমনি ক্ষতির জন্য সরকারও সে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। যে অবস্থায় রাষ্ট্র অন্যের উপর আইনতঃ কোন দায়িত্ব আরোপ করে, তেমনি অবস্থায় রাষ্ট্র যেন সে নিজেও তেমনি দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকে। এ দায়িত্ব পালন বাস্তবক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতাতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফ্রান্স ও জার্মানীতে যেমন সরকারী কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়, এতে কিন্তু এ নিয়ম ভঙ্গ হয় না। কিন্তু তখনই এ নিয়ম ভঙ্গ হয় যখন রাষ্ট্র তার কোন কর্মকর্তার দুষ্কর্মের দায়িত্ব অস্বীকার করে বা উপেক্ষা করে; অথচ অনুরূপ কোন দুষ্কর্মের জন্য রাষ্ট্র কোন বেসরকারী সমিতির শাস্তি বিধান করে।[১] তাছাড়া, তখনও এ নিয়ম ভঙ্গ হয় যখন কোন অফিসের শাসন সংক্রান্ত বিধিভঙ্গের বিষয়ে কোন শাসন বিভাগ বা স্থায়ী কমিশন

১। আরনেস্ট বার্কারের (*E. Barker*) '*Rule of Law*' প্রবন্ধ *Political Quarterly* মে মাস, ১৯১৪। বেনব্রিজ ও পোস্ট মাস্টার জেনারেলের মধ্যে অনুষ্ঠিত মামলায় এ ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

আদালতে আপীলের কোন অধিকার না দিয়ে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ সংস্থা রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন অপরাধমূলক কাজে আইনগত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও এ নিয়ম ভঙ্গ' হয়। এ প্রসংগে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য ইংলণ্ডে ১৯০৬ সনের যে 'ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা' আইন প্রণীত হয় তাও উল্লেখযোগ্য।

নিয়ম-মাফিক সব কিছু ঠিক থাকলেও যদি কার্যতঃ আইনগত প্রতি-কারের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ না থাকে, তবেও আইনের শাসন ব্যাহত হয়। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎটি হ'ল আদালতে আপীলের জন্য ব্যয় বাহুল্য। ফৌজদারী মামলায়ও দেখা যায়, আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের যোগ্যতা তার উপদেশ নিতে যে ব্যয় হয়, তার দ্বারা সীমিত হয়েছে। দেওয়ানী বিষয়গুলোয় আইনের আশ্রয় নেয়া দরিদ্রদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব এবং উচ্চতর আদালতে আপীল করা ধনীদের পক্ষেও অনেকটা বিলাসিতার সামিল। এসব কারণে আইন বিষয়ে অনেক অসন্তোষ দেখা যায়, এবং বিশেষ ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এ অসন্তোষ অত্যন্ত বেশী। এ অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এ অনুভূতির জন্য যে, আইন ও আদালত প্রত্যেক শ্রেণীর দাবীদারদের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দান করে না। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, আইন নতুন সামাজিক পরিস্থিতিতে দ্রুত খাপ খায় না এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আদালতের বিচারকরা তাঁদের পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও জীবিকার পরিবেশ হেতু সাধারণতঃ অর্থশালীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এহ্‌রলিচ (*Ehrlich*) সত্যই বলেছেন যে, বিচারকের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছাড়া ন্যায়বিচারের কোন নিশ্চয়ত নেই।[১] কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ন্যায়বিচারের প্রকৃতির উপর বিচারকের সামাজিক সহানুভূতির বিরাট প্রভাব রয়েছে।[২]

আইনের শাসনকে কিভাবে সার্থক ক'রে তোলা যায় ও কিভাবে সে ত্রুটিগুলো দূর করা যায়, তা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

১। তার *'The nature of the Judicial Process'* শীর্ষক প্রবন্ধের ১৬ পৃষ্ঠা থেকে কারডোজা (*Cardoza*) কর্তৃক উদ্ধৃত, এটা *Nine Madern Legal Philosophy Series'* থেকে নেয়া হয়েছে।

২। লাস্কির (*Landy*) *'Authority in Modern Stale'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

আইনের শাসনের আদর্শকে পরিস্ফুট করার জন্যও উদাহরণগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আইনের শাসন হ'ল ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে একপ্রকার বিশ্বজনীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থা কিসের উপর নির্ভরশীল? এর উত্তর দিতে হ'লে আমাদের ব্যক্তিত্বের মতবাদে ফিরে যেতে হবে। ব্যক্তিত্বই হ'ল একমাত্র আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ। তাই আইনগত অধিকার হয় তার উপর নির্ভর করবে, না হয় তা সামাজিক মঙ্গলের বিরোধী হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আইন সম্পত্তি সংরক্ষণ করে; কিন্তু সম্পত্তির অস্তিত্বের জন্য আইনকে প্রয়োগ করা যায় না। আইন প্রয়োগ হয় এজন্য যে, সম্পত্তি ব্যক্তিত্বের বিকাশে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সম্পত্তির অধিকারকে এমনভাবে সীমিত করতে হবে যেন তা সে লক্ষ্য অর্জনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিকে বাতিল না ক'রে দেয়। 'প্রাকৃতিক অধিকার', 'প্রকৃতির আইন' প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সত্যই হ'ল তাই। একে সঠিকভাবে অনুধাবণ করলে বোঝা যাবে যে, যা আইনের শাসন একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাকে গতিহীন ও চূড়ান্ত এক ব্যবস্থা ব'লে অভিহিত করা ঠিক নয়। ব্যক্তিত্বের দাবীই হ'ল একমাত্র দাবী; যা চরম আনুগত্য পেতে পারে। কিন্তু এর ব্যাখ্যাদান অত্যন্ত কঠিন এবং সামাজিক ব্যবস্থার সাথে তার সমন্বয় সাধনও বড় কঠিন কাজ। চরিত্র, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ধারণা অস্বাভাবিক রকম বিভিন্ন। সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কে এখন বলবে যে, একটা ভেড়া চুরি বন্ধ করতে যে মূল্য দিতে হয় তা একটা মানুষের ফাঁসি দিলে যে মূল্য বিনষ্ট হয় তা থেকে বেশী? নৈতিক মূল্যবোধে এমনি সব পরিবর্তন সময়কালে আইনে প্রতিফলিত হতে হবে। সামাজিক প্রক্রিয়ার বিনিময়ে আইনকে কোন সময় গতিহীন করা উচিত নয়। আসলে আইন কোন সময়ই গতিহীন নয়। যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়, তার মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন ঢাকা পড়ে যায়; কিন্তু এসব পরিবর্তন এত বাস্তব ও উল্লেখযোগ্য যে, যে কোন আইন বিষয়ক লেখক বলতে পারেন, 'আজকের এমন কোন আইন নেই যা অতীতে তার বিরোধী আইনের মত মনে হয় না'।[১]

১। কারদোজার (*cardoza*) গ্রন্থ *'The Nature of the judicial Process'*—ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

এখানে আইনের শাসনের অন্য দিকটিও আমরা তুলে ধরতে পারি। আইনের শাসন তার সীমারেখায় সার্বজনীনতা দাবী করে; কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, সব রকম মানবীয় কাজকর্ম এ সীমা রেখায় পড়বে। রাষ্ট্র যেমন সর্বব্যাপক নয়, আইনও তেমনি সর্বব্যাপক নয়। প্রত্যেক নৈতিক বিধান আইনের আকারে প্রবর্তিত হ'তে পারে, এ ধারণাও অবাস্তব। প্রত্যেকটি কর্তব্য যা নৈতিক বিধান থেকে উদ্ভূত হয়, তাকেও আইন আকারে বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে বা আদালতে কার্যকরী করা যেতে পারে, এ ধারণাও অসংগত। যেখানে আইন তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না, সেসব হাজারো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেদেরকে সম্মানবোধ, প্রথা, বিবেক বিচার বা অন্য ধরনের আনুগত্যবোধে আবদ্ধ রাখে। নির্দিষ্ট আইন-গত শিক্ষা ছাড়াও আইনের লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে 'দার্শনিকতত্ত্ব' রাজ-নৈতিক তথ্য ও নৈতিক শিক্ষা। আদালত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এদের কার্যকরীও করে। কিন্তু তার মূলে যে পরিমাণ সত্য থাকুক না কেন, এগুলোর সার্বজনীন প্রয়োগ কিন্তু সঠিক পন্থা নয়।[১] আইন হ'ল সামাজিক ব্যবস্থার এক কাঠামো। একে এক অবিচ্ছিন্ন কাঠামোও বলা যেতে পারে; কেননা তার বৃদ্ধি আছে এবং তার পরিবর্তনও হয়। কিন্তু তা সত্বেও তা হ'ল সমাজ প্রকৃতির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

আইন কাঠামোতে সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত সত্তা প্রতিফলিত হয় ঠিকই; কিন্তু তার নিজস্ব এক সত্তাও রয়েছে। আইন প্রণেতা ও বিচারকরা শুধুমাত্র যে সমাজের প্রতিনিধি তা নয়; তাদের নিজস্ব পেশাও এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়; বিশেষ করে বিচারকরা সম্প্রদায়ের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বতন্ত্র এক জীবন ধারার পরিচয় বহন করেন। এর জন্য দায়ী হ'ল তার আইনগত প্রশিক্ষণ। আইন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধানে তার গভীর অনুরাগ, পূর্ব দৃষ্টান্তের প্রতি তার ভক্তি এবং বিশেষভাবে তাদের রক্ষণশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মতবাদ। বিচারকদের কাজ হ'ল আইনের ব্যাখ্যা দান ও প্রয়োগ। এভাবে তাঁরা আইন তৈরীও করেন এবং তার পরিবর্ধনেও সাহায্য করেন। সুতরাং তাঁর হাতে 'ইচ্ছাধীন ক্ষমতা'

১। পাউণ্ডের (*Pound*) '*Theory of judicial Decisions*' প্রবন্ধ হার্ভার্ডের আইন পর্যালোচনা—১৯২৩।

www.nagorikpathagar.org

ন্যস্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয় ; কেননা তা না হ'লে আইনের স্থিতিশীলতা ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে পারে। সীমিত এক পর্যায়ে তিনি বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগের জন্য আইনকে পরিবর্তন করতে পারেন। শুধু তাই নয়, পরিবর্তিত সামাজিক প্রয়োজনে আইনের কঠোর নীতিকে কাজে লাগাতেও তিনি পারেন। সুতরাং আইনের বিকাশে তাঁর দৃষ্টিভংগীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক যে, সম্প্রদায়ের জীবন সত্তায় অন্তর্নিহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে অতি দ্রুত গতিতে ; কিন্তু আইনের সত্তায় তত দ্রুততা প্রতিফলিত হয় না। যুগসন্ধিক্ষণে বা দ্রুত অগ্রগতির আমলে এটা আরও বেশী দেখা যায়। স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে আইন সুন্দরভাবে কাজ করে এবং এ জন্য আইন স্থিতিশীল এক অবস্থা ধ'রে রাখে বা পরিস্থিতি পরিবর্তিত হ'লেও আইনের নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে—তা মনে করে। পাউণ্ড বলেছেন যে, এজন্য আইনগত তত্ত্ব ও রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তিনি বলেন : 'আমেরিকার ব্যবহারবিদগণ এখনও বিশ্বাস করেন যে, আইনের নীতি হ'ল চূড়ান্ত, চিরন্তন এবং সর্বজনীন এবং চিরাচরিত প্রথার শিক্ষা হ'ল যে, সিদ্ধান্ত খুঁজে পেতে হবে ; তা তৈরী করা যাবে না। কিন্তু জনগণ বিশ্বাস করে যে, আইন তৈরী করা যেতে পারে এবং আইন তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁদেরও হাত রয়েছে। একজন ব্যবহারবিদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র আইনকে কার্যকরী করে ; কেননা তা হ'ল আইন। কিন্তু জনগণের দৃষ্টিতে তা হ'ল আইন ; কেননা রাষ্ট্রের ইচ্ছায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়ায় রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করেছে[১] চিরন্তন নীতি সম্পর্কে বিবাদ হ'ল এই যে, তা তত্ত্বগত ; ধর্মের মত সেকেলেও দমন মূলক হয়ে যায়। নতুন পরিস্থিতিতে আইন পুরোনো তত্ত্ব প্রয়োগ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংক্রান্ত আদালতে 'চিরন্তন নীতির' ব্যর্থতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'ট্যাফ্ উপত্যকা সিদ্ধান্ত' বা আমেরিকার 'দানবারীর টুপি প্রস্তুতকারক সংক্রান্ত মামলার রায় এবং 'বাকের চুলা ও যন্ত্র তৈরী সংক্রান্ত মামলার রায়' প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় শিল্প সংক্রান্ত নতুন পরিস্থিতির অনুধাবনে আইন কতটুকু ব্যর্থ হয়েছে। 'ষড়যন্ত্রের' মত প্রাচীন

১। *'Yale low journal—vol xxii—Decembsr' 1912.*

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থার ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্বোপরি, এসব আইনে ব্যক্তি ও কাজের মধ্যে অবস্থিত গতিশীল সম্পর্ককে উপেক্ষা করে ব্যক্তি ও কাজের মধ্যে গতিহীন সম্পর্কের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সম্পত্তির অধিকার নির্ধারণে আইন ভাল-ভাবে কার্যকরী হ'লেও কাজকর্ম ও সেবার মত অপার্থিব বিষয়ে আইন তেমন কার্যকরী হয় নি ; যদিও ঐসব ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই মানুষ সম্প্রদায়ে তাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

এ সবের জন্য 'আইনের শাসন' ক্ষেত্রে নতুন নতুন ত্রুটি দেখা দিয়েছে। আইনের মন্থর, জটিল ও ব্যয়বহুল কার্যকারিতার জন্য তথা তার সামঞ্জস্য বিধানের অসুবিধা ও আন্তরিকতার অভাব হেতু কোন কোন বিষয়ের বিবাদ মীমাংসায়, বিশেষ ক'রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্র এ অসুবিধা অনুধাবন করেও তার সমাধানের জন্য বিশেষ শিল্প আদালত' গড়ে তুলেছে। এ ধরনের শিল্প আদালতের সদস্য হন শিল্প ক্ষেত্রের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের আইনবিদ্যার অভিজ্ঞতাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নি।[১] তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট কোন আইনের নীতি অনুসারে গৃহীত হত না। এসব ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অনেক বেশী মুক্ত ও দ্বিধাহীন, এবং তাঁদের পদ্ধতি ছিল অনেকটা বোঝাপড়া স্থাপনের মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, বাধ্যতামূলক মিটমাট খুব সন্তোষজনক হয় নি ; যদিও এ বাধ্যতা মূলক দিকটা হ'ল আইনের ক্ষেত্রে এক মৌলিক উপাদান। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার যুক্তি অবশ্য এর বিপক্ষে তুলে ধরা হয় ; কিন্তু সেগুলোকেও খুব সন্তোষ-জনক মনে হয় নি।[২] হোয়াইটলি (Whiteley) কমিটির কথায় এর মূল কথা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় : 'আমরা যেকোন বাধ্যতামূলক সালিশীর বিরোধী।[৩] অন্যকথায় বলা হয় যে, অনেক দেশে এটা নিঃসন্দেহে

১। ১৯১৯ সনে ব্রিটেনে 'শিল্প-আদালত আইনের' অধীনে এরূপ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানী ও অন্যান্য দেশেও 'সমন্বয় বোর্ড' গঠিত হয়।

২। র‍্যাঙ্কিনের (*Rankin*) '*Arbitration and Conciliation in Australia*' গ্রন্থ।

৩ *Conciliation and Arbitration*' কমিটির রিপোর্ট।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাস করা হয় যে, আধুনিক জীবনের এক অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন এখন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় নি বা তার জন্য প্রস্তুত হয় নি।

এ ধরনের ত্রুটি শুধু যে শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়; অন্যান্য ধরনের অর্থনৈতিক বিবাদ মিটমাট করবার ক্ষেত্রেও এ ধরনের আভ্যন্তরীণ সংস্কার উপযোগিতা ক্রমশঃ স্বীকৃত হচ্ছে। আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ধরনের অগ্রগতির মূলে রয়েছে আইনগত মীমাংসার বাধ্যতামূলক দিক। আনইগত সিদ্ধান্ত অনেক সময় বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। বাহ্যিক শক্তি হিসাবে তা কার্যকর হয়। ক্ষতি পূরণদান, বল পূর্বক বিক্রয় ও অন্যান্য নির্দেশের মাধ্যমে যে ধরনের প্রতিকার বিধান করা হয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে এসে পড়ে একরকম বিজাতীয় ও অকস্মাৎ চাপ। যদি বিবাদমান দলগুলো একত্রিত হয়ে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের মতবিরোধ দূর করতে পারে, তবে তাতে একদিকে যেমন মিতব্যয়িতা আসে, তেমনি অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা কম সৃষ্টি হয়। অবশ্য এ ধরনের মীমাংসার উপরও থাকে আইনের আবেদন। আইনের এমনি আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই হয় অত্যন্ত সন্তোষজনক।

'আইনের শাসনে' যে ধরনের এবং যে পরিমাণ বিশ্বজনীনতা রয়েছে, তার অনুধাবনে আমরা এখন সক্ষম হই। একদিকে এর রয়েছে পরিমাণ-গত সীমারেখা; কারণ আইন শুধুমাত্র আচার-আচরণের বাহ্যিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে, এবং আইনের নিকট আবেদনের অর্থ হ'ল আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধীর কোন না কোন ক্ষতি। তাছাড়া, এর মিটমাটের পদ্ধতির অভ্যন্তরেও রয়েছে পরিমাণগত এক সীমারেখা। আইন যে ন্যায়বিচার করে, তা হল প্রধানতঃ অ্যারিস্টটলের কথায়, 'বিভাজনকারী ন্যায়বিচার'। আইন ন্যায্যভাবে ভাগ ক'রে দেয় বিরোধী দাবীর মধ্যে সমন্বয় সাধন না করে বরং আইন প্রত্যেকের পাওনা ভাগ ক'রে দেয়। যখন দুটো দাবী স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয়, তখনই শুধু আইন বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারে। এটা সত্যি যে, মাঝে মাঝে আইনের উপর অতি ব্যাপক এক ভূমিকা আরোপ করা হয়। আইনের সৃজনশীল ক্ষেত্রের কথা বলতে গিয়ে মিস ফলেট (Miss Follete) বলেন যে, 'এর কাজ শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থ সংরক্ষণই নয়, আমাদের স্বার্থ যেন আমরা বুঝতে পারি, তাই তাকে ব্যাপকতর করা ও গভীরতর করাও এর কাজ।'[১] তা যাইহোক, এটা কিন্তু রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কোন কাজ নয়। এ হ'ল এমন এক কাজ, যার জন্য রয়েছে উল্লিখিত ধরনের বহু সংস্থা। তাছাড়া, এ হল এমন এক কাজ, যা সম্পন্ন করবার জন্য আইনগত আপোষ-মীমাংসার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি থেকে অন্যান্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন হয়েছে সমাজে; যারা আরও সুন্দরভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে।

এ ত্রুটিগুলোকে অবশ্য আইনের ত্রুটি হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এগুলো হচ্ছে তার অদ্ভুত ও মৌলিক কাজ-কর্মের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী। এগুলো সম্পন্ন করবার জন্য আইনকে হতে হবে নির্দেশ-মূলক ও বাহ্যিক। শুধুমাত্র এভাবেই তা নিশ্চিত এক ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করে; যার উপর মানুষ সমাজের অনেক সৌধ গঠন ও পুনর্গঠন করতে পারে।

তিন: আইন ও রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একদিকে যেমন আইনের জনক, তেমনি অন্যদিকে তার সন্তান। আমরা দেখেছি যে, এ দু'সম্পর্কের অনুরূপ আইনের সুস্পষ্ট দুটো শ্রেণী রয়েছে। মাত্র কয়েকটি দেশে বিশেষ করে ইংলণ্ডে এ দুটোরই উৎস হল এক। আইনটি কোন সংবিধান সংক্রান্ত হোক আর সাধারণই হোক, তারা একইভাবে একই সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়। অধিকাংশ দেশে দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য এক এক ক্ষেত্রে এক এক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কোন কোন সময় সাংবিধানিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সংস্থার সৃষ্টি হয়; যেমন দেখা যায়, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে। কোন কোন সময় আইন পরিষদ বিশেষ নিয়মের অধীনে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করে; যেমন ফ্রান্সে আইন পরিষদের দুটো কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে তা সম্পন্ন হয়। বেলজিয়ামে সাংবিধানিক আইন প্রণয়নের জন্য নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে তা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু যেকোন পদ্ধতি অনুসরণ

১। মিস ফলেটের (*Follete*) '*Creative Experience*' গ্রন্থের ষোল অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

করা হোক না কেন এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হোক বা না হোক, এ দু'ধরনের আইনের রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও তাদের পেছনে থাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুমোদন। এ পার্থক্যের পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত আমরা আইনের ও আইনের সাথে রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক রয়েছে, তার যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না।

সাধারণ রাজনৈতিক আইনের পেছনে যে অনুমোদন থাকে, তা হ'ল স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র আইন-ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করে। এ আইন হ'ল রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সংরক্ষণের আওতা। রাষ্ট্র অধিকার ও দায়িত্বের এক বিস্তারিত ব্যবস্থা সংগঠন করে ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। সম্প্রদায়ের জন্য ও সম্প্রদায়ের পক্ষে রাষ্ট্র এ আইনগুলো প্রণয়ন করে থাকে। তাদের আওতায় আইনগুলো রাষ্ট্রের জীবন ব্যবস্থা তেমন-ভাবে বিধারণ না ক'রে বরং সমাজের সুশৃঙ্খল অবস্থা নির্ধারণ করে। সমাজের লক্ষ্য সামনে রেখে সমাজের অংগ হিসাবে রাষ্ট্র তাদের সংরক্ষণ করে। বেসরকারী সম্পর্কের হাজারো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব নির্ধারিত ক'রে দেয়। রাষ্ট্র এসব দায়িত্ব কার্যকরী করতে পারে; কারণ সে একটি সরকারী সংস্থারূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে এবং তাদের পক্ষে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সরকারী দিকটা বেসরকারী দিক থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ক্ষমতা আছে এবং এ ক্ষমতা হ'ল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও আইনকে কার্যকরী করার ক্ষমতা।

রাষ্ট্র তার যেকোন নাগরিকের বিরুদ্ধে আইনকে কার্যকরী করে; কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে যেকোন আইনকে প্রয়োগ করতে পারে কি? যেকোন সংঘের মত রাষ্ট্র তার বিশিষ্ট প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের এবং শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করে এবং শাস্তির দ্বারা সেগুলোকে অনুমোদন করে। আইন প্রণেতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা এবং সরকারের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগেরও কোন যুক্তিযুক্ত বাধা নেই। যেকোন আইন ভঙ্গ-কারী সদস্যের নিকট থেকে সরকার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

এক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিসেবে নয়, বরং সমাজের একটা অংগ হিসেবে সরকারের উপর বল প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। তাই সরকারের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করলে সরকার নিজের সংহিত নষ্ট না ক'রে বেসরকারী ব্যক্তির মত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি সে সংস্থা নিজেই আইন ভঙ্গ করে, তবে কি হবে? আইন অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

এটি হ'ল সাংবিধানিক আইনের সমস্যা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম তত্ত্বের পুরোনো মতবাদে এ দিকটি উপেক্ষিত হয় এবং তার সমাধানের কোন ব্যবস্থা হয় নি। আধুনিক সংবিধানের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংগবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত বাসস্থানের অলঙ্ঘনীয়তার মত কতকগুলো অধিকারের সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। এমনি সাধারণ নিশ্চয়তাবিধান ছাড়াও সরকারের সংগঠন, তার গঠন, নির্বাচন, কার্য বিধি, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং কতকগুলো বিধি-বিধান নির্দিষ্ট রাখে। ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রেও অনুমোদনের সমস্যা নেহাত ছোট নয়; যদিও সেখানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইন প্রণয়নের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রত্যেক বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে; কিন্তু একমাত্র সরকারের হাতেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ন্যস্ত রয়েছে। এটা সত্যি যে, কোন কোন রাষ্ট্রে সাধারণ আইন পরিষদের উপরে এক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। সংবিধান পরিবর্তন করবার জন্য কোন বিশেষ সংস্থার হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়; অথবা কোন কোন দেশে আদালত সংবিধান বিরোধী কোন আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও অচল বলে ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় সমস্যাকে শুধুমাত্র পিছিয়ে দেখা হয়। সাংবিধানিক আইন চূড়ান্ত, কর্তৃপক্ষ বা আদালতের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়। তবে প্রশ্ন ওঠে, এ কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিই চূড়ান্ত হয় এবং আদালতের কর্তৃত্ব যদি সত্যিই চরম হয়, তবে এর নির্ধারণকারী আইনের অনুমোদনের অর্থ কি? রাজনৈতিক পরিস্থিতির এ অবস্থা বিবেচনা করে আমরা সে পুরোনো প্রশ্ন তুলে ধরতে পারি, 'সে রাজনৈতিক সৌধের ভিত্তি কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বা সে ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছে?

ব্রিটিশ সংবিধানের দিকে নজর রেখে ডাইসি এ সমস্যার সমাধান নিম্নরূপে করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন শাসনতান্ত্রিক আইন আদালতের আওতায় আসে নি। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য এমন যে, সেগুলোকে কার্যকরী করতে ব্যর্থ হ'লে সরকারকে সাধারণ আইন পর্যন্ত ভাঙ্গতে হয়। ব্রিটিশ সরকার এক বছরের মধ্যে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে ব্যর্থ হ'লে আসলে তা বে-আইনী ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু এর ফলে অনেক অঘটন ঘটে যেতে পারে। 'বিদ্রোহ সংক্রান্ত আইন' অচল হয়ে পড়বে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং কর আদায় প্রভৃতি বিষয়ে ও শাসন বিভাগের কাজ-কর্ম বে-আইনী হয়ে পড়বে।[১] এসব বিষয়ে আইনগত কাজ পরিচালনার জন্য সরকারকে সংবিধানের মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের সমাধান হ'ল খুব নিপুণ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা যথেষ্ট মনে হয় না। কোন সরকার, এমন কি ব্রিটিশ সরকারও বে-আইনী কাজে না জড়িয়ে কতকগুলো মৌলিক সাংবিধানিক নীতি ভঙ্গ করতে পারে; যেমন পরিষদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান না করা; এ বিষয়ে পার্লামেন্ট এক আইন প্রণয়ন করতে পারে; যদিও তার ফলে সংবিধানের বহু প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ হতে পারে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে আদালত গ্রহণ করতেও বাধ্য। সরকারকে এমন ধরনের কাজ থেকে বিরত করতে কোন রাজনৈতিক আইন সক্ষম হয় না; যা সক্ষম হয়, তা হ'ল জনমতের প্রভাব এবং জনমতের প্রভাব সরকারের আওতার বাইরে।

ধর্মতাত্ত্বিকদের মানবের 'মুক্ত ইচ্ছার' সাথে ঐশ্বরিক শক্তির সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি ঘটেছিল, সার্বভৌম শক্তির সেকেলে তত্ত্ব অনেকটা তারই মত এ যেন এক রহস্যময় উত্তর; যার ফলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। মানুষের ইচ্ছা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর যেমন নিজেকে সীমিত করেছিলেন ব'লে বলা হয়, তেমনি সদস্যদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানে রাষ্ট্র তার সর্বব্যাপক শক্তিমত্তা সীমিত করেন ব'লে মনে হয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যেহেতু চূড়ান্ত, সাংবিধানিক আইনকে তাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা ব'লে মনে হয়; কেননা সাংবিধানিক আইনই রাষ্ট্রকে বেঁধে রেখেছে। নেহাত তার শুভবুদ্ধির জন্য রাষ্ট্র কতকগুলো শক্তি প্রয়োগ

১। ডাইসির (*Dicey*) '*Law of the Constitution*' গ্রন্থের- পনর ও ষোল অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

থেকে বিরত থাকে এবং কতকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে দৃঢ় সংকল্প হয় রাষ্ট্রের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করবার অন্যকোন শক্তি নেই কিন্তু তার নিজস্ব প্রকৃতি ও তার আত্মসংযম থেকে সাংবিধানিক আইনে স্ব-আরোপিত ও স্ব-নির্ধারিত নির্দেশ জারী হয়।[১]

এ ধরনের মতবাদগুলোর মত এ মতবাদেও বাস্তবতার বিনিময়ে ক্ষমতা যুক্তি প্রাণ পেয়েছে। আপাততঃ আমরা রাষ্ট্রকে ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ভাবছি না। এ প্রসংগে এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, রাষ্ট্রের ব্যক্তি যদি সাধারণ মানুষের চেয়ে নিষ্কাম ও বুদ্ধিমান না হয়, তা হ'লে তা ক্ষমতা অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে যে নিশ্চয়তা সে দেয়, তা অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং তখন তার আইন হয়ে পড়বে অর্থহীন। রাষ্ট্রের বর্তমা পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটা অবশ্য খুবই প্রযোজ্য; য আন্তর্জাতিক আইন নামে পরিচিত। তা কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের ইচ্ছা উপর নির্ভরশীল; কেননা অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষত্রে রাষ্ট ইচ্ছা করে যা মেনে চলে, তাই আন্তর্জাতিক আইন। এ কারণেই আন্তর্জাতিক আইন সাংবিধানিক আইন অপেক্ষা অনেক অনিশ্চিত। সাংবিধানিক আইন যে নিশ্চয়তা বিধান করে, তা হয় কার্যকরী ও স্থায়ী। অবশ্য বিপ্লব বা সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার ওলোট পালট হয়ে যায়। তবে এ পার্থক্য কেন—? প্রশ্ন ওঠে। এর কারণ কিন্তু এ নয় যে, সাংবিধানিক আইনের পেছনে রয়েছে অন্য আর এক ধরনের অনুমোদন?

এটাও বলা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত, এবং সাংবিধানিক আইনকে রাষ্ট্রের নয়, বরং সরকারের অবশ্য পালনীয় বলা চলে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা আইন প্রণেতাদের অবশ্য পালনীয়। আইন পরিষদের পেছনে রয়েছে চূড়ান্ত সার্বভৌম। আইন কার্যকরী করাসহ কতকগুলো ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে সত্যি; কিন্তু, সরকার হল ক্ষমতার জিম্মাদার—প্রভু নয়। সরকার যদি সে জিম্মার সাংবিধানিক শর্ত ভঙ্গ

১। সাধারণ আইনের ক্ষেত্রেও এ মতবাদ সুপ্ত থাকে এবং এর প্রকাশ হ'ল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ। বহু ব্যবসায়ী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে ঘৃণা করে এবং তারা সীমিত সার্বভৌমবাদকে অনর্থক ও অবাস্তব ব'লে মনে করে।

www.nagorikpathagar.org

করে, তা হ'লে যে সমর্থনের উপর সরকার নির্ভরশীল, তা-ও বিনষ্ট হয়ে যায়। সরকারের রয়েছে শুধুমাত্র কর্তৃত্বের জিম্মা, এবং চূড়ান্ত সার্বভৌম; এ ক্ষমতা প্রত্যাহারও করতে পারে। জনগণের মহত্তর ইচ্ছার উপর এ নির্ভরশীলতা আধুনিক রাষ্ট্রে এত শক্তিশালী ও নিশ্চিত যে, সাংবিধানিক আইনের অন্যকোন অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

নিঃসন্দেহে এ যুক্তিতে কিছু সত্য রয়েছে। প্রত্যেক সরকারই জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জনমতই সরকারকে সৃষ্টি করে এবং জনমতই তাকে ধ্বংস করে। শেষপর্যায়ে আনুগত্য আইন মেনে চলবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং এ ইচ্ছা নাগরিকদের অনুভূতি ও ঐতিহ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়। সরকার ব্যক্তি ও সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে আইনের বাধ্যকরী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু যদি সামগ্রিকভাবে শাসিতেরা আইন না মেনে চলে, তবে সরকার অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। শাসিতদের ইচ্ছাই সাধারণ আইন সৃষ্টি করে এবং শাসিতরা তা মেনে চলে। তেমনিভাবে সরকার সাংবিধানিক আইন সৃষ্টি করে ও তা মেনে চলে। যে আইনে প্রত্যেকের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, সে আইনকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হ'লে যে আইনে কয়েকজন বা সরকারের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, সে আইনকে সংরক্ষণ করা সহজ। তাদের আনুগত্যের অনুল্লিখিত; অথচ মৌল শর্তই হ'ল তাই; আইন প্রণয়নের বিধি ও শাসনকাজের নিয়ম ও অন্যান্য আইন যা প্রণীত হয়, তা হয় তাদের সম্মতিক্রমে। আইন প্রণয়নের কাঠামোকে সংরক্ষণ না করে কিভাবে তারা আইনের প্রতি আনুগত্য লাভ করতে পারে? অনেক দেশে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের কতগুলো অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয় এবং সরকার পরিচালনার কতকগুলো নিয়ম নির্ধারণ করা হয়; যা সরকার পরিবর্তন বা বাতিল করতে অক্ষম। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের থেকে যে মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর, এ সবের মাধ্যমেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সরকারের কতকগুলো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে; যা সে ইচ্ছা করলেই লঙ্ঘণ করতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যেপার্থক্য নির্দিষ্ট হ'ল তা যথার্থ; কিন্তু তার ফলেও রাষ্ট্রে ব্যাপক শক্তিমত্তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, অনেক লিখিত সংবিধান চূড়ান্ত সার্বভৌম

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক পরিবর্তিত বা বাতিল হ'তে পারে না। আর চূড়ান্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সদস্যদের খুব জোর সংখ্যাগুরু হ'তে পারে। একথা অবশ্য সব রাষ্ট্রের বেলায় খাটে। স্বাধীনতার নিশ্চয়তার পরিবর্তনের অধিকার থেকে সংখ্যাগুরুকে বঞ্চিত করা হবে কিভাবে? রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার চেয়ে অন্যকোন বড় কর্তৃত্ব নেই। এখানে আমরা শেষ পর্যায়ের 'সাধারণ ইচ্ছার' মতবাদে নির্ভর করি। এখানে আমরা বলতে পারি যে, সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রকে সীমিত করেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত নীতি থাকে, যা কোন সার্বভৌম বাতিল করতে সাহসী হয় না; তা সংবিধানে যাই লেখা থাক না কেন। পরবর্তী সময়ে আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা দেব।

ডুগের[১] মত লেখকরা রাষ্ট্র ও সরকার বা সরকার ও শাসিতদের মধ্যে যে পার্থক্য, তা স্থির করেই ক্ষান্ত; কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র কয়েকজন ও বহুর সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। সংঘ হিসেবেই হোক আর বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপেই হোক, রাষ্ট্র যে অবিচ্ছেদ্য, তা তাঁরা স্বীকার করেন না। অপরদিকে, আমাদের কাছে রাষ্ট্র হ'ল বিশেষ এক সংঘ। তার রয়েছে নির্দিষ্ট এক বৈশিষ্ট্য এবং তা অন্যান্য সংঘ, এমন কি সম্প্রদায় থেকেও স্বতন্ত্র।

এ মতবাদের একটা প্রত্যক্ষ ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। 'রাষ্ট্রের সর্বব্যাপক ক্ষমতার' মতবাদ ও ডুগে মতানুসারীদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকারের' নিয়ম-মাফিক কোন প্রশ্ন ওঠে না। সার্বভৌম যদি চূড়ান্ত হয়, তবে কি এসব অধিকার তার প্রকাশ নয়? তবে কিভাবে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোন্ অধিকারের স্বীকৃতি দেয় ও তাকে কার্যকরী করে? শুভেচ্ছা ও সম্মতির আলোকে রাষ্ট্রকৃত অপরাধের প্রতিবিধান থেকে তার সদস্যরা বঞ্চিত হয় না। আসলে বাস্তবে যা ঘটে, তা উপেক্ষা করলে এটাই বলতে হয় যে, অনেক দেশেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এমনি ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 'রাজার' নিকট চূড়ান্ত আবেদন নিয়ে যেতে চায় এবং 'রাজা' অনুগ্রহ ক'রে তা

১। ডুগের (*Duguit*) *'Traite de Droit Constitutionnel,' Passim,* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণও করেন। এতে আর কিছু না হ'লেও এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার রয়েছে। এটা সরকারের বিরুদ্ধে কোন অধিকার নয়। এ হ'ল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার; কেননা চুক্তি সম্পন্ন করে রাষ্ট্র—সরকার নয়। অন্যকোন সংঘের কোন প্রতিনিধি বা সংস্থা কোন কাজ করলে যেমন সে সংঘ তার জন্য দায়ী হয়, তেমনই রাষ্ট্র তার কোন সংস্থার কাজের জন্য দায়ী হয়। সুতরাং এটাই হবে সহজ ও বাস্তব, যদি রাষ্ট্রকে একটা সংঘ হিসেবে গণ্য করা হয়; কেননা সংঘের ন্যায় রাষ্ট্রেরও রয়েছে অনেক দায়-দায়িত্ব। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হলে তার অন্য দায়-দায়িত্বও নিশ্চিতরূপে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে যেসব অধিকারের পেছনে কোন অনুমোদন থাকবে না, তারাও অর্থহীন হয়ে পড়বে—এ আশঙ্কাও অমূলক। সম্প্রদায়ের ইচ্ছার উপর সরকার কেন, রাষ্ট্রেরও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হ'লে তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হই ততক্ষণ পর্যন্ত এর যথার্থ অর্থ অনুধাবন করতে পারি না। রাষ্ট্র শুধু যে তার সদস্যদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তাই নয়; অন্য রাষ্ট্রের সাথেও চুক্তি করে। এখানে রাষ্ট্রের কাজ সরকারের কাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ধরা পড়ে। যখন কোন সরকার কোন বিদেশী ঋণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন সে চুক্তিতে শুধু সে সরকার আবদ্ধ হয় তা নয়; রাষ্ট্রও আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র যেহেতু সার্বভৌম, তাই কি আমরা বলতে পারি যে, তার সৃষ্ট দায়িত্ব সে ভঙ্গ করতে পারে? রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব এখানে বড় কথা নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাই হ'ল এই—মানুষ আইনের অভাবে যে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে, শুধু তার জন্যই রাষ্ট্রের প্রতি তার অনুরাগ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনায় এদিকে আমরা নজর দেব।

চার: আন্তর্জাতিক আইন

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্ত পেয়েছি, তার ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে

www.nagorikpathagar.org

পারি। সাংবিধানিক আইন সরকারের উপর কতকগুলো দায়িত্ব অর্পণ করে, এবং এসব দায়িত্ব নাগরিকদের উপর সাধারণ আইনে অর্পিত দায়িত্বের মতই সুপ্রতিষ্ঠিত। এ কারণে সাংবিধানিক আইনকে আইন বলে গণ্য করা হয়। এভাবে দেখতে গেলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ছাড়াও অন্য ধরনের কতকগুলো অনুমোদন আছে, যা ঠিক তেমনি কার্যকরী। এ কথা স্বীকার করলে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-কানুন রয়েছে, সেগুলোকে আইন বলে গণ্য করবার পথে অনেক বাধা দূর হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে আরও নিশ্চিত অনুমোদনেরও আভাস পাওয়া যায় এতে। তাছাড়া, অন্য অসুবিধাও এর ফলে দূর হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের এক জটিল কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ম-কানুন ছাড়া আধুনিক সভ্যতায় এক অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা হত। যেসব সম্পর্ক একটা রাষ্ট্রের পূর্ণ আওতার অন্তর্ভুক্ত, সে ক্ষেত্রে আইন ও শৃঙ্খলার এক প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে; কিন্তু আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজ করে এক শূন্যতা। সেখানে নেই কোন শৃঙ্খলাবোধ বা নিরাপত্তা; ফলে যেকোন রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হ'তে পারে, একদিকে থাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল বিধি-বিধান; কিন্তু অন্যদিকে দুই রাষ্ট্রের মাঝামাঝি অবস্থায় বিরাজ করে এক নৈরাজ্য। যখন দুটো রাষ্ট্র কোন কোন্দলে অবতীর্ণ হয়, তখন সে নৈরাজ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারণ করার বিধি-বিধানই হ'ল আন্তর্জাতিক আইন। এখন পর্যন্ত এর কোন অংশ কোন আইন পরিষদ থেকে উদ্ভূত হয় নি এবং কোন সমায়ত এখতিয়ারভুক্ত আদালত কখনও তাকে কার্যকরীও করে নি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুশৃঙ্খল সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কার্যকরী হ'তে হ'লে আন্তর্জাতিক আইনের যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইনের সম্প্রসারণ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৃহত্তর জগতে সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা এতে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

তাই নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক শৃঙ্খলাবোধের ভিত্তি পত্তন করেছে। 'চুক্তির অধিকারের' মত এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার বিষয়ে, ভূখণ্ড দখলের স্বীকৃত-পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর সমুদ্র, উপকূল ভাগ এবং বিরাট আন্তর্জাতিক জলপথে ও প্রণালী সম্বন্ধে, এক দেশে অন্য দেশের অধিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে, কূটনীতি ও অন্যান্য ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধ'রে কতকগুলো নিয়ম-কানুন গ'ড়ে উঠেছে ; যা শান্তিকালে বিভিন্ন রাষ্ট্র মেনে চলে। এমনি ধরনের নিয়ম-কানুনের ভিত্তির উপর আরও সুপিকৃত হয়েছে কতকগুলো বিশেষ চুক্তি বা ঐক্যমত ; যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ যোগাযোগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সরল গতিতে পরিচালিত হ'তে পারে। তাছাড়াও রয়েছে সকল সভ্য দেশে কর্মী ও মজুর শ্রেণীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক নিম্নতম জীবনমানের সর্বসম্মত ধারণা ; যা সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মেনে চলা হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক এক ব্যবস্থা দিনে দিনে গ'ড়ে উঠেছে এবং ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। অন্যত্র যেমনটি হয়েছে এখানেও তাই ; অর্থাৎ রাষ্ট্রের পূর্বে সমাজ গ'ড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র তার সার্বভৌম শক্তির দাপটে বিভ্রান্ত হয়ে এবং তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঐতিহাসিক দাবী হারাবার ভয়ে হতচকিত হয়ে পরিবেশকে মেনে নিতে রাজী হয় নি ; কিন্তু বহু বিলম্বে হ'লেও অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে আজ সে বাস্তবতার এমনি নির্মম প্রয়োজনকে মেনে নিতে রাজী হয়েছে। অবশ্য মেনে তাকে নিতে হয় ; কেননা সমাজ বিবর্তনের দাবী অস্বীকার করবে কে ?

যুদ্ধকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক আইনের বৃহত্তর অংশ সম্পর্কে আমরা এখনও কোন আলোচনা করি নি। শান্তির নীতি অপেক্ষা যুদ্ধের নিয়ম-কানুনে অধিক শ্রম ব্যয়িত হওয়া উচিত, এ মনোভাব সার্বভৌম ও আন্তঃরাষ্ট্রের মিথ্যা আদর্শের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তাই আন্তর্জাতিক আইনের সামগ্রিক বিকাশকে ব্যাহত করে। যুদ্ধের শক্ত দিয়ে আইনকে পর্যুদস্ত করার ধারণার যে একটা নিজস্ব নিয়ম থাকা উচিত, তা নীতিগতভাবে অবাস্তব ও

www.nagorikpathagar.org

কার্যক্ষেত্রে অর্থহীন। বল প্রয়োগে কোন অধিকার সৃষ্টি হয় না এবং তা কোন কিছুরই স্বীকৃতি দেয় না। প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যুদ্ধ কোন দাবা খেলার মত হাল্কা ব্যাপার নয়; এ হ'ল জীবন মরণের সংগ্রাম এবং এর পদ্ধতি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক। মানবতার বিচার-বিবেচনা অনর্থক ধ্বংসকে প্রতিরোধ করে। ধ্বংসে বিজয়ের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। কিন্তু কে এমন সীমারেখা নির্ধারণ করার নিয়ম রচনা করবে, যার বাইরে যুদ্ধকালে ধ্বংস আর কার্যকরী হবে না? এ সীমা রেখার মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ ক'রে যুদ্ধের প্রতি নতুন অসংগতি যোগ করবে কে? বিষাক্ত গ্যাস যদি অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থ থেকে বেশী কার্যকরী হয়, তবে কোন্ যুক্তিতে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে? মানবতার আবেদন তুলে ধরলেও আমরা এ উত্তর পেতে পারি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতার কাজ সম্পন্ন হবে দ্রুত বিজয়ের মাধ্যমে অথবা পরাজয়ের গ্লাণি থেকে অব্যাহতি লাভের মাধ্যমে। যুদ্ধ এমনি স্বচ্ছ পার্থক্য নির্দেশের সুযোগ দেয় না; বিশেষ ক'রে আধুনিক যুদ্ধতো তা মোটেই দেয় না; কেননা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেসামরিক জনসংখ্যাও এতে জড়িয়ে পড়ে; কারণ তাদের অস্ত্র নির্মাণ করতে হয় বা পৌরজীবনের স্বাভাবিক কাজে তাদের সৈনিকদের স্থান পূরণ করতে হয়। যুদ্ধ ঘোষণা, শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ও যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত নিয়ম এবং অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের যত্ন নেয়া ও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে সদয় ব্যবহার সংক্রান্ত রীতি নীতি ছাড়া যুদ্ধ পরিচালনার বেশীর ভাগ নিয়মই শুধুমাত্র যে অযৌক্তিক ও অসংগত, তাই নয়; বরং সে নিয়ম-কানুনগুলো এমনভাবে লঙ্ঘন করা হয় যে, তাদেরকে আইন ব'লে চালানো ঠিক নয়। শান্তিকালীন নিয়ম থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং সাময়িক ব্যর্থতা সত্বেও সেগুলোই আসলে রাষ্ট্রের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সাংবিধানিক আইনের সংগঠন সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকলে আন্তর্জাতিক আইনের আসল অনুমোদন সম্বন্ধে বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এ অনুমোদনের কিছু অংশ এর আগেই এসে গেছে এবং অবশিষ্টটুকুও এসে যাবে। প্রত্যেক আইনের অনুমোদন হচ্ছে শেষপর্যায়ে জনমত। রাজনৈতিক আইন সম্পর্কে বিবেচনা করলে আমরা দেখব যে, সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্র নির্ধারণ ও প্রয়োগের কতকগুলো

www.nagorikpathagar.org

সংস্থা রয়েছে। এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সেসব সংস্থায়ও মতৈক্যের অভাব দেখা যায়। মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেসব সংস্থা আপনা আপনি সংগঠিত হবে।

এ অগ্রগতির দুটো প্রধান অন্তরায় হ'ল জাতীয় সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃত মতবাদ ও ভূখণ্ডের মালিকানার নীতি। এ প্রতিবন্ধকগুলোর মূল, আসলে নিহিত রয়েছে জনমতের কুসংস্কারে; কোন বাস্তব অবস্থায় নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। এ আদর্শ হ'ল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার চূড়ান্তরূপ। নৈতিক দায়িত্বের বন্ধনে রাষ্ট্র আবদ্ধ থাকলেও তা অন্য কোন আইনের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাইরের কোন বিধি-নিষেধ সহ্য করে না। নিজের এলাকায় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে কোন গৌরবোজ্জল দাবী সে পরিহার করে না। রাষ্ট্র কোন সৌভ্রাতৃমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অদ্ভুতভাবে সে 'সমগ্র নৈতিক বিশ্বের অভিভাবকরূপে' নিজের দাবী জাহির করে; অথচ সংঘবদ্ধ নৈতিক জগতের মধ্যে একটি উপাদান হিসেবে কাজ করতে নারাজ। এ রাষ্ট্রীয় দর্শন এমনি দাম্ভিক যা রাষ্ট্র কোন নৈতিক আইন ভঙ্গ করতে পারে তা স্বীকার করতেও তা নারাজ। রাষ্ট্র কোন লোককে হত্যা করলে তা কোন দিনই হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে না।[১]

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে যে, এ মতবাদ বাস্তব ভিত্তিক নয়। রাষ্ট্রের বাইরে কোন সমাজ নেই, এ ভুল ধারণার উপর তা প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজের অস্তিত্ব দিবালোকের মত স্পষ্ট। সমাজ যতদূর বিস্তৃত হয়; এক ধরনের শৃঙ্খলাবোধও ততটুকু প্রসারিত হয়। কোন রাষ্ট্র কিন্তু এ শৃঙ্খলাবোধের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না। এ সাধারণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তাদের কর্তব্য স্বীকার করে নেয় এবং তার ফলই হ'ল আন্তর্জাতিক আইন। কোন একটি রাষ্ট্র এ আন্তর্জাতিক

১। বোসাঙ্কেটের (*Bosanquet*) '*Philosophical Theory of the state*' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়। এ মতবাদের সমালোচনার জন্য '*Proceedings of the Aristotelian Society' New Series* ষোল অধ্যায় দেখতে হবে। প্রবন্ধটির নাম "*The Nature of the state in view of its External Relations.*"

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থার নিশ্চয়তাবিধানে সক্ষম; এ ধারণা অচল। কোন একটি রাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে; এ ধারণা জনমত দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। সরকরের আভ্যন্তরীণ কার্যকরিতা সম্পর্কে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের মতবাদ বিপর্যস্ত হয়েছে। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ মতবাদের ভিত্তি নড়ে উঠেছে; যদিও এখনও তা কোন রকমে টিকে রয়েছে। যদি জনমত বাস্তবতা বর্জিত ঐতিহ্য থেকে নিজেকে আরও একটু মুক্ত করতে পারে, তা হলে আন্তর্জাতিক আইনের পেছনে অনুমোদন দানের বিষয়ে তেমন কোন মৌলিক অসুবিধা আর থাকবে না। অবশ্য গোঁড়া দার্শনিকরা নিঃসন্দেহ তাকে উড়িয়ে দেবেন; কিন্তু তাঁরাও একেবারে তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না।[২]

আন্তর্জাতিক আইনের সুষ্ঠু বিকাশের পথে আর একটি অন্তরায় হ'ল একটি নীতি, যে নীতিতে বিশ্বাস করা হয় যে, সংহত ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত মালিকানা রয়েছে। বিশ্ব যেন কতকগুলো রাজনৈতিক ভূমি মালিকের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়েগেছে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ এলাকায় সর্বাধিকারী এবং সে এলাকার সব কিছুই যেন তাদের লভ্যাংশ। এ মতবাদ সীমানা প্রশ্নও অনধিকার চর্চা ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের ভাগ্যে আর বেশী কিছু জোটে না। একটা অংশতঃ হ'ল সামন্তবাদের উত্তরাধিকার, এবং আধুনিক উপনিবেশবাদের ফলে এর নতুন ক'রে বল সঞ্চার হয়েছে। জন-বসতিহীন বা অনুন্নত এলাকায় কোন রাষ্ট্র তার উপনিবেশ স্থাপন করে ইচ্ছামত সেসব ভূমির উপর দখল কায়েম করতে পারে। তাছাড়া, যখন সে নিজের নাগরিককে ভূখণ্ডের ব্যবহার ও ব্যবসায়ের অধিকার নিশ্চিত করে দেয় বা কোন মালিকের দখলে তখনও যায় নি এমন ভূ-খন্ডের উপর কার্যকর দাবী প্রতিষ্ঠা করে অথবা আদিবাসী অধ্যুষিত কোন দেশে নিজের প্রাধান্য বিস্তার ক'রে তার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের শর্ত হিসেবে ভূমির মালিকানা লাভ করে, তখনও তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এগুলো হ'ল সাময়িক পরিস্থিতি; যা অগ্রগতির সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। এক সময় এটা বলা হ'ত যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্র কানাডার ভূ-খণ্ডের মালিকানা লাভ করেছে। আজকে কিন্তু তা সত্য

২। বোসাঙ্কেটের প্রবন্ধ *"The Function of the state in Promoting Unity of Mankind."*

www.nagorikpathagar.org

নয়। অন্য কারণের জন্য হ'লেও ইংলণ্ড ভারতের উপর মালিকানা লাভ করেছে; এ কথাও কতটুকু সত্য. তা বিবেচনাসাপেক্ষ। তাছাড়া ব্রিটিশ রাষ্ট্র ইংলণ্ডের মালিক একথা বলাও বিভ্রান্তিকর।

মহৎ উদ্দেশ্যে ভূমি দখলের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে; অর্থাৎ সরকারী সুবিধা বা প্রয়োজনের জন্য রাষ্ট্র যেকোন অধিবাসীর ভূমি দখল করতে পারে।[১] তাহ'লেও রাষ্ট্র যোগ্যশর্তে সম্পত্তি দখল করতে পারে। কিন্তু এ দখল তার পূর্বের মালিকানা থেকে স্বতন্ত্র। যখন বিশ্বের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ, তখন রাষ্ট্রকে ভূমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবা আর বুঝি সম্ভব হবে না। স্থায়িত্বের পর কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে তার একাংশ বিক্রী করতে পারে না। অবশ্য নিপোলিয়ন যুক্ত রাষ্ট্রের নিকট লুইসিয়ানা বিক্রী করেন।

এর কারণ অবশ্য এই যে, ভূমির মালিকানায় দ্বিত্ব হ'তে পারে না; অর্থাৎ রাষ্ট্র একবার তার মালিক হবে এবং আর একবার হবে অধিবাসিরা, তা অস্বাভাবিক। যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু জনস্বার্থে রাষ্ট্রের দখলে যাওয়া দরকার, তাছাড়া রাষ্ট্র যে বিষয়ে মালিকানা পেতে পারে, তা হ'ল এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সম্প্রদায়ের একটা অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের উপর সম্প্রদায় যে অধিকার ন্যস্ত করেছে তা। এ ব্যাপারটা স্বীকৃত হ'লে আন্তর্জাতিক আইনের আওতা ও কার্যকারিতার ক্ষেত্র থেকে গুরুতর বাধাটা অপসারিত হয়ে যাবে। শক্তিশালী ও অস্ত্র সজ্জিত ব্যক্তির মত ভূ-সম্পত্তির মালিকরা সাধারণ আইন ব্যবস্থা থেকে আলাদা হয়ে গেছেন ব'লে মনে হয়। তাই সভ্যত'র হাজারো সূত্রে ঐক্যবদ্ধ বিশ্বে জনহিতের বাহ্যিক অবস্থার নিশ্চয়তার জন্য যেসব সংস্থা রয়েছে, তারা তাদের কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারে না, যদি না প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সাথে সুসমঞ্জস ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সহযোগিতা করে।

১। এ অধিকার আপনা আপনি সীমিত হ'তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও অংগ-রাজ্যের আদালতের বহু সিদ্ধান্তে এর নির্দেশ রয়েছে। ইংলণ্ডে 'মহৎ উদ্দেশ্যে ভূমি দখলের' বিধি-নিষেধ খুব পরিচিত নয় এবং সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা তেমনভাবে নির্ধারিত হয় নি। কিন্তু কার্যকর নীতিটি অনেকটা একরকম।

www.nagorikpathagar.org

তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের যা প্রয়োজন, তা হ'ল একটি আন্তর্জাতিক আদালত। তার প্রয়োজন শুধুমাত্র বিবাদ মীমাংসার জন্য নয়; বরং আন্তর্জাতিক জনমতকে সুসংহত করবার জন্যও। জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক আদালতের প্রতিষ্ঠা এদিকে এক বিশিষ্ট অগ্রগতিস্বরূপ। নির্দিষ্ট এক কার্যকালের জন্য বিচারকেরা নিযুক্ত হ'তেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য পূর্বতন হেগ আদালতের তুলনায় এটি ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ আদালতে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলো বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্য থেকে বাছাই করে অস্থায়ী আদালত বসানো হ'ত। একটা স্থায়ী আদালতের অনেক সুবিধা। এর স্থায়িত্বের জন্য ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় এবং জনমতের সমর্থন লাভ ক'রে তা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং কালক্রমে আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসার জন্য তাই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসাস্থল।

এ ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যেটির অভাব ছিল তা হ'ল আদালতের; আইনের নয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আইনে যেসব উৎসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হ'ল: (ক) আন্তর্জাতিক রীতিনীতি (খ) আন্তর্জাতিক প্রথা, (গ) সুসভ্য জাতিগুলোর স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতি এবং (ঘ) বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ব্যবহারবিদদের লেখা ও শিক্ষা। কিন্তু উল্লিখিত উৎসগুলোর মধ্যে ন্যায়-নীতির মত কোনটিই তেমন কার্যকরী নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর সম্মতি-ক্রমে ন্যায়নীতির প্রয়োগ হয়। আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি ও জাতীয় আইনের মূলনীতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন। যুগের প্রভাবে ও সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ই বেড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়।

উপসংহারে আমাদের এর প্রতি জোর দিতে হবে যে, আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতার একমাত্র সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে ব্যাপক ভিত্তিক জনমত। আদালত হচ্ছে একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এর চারদিক ঘিরে জনমত সুসংহত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সব থেকে বড় অসুবিধাটা হ'ল, সরকারী কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব। কূটনৈতিক বিষয়গুলো তার বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্য জনমতের প্রভাবের উর্ধ্বে থাকে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নাগরিকদের প্রত্যক্ষ

www.nagorikpathagar.org

প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। কিন্তু তার বৈদেশিক বিষয়গুলো এমন ভাবে এক সংস্থা পরিচালিত করে যা চূড়ান্ত সার্বভৌমের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তা সে বিজাতীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকে; কিন্তু সে সব ঐতিহ্য আজকাল অচল হয়ে পড়েছে। বৈদেশিক দপ্তর থেকে সম্প্রতি সরকারী গোপন দলিলপত্রের গোপনীয়তা যেভাবে ফাঁস হয়ে পড়েছে এবং কূটনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতির যে চিত্র তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার ফলে অন্তত: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির সাথে তার পার্থক্য আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যেন রয়েছে দুটি ব্যক্তিত্ব। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যা হয় শৃঙ্খলার অভিভাবক, বৈদেশিক ক্ষেত্রে তাই হয় তার শত্রু। এ অবস্থার জন্য দায়ী হ'ল অবশ্য আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতার অভাব। প্রত্যেক জায়গায় যদি রাষ্ট্র আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে ও আইনের মাধ্যমে কাজ করে যায়, তবেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য অর্জিত হয়।

এখানে অবশ্য এক স্তরের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন প্রশ্ন নেই; যদিও সার্বজনীন আইনের রাজত্বের কথা চিন্তা করে অনেকে নির্বোধের মত এমনি দুঃস্বপ্ন দেখেন। রাষ্ট্রের মধ্যে আইন তেমন কোন 'এক-রূপতা', সৃষ্টি করে না এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তা হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আইন তার সঠিক কার্যকলাপে বলপ্রয়োগের প্রবণতা প্রতিরোধ করে এবং তাই আবার আভ্যন্তরীণ শক্তির শত্রু বিশেষ। যে-সব মৌল শক্তি সভ্যতার সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, আইন ব্যবস্থার সৃষ্ট স্বাধীনতায় তারা সার্থকতা খুঁজে পায়। শৃঙ্খলাবোধই হ'ল জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলাবোধ কিন্তু অনিশ্চিত ও শূন্য-গর্ভই থেকে যায়।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ঃ

রাজনৈতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ

রাজনৈতিক আইন

- জাতীয় আইন
- আন্তর্জাতিক আইন
  (এর পূর্ণ বিকাশ হ'লে জাতীয় আইনের মতই তার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হবে)

জাতীয় আইন

- সাংবিধানিক আইন
  এ আইন রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ধারণ করে এবং প্রধানতঃ জনমতের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুমোদিত হয়।
- সাধারণ আইন
  এ আইন নাগরিক ও রাষ্ট্র এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং আদালতে প্রযোজ্য হয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুমোদিত হয়।

সাধারণ আইন

- সরকারী
  রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।
- বেসরকারী
  নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে

সরকারী

- শাসন বিভাগীয়
  রাষ্ট্রের সাথে কর্মচারীদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।
- সাধারণ
  রাষ্ট্রের সাথে বেসরকারী নাগরিকদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

রাজনৈতিক সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এক : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা

এখন রাষ্ট্র ধর্মের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং নৈতিক বিষয়গুলোয় বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত হয়েছে। তাই এখনকার সব থেকে জটিল সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক সুষম সম্বন্ধ নির্ণয়। যতদিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির জ্যোতিকেন্দ্র ছিল এক ও অভিন্ন, ততদিন পর্যন্ত এ প্রশ্নের বাস্তব গুরুত্ব তেমন ছিল না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিবর্তন দুটো শুধুমাত্র স্বতন্ত্রই ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা; কিন্তু তারা আলাদা হ'লেও একটি অপরটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মধ্য যুগের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক তরবারীর মধ্যে যে সংঘাত ছিল, এ দ্বন্দ্ব কিন্তু তা থেকে ভিন্ন। যখন তারা নিজের নিজের যথার্থ কর্মক্ষেত্র খুঁজে পায়, তখন সে সংগ্রাম শেষ হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। একটি অপরটির উপর প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এবং সর্বদা তাই করে চলেছে। রাজনৈতিক সরকার তার প্রাচীন চরম মনোভাব হারিয়ে ফেলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এ দিকে তার সার্বভৌম দাবী জোরদার করেছে। অস্ত্রশস্ত্র তৈরীকারী শিল্পীরা অত্যন্ত সোজা কথায় চিৎকার করছে: 'হে তোমার দেশের সরকার! তোমার দলীয় প্রধান, সংবিধান নীতি, ঐতিহাসিক দল, তোমার নেতৃবর্গ ও জরুরী সমস্যা এবং খেলার অন্যান্য পুতুল নিয়ে কেটে পড়। আমি যাচ্ছি খাজাঞ্চিখানায় বংশীবাদককে তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে তার সুরের ঝংকার থামাতে বলতে।'[১] এটা অন্য বাক্যের অতিশয়োক্তি হ'লেও আধুনিক যুগের মর্মবাণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এমন কতকগুলো অশোভন ঘটনা ঘটে গেছে, যেখানে একটা আর্থিক সংঘের কাজ-কারবারে সরকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধর্মঘট নিষিদ্ধ ক'রে সরকার আইন প্রণয়ন

১। বার্নার্ড শ'র নাটক: '*Major Barbara*'-এর তৃতীয় অঙ্ক।

www.nagorikpathagar.org

করেছে সত্যি ; কিন্তু যখন ধর্মঘট শুরু হয়, তখন সরকার সে আইনকে প্রয়োগ করতে অসহায় হয়ে পড়ে। অন্যকথায়, রেল কর্মচারী ও খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের মত আর্থিক চাপের কাছে রাষ্ট্র নতি স্বীকার করে এবং তাদের ইচ্ছামত সরকার আইন প্রণয়ন করে, অথবা এক শক্তিশালী ধনিকচক্রের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে ও তাদের ইচ্ছামত সরকার নীতি গ্রহণ করে।[১] অথবা ভারতীয় স্বরাজ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রতিরোধের সামনে রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। অথবা তার উপযুক্ত রাজনৈতিক অস্ত্রের ব্যর্থতা সম্পর্কেও স্বীকার করে এবং একটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে যোগসাজস ক'রে অন্যটির মোকাবেলা করে।

নিয়মনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হ'ল শ্রেষ্ঠতর। তা অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিবেশ ও সীমারেখা নির্ধারণ করে। অন্য পদ্ধতি ব্যর্থ হ'লে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বা তার কোন এক অংশকে জাতীয়করণ করার নির্দেশ দেয়। এখানেও কিন্তু ক্ষমতার আকৃতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নির্ভর করে ইচ্ছার ঐক্যের উপর এবং তাই তার কার্যকরী আওতাকে সীমিত করে। কোন কাজে যদি জনমতের একাংশ দূরে সরে যায়, তবে তাতেও সরকারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমে আসে। যেখানে থাকে বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব ; বিশেষ করে আজকের সমাজে প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে কোন কঠোর আইন প্রণয়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রত্যেক সরকার শক্তির প্রান্তিক সীমায় কার্যকর থাকে এবং তাদের পক্ষে কার্যকরী জনমতের প্রভাবে সে সাম্যবস্থা বজায় থাকে। কোন কাজের ফলে এ প্রান্তিক পর্যায় দুর্বল হয়ে পড়লে তাতে তার কর্তৃত্বও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। তাছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকারের কাজ-কর্ম হ'ল প্রকাশ্য এবং তা অনেক ক্ষেত্রে প্রচারাধিক্য দোষে দুষ্ট। সংঘবদ্ধ বিরোধীদলও তাকে যতদূর সম্ভব কালিমা লিপ্ত করতে সচেষ্ট থাকে। আবার, রাজনৈতিক ক্ষমতার শেষপর্যায় হ'ল বলপ্রয়োগ, এবং সে বলপ্রয়োগও হল বাহ্যিক। বলপ্রয়োগে কোন কিছু কার্যকরী করতে যাওয়ারও

১। এ প্রসংগে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে *Comite des Forges'* কমিটির প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তা পুরোপুরি কার্যকরী হয় না। শিল্প-সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবলেই আমরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি সম্বন্ধে বুঝতে পারি। যদিও তার পেছনে থাকে প্রচুর জন সমর্থন। একচেটিয়া ট্রাস্টগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংগ্রামকে লক্ষ্য করলেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত পেতে পারি। ট্রাস্টগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করে তাই নয়; ভেতর থেকে তা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দুর্বলও করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার লক্ষ্যে যে ঐক্য ও সংহতি বর্তমান, রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনদিন তা অর্জন করতে পারে না।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়েও চলতে পারে। এটা অবশ্য একটা অবাস্তব মতবাদ, রাষ্ট্রের শক্তিমত্তাকে আমরা কখনও ছোট করতে পারি না। রাষ্ট্রের কোন কোন কাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা-যে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আগ্রহ প্রকাশ করে, তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অদ্ভুত শক্তির আভাস বহন করে। যে একক ক্ষমতা সার্বজনীন পরিবেশ সৃষ্টির নির্দেশ দেয়, তার ক্ষমতাচ্যুতির কোন ভয় নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতারও অনেক অদ্ভুত সুবিধা রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হল, আয়ের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ; যা হচ্ছে তার অধীনস্থ সকলের জীবিকা অর্জনের পন্থা। তার অর্থ হল জাগতিক সম্পদ, চাক্‌রী-বাক্‌রী, বাজার, ঋণের উৎস, মূল্য এবং প্রতিযোগিতা প্রভৃতির উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। তার অর্থ হল, যোগানের নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে চাহিদার ক্ষমতা। এ হচ্ছে স্তরীভূত ব্যবস্থা; যার উৎপত্তি হয় অসাম্য থেকে এবং যা অসাম্য সৃষ্টি করে। জীবন ও পরিবেশের যে অবস্থায় মানুষে মানুষে অসাম্য ও পার্থক্য গ'ড়ে ওঠে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা সে উৎস থেকে প্রাণ পায়; অথচ রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি হল ঐসব চিরন্তন পরিস্থিতি, যা সাম্যের দাবীর প্রেরণা যোগায়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা হল বেগবান, অশৃঙ্খলিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে অনেক ধীর, অনেক অনমনীয়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে এরও পরিবর্তন হয় বটে; কিন্তু তা এমন ব্যাপক ও ঐতিহ্যপরায়ণ যে, সম্প্রদায়ের জীবন আলোড়িত করা

www.nagorikpathagar.org

বৃহৎ কোন আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক শক্তি তেমন প্রভাবিত হয় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার পূর্বে প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তনের গতি প্রভৃতি লক্ষ্য করে; রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করলে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব কার্যকরী হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার নিকটতম কেন্দ্রে কার্যকরী হয় এবং ইচ্ছামত বিস্তৃত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী তার আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম অবিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং যে ক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রগতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে, সেখানেই তার প্রভাব হয় গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র কিন্তু তার শুল্কবিধি ব্যবসা-বাণিজ্য বা জলযানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ও অন্যান্য পদ্ধতির ফলে ঐ অবিচ্ছিন্ন গতি রুদ্ধ করে এবং এসবের উপস্থিতি না থাকলে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি বা অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের গতিপ্রকৃতি অন্যরকম হ'তে পারত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার এখানে আমরা এক সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যেক দিকে অবাধ গতিতে চলতে থাকে; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়। অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা হ'ল বহুরূপী ও বহুকেন্দ্রিক; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে আবেগহীন ও কেন্দ্রীভূত।

এ থেকে বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। অবশ্য রাজনৈতিক অর্থে অর্থনৈতিক ক্ষমতার তেমন সীমা নেই বললেই হয়। শুল্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্র যতদুর সম্ভব তার নিজস্ব রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে অর্থনৈতিক কাজ-কারবার সীমিত রাখতে চায়; কিন্তু রাষ্ট্রের এ চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয় এবং সফল হলেও তা হয় দেশের কতকগুলো আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে। যদি তার ফলে, ধরা যাক, ইস্পাত নির্মাণকারীরা লাভবান হয়, তবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প আবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদি তার ফলে কয়েকজন শিল্পপতি লাভবান হয়, তবে কৃষককুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার কৃষকদের সুবিধা হ'লে কয়েক ধরণের শিল্পের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যদি সে কারণে দেশের শিল্পপতিরা উপকৃত হয়, তবে তাতে আমদানীকারক ও

www.nagorikpathagar.org

রপ্তানীকারকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাছাড়া, তাতে উৎপাদকদের উপকার হ'লে উপভোগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি হ'ল এমনি যে, তা কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সমায়ত হয় না। কোন দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে: কারণ তখন জনগণ সমগ্র বিশ্বের সম্পদের উপর নির্ভর করে, এবং অন্যদেশের উন্নয়নের জন্যও নিজেদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ করে। নাগরিকদের অংশীদারত্ব অর্থবিনিয়োগকারী বা যৌথ কারবারী বা ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে এবং নাগরিকত্বের সংকীর্ণ চক্রে তখন আর তারা আবদ্ধ থাকে না। স্বার্থ পৃথকীকরণের যে বৃহত্তর ক্ষেত্র, তার এ একটা দিক যা রাষ্ট্র স্বীকার করতে চায় না। দুটি ক্ষেত্রের অনন্যতার যে প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল, তা উভয়েরই ক্ষতি সাধন করে। বিগত যুগের রাজনৈতিক আদর্শে মানুষ শিক্ষালাভ করে ও সময়ের কুসংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে তখনও সার্ব ভৌম রাষ্ট্রের নামে অর্থনৈতিক জীবনের শিরা-উপশিরা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ভার্সাই সন্ধিচুক্তি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অর্থনৈতিক সংঘের উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক কাজকর্ম আরোপের মত সমাজ জীবনের দ্বিধা-বিভক্তির কোন যৌক্তিকতা নেই। চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার যে সমাধান হয় তা এখানে অত্যন্ত অপ্রতুল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ'ল একই লক্ষ্য অর্জনের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। তাদের উর্ধ্বে যে লক্ষ্য রয়েছে, তা অর্জনের জন্য তারা যেন দুটি সংস্থা। মানব মঙ্গলের জন্য তারা সমানভাবে গুরুত্ব-পূর্ণ দুটি পূর্বশর্ত। তারা একটি অপরটির উপর বিস্তৃত ও একটি অপরটিকে ছেদ করে। দুটিই হল বাহ্যিক ও দ্বিতীয় স্তরের পদ্ধতি। তারা উভয়েই বিশ্বজনীন পদ্ধতি; কেননা মানুষ যা চায়, তা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয় এবং মানুষ যা চায়, তার কোনটিই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া অর্জিত হয় না। মানুষ অন্য যেসব বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্তুষ্টি দান করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলো শুধুমাত্র তাদের সুফলের জন্য বর্তমান।

www.nagorikpathagar.org

তারা হাতিয়ার মাত্র, এবং তাদের অবদান নিহিত রয়েছে তাদের বাইরে। পরিবার, চার্চ, ক্লাব বা সাধারণ জীবন বা বন্ধুত্ব বা সংস্কৃতির জন্য যেসব সংঘ রয়েছে, তাদের সুষম ফল তাদের অভ্যন্তরে নিহিত; কিন্তু রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধু কর্মপদ্ধতি মাত্র। মানুষও তাদের কাম্য জিনিসের মধ্যে যে চিরন্তন এক বন্ধন রয়েছে, তার প্রয়োজনের জন্যই চিরকাল মানুষ তাদের অভাব অনুভব করেছে। তাই তাদেরকে আমরা ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি।

এ কারণেই এদের কোন একটি আর একটি থেকে কোন দিনই বিচ্ছিন্ন হয় না। রাষ্ট্র কোনদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অধিকার পরিহার করতে পারে না; কেননা এর মধ্যে আইনের মত কতকগুলো সাবজনীন বিধান শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়; তা একান্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের চরমপন্থী সমর্থকও স্বীকার করে যে, রাষ্ট্র বৈধ মুদ্রা প্রতিষ্ঠা করলে ও তার নিশ্চয়তা বিধান করলে খুব ভাল হয়। তাছাড়া, প্রায় সকলেই স্বীকার করে যে, সার্বজনীন প্রকৃতির কতকগুলো অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্র বা কাউন্টি ও মিউনিসি-প্যালিটির মত কোন এককের দ্বারা পরিচালিত হলে তাই হয় সর্বোৎকৃষ্ট। ডাক বিভাগ ও পানীয় সরবরাহের বিষয় এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তা নির্ধারণ করতে হবে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে; স্বার্থের বিভিন্নতার ভিত্তিতে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সবরকম পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের মত যোগ্য আর কোন সংস্থা নেই। অন্যদিকে এটাও বলা যায় যে, খুচরো বিক্রীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হ'ল একান্ত অযোগ্য। যেখানে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মান বাঞ্ছনীয় মনে হয় এবং যে ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন সার্থক মনে হয় সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সামাজিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয়; মনে হয় সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মান ও ব্যক্তিগত উৎসাহ উভয়ই মূল্যবান। তাই রাষ্ট্রের কাজকর্ম হওয়া উচিত নিয়ন্ত্রণমূলক—গঠনমূলক নয়।

www.nagorikpathagar.org

অন্যকথায়, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে এবং তা করাও প্রয়োজন; কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য নয়, বরং তা হবে সমাজিক মান বজায় রাখার জন্য দমনমূলক কাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রামের অহেতুক সংকট দূর করবার জন্য; কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠির স্বার্থপরতা বা অসাবধানতার বিরুদ্ধে সাধারণ স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য, জনস্বার্থ নিশ্চিত করতে একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং সাময়িক লাভের উদ্দেশ্যে যেন কোন দেশের সম্পদ বিনষ্ট না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য। কোন চিরন্তননীতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতা নির্ধারিত করা যায় না। অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিতে এবং তার নিজস্ব ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তা পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে মানুষ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ও সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করতে পারে না। রাষ্ট্রের কাজকর্ম বা তার ব্যর্থতার সাথে মানুষের আশা-ভরসা ও ভয় এমনভাবে জড়িত যে, যুক্তিসংগত বিবেচনার বদলে তারা ভাবাবেগে চালিত হয়। তা সত্বেও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে যেমন তার সার্থকতার ও ব্যর্থতার কাহিনী সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; রাষ্ট্রও তেমনি তার যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত।

আধুনিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় এবং তা হ'ল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু হবে বা কি ধরনের হবে, রাষ্ট্রের কি পরিমাণ অংশ গ্রহণ প্রয়োজন; এ ধরনের সংগ্রাম থেকে আধুনিককালে তার উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধন হয়েছে। সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্যবস্থা তাদের মধ্যে একটি।

সংরক্ষণমূলক শুল্কের আবেদন দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলাকার ঐক্য বিধান করে জাতীয়তার সাধারণ মনোভাব জাগ্রত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, তা বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় বাজারকে সংরক্ষণ করে নির্দিষ্ট স্বার্থকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা তা প্রতিহত হয়; কেননা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অগ্রগতির ফলে সমগ্র বিশ্বে শ্রমবিভাগ সার্থকভাবে প্রসার লাভ করে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ গতিতে তা চালু থাকে। রাষ্ট্রের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আধুনিক শিল্প জীবনের প্রতিযোগিতার

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে ন্যূনতম জীবনমান প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখা ; আমাদের সমাজের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন পরিবার সম্মিলিত 'আত্মীয় গোষ্ঠীর' সমর্থন হারিয়েছে। পুরোনো সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তিগত সংহতি আর সে দুর্বল ও লুপ্ত গৌরব পরিবারকে সাহায্য করে না। নতুন নতুন সুযোগের সাথে নতুন নতুন বিপদও উপস্থিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনে এসেছে আকস্মিক দুর্ঘটনা, অংগহানির বেদনা, বেকার সমস্যা আর অত্যাচারের মত হাজারো অভিশাপ। অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে এসবের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হাতিয়াররূপে খাড়া করেছে। তারা রাষ্ট্রের প্রতিও আবেদন করে, এবং রাষ্ট্র ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের দিকে এগিয়ে এসেছে।

এ প্রসংগে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা অসাম্যের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নতুন অসাম্যের দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া অধিকার ও দর কষাকষি প্রভৃতি যেসব পদ্ধতি তার রয়েছে, তার ফলে একদল আর একদলের বিরুদ্ধে বা একজনের লাভ অন্যজনের ক্ষতির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া, সহযোগিতার মন্ত্র যতই থাক না কেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হ'ল এক বিরাট সংগ্রাম ক্ষেত্র। এ সংগ্রামে সাধারণ স্বার্থ বিরাটভাবে আঘাত পায়। দুর্বলরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে ও বিভিন্ন রকম অত্যাচার ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। এসব যে তাদের নিজেদের বা তাদের পরিবারের ক্ষতিসাধন করে মাত্র তা নয় ; সমাজের পক্ষেও তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাষ্ট্র সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের মধ্যে যেসব ঐক্যবোধ রয়েছে, তাই হ'ল রাষ্ট্রের ব্যাপক ভিত্তি ; মানুষের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে, তা নয়। রাষ্ট্র মানুষকে নাগরিকত্বের আশীর্বাদ এনে দেয় এবং তা হয় সাধারণ সম্পদ। রাষ্ট্র রক্ষাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এসব দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তা অসাম্য ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সংকটকে দূর করতে সচেষ্ট হয়। গত একশো বছরের শিল্পসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে এসব কাজ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এবং রাষ্ট্র এসব সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

তার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপক সার্বভৌমের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং বংশানুক্রমিক বা জাতীয়-তাবাদী রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য বিশেষভাবে আবেদন সৃষ্টি, উপনিবেশ স্থাপন, অধীন শাসিত রাজ্য স্থাপন, ম্যাণ্ডেট লাভ বা প্রভাব কেন্দ্র সংগঠনের উচ্চাকাঙ্খা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত বাজার বা কাঁচামালের নতুন উৎস বা খনিজ সম্পদের লালসায় সচকিত হয়ে ওঠে। স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর জন্য যেসব সন্ধি প্রতিষ্ঠা হয় বা যেসব অধিবেশন আহুত হয়, তাদের বেশীর ভাগই অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েই হয়। এসব অধিবেশনে বা চুক্তিতে শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা আদায়, বাণিজ্যের সুযোগ বা অনুরূপ সুবিধা নিয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজ সদস্য ও অন্য রাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যে যে আর্থিক সম্পর্ক বিদ্যমান, এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের এক অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে এবং অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে এ নিয়ন্ত্রণও বৃদ্ধি পায়। এভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেন-দেনের এক বিস্তারিত সম্পর্ক সৃষ্টি-হয়। কখনও কখনও রাষ্ট্রও নিজে ঋণ গ্রহণ করে বা বিদেশে ঋণ দেয়; তবে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকারী সংস্থা বা বেসরকারী সমিতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ঋণ গ্রহণ করে এবং প্রায় সবসময়ই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেসর-কারী ঋণদাতার মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়। তা যাই হোক, ঋণ দান-কারী দেশ এসব বিদেশী ঋণের উপর পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। তার সম্মতি ব্যতীত আদান প্রদান হয় না এবং আর্থিক সংস্থাগুলোও বৈদেশিক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করে তা করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বৃটিশ সরকারের মনোভাবের দরুন বহুদিন ধরে রাশিয়ায় ঋণদানের জন্য বৃটেনের আর্থিক বজার বন্ধ রয়েছে। ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে সমৃদ্ধ দেশগুলোর সরকার নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

রাষ্ট্র যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজের গতি নির্ধারণ করতে ছেড়ে দিতে পারে না, তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না। 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের' মন্ত্র তারা তারস্বরে চীৎকার করে ঘোষণা করতে পারে; কিন্তু যখন তারা বলে যে, 'আমাদের বিষয় আমাদেরকে পরিচালনা করতে দাও, তখন তারা পারস্পরিক দাবীর প্রতি কোন মনোযোগ দেয় না এবং রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত থাকে না। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র কর আদায় করবে, তবে কিভাবে কর আদায় করা হবে এবং কতটুকু কর আদায় করা হবে, তা কিন্তু অর্থনৈতিক কাজের

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্ভুক্ত। কর আদায়ের যে নীতি অনুসরণ করা হোক না কেন, সব রকম কর ধার্যের ফলে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। কতকগুলো করের ব্যাপার, বিশেষ করে শুল্ক ব্যবস্থা এক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে করতে হয়। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজের অর্থনৈতিক ফলাফল রয়েছে এবং অর্থনৈতিক স্বার্থগুলো পরস্পর বিরোধী ও অসম। তাই তাদের কার্যকর করবার জন্য রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করে। শ্রমের উত্তম শর্ত আদায়ের প্রচেষ্টায় শ্রমিকই হোক অথবা ট্রেড-ইউনিয়নের প্রতিরোধকল্পে মালিক পক্ষই হোক—উৎপাদনকারীরা সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণকারী উৎপাদক হোক অথবা উচ্চ দ্রব্যমূল্য বিরোধী উপভোগকারীই হোক, সমাজতন্ত্রকে আক্রমণকারী ধনতন্ত্রের পূজারীই হোক আর ধনতন্ত্রের নিন্দুক সমাজতন্ত্রবাদীই হোক, তারা সবাই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। রাজনৈতিক দলের মতবাদ বা কাজকর্মে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্থিক স্বার্থ ও পদমর্যাদার পার্থক্যই হ'ল দলগত পার্থক্যের মূল। আধুনিক সমাজের প্রধান বৈষম্য হ'ল অর্থনৈতিক ; কুলগত বা সাংস্কৃতিক নয়। এ আর্থিক বৈষম্য থেকেই রাজনৈতিক দল তাদের প্রাণশক্তি, তাদের স্থায়িত্ব, এমন কি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত আহরণ করে।

যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আধুনিক রাষ্ট্রের পরতে পরতে বর্তমান, তার প্রধান কারণ এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ও আয়তন রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ও আয়তন এক নয়। গণতন্ত্র শ্রমিকদের হাতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভোটাধিকার দিয়েছে সত্যি, কিন্তু যেমনটি আশা করা গিয়েছিল বা প্রতিপক্ষরা যেমন আশঙ্কা করেছিলেন, তেমন পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু তাদের হাতে যায় নি। আর্থিক দুর্বলতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হ'তে পারে। এর বিপরীত অবস্থাও ঘটতে পারে ; তবে তার সম্ভাবনা খুব কম। কোন কোন পরিস্থিতিতে প্রবল অর্থনৈতিক স্বার্থ জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং কার্যতঃ তা পরিত্যক্ত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট বিরাট একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নকে রুখতে পারে নি। কিন্তু তথাপি এটা বলা প্রয়োজন যে, যদিও তারা তার প্রতিরোধে সক্ষম হয় নি, তথাপি তাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র সোভিয়েট বিপ্লবের মত বিশালকায় বিপ্লবের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পদদলিত করতে পেরেছে, এবং

www.nagorikpathagar.org

তাও বহু মূল্যের বিনিময়ে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার বহু হাতিয়ার রয়েছে; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার তূণে রয়েছে মাত্র কয়েকটি বান। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে খোলাখুলি সমরে নামতে হয়; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতার অনেক গোপন অলিগলি রয়েছে। একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে অর্থনৈতিক ক্ষমতার থাকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা হ'ল বহুত্ববাদী এবং সহজেই তা বিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রায়ই দূষিত হয় না; কারণ সে যা চায় তা সে নিজের জন্যই চায়। তাছাড়া, একমাত্র নিজের দ্বারাই তা দূষিত হ'তে পারে। এছাড়া, তাকে বিভ্রান্ত করবার অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু প্রত্যেক পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পদের বিষক্রিয়ার সম্মুখীন হ'তে পারে, তা সে সংবাদপত্র সংক্রান্তই হোক আর রাজনৈতিক দলেরই হোক বা সরকারের পর্যায়েই হোক।

তথাপি মনে রাখতে হবে, যে দুটো ক্ষমতা সমায়ত নয়। সম্পদ জনমতের সংস্থাকে কিনে ফেলতে পারে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; কিন্তু তথাপি ভিন্ন স্বার্থবোধ বেঁচে থাকে ও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্য-পক্ষে, পরিবহণ বা খনিজ শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে সংঘবদ্ধ শ্রমের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সহানুভূতিহীন কোন সরকারকে তার অভিপ্রায়ের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে; কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় আইনগত ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠে বা মূলধনের সূক্ষ্ম ক্রিয়ায় তা ব্যর্থ হয়েও যেতে পারে।[১] তাছাড়া, একটা দীর্ঘকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক কাঠামো অর্থনৈতিক পদ্ধতির কোনরূপ প্রভাবে পড়ে না। বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় সাধারণতঃ এক লাফে বা আকস্মিকভাবে। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে তেমন রাজ-নৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করা খুব কঠিন। অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে ক্রমে ক্রমে, এবং অনেক সময় অজ্ঞাতসারে; কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয় খোলাখুলিভাবে একটা বড় গোষ্ঠীর বিচার-বিবেচনা ও সম্মিলিত

১। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারণ ধর্মঘটের ন্যায় শ্রমের অর্থনৈতিক ক্ষমতার মারাত্মক প্রয়োগ এখন পর্যন্ত তেমন সার্থকতা লাভ করে নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় রয়েছে। এ প্রসংগে আমরা হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের, সুইডেনে অনুষ্ঠিত ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘট ও নিউজিল্যাণ্ডের ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের আধা সাধারণ ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করতে পারি। যখনই বিষয়টি রাজনৈতিক হয়ে পড়েছে তখনই তা কিছু সফলতা অর্জন করেছে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বেলজিয়ামে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে যে ধর্মঘট শুরু হয় বা কাপ্ পুশের (*Kapp Putsch*) আমলে জার্মানীতে যে ধর্মঘট শুরু হয়, তাও এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে। সে গোষ্ঠীও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত শক্তিশালী হয়ে থাকে।

দুইঃ রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনঃ অতীত দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ দর্শন

সামাজিক মুক্তির যে বৃহৎ আন্দোলন সংঘটিত হয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পৃথকীকরণ ছিল তারই অংশবিশেষ। ইতিহাসের গতিধারায় মানুষের চিন্তা ও কাজকর্মে কর্তৃত্বের চাপ কমে এল। উপজাতীয় চিন্তাধারার বাইরে চিন্তা করবার শিক্ষা তারা পেল। যেসব প্রথার বন্ধনে তাদের জীবন আবদ্ধ ছিল, তাদের বাইরে ভিন্ন পথে কাজ করবার শিক্ষাও পেল। সামাজিক মুক্তির একটা বড় দিক ছিল ভূমির উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার জন্য জীবনে যে গতিহীনতা ও অধীনতার সৃষ্টি হয়ে ছিল তা থেকে মুক্তি। সে অবস্থায় প্রত্যেক পরিবার বা গোষ্ঠী যেসব দ্রব্য উৎপন্ন করত প্রত্যক্ষভাবে তাদের উপর নির্ভর করত। অতীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে কেউ কেউ এ থেকে মুক্তি পায় এবং কেউ কেউ বিজয়াভিযান ও বলপূর্বক দখলের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু আসলে শিল্প পুঁজি বিকাশ লাভ করার পরই শুধু অর্থনৈতিক জীবন বাস্তব স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। মূলধন ছিল গতিশীল ভূমির মত মূলধনের মালিকানা; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিণতি ছিল না। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ, উচ্চাকাঙ্খা এবং সৃজনশীল প্রতিভার সৃষ্টি হ'ল মূলধন। ধনতন্ত্রের অস্থির শক্তি প্রথার জগদ্দল পাথরকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল। তার মধ্যে সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের এমন এক সম্ভাবনা নিহিত ছিল যা পূর্বতন যেকোন অর্থনৈতিক পর্যায়ে ছিল অজ্ঞাত। এ অর্থে মার্শের কথা যথার্থ। তিনি বলেছেন: "মূলধন হল জীবন্ত এক দানব। এ অত্যন্ত কর্মক্ষম এবং দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।" উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর মূল্য ভূমির মূল্যকে ছাড়িয়ে গেল এবং আরও ছাড়িয়ে গেল তখনকার মজুত-মালের মূল্যকে।[১] এভাবে এক অর্থনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হল; যার ফলে ক্ষমতার প্রাচীন ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

অতীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিত; বিশেষ করে যখন পরবর্তিত অবস্থায় সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হ'ত। পুরোনো

১। মার্শালের (*Marshall*) '*Industry and Trade* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ ভূমির সাথে নতুন সম্পদ বাণিজ্য কর্তৃত্বে অংশীদার হাতে চাইল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ করে রাজনৈতিক সুবিধার দিকে নজর দেয়। সাধারণ লোকদের আর্থিক ক্ষমতা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তাল মিলতে রাষ্ট্রও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এগিয়ে এল। ধনিকতন্ত্র নিজেকে প্রসারিত করে নতুনভাবে গড়েওঠা ধনী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করল। অন্য-কথায়, যখন অধীনস্থ শ্রেণী তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংঘবদ্ধ করে, তখন ধনিকতন্ত্রেরও রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এসব সংগ্রাম নতুন কোন নীতির ভিত্তিতে সংঘটিত হয় নি। আসলে এটা ছিল শাসকশ্রেণীর সংগঠনের ব্যাপার এবং তার মধ্যে নতুন নতুন উপাদান গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এ সংঘর্ষের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ঐক্য সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এ ঐক্যই সর্বদা শ্রেণী-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। যেসব শ্রেণী রাজনৈতিক দিকে থেকে হতমান ছিল, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তারা অবনত রইল। সামন্ততন্ত্রের মত শাসক শ্রেণী ছিল ধনিক শ্রেণী। সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী যাজক শ্রেণীর ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল শক্তিশালী।[১] উচ্চ ও নিম্ন অভিজাত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও সম্পদশালী নগরবাসী প্রভৃতি স্তরীভূত শ্রেণীর ছিল বিভিন্ন মাত্রার অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা। তাদের নীচে ছিল সম্পদহীন জন সাধারণ, কৃষককুল ও সর্বহারার দল।

আধুনিক ধনতন্ত্র নতুন ভাবধারা নিয়ে এসে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এতদিন পর্যন্ত ভূমি ছাড়া বাণিজ্য ও অর্থই ছিল সম্পদের প্রধান উৎস। সুতরাং যেসব শ্রেণী অর্থশালী হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে তারাও ক্ষমতা এবং সম্মান পেতে চাইল। তাই দেখা যায়, সতর ও আঠার শতকে ইংরেজ বণিকদের উচ্চাকাঙ্খা ছিল ভূমি ক্রয় করা, ভদ্রলোকের পদমর্যাদা লাভ করা এবং প্রভাবশালী ভূমি অধিকারী শ্রেণীগুলোর সাথে বৈবাহিক ও অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা। বণিকরা শুধুমাত্র ভূমির অধিকারী হয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক

১। বিয়ার্ডের (*Beard*) '*Economic Basis of Politics*' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

পদ মর্যাদা লাভ করতে পারত।[১] কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত ধনতন্ত্র বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে এবং তা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠে। তুলার কারখানা ও ইস্পাত মিলের মালিকদের ক্ষমতার দরজায় ধাক্কা দিতে হয় নি। এমনিতেই তারা ক্ষমতা চক্রে প্রবেশ করে। তাঁদের কাজ-কারবারের উপর নির্ভর করে বহুসংখ্যক লোক জীবিকার্জন করত। হ্যারিংটন তাঁর 'ওসিয়ানা' (Oceana) গ্রন্থে বলেন যে, ক্ষমতা ও মালিকানা একসূত্রে গ্রথিত। নিশ্চিতরূপে তা জীবিকার্জনের পদ্ধতির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে বিরাট জনসংখ্যা মূলধনের উপর নির্ভর করতে লাগল। তাদের সংখ্যা ভূমির উপর নির্ভর-শীল জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশী।

অবশ্য প্রশ্ন ওঠে, তখন শিল্পপতিরা কেন সোজাসুজি ভূমির মালিকদের রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করল না কেন এবং ক্ষমতার প্রাচীন ঐক্য এভাবে কেন প্রতিষ্ঠিত হল না? এর কারণ ছিল দুটি এবং দুটি কারণই শিল্প বিপ্লবের সাথে যে বিরাট সামাজিক পৃথকীকরণ সংঘটিত হয়, তার স্বাক্ষর বহন করে। প্রথমতঃ, ভূমির মালিক শ্রেণীর স্বার্থের যে ঐক্য ও সংহতি ছিল, শিল্পপতিদের তা ছিল না। পুঁজিপতিদের অভ্যুদয়ে যে অর্থনৈতিক পৃথকীকরণ দেখা দেয়, তাতে তাদের মধ্যেও এক বিরোধী-স্বার্থের জন্ম হয়। প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কাঁচামালের মালিকদের স্বার্থ উৎপাদকদের স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। বণিক ও জাহাজের মালিকদের স্বার্থ দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থ থেকে ছিল আলাদা। অর্থের নতুন শক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ খুঁজে ফিরছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসাম্য আরও বহুমুখী ও তীব্র হয়ে উঠল। ভূমির মালিকদের পক্ষে কোন রাজনৈতিক রীতির ব্যাপারে এক মত হওয়া ছিল সহজ; কিন্তু মূলধনের রাজনৈতিক দাবীকে সর্বসম্মত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। শুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারটা দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যাক। তাছাড়া, নতুন শ্রম বিভাগ আর্থিক ক্ষেত্রে অবনত শ্রেণীগুলোর হাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুন সুযোগ এনে দেয়। অতীতে এ সুযোগ তাদের জীবনে কোন দিন আসে নি।

১। টয়েনবির (*Toyenbee*) *'The Industrial Revolution'* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

সংগঠনের সম্ভাবনা তারা উপলব্ধি করে। সবসময় বিশ্ব তাদের শ্রমের উপর নির্ভর করেছে। এখন সে নির্ভরশীলতাকে তারা মূলধনের মালিক-দের বিরুদ্ধে এক কার্যকরী হাতিয়াররূপে খাড়া করে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতাকে প্রতিহত করে সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারত; কিন্তু সর্বহারাদের মধ্যে সে ধারণার প্রসারকে রোধ করতে বা সম্মিলিতভাবে তাদের কাজ থেকে অনুপস্থিতি থাকার ব্যাপারকে তারা রোধ করতে পারত না। নতুন সংগঠনের ফলে তাদের হাত দৃঢ় হয়ে ওঠে। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষমতা দানা বাঁধল যা ভূমির মালিকান বা সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিল সম্পর্কহীন। শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন শ্রমের বদলে যন্ত্র প্রবর্তিত হয় তখন যন্ত্র ও আসবাবপত্রের উপর শ্রমিকদের প্রভাব কমে আসে। কিন্তু তার বদলে তাদের হাতে আসে এই ক্ষমতা। সম্পত্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের এই ক্ষমতা অনেকটা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে; কেননা মালিকানার সাথে তা যুক্ত ছিল না।

এই নতুন শক্তির অভ্যুদয়ে সরকারের দৃষ্টিভংগী ও কাজকর্ম অনেকটা পরিবর্তিত হয়। যে অর্থে ভূমির মালিকরা এক শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়, সে অর্থে শিল্পপতিরা শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তারা অবশ্য সরকারের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করত; কিন্তু স্বাভাবিক অধিকারে তারা রাষ্ট্রের শাসক ছিল না। তাদের সম্পত্তির ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয় নি। যাদের খুব অল্প সম্পত্তি ছিল বা যাদের কিছুই ছিল না, তাদের সাথে তাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে বা অনেক সময় তারা তাদের সহযোগিতা করেছে। সুতরাং সরকার তখন ছিল একরকম বোঝাপড়া সমঝোতার ফল-স্বরূপ। অতীতের শ্রেণী কাঠামোর নিশ্চয়তা বিনিষ্ট হয়। কিন্তু এমনি স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ মঙ্গলের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। অতীতে ভূমির মালিকরা শুধু যে তাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করছে তা নয়; সাথে সাথে তাদের স্বার্থ বিস্তৃতও করেছে। অনুরূপভাবে গিল্ড বা 'ব্যবসায় সংঘ' তাদের বাজারে পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখেছে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের শিল্পও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখন কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহত্তর আদালতের কাছে প্রত্যেক স্বার্থকে তাদের স্বপক্ষে ওকালতি

www.nagorikpathagar.org

করতে হয়েছে এবং তাদের মতলব যাই হোক না কেন, সাধারণ মঙ্গলের নামে তাদের লক্ষ্য তুলে ধরতে হয়েছে ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয়েছে।

গণতন্ত্রের পক্ষে এটা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, গণতন্ত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী স্বার্থ ও জন-সমর্থনের প্রতি আবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। এখন সরকার এবং সম্পদ বা সরকার এবং সামাজিক মর্যাদার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রইল না। ফলে সমাজের শ্রেণী কাঠামো তার অনমনীয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হ'ল এবং অনেক সময় তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর অগ্রগতির প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পদ রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রয় করতে পেরেছিল। ওয়ালপোলের আমলে এমনি ঘটেছিল। কিন্তু ভোটাধিকারের সম্প্রসারণে এ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়ে যায়। তা তখন অগ্নিবর্ষী বক্তার প্রতিশ্রুতি ও তার সমর্থকদের প্রতি তার আশ্বাসের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে নি; যদিও এসব কালে তেমন কার্যকরী হয় নি; তবে যেখানে সাধারণ লোক ছিল অজ্ঞ ও অচেতন; সেখানে ঝড়ের বেগে বক্তা তার বক্তৃতার তুবড়ী চালিয়ে সকলকে অবাক করে দিতে পেরেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের একমাত্র পন্থা হল জনগণকে হাতকরা। এ উদ্দেশ্যে সম্পদও কাজে লাগে; তবে সম্পদের ব্যবহার হয় প্রধানতঃ জনমতের বৃহৎ সংস্থাগুলোকে কিনে ফেলায় ও তাদের নিয়ন্ত্রণের কাজে। কিন্তু এর কার্যকারিতাকে একটু বাড়িয়ে বলাও যায়। জনমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয় এবং এর প্রকাশের বহু পদ্ধতিও রয়েছে জনমতের বড় বড় মুখপাত্র বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলো জনগণের কুসংস্কারকে কাজে লাগায়; কিন্তু তাদের মতের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু যায় না। এসব ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তাদের সফলতার জন্য জনমতের উপর তারা নির্ভরশীল। কতকগুলো মতই একটা সংবাদপত্রের জন্ম দেয়; কোন সংবাদপত্র কোন মত সৃষ্টি করে না। আগেই তৈরী জনমতকে সংবাদপত্র সমর্থন করে ও তাকে শক্তিশালী করে। বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অত্যন্ত কার্যকরী; কেননা এসব বিষয়ে সংবাদের উৎস হ'ল অত্যন্ত গোপনীয় এবং বিশেষ মহলের মধ্যে সীমিত। এ কারণে সরকার তার বৈদেশিক নীতির বিকাশে

www.nagorikpathagar.org

সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করে ;[১] কিন্তু জনমতের বৃহৎ বৃহৎ গতি কিন্তু স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে গ'ড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। এদের নিয়ন্ত্রণ বা দমন প্রচেষ্টা তেমন সফল হয় না। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এর বড় এক দৃষ্টান্ত। শেষপর্যায়ে জনমত হচ্ছে জন সাধারণের চরিত্রের প্রকাশ।

এর একটা ফল হ'ল তার সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মূলধনকে রাজনীতিতে আত্মরক্ষা মূলক এক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে তাকে ঐসব শ্রেণীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যারা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। এর আইনগত ভিত্তিতে কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে এবং সেসব জায়গায় সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হয়। ধনতন্ত্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর, এবং রাষ্ট্র মৃত্যুকর আরোপ ক'রে এবং উত্তরাধিকার কর প্রবর্তন করে এমন এক নীতি গ্রহণ করছে যার ফলে তার স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়। অনেকে আবার মত প্রকাশ করেন যে, এদিকে রাষ্ট্রের আরও অগ্রসর হওয়া উচিত এবং মোটামুটি পরিমাণ ছাড়া সমস্ত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারের অবসান হওয়া উচিত। শুধু প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীর জন্য কিছু বিবেচনা করতে হবে।[২] রাষ্ট্রের করধার্যের ক্ষমতা সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের পক্ষে ভীতিপ্রদ। রাষ্ট্রের কাজকর্ম বিস্তৃত হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। তাছাড়া, রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে ঋণও গ্রহণ করেছে, যদিও তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পদ ধ্বংসকারী যুদ্ধের জন্যই নয়। এসবের জন্য রাষ্ট্রকে বেশী পরিমাণে করধার্য করতে হয়। করধার্যের এ পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবীরূপে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এবং আয়ের জন্য রাষ্ট্রও পর্যায়ক্রমিক বাছাই

১। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পয়নকারী (*Poincore*) ২৭শে নভেম্বর তারিখে ৬০ লক্ষ ফ্রাংক ঋণ চেয়ে পাঠান। তা'দিয়ে তিনি বিদেশে খবর আদান-প্রদানের জন্য এক গোপন তহবিল গঠন করতে চেয়েছিলেন। ইশ্বোলস্কি যোগাযোগে এর উপর কটাক্ষ করা হয় এবং বলা হয় যে, গোপন প্রচার অভিযানের জন্য সে তহবিল ব্যবহৃত হত।

২। ড্যাল্টনের (*Dalton*) '*In equality of Income* গ্রন্থের চতুর্থ অংশ।

www.nagorikpathagar.org

করে এবং প্রগতিশীলহারে করধার্য করতে বাধ্য হয়।[১] ধনতন্ত্র রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্প্রসারণের বিরোধিতা করে; বিশেষ ক'রে সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সম্প্রসারণ ধনতন্ত্র চায় না। তাছাড়া, সামাজিক পরিবর্তন আনবার জন্য করধার্যের পদ্ধতির বিরোধিতা করে ধনতন্ত্র এবং বিশেষ করে পার্থক্য নির্দেশ করে; রাষ্ট্র যে করধার্য করে তার কঠোর সমালোচনা করে; কেননা এতে করের বোঝা সম্পদ-শালীদের অধিক বহন করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্ন এসে পড়ে।

ধনতান্ত্রিক ক্ষমতা বাইরে এমনিসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে ভেতরে নিজেকে সুসংহত করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে এর সুসংবদ্ধ সংগঠন গ'ড়ে উঠেছে। নিয়ন্ত্রণমূলক এ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির উল্লেখ ছাড়া আমাদের আর করার তেমন কিছু নেই। এ ব্যবস্থা উদ্যোগী পুঁজি-পতিকে তার নিজস্ব যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী মূলধন নিয়োগে প্রেরণা দেয় এবং এভাবে বৃহৎ কেন্দ্রায়ত ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক পুঁজি বিনিয়োগকারীর স্বার্থে স্থায়িত্ব এনে দেয়। এতে পরিচলনার কলাকৌশল থেকে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে মূলধনের উপর বৃহত্তর ক্ষমতা ন্যস্ত হয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসার সাথে মূলধনের সংযোজন সহজতর হয়ে ওঠে। এ ব্যবস্থার ফলে ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ, বীমা ও অন্যান্য ধরনের শক্তিশালী ও অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত আর্থিক সংস্থা পরস্পর নির্ভরশীল পরিচালকমণ্ডলী অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান মূলধনকে এ ব্যবস্থা অধিক উপর্জনের সম্ভবনার পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে। 'চালু প্রতিষ্ঠান' এতে অনেক অদৃশ্য সম্পদও লাভ করে। একবার জনসা-ধারণের নেকনজর ও সদিচ্ছা লাভ করলে এবং রাষ্ট্র একবার সনদ ও অধিকার দান সমাপ্ত করলে এ ব্যবস্থায় শিল্পের অগ্রনায়ক বিশেষ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয় এবং এপদ্ধতিতে সেগুলো বৃহৎ একচক্রের কায়েমী স্বার্থে রূপান্তরিত হয়। সর্বোপরি, এতে সৃষ্টি হয় নৈর্ব্যক্তিক

১। প্রগতিশীল (*Progressive*) শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এ হারে করধার্য করা হ'লে আনুপাতিকহারে যে কর দিতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এক সত্তা; নাম না জানা অথচ এড়িয়ে যাওয়া, স্থায়ী ও অমর। এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত মালিক এমন এক নিশ্চয়তা উপভোগ করে এবং স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয় যা বিশ্বে এর পূর্বে কোনদিন সম্ভব হয় নি। এভাবে মূলধনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আরও গতিশীল হয়ে ওঠে ও আরও ব্যাপক আকারে আধিপত্য বিস্তার করে এবং নিজের স্বার্থে সম্প্রদায়ের উৎপাদনশীল কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত করে।

এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-ক্ষমতার পরিবর্তনশীলতার প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। অর্থনৈতিক 'করপোরেশনের' জন্মের ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি বিধ্বস্ত হয়। ভাল বা মন্দ উভয়ের জন্যই তার ক্ষমতা এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যাকে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত রাখা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় নীতির উপর প্রভাব বিস্তার থেকে এ শক্তি বিরত থাকে না। অন্যদিকে রাষ্ট্র ও তার সদস্যদের সাধারণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একে নিয়ন্ত্রণ না করে পারে না। এক-চেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে উপভোগকারী রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করে, শ্রমিকরা শ্রমের রক্ষাকবচ দাবী করে এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা 'অন্যায় প্রতিযোগিতা' থেকে রেহাই পেতে রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় পেতে চায়। অন্যদিকে, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য শুল্ক সংরক্ষণ দাবী করে। রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব নিয়ত অনুভব করে চুপচাপ থাকতে পারে না। জনমতের সাথে তাল রেখে তাকে পথ রচনা করতে হয়। তার গণতন্ত্রায়ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যমণি যে অসাম্য, তাকে সাম্যাবস্থায় রাখতে রাষ্ট্রকে তার প্রভাব বিস্তার করতে হয়।

এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের চেয়ে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম অনেক বেড়ে যায়। কখনও কখনও আধুনিক রাষ্ট্র রেলপথ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। রাষ্ট্র যদি একাজ থেকে বিরত থাকে তথাপি বিভিন্ন বোর্ড ও কমিশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ চালিয়ে যায়। এসব কমিশন ও বোর্ডের হাতে অনুসন্ধান ও তদারকের প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, এবং আইনের শর্তাধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের মান, কর ও অন্যান্য দেয় এবং করপোরেশন-

www.nagorikpathagar.org

গুলোর ঋণপত্র প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের অধিকার তারা প্রয়োগ করে। রাজনৈতিক কমিশনের গঠন ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা যায়। অর্থনৈতিক বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ করপোরেশনগুলোর তদারকের জন্য এসব কমিশন গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সম্প্রতি গঠিত এরূপ একটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: যেহেতু পেন-সিলভেনিয়া ও সমগ্র জাতি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাই আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি যে আমরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাদের দেহ ও আত্মার উপর প্রভুত্ব করে আমাদের সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত করব। তা না হ'লে আমরা বহু ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও সব চাইতে প্রভাবশালী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের অসহায় ভৃত্য হয়ে পড়তাম। হয় আমাদের বিদ্যুৎ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, না হয় তার প্রভু ও মালিকরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে।[১] এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ আইন, কর্মীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন, বেকার সমস্যা নিরোধ আইন প্রভৃতির মত কতকগুলো সামাজিক উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়নের ফলে প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন শাসন বিভাগের স্থায়ী শাসন পর্ষৎ ও নতুন নতুন আধা-বিভাগীয় পর্ষৎ গঠনেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসব বোর্ড ও কমিশন অনেকটা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রহরা কেন্দ্রের মত।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দ্বন্দ্বের আর একটা দিক সম্পর্কেও একটু আলোচনা প্রয়োজন। অন্যত্র তারা পরিত্যক্ত হ'লেও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুদিন চলতে থাকে। এই প্রশ্নেও তাই হয়েছিল। এই মতবাদ এখনও প্রচলিত যে, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা হ'ল এক ধরনের ব্যয়বহুল ক্ষমতার প্রদর্শনীয় মত। এর ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতায় বাড়তি করের বোঝা এসে যায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যাহত হ'তে থাকে;

১। গভর্নর পিনসটের (*Pinchot*) বাণী। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বৃহৎ বিদ্যুৎ পর্যালোচনা পর্ষৎ-এর রিপোর্টের ভূমিকায় এ বাণী লিপিবদ্ধ হয়।

www.nagorikpathagar.org

তবে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সম্মিলিত করার যুক্তি খাড়া করা হয়। এ দাবীও তোলা হয় যে, রাজনৈতিক মালিকানা অনেকটা অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য আমরা এর আগে যা দেখেছি তাতে মনে হয়, এ যুক্তি উপনিবেশ বা অধীন কোন ভূখণ্ডের মালিকানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মত যখনই তারা স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় পরিণত হয়, তখন থেকে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধার দিকে নজর রেখে নীতি নির্ধারণ করে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যা আমদানী করে, তার এক-তৃতীয়াংশও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে আমদানী করে না।[১] অন্যদিকে, কতগুলো বিষেশ সুবিধা ব্যতীত আসল উপনিবেশ থেকেও যে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা হয় তাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এ সুবিধাকে সাধারণত: অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। যুদ্ধের আগের বছরের বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, 'যদি যুক্তরাজ্য সমগ্র আফ্রিকা অঞ্চলে তার অধিকার বজায় রাখত' উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসাবেই হোক আর শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসাবেই হোক, তবে সে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কিন্তু যুক্তরাজ্যের শিল্প উৎপাদনের শতকরা দু'ভাগের বেশী বাজারজাত করা যেত না, বা শতকরা দু'ভাগের বেশী তার আমদানীও বাড়ত না। অবশ্য অন্য কোন দেশ তার অধিকৃত অঞ্চলের এমন একচেটিয়া ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। মূলত: এসব ব্রিটিশ-আফ্রিকান এলাকা শতকরা এক-ভাগ ব্রিটিশ পণ্যের বাজার ছিল ও এসব অঞ্চল থেকে শতকরা একভাগেরও কম কাঁচামাল আমদানী করা হ'ত; ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব ছিল চিলির গুরুত্বের মতই। ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে আর্জেন্টিনা ঐসব অঞ্চল থেকে তিনগুন গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমদানীর ক্ষেত্র হিসেবে ছিল ছয়গুণ গুরুত্বপূর্ণ।[২] অথচ ব্রিটিশ সরকার তার অধিকারও সেখানে তার মালিকানা বজায় রাখতে কোন ব্যয়ই করে নি।

১। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে কানাডার আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৯৮ মিলিয়ান ডলার মূল্যের দ্রব্য, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডা ৬০৪ মিলিয়ান ডলার মূল্যের দ্রব্য আমদানী করে।

২। লিউনার্দ উলফের (*Leonard Woolf*) '*Economic Imperialism*' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহারে আমরা মোটামুটি খতিয়ান ক'রে দেখতে পারি, কি পরিমাণে এ অগ্রগতি আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে অনেক চিন্তাবিদ অবশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্যোতিকেন্দ্রেব পুনর্মিলনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে' এ মনোভাব খুব প্রবল এবং ভিন্ন কর্মপন্থায় 'সংঘমূলক সমাজতন্ত্র' ও এ চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার পক্ষপাতী। আমাদের সমগ্র আলোচনা কিন্তু ভিন্ন পথ নির্দেশ করে। আমরা প্রথম থেকে দেখাতে চেয়েছি যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পৃথকীকরণ হচ্ছে সামাজিক বিবর্তনের পদ্ধতিরই এক অংশ মাত্র। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনেক চিন্তাবিদকে কর্তৃত্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অতীতে যেমন ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব মানুষকে ঐশ্বরতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বা তার বিপরীত পথ—ইরাস্‌শিয়ান' মতবাদে প্রলুব্ধ করেছিল; তেমনি তাঁরা ভাবেন যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্মিলিত হ'লে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমে যাবে। কিন্তু আসল কথা হ'ল পৃথকীকরণের সমস্যার সমাধান এভাবে হবে না। যদি কোন সমাধান সম্ভব হয় তবে তা হবে মিলনে, তাদের সুস্পষ্ট সত্তার স্বীকৃতিতে নয়। এটাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে, সোভিয়েট ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক কার্যক্রম প্রথম থেকেই তৈরী করেছিল, কিন্তু সে অনুন্নত সমাজেও সংকটের জন্য সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি।

এ দু'শক্তির মিলন কতটুকু সম্ভব হতে পারে এটা সত্যি এক জটিল ও আকর্ষণীয় প্রশ্ন; এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিকাশ ধারার গতির নিরিখে। রাষ্ট্রে যে পরিমাণ সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তেমনটি হয় নি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রয়েছে আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং বিশেষ করে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান। যুদ্ধের বছর আশী আগে থেকে শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে জীবনের মান যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা চলতে থাকলে এ ব্যবধান কমে যাবে। শ্রমিকরা কিছু কিছু সঞ্চয় করে এক সংরক্ষিত তহবিল গঠন করতে পারলে তা সে তহবিল যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তারাও আস্তে আস্তে সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্পপতিদের সাথে একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তড়িৎ পরিবর্তনের বিরোধী তারাও হয়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতিতে

www.nagorikpathagar.org

এর প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে; তাছাড়া, যুদ্ধের অভিশাপে বহু যুগের শিল্প কর্মের ফল যদি বিনষ্ট না হয় তবেও কিছুটা সম্ভাবনা থাকে এবং বিশেষ ক'রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে যদি দারিদ্র্য কমে আসে তবেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৃহৎ এক ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হতে পারে।

রাষ্ট্রের কার্যকলাপের গতিও সে দিকে ধাবিত হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক অধিকার ন্যস্ত হবার পর থেকে অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্যও হয়েছে নিম্নতম জীবন মানের নিশ্চয়তা বিধান করা, এবং খারাপ স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা বিধান, দুর্ঘটনা, বেকার সমস্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে, ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বনিম্ন বেতন হার নির্ধারণ, পরিবার ভাতা, বৃদ্ধ বয়সের পেনসন দান, শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ, কার্যকাল নির্ধারণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে রাষ্ট্র সে লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি আরও একটু সুসংহত হত, তবে এ নিয়ন্ত্রণের এক বিরাট অংশ আর্থিক সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যেত, এবং তাদের সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের মত বিষয়গুলো রাষ্ট্র দেখা শোনা করত।[১] তা যাই হোক গতিধারা সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাদের আর পিছু হটবার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রদায় ও যেসব শ্রেণী এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে তারা এসব ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে; কেননা তা অপচয় এবং অধঃপতন এবং অর্থনৈতিক অসহায়তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা বিধান করেছে। রাষ্ট্র বিরাট জনগোষ্ঠির মহান রক্ষা কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের ন্যূনতম জীবনমান একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে, অর্থাৎ যখন কেহ পুষ্টি, আশ্রয়, উষ্ণতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ন্যূনতম প্রয়োজনের অভাবে হা-হুতাশ করবে না তখন সমাজ আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। সে প্রান্তিক সীমার বাইরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক সংকটের জঘন্যতম আক্রোশ

১। হুইটলি কমিটির রিপোর্টে শিল্প পরিষদের মাধ্যমে অধিকতর অর্থনৈতিক সম্মিলন সংঘটনের আশা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়: "আমাদের কাছে মনে হয় যে, পরবর্তীকালে রাষ্ট্র যদি এসব পরিষদের চুক্তি বা ঐক্যমতকে আইনের অনুমোদন দেয়, তবে তাই হবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে পরিষদগুলোকেই।"

www.nagorikpathagar.org

থেকে মুক্ত ; যদিও সামাজিক কল্যাণের সম্ভাবনা তখন তার মধ্যে নিহিত থাকে। মানুষের ডুবে মরার হাত থেকে বাঁচার ইচ্ছা ও সাঁতারুদের পুরস্কার লাভের জন্য সাঁতার প্রতিযোগিতা দুটো ভিন্ন জিনিস। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সংগ্রাম একটা প্রগতিশীল সভ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ কিন্তু জীবন সংগ্রামে ন্যূনতম দ্রব্য লাভের সংগ্রাম তার সাথে সংগতি পূর্ণ নয়।

রাষ্ট্র অর্থনৈতিক চত্বরকে সংরক্ষণ করে, কিন্তু তাকে ধ্বংস করে না ; ধ্বংস করতে পারেও না। উদাহরণস্বরূপ, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা বজায় রেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংরক্ষণ করে ; তা সে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের হোক বা বিদেশের হোক। এখানে এবং সর্বত্রই রাষ্ট্রের কাজ হল সংরক্ষণ করা এবং শৃংখলা বজায় রাখা, এবং তার আওতার ভেতরে সাধারণ স্বার্থের বিকাশ করা ; কিন্তু যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষমতা অসাম্য সৃষ্টি করে ও তার উপর নির্ভরশীল থাকে, তাই তার কাজ হচ্ছে সব থেকে জটিল ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পর্যায়

সংগঠন ও বিলুপ্তি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

সংগঠন ও বিলুপ্তি

এক: রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন

এ অধ্যায় রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে হবে। আধুনিক বিশ্বের বেশীর ভাগ রাষ্ট্র হ'ল মাত্র কয়েকশো বছরের পুরোনো, এবং যে ক'টি প্রাচীনকাল থেকে টিকে আছে তাদের প্রতিষ্ঠান ও সীমানা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, তাদের টিকে থাকাটা নামমাত্র। আমাদের আমলেও চেকোশ্লো-ভাকিয়ায় এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বা মধ্যযুগের সাম্রাজ্যের কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি? ইতিহাসের অন্ধকার কুঠরীতে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের নজরে পড়ে এক সারি প্রাচীন সাম্রাজ্য। তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধ্বংসাবশেষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'রাজদণ্ড ও রাজমুকুট নিশ্চয়ই ধ্বসে পড়বে'—ইতিহাস এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছে। রাষ্ট্রগুলোর মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা কি ব্যাখ্যা দেব? কিভাবে তাদের জন্ম হয়েছে? কেন তাদের এই বিলুপ্তি?

নির্দিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর জন্মবৃত্তান্ত মোটামুটি সহজ। প্রাচীনকালের লেখকগণ তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন যে, কতকগুলো রাষ্ট্র হ'ল প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এবং কতকগুলো রাষ্ট্র হচ্ছে অধিকার ভিত্তিক; অর্থাৎ কতকগুলো রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে শান্তিকালে এবং কতকগুলো প্রাণ পেয়েছে যুদ্ধের ফলে। আমরা দেখেছি, সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে তা বিশিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করে। এ হ'ল রাষ্ট্রের মৌলিক জন্ম কাহিনী। অন্যগুলো হচ্ছে হয় পুনর্জন্ম না হয় পুনর্গঠন। যখন কোন নতুন দেশ অধিকৃত হয় বা অন্য রাষ্ট্রের জনগণ দ্বারা অধ্যুষিত হয়, তখন এক অর্থে একটা নতুন রাষ্ট্রে জন্ম হয়। কিন্তু তার সদস্যরা পুরোনো রাষ্ট্রের পূর্ব-

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারিত নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে আনে। কোন রাষ্ট্রই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া জন্ম গ্রহণ করে না ; যদিও মনে হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হল। যুদ্ধের ফলে যেসব রাষ্ট্রের জন্ম হয় তাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। কোন অধীন জনগোষ্ঠি অধীনতা পাশ ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় বিজয় পতাকা উত্তোলন করে সত্যি, কিন্তু তার পূর্বেও তাকে দীর্ঘ ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করতে হয়েছে এবং ইতিমধ্যেও অধীন জনগোষ্ঠির হিসেবে রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশ গ্রহণ করেছে। কোন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিজেও আর একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে বা মুক্তি দেয়, এবং এ ক্ষেত্রেও অবস্থা ঠিক তেমনি। তেমনি-ভাবে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র যারা নিজের অধীনতা পাশে বিদেশী জন সাধারণকে আবদ্ধ রাখে নিজের অজান্তে ও অনিচ্ছাসত্বেও ; তাদের রাজনৈতিক পুনর্জন্মের পথ প্রস্তুত করতে থাকে। আইন শৃঙ্খলা ও সংগঠনবোধ জাগ্রত রাখলেও তার বিজাতীয় উপস্থিতির দ্বারা সে অধীনস্থ জনগোষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ ও স্বশাসনের স্পৃহাকে তীব্রতর করে। এ সত্য অতীতের সাম্রাজ্য অপেক্ষা আধুনিক সাম্রাজ্যগুলো সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করেছে এবং তাই তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে ও শেষপর্যন্ত তাদের আধিপত্যের দাবী পরিত্যাগ করে। সাম্রাজ্য সর্বদাই সন্তানবতী জননীর মত নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে ; কিন্তু অতীতে শিশুরাই অনেক সময় মাতা-পিতাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেলেছে। আধুনিক সাম্রাজ্যগুলোর বড় উদ্বেগ হ'ল এরূপ বিচ্ছিন্নতাকে রোধ করা এবং বিদ্রোহে উস্কানী দিয়ে নিজের পতনকে না ডেকে এনে নিজের কর্তৃত্ব কিভাবে বজায় রাখা যায়, সে সূত্র আবিষ্কার করা। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল এই।

পুরোনো রাষ্ট্রের দ্বিধাবিভক্তি বা সংযুক্তির ফলেও নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড মিলিয়ে হয়েছে গ্রেট বৃটেন। আইরিশ ফ্রি স্টেটের জন্ম হয় যুক্তরাজ্যের দ্বিধাবিভক্তির ফলে। নরওয়ে ও সুইডেন এবং বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড পৃথক হয়ে রাষ্ট্র সংগঠন করেছে ; কিন্তু জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে প্রধানতঃ বিজয়াভিযান ও রাজবংশের ঐক্যের ফলে এবং ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তাদের বিচ্ছিন্নতা

www.nagorikpathagar.org

ঘটেছে। তারপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে এসেছে জাতীয়তা-বোধ। স্বায়ত্তশাসনের দাবী কখনও বিভক্ত করে, কখনও বা সংযুক্তি ঘটিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, অথবা প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ঐক্য স্থাপনে বা বিভক্তিকরণে তার প্রতিরোধ করে। আধুনিক বিশ্বে এ দুই প্রধান শক্তিই রাষ্ট্রের পুনর্গঠন নির্ধারণ করে—জাতীয়তার মৌলবোধ রাষ্ট্রের মধ্যে আপন সত্তা খুঁজে ফেরে এবং সার্বভৌম শক্তি তার প্রতিরোধ করে। যখন জাতীয়তার শক্তি কার্যকর থাকে না বা যখন তা নিঃশেষ হয়ে যায় তখন আর একটা নীতি কার্যকরী হয় এবং তাই হ'ল যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যসূত্র হিসেবে জাতীয়তার প্রভাব তেমন নেই, এবং তা অন্যান্য স্বার্থবোধের চাপে তলিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অদ্ভুত ব্যাপারটা হ'ল এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তবে অংগরাজ্যগুলো সাধারণতঃ অন্য আর এক নীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু যদি অংগরাজ্যগুলো জাতীয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয়তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্টারিও, ম্যাসাচুসেট্স্ বা দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া বা উরটেম-বার্গ ও বার্নের জাতীয়তার কথা বলা যেমন নিরর্থক, তেমনি সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর জাতীয়তা আরোপ করাও হবে অবাস্তব। সুতরাং যুক্ত-রাষ্ট্রের এক অদ্ভুত কার্যক্রম রয়েছে এবং তা হল জাতীয়তাবাদের চরম উৎকর্ষকে দমিয়ে রাখা; কেননা তার ফলেই জাতীয়তাবিহীন ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলো অবাধে সংগঠিত হতে পারে।

জাতীয়তা ভিত্তিক বিদ্রোহ ছাড়াও প্রাচীন রাষ্ট্র থেকে কোন এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাষ্ট্র মাঝে মাঝে জন্ম লাভ করেছে। বৃহৎ রাষ্ট্র থেকে খুব কম সময়ই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্বার্থকতা লাভ করে। রোমের প্রাচীন ইতিহাসে দু' দু'বার রোমান সর্বহারারা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন গড়ে তোলে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মূলে ছিল তাদের এ ধারণা যে, যুক্তরাষ্ট্রের অংগ্যরাজ্যগুলোর রয়েছে সার্বভৌম অধিকার প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের বহু উপনিবেশ ধর্মীয় ও শ্রেণী স্বতন্ত্র্যে প্রেরণা পেয়ে গড়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নতুন বাসস্থান খুঁজে পেয়েছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে। 'মরমোন' বা 'অভিযাত্রী-যাজকদের' কথা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

এটাও দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ের যে যে কারণ-গুলো কার্যকর হয়, প্রাচীন রাষ্ট্রের পতনের মূলেও থাকে সে সব কারণ। কিন্তু সংগঠনের প্রাথমিক কারণ থাকে এ সবের ঊর্ধ্বে। অন্যান্য সংস্থা থেকে স্বতন্ত্র সংস্থা রাষ্ট্র সামাজিক পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তার কাজকর্মের জন্য যথাযোগ্য সংগঠন ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে তোলে। এইটেই হ'ল রাষ্ট্রের স্বাভাবিক উৎপত্তির কারণ। এখন প্রশ্ন হ'ল, যদি রাষ্ট্রের জন্ম এভাবে হয়, তবে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন কারণ রয়েছে কি? দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূলে যেমন থাকে একটি জন্ম কারণ, তেমনি তার মৃত্যুর কোন স্বাভাবিক কারণ থাকলে তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

অনেক চিন্তাবিদ এ প্রশ্নের হাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা যুদ্ধ ও আক্রমণের ভয়াবহ ফলাফল বর্ণনা ক'রে ক্ষান্ত হন নি বা ক্ষমতা বন্টনের পরিবর্তনের ফলে যে তা বিচ্ছিন্ন হয় বা নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা বাহ্যিক শক্তির চাপে যে রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়ে তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। এতে তাঁরা মোটেই খুশী নন যে, কোন রাজবংশের শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিলোপের পর রাষ্ট্র ধ্বসে পড়ে, বা যখন প্রাচীন ভূমি অনুর্বর হয়ে যায় তখন তার আয়ু শেষ হয়ে যায়, বা যখন বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে বা যখন রোগ, যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যা হ্রাস পায়, তখনও তা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, বা যখন সরকারের দুর্বার অহমিকা বা নিবুদ্ধিতার জন্য রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয় বা যখন জনসংখ্যার নিবুদ্ধিতার জন্য তার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের পতন হয়। ইতিহাসের আকস্মিকতাকেও রাষ্ট্রের মৃত্যুর অন্যতম যুক্তিযুক্ত কারণ ব'লে তাঁরা মনে করেন না। রাষ্ট্রের মৃত্যুর এক আভ্যন্ত-রীণ কারণ রয়েছে, যা তার প্রকৃতির অভ্যন্তরেই নিহিত। রাষ্ট্রেরও এক নির্দিষ্ট জীবন সীমা রয়েছে এবং মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটে।

এ হ'ল রাষ্ট্রের সে রহস্যময় ব্যাখ্যা যার সমলোচনা আমরা করেছি। এতে রাষ্ট্রের উপর জীবনের এমন এক মতবাদ প্রয়োগ করা হয় যা শুধুমাত্র সমাজের উপর প্রযোজ্য হয় এবং যা সমাজের ক্ষেত্রেও

www.nagorikpathagar.org

অসত্য প্রমাণিত হয়। আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে, জৈব জীবনের যে সুসমঞ্জস ছন্দ রয়েছে তা সমাজের উপর প্রয়োগ করা চলে না।[১] এখানে আমরা অন্য পথ অবলম্বন করব। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিবরণ আবার তুলে ধরব। রাষ্ট্র হ'ল একটা কাঠামো, এবং কাঠামো ধ্বসে পড়তে পারে ও অন্তর্নিহিত হতে পারে। অন্যান্য সংগঠনের মত এটাও ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হতে পারে। বাহির থেকেই হোক আর ভেতর থেকেই হোক এর ধ্বংস হতে পারে। কিন্তু এ ধ্বংসলীলায় সমাজ সাধারণতঃ ধ্বংস হয় না। 'পোলিশ' রাষ্ট্র চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলেও পোল্যাণ্ডের সম্প্রদায় অক্ষত ছিল। যখন সম্রাজ্যের বিরাট খোলস বিধবস্ত হয়ে পড়ে তখনও রোমের সম্প্রদায় বেঁচে ছিল। যদি কোন জনপদ বা রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনকে সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির শুরু ও সমাপ্তি ব'লে গণ্য করি, তবে আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে হারিয়ে ফেলি।

প্রাচীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার কিন্তু মানব ইতিহাসে এতগুলো নতুন সূচনার আভাস দেয় না। কোন সাম্রাজ্যের অগ্রগতি বা পতনের ফলে সেখানকার জনগণের জীবন ও জীবন পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যেত না। তারা বেঁচেছে, ভুগেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের পথ অনুসরণ করছে। নিজের চারদিকে রাজারাজড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে তারা স্বপ্ন দেখেছে এবং সংগ্রাম করেছে। আসলে সাম্রাজ্যের পতন ছিল অনিবার্য। যে শক্তিকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকে সে শক্তিকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্র মৃত্যু বরণ করে। সাম্রাজ্যের পতন হয়; কারণ এই নয় যে, সে শৈশব—বৃদ্ধত্বের জৈবিকচক্র পূর্ণ করেছে, বরং তার কারণ হ'ল সাম্রাজ্যর নিশ্চিত শক্তি সম্মিলনের উপর নির্ভর করে এবং তার প্রয়োগ যত বেশী হয় প্রতিরোধও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও, মানবিক কাজ-কর্মের পরিবর্তিত অবস্থার ক্ষমতার হস্তান্তর অনিবার্য। সাম্রাজ্যের শুরু হয় এক বিপর্যয়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে এক বিপর্যয়ের মধ্যে। প্রথমটি হ'ল পরাজয়ের এবং শেষটি হ'ল বিজয়ের বিপর্যয়। অবশ্য ক্ষমতার এ সহজ নিয়মটিকে রাষ্ট্রের মৃত্যুর এক নীতি হিসেবে দাঁড় করানো উচিত নয়।

১। লেখকের ***'Community'*** গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৯—

www.nagorikpathagar.org

জীবন ও সংগঠনের মধ্যে যে পার্থক্য, তার স্পষ্ট বিকাশ ঘটে রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন চেতনার সব থেকে বড় ও সম্ভবতঃ সব থেকে স্থায়ী প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। মানুষ যে লক্ষ্য খুঁজে ফেরে তা নির্ধারিত হয় তাদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির মাধ্যমে, এবং রাষ্ট্র নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের এক বিশাল সংস্থায় পরিণত হয়। অজ্ঞাতসারে মানুষ সে সংস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে অথবা তার মধ্যে সে আদর্শের খোঁজ করে যে আদর্শে তার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যে অন্ধভক্তি বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়—সৃজনশীল অনুভূতির সাথে তার সৃষ্টি তুলনীয় হয় না। তাই এর পচনক্রিয়া শুরু হয় এবং বাহির থেকে আবার তার পুনর্গঠন হয়। আকৃতি ও মর্মবাণীর মধ্যে তথা প্রতিষ্ঠান ও জীবনের মধ্যে রয়েছে এ ধরনের অনৈক্য। পরবর্তী যুগের নতুন জীবন প্রতিষ্ঠানিক স্তম্ভকে ভেঙ্গে ফেলে ও নিজের মত করে আবার তৈরী করে। যেখানে সে তা করতে পারে না, সেখানে জীবনই অধঃপতিত হয়ে পড়ে। মানুষ তার মাধ্যমে যা চায়, সংগঠন কিন্তু তাকে কোনদিনই দিতে পারে না। তাই এর রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় মানবীয় আদর্শ বেঁচে থাকে। এক কথায়, সমাজ রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক ধারাবাহিক। এ সত্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন ; কেননা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সেবা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় তা প্রচুর আলোকপাত করে।

দুই : সভ্যতা ও সংস্কৃতি :

সমাজের এক আভ্যন্তরীণ পরিবেশ রয়েছে। একে সে তৈরী করেছে। কিন্তু সমাজ তার বাইরের রূপকে গঠন করেছে। এ আভ্যন্তরীণ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হ'ল প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ব্যবস্থা, শৃঙ্খলার জটিল ও বহুমুখী ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা ও হাতিয়ারসমূহ, প্রকাশভঙ্গী ও ভাবের আদান প্রদানের পদ্ধতি, জীবনের মান নির্ধারণকারী স্বাচ্ছন্দ্য, রুচিশীলতা ও বিলাস সামগ্রী, সম্পদ উৎপাদন ও বন্টন নির্ধারণকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানবের সকল বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পকলা, যা এ পৃথিবীকে মানবের জন্য সুখের আবাসভূমিতে পরিণত করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত হ'ল শিল্প সংক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠানিক সাজসরঞ্জাম, আইন পরিষদ, টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ, সমিতি সনন্দ, রেলপথ, বীমা সংস্থা ও যানবাহনের ব্যবস্থা। জীবনের এ সমগ্র সাজ-সরঞ্জামকে আমরা বলব

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতা। রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার একটা প্রশাখা বিশেষ।

সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র হ'ল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সভ্যতার প্রাণসঞ্চারকারী ও সৃজনশীল অধ্যাত্মবোধ। সভ্যতা যেন সংস্কৃতির হাতিয়ার, সংস্কৃতির অবয়ব যেন তার পরিচ্ছদ। সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে রাজনীতির ভেতর দিয়ে, অর্থনৈতিক কাজকর্মে, শিল্পকৌশলে, কিন্তু সংস্কৃতি বিকশিত হয় শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে এবং নৈতিকতায়। আমরা যা তাই হ'ল আমাদের সংস্কৃতি, কিন্তু আমরা যা ব্যবহার করি তাই হ'ল আমাদের সভ্যতা। সংস্কৃতির কলাকৌশল আছে, কিন্তু কলাকৌশল নিজে সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হ'ল জীবনের পরিপূর্ণতা। আমরা যা চাই তারই মধ্যে এর প্রকাশ, তাদের ফলাফলে তার প্রকাশ ঘটে না। তাদের অন্তর্নিহিত গুরুত্বের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা, কারখানা বা ব্যালট বাক্সকে কেহ চায় না। যদি আমরা পদ্ধতি ব্যতীত ফল পাই তবে পদ্ধতি চাই কেন? কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ গুরুত্ব রয়েছে। কোন কিছু অর্জনের পথ ও অর্জিত ফলের মধ্যে যে পার্থক্য এ হ'ল তাই। জীবন যাত্রার পথ ও জীবনের মধ্যে যে তফাৎ তা এই। কোন কলাকৌশলে যে আনন্দ আসে তা উদ্ভূত, যদিও তা অন্যান্যদের মত মনকে জুড়ে থাকে, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতি যে আকর্ষণ তা হ'ল মৌলিক।

সভ্যতার কোন বিষয়বস্তু ও সংস্কৃতির কোন কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানিক বা কলাকৌশলের সফলতা সভ্যতার মানকে উন্নত করে। অতীতের কার্যকলাপের উপর এ হ'ল অগ্রগতি। একবার বয়নযন্ত্র বা রেলওয়ে ইঞ্জিন বা টাইপ রাইটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'লে মানুষ তার অগ্রগতি সাধন করতে থাকে। সভ্যতা ক্রমবর্ধিষ্ণু। নতুন নমুনা উন্নততর হয় এবং তা পুরাতনকে অচল ক'রে ফেলে। কোন অগ্রগতি নিজেকে চিরস্থায়ী করে এবং তা আরও অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সভ্যতাকে সত্যই বলা হয় 'এক পদক্ষেপ'। কেননা একটি পদক্ষেপ অন্যটির প্রেরণা দেয় এবং তা এগিয়ে চলে। বিরাট কোন ঐতিহাসিক বিপর্যয় এ ক্রমবর্ধমানতাকে ব্যাহত করতে পারে, কিন্তু কোন কিছুই একে ভেঙ্গে দিতে পারে না। সভ্যতার প্রগতিশীল সৌধে যে যুগ কোন প্রস্তর খন্ড সংযোজন করতে পারল না তা সত্যিই

www.nagorikpathagar.org

দরিদ্র। কিন্তু সংস্কৃতি ক্রমবর্ধিষ্ণু নয়। প্রত্যেক যুগে একে নতুন করে জয় করতে হবে। সভ্যতার মত তা সহজ উত্তরাধিকার নয়।

এটা অবশ্য ঠিক যে এক্ষেত্রেও অতীত গৌরব বর্তমান অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, কিন্তু বর্তমান যে অতীতের সমপর্যায়ে যাবে বা অতীতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গ্রীক সুকুমার শিল্প ও গ্রীক নাট্য জগতে যে অনুপম সৃষ্টি দেখা গেছে পরবর্তী যুগে তা আর দেখা যায়নি। যাঁরা দাঁন্তে বা শেকস্‌পিয়ারের অনুগামী তাঁদের কীর্তি তেমন সমুজ্জ্বল নয়। আর্কিমিডিস বা গ্যালিলিও বা নিউটন যা আবিষ্কার করেন তাকে ভিত্তি করে তাঁদের অনুগামীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, কিন্তু সফোক্লিস বা মাইকেল এঞ্জেলো বা মিলটন যা প্রকাশ করেছেন তাঁদেরকে সামনে রেখে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা কেহই তেমন নিপুণভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন নি। আমরা অস্বীকার করছি না যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু সে অগ্রগতি সুদৃঢ় নয়। এ হচ্ছে পরিবর্তনশীল এবং অনেকটা খাম-খেয়ালী। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ রয়েছে এবং রয়েছে ব্যর্থতা।

এ কারণটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আর একটি পার্থক্যের আভাস দেয়। সংস্কৃতিকে সব সময় নতুন করে জয় করতে হবে, কারণ এ হ'ল মানব মনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। প্রকৃত অর্থে একজন সঙ্গীতজ্ঞ শুধুমাত্র সঙ্গীতজ্ঞদের জন্যই সুর সৃষ্টি করেন। এবং একজন শিল্পী শুধুমাত্র শিল্পীর জন্যই শিল্প সৃষ্টি করেন। যাদের মধ্যে কবিত্ব অনুভূতি রয়েছে কবি শুধুমাত্র তাদের জন্য কাব্য রচনা করেন। প্রত্যেকটি শিল্পকর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকে অন্তত: দু'জন শিল্পী—একজন সৃষ্টি করেন এবং একজন তা অনুধাবন করেন। প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বেলায় এ কথা খাটে। সাংস্কৃতিক প্রকাশ হ'ল সহকর্মীদের মধ্যে আদান-প্রদান, এবং তাদের মধ্যে যে সমতা বা ঐক্যানুভূতি রয়েছে তার ফলেই তা সম্ভব হয়। একজন শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য অন্য শিল্পীদের জন্য, কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ আর এক-জন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য নয়। কোন সেতু-নির্মাতা অন্য সেতু নির্মাতাদের জন্য কাজ করেন না। তিনি করেন এমন লোকের জন্য যাদের অনেকেই তাঁর নির্মাণ কৌশলের কিছুই বোঝেন না। লক্ষ লক্ষ লোক কোন কিছু না বুঝেই যে কোন কলা কৌশলকে প্রয়োগ করে। আসলে যে কৌশলকে অনুধাবন করতে কম বুদ্ধির প্রয়োজন, সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ

www.nagorikpathagar.org

কৌশল। আবিষ্কারকের লক্ষ্য এমন আবিষ্কার, যা সকলে বুঝতে পারে। আমাদের যুগের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক ভুল ধারণা আমরা পাব এবং যদি তার প্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশলী সাজ সরঞ্জামের দ্বারা বিচার করতে প্রবৃত্ত হই তবে এ যুগও অন্য যুগের মধ্যে তুলনা করবার এক ত্রুটিপূর্ণ মান প্রয়োগ করব। যেসব বই মানুষ পড়ে এবং লেখে, যেসব আদর্শ মানুষ পোষণ করে, যে আনন্দ তাদের মনকে উদ্বেল করে, যে ধর্ম তারা পালন করে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে এবং যেসব বিষয় তারা সযত্নে গ্রহণ করে ও যেসব সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে সে সবের মানদণ্ডে আমরা যদি সে যুগকে বিচার করি তবে আমাদের বিচার-বিবেচনা অনেকটা সঠিক হবে।

এ থেকে এটাও অনুসৃত হয় যে, এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠী থেকে সভ্যতা ধার করতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতি এভাবে গ্রহণ করা যায় না। কলা কৌশলের কোন পরিবর্তন না করেও তাদেরকে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু যেহেতু প্রতিষ্ঠানিক বিধিনিয়ম সংস্কৃতির সাথে অনেকটা সংশ্লিষ্ট; তাই তাদের পুনঃপ্রয়োগে কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়। বর্বররা অতি সহজে রাইফেলের ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু ব্যালট বাক্সের ব্যবহার তেমন সহজভাবে করতে পারে না। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ে প্রাচ্যের বা দক্ষিণ আমেরিকার সামাজিক জীবনে প্রযোজ্য হতে পারে না। তা সত্বেও সেগুলো অনেকাংশে স্থানান্তরযোগ্য এবং আসলে তাদের জন্মস্থান ছাড়াও অনেক দেশে তাদের প্রয়োগ হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতিকে এ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। যে জনগোষ্ঠী একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং যারা এর নিয়ত সংযোগে রয়েছে, তারা সংস্কৃতিকে ক্রমে ক্রমে নিজের করে নিতে পারে, এবং তার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে তাকে গ্রহণ করে। যখন বাহ্যিক বিচার-বিবেচনার ফলে কোথাও কোন বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে, তখন তা হয় সত্যের অপলাপ বা শূন্যগর্ভ এক বিষয়। দু'হাজার বছরে খ্রীস্টধর্মের যে অসাধারণ রূপান্তর ঘটেছে অর্থাৎ মূলনীতির যে কাটছাঁট হয়েছে, তাই হ'ল এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সংস্কৃতিকে খাপ খাইয়ে নেয়া যায় না। কোন জাতির সংস্কৃতিতে সে জাতির চরিত্রবল প্রকাশিত হয়; সুতরাং সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির চেয়ে অনেক ব্যাপক। জাপান তড়িৎ গতিতে পাশ্চাত্যের সভ্যতা গ্রহণ করেছে,

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাপানের কোন আগ্রহ নেই। অবশ্য আমাদের এর এ অর্থ করা ঠিক নয় যে, এ দু'টো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশী হোক বা গৃহীতই হোক, সভ্যতা হ'ল এক ধরণের সামাজিক পরিবেশ এবং মানুষ একই অবস্থায় সমানভাবে প্রভাবিত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট মনে হয় যে, সাধারণ সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সভ্যতা হবে এক ও বিশ্বজনীন। কিন্তু জীবনের এমনি সমতার মধ্যেও থাকবে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এবং তাও ভেতর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাবে।

উভয়ের মধ্যে আর একটা পার্থক্য ও নির্দেশ করা যায়। আমরা আগেই বলেছি যে, সংস্কৃতির সাথে পার্থক্য বজায় রেখে সভ্যতা হয় ক্রমবর্ধিষ্ণু। এটা আর এক অর্থেও সত্যি পদ্ধতিগুলোকে ক্ষমতার বিরাট যন্ত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে। কোন ব্যবস্থাকে বৃহত্তর জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি এমনি ধরণের সংযোজনের প্রতিরোধ করে। আমি এ সত্যকে নিম্নলিখিতভাবে অন্যত্র বর্ণনা করেছি: "আমরা কোন গোষ্ঠীর বা জাতির সম্পদকে একত্রিত করে তার সমষ্টি পেতে পারি। আমরা তার জনশক্তিকে যোগ করেও তার সমষ্টি পাই। কিন্তু আমরা তার স্বাস্থ্য বা তাদের অভ্যাস বা সংস্কৃতিকে যোগ করতে পারি না। যেমন হাজার হাজার দুর্বল শক্তি একককে যোগ করে একটা বিরাট শক্তি সৃষ্টি করা যায়, তেমনি হাজার হাজার দুর্বল উদ্দেশ্যকে একত্রিত করে এক শক্তিশালী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য দাঁড় করানো সম্ভব নয়। সম্পদকে যেমনভাবে যুক্ত করা যায়, তেমনিভাবে জ্ঞানের সংযোজন সম্ভব নয়। হাজারো মাঝারি পর্যায়ের ধীশক্তিকে একত্রিত করে প্রতিভার সৃষ্টি সম্ভব নয়।"[১]

আমরা এখন যে সমাজে তা ঘটে তার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উত্থান পতনের গুরুত্ব নতুন করে বিবেচনা করতে পারি। রাষ্ট্র শুধু যে সভ্যতার বৃহত্তম সংগঠন তা নয়, এ হ'ল বিরাট এক কাঠামো যা সকলের সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু সংস্কৃতির সাথে তার সম্পর্ক এমন অচ্ছেদ্য নয় যে কোন রাষ্ট্রের পতনে সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে। রাজনৈতিক কাঠামোকে

১। লেখকের '*Elements of Social Science* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে, কিন্তু জীবনের গতি সতত: প্রবাহবান। জীবন তখন পরিবার, স্থানীয় সংগঠন ও প্রথার জটিলতার মত অপ্রতুল কোন সংগঠনকে আশ্রয় করে অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হলে আবার তা সগৌরবে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

এখন আমরা চূড়ান্ত ও আকর্ষণীয় প্রশ্নটির সামনা-সামনি এসে পড়েছি। ইতিহাসে কি বেঁচে থাকে এবং কি মরে যায়? পরিবর্তন ও বিভ্রান্তি পরিপূর্ণ হাজারো নথিপত্রে, সময়ের বিনষ্টকারী প্রভাবের সামনে মানুষের কাজকর্ম ও দুঃখের কোন কোন জিনিস টিঁকে থাকে? হাজারো বিজয়াভিযানের জয়ডঙ্কা ও বিপর্যয়কে ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ ও প্রাচীন ধর্মমতের পর্যায়ক্রমিক বিনাশের উর্ধ্বে এমন কিছু কি আছে যা আজও টিকে আছে? হাঁ, ঐ সবে যা প্রথম থেকে সৃষ্টি হয়ে যুগের স্রোতধারায় আজও হারিয়ে যায়নি। সবই যদি পরিবর্তনশীল, তবে এমন কোনটি আছে যা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে আজও বয়ে চলেছে? সবই যদি পরিবর্তন, তবে কি সে পরিবর্তন ধারায় কোন দিক নির্দেশ নেই?

সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতার অর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিকতা নয়। সংগঠন বাহির থেকে পুনর্গঠিত হয়। তাদের সংস্কার সাধন হয়, তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেগুলোকে পাল্টিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সমাজ ভেতর থেকে পুনর্গঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং জীবনের নতুন উপাদান অজ্ঞাতসারে সামাজদেহে প্রাণসঞ্চার করে। যদি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকাই বা রাষ্ট্রের সাথে সমাজকে এক করে দেখি তা হ'লে ইতিহাস হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক ও বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি এমন যেন প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র ঘটনা জীবন ও মৃত্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা তাদের জীবদেহের সাথে তুলনা করি যেন তারা অস্তিত্বের পূর্বের শূন্যতা থেকে যাত্রা শুরু করে শেষপর্যায়ে অন্তর্ধান পর্যন্ত এগিয়ে যায়। আমরা মনে করি কোন জনগোষ্ঠী যেন এক এক যুগের মত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কোন জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয় না। অন্তহীন পরিবর্তনের মাঝে তাদের নব নব রূপে রূপান্তর ঘটে। তাদের না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু। শর্তসাপেক্ষে তারা অমরত্ব লাভ করে, কেননা বর্তমান তার

www.nagorikpathagar.org

নিজের অতীতকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে। জনগোষ্ঠীর কোন পরিচয় নেই, আছে শুধু ধারাবাহিকতা। জীবন্ত জিনিসের মধ্যে কোন 'অভেদগুণ' বা একরূপতা থাকা সম্ভব নয়। কোন জনগোষ্ঠী যেন বংশ ও পরিবেশের এক ঠাস-বুনুনি। ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তারা বিচিত্র হয়ে ওঠে। নমুনা সৃষ্টি হয় এবং বেড়েই চলে; কেননা এ প্রক্রিয়া অনন্ত, বুনট সীমিত হয় এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাই ঐতিহাসিক রূপের স্থিত্ব আশা করা বৃথা। সুতো মিলিত হয়ে ছিন্ন হয় এবং এমন এক সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয় থাকে আর চিনা যায় না। কোন জিনিসই এক ও অভিন্ন থাকে না; অভিন্ন থাকে শুধু জীবনের অজ্ঞাত উপাদান—যেখানে জীবনের সুতো নিয়ত বুনোনিতে রত।

জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যবহার্য ধর্মবিশ্বাস ও মৃত প্রতিষ্ঠানের উপর জয়লাভ করে। ঐতিহাসিক ঐক্যের সাথে আমরা সাগ্রহে আমাদের বর্তমান সামাজিক সত্বাকে এক ক'রে দেখি। কিন্তু তা ঐতিহাসিক ঐক্য থেকেও গভীর। তার ঐতিহাসিক গৌরব সত্বেও এলিজাবেথের ইংলণ্ড আজকের ইংরেজদের জন্য কোন অনুপ্রেরণা যোগায় না। আসলে তার কোন অংশটুকুই-বা বেঁচে আছে? পরিবারের প্রতিকৃতি বা অভিজাত সম্প্রদায়ের যা আজও টিকে আছে তা এ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকে তাদের নিজের অতীতের সাথে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেয় না; কেননা প্রত্যেকটি আমলই হ'ল নতুন সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি এবং তা হচ্ছে চিরন্তন পরিবর্তনশীল। তাদের পুরোনো, রূপকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে গড়ে উঠেছে। ইংরেজ সমাজের সে পরিবেশ রয়েছে বটে, কিন্তু তা কত স্বতন্ত্র, কত ভিন্ন। ইংরেজদের কুল বা বংশ রয়েছে বটে, কিন্তু তা পুরোনো উপাদানের সাথে এমনভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং নতুনের সাথে এমন মিতালী করেছে যে সে পরিবর্তন হয়ে উঠেছে অপরিমেয়। নতুন জীবনমান, নতুন সুযোগ, নতুন নতুন বিশ্বাস এবং নতুন নতুন সমস্যা আমাদের আজকের দুনিয়াকে মাত্র কয়েক পুরুষের আগের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। সংস্কৃতির মাত্র কয়েকটি স্তম্ভ তাদের গুরুত্ব নিয়ে এ যুগে বেঁচে আছে মাত্র কয়েকটি কাব্য এবং কয়েকটি নাটক, কিছু কিছু সৌধ এবং কিছু কিছু শিল্পকর্ম। তারা বেঁচে আছে, কারণ তাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে সার্বজনীন সূত্র যা সমগ্র মানবের সম্পদ।

www.nagorikpathagar.org

তথাপি বলতে হবে যে, আজকের নতুন জীবনে এসেছে অতীতের গর্ভ থেকেই। নতুন ও পুরোনো জনগোষ্ঠী সমভাবে উদ্ভূত হয়েছে সে মানবকুল থেকে, যা বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভেতর দিয়ে ঠেকেছে গিয়ে পৃথিবীর সে আদিম প্রভাতে। কোন জনগোষ্ঠীই দৈহিক দিক থেকে কারো চেয়ে অল্পবয়স্ক বা বৃদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক সূত্রে যে মিলন ঘটেছে তাই হ'ল অল্পবয়স্ক। নতুন হচ্ছে সে সুযোগ-সুবিধা যা বংশগতি ও পরিবেশের অচ্ছেদ্য অবস্থার ফলশ্রুতি। জনগোষ্ঠির যেমন নেই কোন আদি ও অন্ত; তেমনি নেই তার নিত্যতা। জাতি হ'ল একটা সন্ধিস্থল —একটা সামাজিক ঐক্য। যখন তার অগ্রগতি ঘটে তখন তার সদস্যারা সে সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে তার নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কুলগত ঐক্য ও ঐতিহাসিক অভিন্নতার ঐতিহ্য ছাড়া যে বিষয়ে তাদের সচেতনতা জাগ্রত হয় তা হ'ল বর্তমান কালের সাধারণ সংস্কৃতি। আমরা দেখেছি—এ সংস্কৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। একই জাতির সীমারেখায় তা প্রচুর বিভিন্নতার সূচনা করে। তার মধ্যে যে স্থায়ী প্রকাশ ঘটে তা এমন কিছু যা জাতীয়তাকে ছাপিয়ে ওঠে।

এ সব বিচার-বিবেচনা যে পুরোনো অথচ এখনও চালু মতের বিরোধী। এ মত অনুযায়ী মানুষের সমাজও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের কতগুলো স্তর পার হয়ে যায়। সে মত অনুসারে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন যেন সামাজিক প্রক্রিয়ার ছন্দময় আদি ও অন্ত। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও প্রত্যেকটি সংস্কৃতিকে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ উত্তীর্ণ হতে হয়। প্রত্যেকের থাকবে "তার শৈশব যৌবন, পূর্ণ বয়স ও বৃদ্ধ বয়স"।[১] এ মতবাদের একজন সাম্প্রতিক অনুসারী এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ইতিহাসে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বরং ইতিহাসে যা দেখা গেছে তা হ'ল সংস্কৃতি বা সভ্যতার অস্পষ্ট উত্তরাধিকার। প্রত্যেকে নিজের নিজের সৌভাগ্য রচনা করেছে। স্পেঙ্গলার তার বিকাশচক্রের এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনে আসে বসন্ত, গ্রীষ্মকাল, শরৎ ও শীত কাল।[২]

১। স্পেঙ্গলারের (*Spengler*)। *Wrtengang des Aceenddands* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

২। ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

তিনি পাশাপাশি সারিতে প্রত্যেক পর্যায়ের লক্ষণ চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরেছেন। চার পর্যায়ে তিনি ভারতীয়, গ্রীকো—রোমান বা প্রাচীন আরবীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। শেষটি বলতে তিনি সমকালীন ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন এবং বলেছেন যে এ তার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এর অগ্রগতির পথ এখন রুদ্ধ। যে সব সংস্কৃতি এখনও কালের গর্ভে রয়েছে ভবিষ্যৎ তাদের পথ চেয়ে আছে, এবং বিশ্বের মহান যুগ যখন আবার নতুন আলো বিকরণ করবে তখন তাদের মহিমা প্রকাশ হবে।

প্রাচীন নিয়তিবাদের এ সাম্প্রতিক ব্যাখ্যার কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন; কেননা তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতবাদকে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের সোজাসুজি বিরোধিতা করে। স্পেঙ্গলারের মতে সংস্কৃতির বসন্তকাল হল এক ধরনের স্বপ্নালো সচেতনতার জাগরণ এবং পৌরাণিক কল্পনা বিলাসে তার প্রকাশ। এ সব পৌরাণিক বিলাস ও কিংবদন্তী প্রকৃতির সাথে মানুষের একত্বের সহজাত বিকাশ। এগুলোই হল সে অভিজ্ঞতার রহস্যময় অভিজ্ঞা-নের উপাদান আর তার সৃষ্টি হল ঋগবেদ, হেলেনীয় সৃষ্টিক্রম, খ্রীস্টান যাজকদের লেখা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্য হচ্ছে দাঁন্তের 'ডিভাইন কমেডি' এবং একুনাসের 'সুম্মা'।

এরই মধ্যে শহর তার ক্ষুরধার বুদ্ধি (যদিও তা সংকীর্ণ) নিয়ে অবির্ভুত হয় এবং তার মর্মবাণী গ্রামীণ জীবনের প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। বসন্তকাল সংক্রান্ত বিশ্বচিত্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মানুষ যুক্তি দেখাতে শিখল এবং শিখল বস্তু-নিরপেক্ষ চিন্তার বিকাশ সাধন করতে। এ যেন সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা। অনুসন্ধিৎসু মন আত্মপ্রত্যয়ে ভর করে খুঁজতে লাগল নতুন নতুন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যার নতুন নতুন বাহন। বিশ্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল। এ যুগ হ'ল আবিষ্কারের যুগ, অনুসন্ধানের যুগ। পাশ্চাত্যে এ যুগই হ'ল গ্যালিলিও, ডেকার্তে ও বেকনের যুগ। এ যেন সৃষ্টির উল্লাসে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং অজ্ঞাতসারে তা শরতের মাঝে ঢলে পড়ে। বিশাল নগরীর মর্মবাণী শক্তি সঞ্চয় করে। সামাজিক জীবন প্রকৃতির জীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে গেল। দার্শনিকের কাছে প্রথমটি ধরা পড়ল প্রথার বন্ধনরূপে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠেনি। এটি হচ্ছে উজ্জ্বলতা যা জাঁকজমকের যুগ—গ্রীক সফিস্টদের

www.nagorikpathagar.org

যুগ বা লক, রুশো ও ভল্টেয়ারের যুগ। শরৎ কিন্তু তার ফলের ঝুড়ি ব'য়ে আনে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দেবার পূর্বে মহান মিশ্রিত দর্শনগুলো সার্থকতা লাভ করে। তাদের ভিত্তি হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য ও তার সম্পর্কে সুষম জ্ঞানের আত্মপ্রত্যয়। ফলে আমরা পেলাম প্লেটো ও অ্যারিস্টটল বা ইবন্ সিনা বা কান্ট ও হেগেলের ব্যাপক চিন্তা কাঠামো।

এরপর এল হিমশীতল শীতকাল। চিন্তার ঐক্য সমলোচনা মুখর বুদ্ধিবৃত্তির আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না বা সমাজের ঐক্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আক্রমণ থেকেও রেহাই পেল না। সমাজের মহান আদর্শ ভেঙ্গে পড়ল। এখন আর ধর্মবিশ্বাস বা স্থানীয় ঐতিহ্য জীবনের সংহতি রক্ষণ করতে পারছে না। এ হ'ল বিশ্বনগরীর যুগ, বিশ্ব-নাগরিকত্বের যুগ। ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদের সাথে সাথে গড়ে ওঠে তার বিপরিতধর্মী প্রগতিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ। এভাবে জাতির শেষ বৃহৎ ঐক্যও ধ্বসে পড়ল এবং তার স্থান দখল করবার জন্য আর কিছু রইল না। গ্রীক বিশ্বে এটা হচ্ছে 'সিনিক (Cynics) 'সাইরেনাইকস্ (Cyrenaics ও স্টোয়িকদের যুগ। পাশ্চাত্য জগতে এ হল সোপেনহাওয়ার এবং নীটসে, ওয়াগনার ও ইবসেনের যুগ। গঠনমূলক কাল শেষ হ'ল এবং মানুষ তাদেরই ভেঙ্গে ফেলা ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর বাস করছে। যখন এমনি অবস্থা আসে তখন বুঝতে হবে সংস্কৃতি তার গতি ধারা শেষ করেছে। এর জীবন ক্ষয় হয়ে গেছে। কেন্দ্রবিমুখী শক্তিগুলো জয়যুক্ত হয়েছে।

যে তত্ত্ব বর্ণনা করা হল তা সত্যিই খুব আকর্ষণীয় এবং লেখক অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সহযোগে এর শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু ঋতু সংক্রান্ত তুলনাই হোক আর জীবদেহের যে তুলনা তাই হোক—তাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কঁতের মতানুযায়ী এটা জোর করে বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে মানবের সংস্কৃতি সুস্পষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, প্রত্যেকটি সংস্কৃতি অবরুদ্ধ বা চারিদিক বেষ্টিত এক চক্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণ নির্দিষ্ট, তবে তা হবে সত্যের অপলাপ। সাম্রাজ্যগুলোর পতনের ফলে মনব সভ্যতার ব্যাপক গতি রুদ্ধ হয় নি বা সংস্কৃতির অগ্রগতির পথও রুদ্ধ হয় নি। বিশিষ্ট সংস্কৃতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা বা বসন্ত থেকে

www.nagorikpathagar.org

শীতকাল পর্যন্ত তার পরিব্যাপ্তি নির্দিষ্ট করা নেহাত খেয়াল-খুশীর ব্যাপার। হোমারের আমলের সংস্কৃতিকে অনেক পণ্ডিত চরম পর্যায় বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কিভাবে আমরা দেখাতে পারি যে, সে সংস্কৃতি ছিল শুধুমাত্র শুরু, তার চরম বিকাশ নয়? কিভাবে আমরা দেখাতে পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতি তার গতিধারা পরিপূর্ণ করেছে? গ্রীক সফিস্টরা (প্লেটো ও অ্যারিস্টটলসহ) গ্রীক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে পড়ে কেন এবং স্টোয়িকদের তার শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ শীতকালে ফেলা হয় কেন? ধর্মীয় দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর অনুপস্থিতি এবং নৈতিক জীবনবাদের উপস্থিতিতে কি এক সংস্কৃতিচক্র সমাপ্ত হয়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আড়াই হাজার বছর আগের প্রগতিবাদী লাওসে এবং নীতিবাদী কনফুসিয়াসের আমল থেকেই চীনা সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছে।

মানব ইতিহাসে এমন এক প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে যার ফলে ছোট ছোট আত্মীয়-গোষ্ঠী বিশ্বনগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশাপাশি চলেছে। কিংবদন্তীর আলো-আঁধারী পর্যায় থেকে যুক্তি যুক্ত বিশ্বাস ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক সাধারণ দিক নির্দেশ রয়েছে। কঁতের দুঃসাহসিক সূত্রকে সমর্থন করবার যুক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মানুষ ধর্মতত্ত্ব থেকে সুস্পষ্ট বিশ্ব-অনুধাবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে নগর জীবনের বিকাশ এবং তারই প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে সমাজের মর্মকথা ও প্রকৃতি। এ ভাবে আমরা নির্দিষ্ট কোন সমাজের নয়, বরং সাধারণভাবে সমাজের বিবর্তন-ধারা বুঝতে পারি; বিশিষ্ট কোন রাষ্ট্রের নয়, বরং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের বিবর্তন ধারার দিকে নির্দেশ করতে পারি। মানব সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তথাপি মানুষ থাকে মানব সম্প্রদায় ভুক্ত। সভ্যতার সমগ্র বাহন তার সাধারণ প্রয়োজন মিটাবার উপায়স্বরূপ। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তা হস্তান্তরিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য সে সংস্থাগুলোও সভ্যতার অংশ বিশেষ। সভ্যতা ক্রমশ বিশ্ব সভ্যতায় রূপান্তরিত হয় এবং অতীতে বর্বরদের হাতে তাকে যেভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে তা থেকে সে মুক্ত হয়। এখন সভ্যতার ধ্বংস আনতে হ'লে, অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের সম্পদরাজি টিকে আছে

www.nagorikpathagar.org

ততদিন ভেতর থেকে এর ধ্বংস সাধন করতে হবে। তাছাড়া, সভ্যতার যে প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য করেছি তা এমন যে সমগ্র মানবকুলকে এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে না ফেলে এবং অতুলনীয় এক অনগ্রসরতার মধ্যে তাকে ঠেলে না দিয়ে সভ্যতাকে ধ্বংস করা যায় না। সভ্যতার ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুচক্রের কোন পরিপূর্ণতা নেই এবং নেই এর কোন নতুন শুরু। এতে ফিরে যাওয়ারও কোন পথ নেই। কৃষকসম্প্রদায় থেকে যে পথ বিশ্বনগরীর দিকে এগিয়ে গেছে সে পথে আবার কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে ফিরে আসা যায় না। বিশ্বনগরীর পর্যায় স্থায়ী, কেননা তা নির্ভর করে কলা-কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নয়নের উপর এবং সেগুলো হ'ল মানবের স্থায়ী সম্পদ।

অন্যদিকে সংস্কৃতি হ'ল আরও অনিশ্চিত ও আরও স্থিতিহীন। এর অগ্রগতি আছে এবং আছে অনগ্রসরতা। সভ্যতার শর্তাবলী অনুশীলন করলেও তার গতি পথের নিরিখ মেলে না। কোন নির্দিষ্ট যুগে কেন তা গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে এবং কেনই বা গৌরবের আসন থেকে তা নেমে যায় তার কোন ব্যাখ্যা আমরা নিতে পারব না। এ বিষয়ে আমরা রয়েছি অজ্ঞাত অনিশ্চয়তার এক রাজ্যে। যে পরিস্থিতিতে তার অগ্রগতি হয় বা তার অধঃপতন হয় তা আমরা নির্দেশ করতে পারি; কিন্তু তার সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করতে পারি না। আমাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আমরা একে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই। জীবনের পরিবর্তনশীলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে এগুলো। সংস্কৃতি স্থির থাকে না। স্থিতির জন্যও তাকে পরিবর্তিত হতে হয়। এর নতুন নতুন প্রকাশ ভঙ্গির দরকার হয়। সংস্কৃতি হল সৃষ্টি এবং স্তব্ধ হয় যদিও জীবন যুগে যুগে পুনর্জীবন লাভ করে। প্রতিনিয়ত তা নব নব পদ্ধতি নব নব মুক্তি পথ খুঁজে ফেরে এবং তাই তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দরকার হয়।

তার সাফল্যও ব্যর্থতা নিয়ে এ অনুসন্ধান কাজে আমরা তার পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতার প্রতিকৃতি থেকে আরও দূরে সরে যাই। পাহাড় ও উপত্যকা কোন এক অজ্ঞাত দিগন্তে মিলিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের আবছা কুয়াশা নতুন উত্তরাধিকারকে হারিয়ে ফেলে। তাই কল্পনাশক্তিও কোন সীমা নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয় না। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা

www.nagorikpathagar.org

ও নৃতত্ত্বের মাধ্যমে অমরা যে কালের গ্রন্থি উন্মোচিত করেছি তার ফলে আমাদের চিন্তাধারা বাইবেল আমলের ছোট্ট খাঁচা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আমাদের নিজেদের আমলের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভংগী এ সম্প্রসারণের ফলে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। এর ইতিহাসে এক মুহূর্তের কোন কাজ কোন সভ্যতাকে ধ্বংস করে না বা মানবের জন্য কোন নতুন যুগেরও সূচনা করে না। আমাদের সাময়িক আশা ও ভীতি আমাদের জন্য নতুন কারাগার তৈরী করে। তার মধ্যে আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে ছবি আঁকি, তা কিন্তু এ আমলের সম্পদ নয়, বরং তা মানবকুল প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যা করেছে তারই প্রতিধ্বনি।

এ প্রক্রিয়ায় মানুষ অনেক হাতিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেকগুলোকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কতকগুলোকে সে অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যপোযোগী ব'লে গ্রহণ করেছে; কারণ তাদের প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছে। রাষ্ট্র এর পরবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ

(এক) ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক রাষ্ট্র

এ গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাষ্ট্রের সাধারণ বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক সংঘ অবিছিন্ন সামাজিক কাঠামো থেকে ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে, এবং সম্প্রদায়ও অন্যান্য সংঘ থেকে তার যে স্বাতন্ত্র্য, সে সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। রাষ্ট্র নামে পরিচিত ঐ এককও অনবদ্য সংঘটির বৈশিষ্ট্য কিভাবে বিকাশিত হয়েছে সে প্রক্রিয়াকে তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্র হেলেনীয় শাসন ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের মত অসম্পূর্ণ বহু পর্যায় অতিক্রম করে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদেরকে সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় সংগঠন না বলে বরং আমরা বলব যুগসন্ধিক্ষণের অবস্থা। 'পাইথেকেন থ্রোপাস' নামক আদিবাসি গোষ্টিকে যেমন বিশিষ্ট কোন মানবকুলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তেমনি এগুলোকে রাষ্ট্রের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। কিন্তু বিবর্তনের ফলেও সে প্রক্রিয়ায় রয়েছে বৈচিত্র্য। এই একক ও এ অনবদ্য 'রাষ্ট্র-সংঘের' বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ রয়েছে। যুগসন্ধিকালের অগ্রগতি এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে কোথায় আমরা পার্থক্য নির্দেশ করব সে হচ্ছে এক অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব প্রচেষ্টা। রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব অবস্থা থেকে রাষ্ট্রের যে পার্থক্য সূচিত হয় তা অজ্ঞাতসারে রাষ্ট্রের বিবর্তনে রূপ পায়। সে প্রক্রিয়াতেও আমরা উন্নত রাষ্ট্র ও প্রথমিক পর্যায়ে গঠিত অপূর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি না। তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রশ্ন ওঠে, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও ঈশ্বরতন্ত্রকে এক ভাগে ও আধুনিক গণতন্ত্রকে অন্যভাগে ফেলে কি আমরা এর প্রকারভেদ করতে পারি ?

প্রাচীন উপজাতি ও অন্যান্য আদিম সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা যায়। তা যাই হোক, তাদের গণ-তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এটা বলাই যথেষ্ট যে সম্প্রদায় হিসাবে সেগুলো ছিল গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্র হিসাবে নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মনে হয় একটি

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর বা বর্ণের বা পরিবারের আধিপত্যের ভেতর দিয়েই রাজনৈতিক শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমগ্র সম্প্রদায় ছিল সে শ্রেণী বা বর্ণের বা পরিবারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রাচীনকালের রাষ্ট্র ছিল পুরোপুরি 'শ্রেণী রাষ্ট্র'। একদিকে রাজস্ব-দাতা ও সেবাকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্যের ভিত্তিতে এসব রাষ্ট্রে-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিম জীবনের অবস্থায় এটাই ছিল অনিবার্য ; কেননা সেখানে সমষ্টিগত জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি কঠোর প্রথার মধ্যমে সমর্থিত হত। অজ্ঞতা, অজানা ক্ষমতা ও তার মানবীয় ব্যাখ্যাকারীর প্রতি এক ধরনের কুসংস্কার পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি করতে হয় এবং জীবন দৌর্বল্যও অনিশ্চয়তা অপ্রতিহত ক্ষমতার পেছনে তাদের সংহতিকে অনিবার্য করে তুলত। সে ক্ষমতার রূপান্তর ও সংমিশ্রণের পরিচয় আমরা এর আগেই পেয়েছি। রাষ্ট্র সেকেলে আনুগত্যের সংস্থা থেকে সচেতন প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। অবিকশিত ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অধিকারে পরিণত হয়। তারপর তা দায়িত্বশীল কর্তৃত্বে রূপলাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত কর্তৃপক্ষে রূপান্তরিত হয়। গণতন্ত্র বলতে যদি আমরা শুধুমাত্র বহু ব্যক্তির শাসন না বুঝে সাধারণ ইচ্ছার কার্যকর বাস্তবায়ন বুঝি, যা তার নির্বাচিত সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন যোগায়, তাহলে বলতে হয় যে, এ প্রক্রিয়ার পরিণতি হ'ল এক ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যদিও শুরুতে তার সঠিক পরিচয় মেলে না। রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়ের একটা শাখা হিসাবে যদি আমরা ব্যাখ্যা করে থাকি, তবে যে সব রাষ্ট্রে সাধারণ ইচ্ছা কার্যকর নয় সে-গুলোকে বলতে পারি খুব জোর অপূর্ণ রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করলে এ ধারণার সমর্থন মেলে, কেননা অনেক ব্যতিক্রম সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রধান গতি হচ্ছে গণতন্ত্রের পথে, অবশ্য যদি তা রাষ্ট্রের সার্থকরূপ লাভ করে থাকে। অবশ্য এ ধারণা প্রায়ই সমলোচনার সম্মুখীন হয়। এ মতবাদের একজন বিশিষ্ট সমালোচক স্পেঙ্গলার ঘোষণা করেছেন যে, গণতন্ত্র হচ্ছে 'কৃত্রিম এবং অনৈতিহাসিক' এবং স্বাভাবিক অবস্থা হ'চ্ছে বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা অথবা শ্রেণী রাষ্ট্র।

কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফলের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা সম্ভবতঃ অর্থহীন। তাছাড়া, মহাসংকটকালের কোন বিরাট পরীক্ষায়ও কৃত্রিমতার এ অভিযোগ সমর্থিত হয় নি। আমরা এটাও ধরতে পারি যে, স্থায়ী সরকারের ভিত্তিও খুব মজবুত। রাজনৈতিক বিপ্লবের আলোচনায় এটাও

www.nagorikpathagar.org

দেখেছি যে, কোন সংকটময় মুহূর্তে বংশানুক্রমিক রাষ্ট্র অপেক্ষা গণতন্ত্রই সুষ্ঠুভাবে তার মোকাবেলা করে। সাম্যের অনুরাগীদের মধ্যে রাজনৈতিক সাম্য কৃত্রিম নয় এবং সহজে তার অবসানও হয় না। যেসব প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়ের সচেতন সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের সঞ্জীবনী ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোই হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী। জনগণ নিজেদের সরকার ছাড়া প্রত্যেকটিকে ভেঙ্গে দিতে পারে। শুধু নিজেদের সরকারের বেলায় কোন বিকল্প থাকে না। একটি প্রজাতন্ত্র যদিও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে প্রায় অজেয়, তথাপি বাহির থেকে তার ধ্বংস আসতে পারে। প্রত্যেকটি সংকটে সে ব্যবস্থার এক স্পষ্ট চিত্র সাধারণের মনকে আলোড়িত করে যদি সে ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সচেতন যুক্তিভিত্তিক সমর্থনের নিয়ত প্রয়াস থাকে তবে আকস্মিক আলোড়ন তেমন অস্বস্তিকর হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তি যে আত্মসচেতনতা তাই রয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে। সচেতন গণতন্ত্র ছাড়া সকল রকমের রাষ্ট্রে সরকারের শিকড়কে বৃক্ষ-কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে। যতদিন পর্যন্ত প্রথা তার চিরাচরিত শান্ত পথ অনুসরণ করে প্রথাভিত্তিক কর্তৃপক্ষ ততদিন যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী থাকে। কিন্তু সংকটকালে যখন প্রথাভঙ্গকারী ঘটনা ঘটতে থাকে তখন বোঝা যায় যে, প্রথা সুদৃঢ় কোন বস্তু নয়, বরং তার খোলস মাত্র। আর শুধু মাত্র কাল বা যুগ কোন শক্তি নয়, বিশ্বাস নিশ্চিতও নয়, অলঙ্ঘণীয়-ও নয়; কেননা তারা খুব অস্পষ্ট এবং জীবনের প্রবৃত্তিগুলো মানবের প্রতিষ্ঠানে কোন দিনই সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় নি। অন্যান্য সরকার অপেক্ষা গণতন্ত্রে এর বাস্তবায়ন অনেক বেশী হয় এবং এ জন্যই মনে হয় যে, গণতন্ত্র অনেক বেশী স্থায়ী এবং তার অগ্রগতিও অনেক নিশ্চিত।

তাছাড়া, যদি সরকার নির্ধারণে সাধারণ ইচ্ছা কার্যকর না থাকে তবে তার অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হয়ে উঠবে কল্যাণকেন্দ্রের স্থলে এক ক্ষমতা চক্র। দায়িত্বহীন ক্ষমতার অধিকারীরা সাধারণ কল্যাণ সাধনের কথা স্বীকার করলেও আসলে তা হয় এক নীতির ব্যাপার, বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। এখন ক্ষমতাচক্রের মতবাদকে চূড়ান্ত বলা হয় না। চূড়ান্ত হ'ল কল্যাণকর ব্যবস্থার মতবাদ। ক্ষমতা হচ্ছে একটা হাতিয়ার, কিন্তু কল্যাণ হ'ল লক্ষ্য। সুতরাং যে ব্যবস্থায় একটি শ্রেণীর কল্যাণ সাধন করা হয় ও যে ব্যবস্থায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন

www.nagorikpathagar.org

করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অথবা অধিকাংশ লোকের নিজেদের অভিমত সংঘবদ্ধ করা, প্রকাশ করা বা আদান-প্রদান করার ক্ষমতাও এ 'ক্ষমতাচক্রের' পক্ষে বিপদ-জনক। এরূপ ক্ষমতা ভিত্তিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে স্থিতি-শীলতা, কিন্তু তার ক্ষমতা তা অর্জন করতে পারে না ; কারণ সভ্যতার কার্যকর শক্তিগুলো প্রধানতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। এ প্রসংগে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক ব্যবস্থা কোন সময় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিছক বল-প্রয়োগ ভিত্তিক, সেখানেও তা সেভাবে নির্ধারিত হয় না। আসলে ক্ষমতা ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে টিকতে পারে না এবং সামাজিক ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত জীবনবোধের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় থাকে প্রথা, নৈতিকতা, আত্মীয়তা ও ধর্মের নির্দেশনা ; গ্রীনের কথামত, কোন স্বৈরতন্ত্রও এ অন্তর্নিহিত ব্যবস্থাকে স্পর্শ করতে পারে না। পারে শুধু তখনই যখন সে ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সুতরাং ক্ষমতাচক্রেও তার সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ত চলেছে এক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। সভ্যতার প্রভাবে এ দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায় এবং তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে সামাজিক পরিবর্তনের মন্থর প্রক্রিয়াই হোক আর সামাজিক সংকটের দারুণ বিপর্যয়ই হোক গণতন্ত্রের তুলনায় বংশানুক্রমিক রাষ্ট্র বা শ্রেণীরাষ্ট্রের স্থিতিহীনতা এবং অপ্রতুলতা অনেক বেশী।

রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য আমরা এদিকে মনোযোগ দিয়েছি। এখন শ্রেণী বিভাগের কাজে হাত দেয়া যাক। এ অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাগ ও তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এখন আমরা রাষ্ট্রকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি ; যেমন—(ক) বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রে বা রাজতন্ত্র এবং (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রে সম্প্রদায়ের সমায়ত কোন সাধারণ ইচ্ছার পরিব্যাপ্তি নেই, আথবা সেখানে সাধারণ ইচ্ছা নিছক সম্মতি সূচক বা অনুগত। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ ইচ্ছা সাম-গ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের সমায়ত, অথবা সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশে তা পরিব্যাপ্ত এবং সরকারের পেছনে তা সচেতনভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর সমর্থন যোগায়।

www.nagorikpathagar.org

ক শ্রেণীতে আমরা শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য এবং ঐসব অপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, যেখানে সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা উপভোগকারী অংশ শাসন কার্য পরিচালনা করে। গ্রীক রাষ্ট্রগুলোকেও আমরা এ ভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছিল সত্যি. কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতে তারা ছিল এক শাসক শ্রেণী এবং তাদের পূর্ণ বিকাশের দিনেও এ রাষ্ট্রগুলো ছিল খুব জোর ধনিক-তান্ত্রিক। সীমিত চক্রে নাগরিক জীবনে যতই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন, যদি সে রাষ্ট্রে সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ অংশ বাদ পড়ে, তবে সে রাষ্ট্র রাজতন্ত্র ছাড়া আর কি হতে পারে? যে রাষ্ট্রে প্রয়োজন বশে অধিবাসীদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় এবং যেখানে তাদের ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার কোন অংশ বিশেষ নয়, সে রাষ্ট্র মূলতঃ ক্ষমতাভিত্তিক ব্যবস্থা। ক্ষমতার উপর তা প্রতিষ্ঠিত এবং তার নীতি হচ্ছে অনিবার্যভাবে দমনমূলক।

খ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হ'ল শুধুমাত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। বাস্তবিকপক্ষে, গণতন্ত্র হচ্ছে মাত্রাগত এবং অন্য ক্ষেত্রের মত এখানেও তার মাত্রানির্দেশ খুবই শক্ত। কিন্তু যে রাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি, সে রাষ্ট্রকে অগণতান্ত্রিক বলা ঠিক নয়; কারণ নারীরা স্বতন্ত্র কোন রাজনৈতিক শ্রেণীর পর্যায়ে আসে না এবং পরিবারের পুরুষদের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে না হলেও তাদের আশা-আকাঙ্খা ও মতামতের প্রকাশ ঘটে। তাছাড়া, যেসব রাষ্ট্রে পৌরদায়িত্ব পালনের নিম্নতম ব্যক্তি-গত যোগ্যতা আদায়ের জন্য কোন কোন ভাবে নাগরিকত্বের অধিকার সীমিত হয়, সে রাষ্ট্রকেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কোন বাধা নেই। এসব ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে জনগণের ইচ্ছা যেভাবে প্রভাবিত হয়, তাতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কতটুকু কার্যকর; সে প্রশ্নও তোলা ঠিক নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আইনগত সার্বভৌমত্ব নিয়ম-নিষ্ঠভাবে সাধারণ ইচ্ছার প্রয়োগে নির্ধারিত হয়, তা যেকোন প্রভাবই তার উপর পড়ুক না কেন, এ রাষ্ট্রকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করব। এ অধ্যায়ে এদের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

দুইঃ রাজতন্ত্রের বিভিন্নরূপঃ

রাজতন্ত্রে ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের দিকটা বিশেষভাবে প্রবল; যদিও তা ঐতিহ্যের প্রভাবে অস্পষ্ট থাকে বা কয়েকজনের দ্বারা বহুর আনুগত্যের

www.nagorikpathagar.org

বন্ধন ধর্মের প্রভাবে দৃঢ়তর হয়। রাজতান্ত্রিক পরিবেশে রাষ্ট্র এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ; কেননা প্রকাশ্যভাবেও সেখানে সার্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্য গৃহীত হয় না। ফলে নিজের গৌরববোধ ও জনগণের নীচতার মানসিকতা দিয়ে সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে তার সবরকম মনস্তাত্বিক প্রভাবের প্রয়োজন হয়। এজন্য এ ব্যবস্থা ক্ষমতার এক মহান আদর্শ গড়ে তোলে এবং শাসকদের ক্ষমতা ও মহিমার আলোকে শাসিতরা যেন এক আবেগময় আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয় ও তার উৎসাহ দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সামরিক কীর্তিকে জীবনের গৌরব হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সকলের মধ্যে সাহস, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের গুণাবলী গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা হয়। বিজয়াভিযানের কর্মসূচীতে এ ব্যবস্থায় 'রাজা ও দেশকে' এক করে দেখা হয় এবং তার যুদ্ধংদেহী নীতির ফলে যে বিপর্যয় নেমে আসে তাতে নিজেকে রাষ্ট্রের ত্রাণকর্তা ও মহাবীর মহাপুরুষরূপে দাঁড় করানো হয়। শ্রেণী ও বংশগৌরবের পার্থক্যকে এ ব্যবস্থায় পাহাড় প্রমাণ উচুঁ ক'রে তোলা হয় ; যার ফলে অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে কোন আদান-প্রদান অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকদের পরিশ্রমের ফলে যে উদ্বৃত্ত হয়, এ ব্যবস্থায় তা খাজনা ও করের আকারে রাজকীয় কোষাগারে চলে আসে। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্মিলন ঘটে এবং তার ফলে প্রজারা সকল সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মীয়-বন্ধন, মৈত্রী ও ধর্মীয় ব্যবস্থা যে ধরনের আনুগত্য সৃষ্টি করে এবং যেরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তাছাড়া আধিপত্যের এমন কঠোর ব্যবস্থা নিপীড়িত ও নিগৃহীতদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাই এ ব্যবস্থার পেছনে প্রেরণা যোগায় এ ত্রয়ীর প্রভাব। তাই রাজতন্ত্রের পটভূমিতে থাকে ধর্মীয় প্রভাব, দেব-দেবীদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং যাজকরা তাদের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেন আনুগত্যের চরম দায়িত্বের মূল্যবোধ।

রহস্যময় ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বের জটিল সমস্যার পটভূমিতে কল্পনা-প্রবণ অজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রবণতায় উদ্ভূত হয়ে এসব ধর্ম বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রের শ্রেণী-শাসনের সাথে বরাবর সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

সব রাজতন্ত্রই হ'ল ধনিকতন্ত্র। প্রথমত: রাজতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রকে রাষ্ট্রের দুটো আলাদা শ্রেণী হিসেবেই বিভক্ত করা হয় ; কিন্তু দু'টোর মধ্যে পার্থক্য খুব কম। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করবার জন্য যতগুলো শব্দ আছে, তাদের মধ্যে সংখ্যাবাচকগুলো হ'ল সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর।

www.nagorikpathagar.org

নিয়মমাফিক রাজতন্ত্র বলতে বুঝায়, একজনের শাসনকে এবং ধনিকতন্ত্র বলতে বুঝায়, কয়েকজনের শাসনকে। কিন্তু প্রায় সব ধনিকতন্ত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল শীর্ষে তাদের হয় একজন নামমাত্র প্রধান বা রাজা থাকেন। অপরপক্ষে, সত্যি বলতে কি, কোন সরকারই নিছক রাজতন্ত্র নয়। কোথাও দৃশ্যতঃ একজন শ্রেষ্ঠ শাসক থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি নির্ভর করেন আর একটি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর কার্যকর সমর্থনের উপর। তিনি সে শ্রেণীর স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে এবং তাদের সহযোগিতায় শাসন কাজ পরিচালনা করেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ এ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় উইলহেলমের মত তিনি দাবী করতে পারেন যে, "একমাত্র ঈশ্বরের দয়ায় তিনি একাকী শাসন করছেন, কিন্তু তথাপি এটা প্রয়োজন যে, আর একটি শ্রেণী রাজার ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে সংগতি রেখে নিজদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। এটাও সত্যি যে, সে শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ বাধবে, অর্থাৎ যেমন রাজা জন ও তাঁর ব্যারণদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল তেমনি রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তা হ'ল ধনিকতন্ত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; একটা সরকারী দল ও তার বিরোধী গোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রত্যেকটি রাজতন্ত্রেই রয়েছে ধনিকতন্ত্রের উপাদন; যদিও সকল ধনিকতন্ত্র রাজতন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছে না।[১] কোন কোন ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন একজন প্রধান শাসক বা সম্রাট ছাড়াও এক পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে; যদিও তা সাধারণতঃ নগর রাষ্ট্রের পরিস্থিতি উদ্ভবের জন্য হয়। প্রজাতান্ত্রিক রোমের সেনেট ও ম্যাজিস্টেটদের শাসন এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং রাজতন্ত্র বা সমষ্টিগত শাসক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা ধনিকতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ করতে পারি।

রাজতান্ত্রিক ধনিকতন্ত্র সাধারণতঃ হয়ে থাকে বংশানুক্রমিক অথবা নির্বাচিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রথমে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং পরে বংশানুক্রমিক পর্যায়ে তা স্থিতিশীল হয়। এ সব ক্ষেত্রের নির্বাচনে অবশ্য প্রভাবশালী শ্রেণীই শুধুমাত্র অংশ গ্রহণ করে থাকে। পোল্যাণ্ডের নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে সে অদ্ভুত সংবিধানের দুর্বলতা বলে

১। কোন কোন আদিম সমাজে প্রধান বা রাজা তার প্রজাদের উপর রহস্যময় এমন এক প্রাধান্য লাভ করে থাকেন যে, তাকে রাজতন্ত্রের আখ্যা দেয়া সম্ভব, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে বা কোন সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রে তা দেখা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

প্রায়ই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও এ দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজকীয় ক্ষমতা বহুদিন পর্যন্ত এক রাজকীয় পরিবারে সীমিত থাকে। কিন্তু কোন দিনই রোমে তা বংশানুক্রমিক অধিকারে রূপ নেয় নি এবং শেষ পর্যন্ত রোমান সামরিক বাহিনীর খেয়াল-খুশীমত পরিচালিত হতে থাকে। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রের একটা বড় সুবিধা হ'ল, রাষ্ট্র প্রধানের নিশ্চিত শাসন। এর ফলে ক্ষমতার প্রতি দুর্জ্ঞেয় এক শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষমতার উত্তরাধিকারীর দুর্বলতা বা নির্বুদ্ধিতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি দূর হয়ে যায়। ধনিকতন্ত্রের উপযুক্ত পরিবেশে বংশানুক্রমিক সম্রাটের দুবলতার ফলে এ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর প্রকৃত ক্ষমতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বংশানুক্রমিক ও নির্বাচিত রাজতন্ত্র ছাড়াও কয়েকটি অস্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থা এর সাথে যোগ করা যেতে পারে ; যেগুলো রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ। সামরিক বাহিনী কর্তৃক জবরদস্তি শাসন দখলের ফলে বা প্রাচীন ধনিকতন্ত্রে 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের' ফলেও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। কিন্তু এভাবে কোন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে তাঁর ক্ষমতা অনিশ্চিত থেকেই যায় যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর নিয়োগকে অন্য কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বা নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ করতে না পারেন। আর একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা হ'ল এক নায়কতন্ত্র। এক্ষেত্রে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় বিশেষ কোন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য। রোমের এক নায়কতন্ত্রের ইতিহাস এধরনের। আধুনিক কালেও ক্রমওয়েলের মত শাসক রাষ্ট্রের 'রক্ষাকর্তা' হিসেবে শাসন কাজ পরিচালনা করেছেন। রোমের মত কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্র শাসনতন্ত্র ভিত্তিকও হ'তে পারে ; তবে প্রায়ই তা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল থাকে।

এরপর আমরা রাজতান্ত্রিক ধনিকতন্ত্র থেকে যৌথ ধনিকতন্ত্রের দিকে নজর দিতে পারি। এ ব্যবস্থা অবশ্য খুব কম দেখা যায় এবং ধনিকতন্ত্র যে ধরনের নিশ্চয়তা দাবী করে, এ ব্যবস্থা তা পূরণে ব্যর্থ হয়। অবশ্য নগররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এক ধরনের যৌথশাসনব্যবস্থা। প্রাচীন কালেও অনেক সময় দেখা গেছে যে, প্রাচীনদের এক পরিষদ বা উপজাতীয় প্রধানরা আধিপত্য চলিয়ে যাচ্ছেন। তবে আধুনিককালে এর দেখা পাওয়া খুব শক্ত। যা আধুনিককালে দেখা যায় তা হ'ল রাজতন্ত্র ও

www.nagorikpathagar.org

যৌথ ব্যবস্থার এক সংমিশ্রন। নামমাত্র সম্রাট কোন এক পরিষদের উপ নির্ভর করেন। এ ধরনের পরিষদ কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে সক্রি অংশ গ্রহণ করে। এ পরিষদ জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হতে পারে ব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী শ্রেণীর সদস্য নিয়েও গঠিত হতে পারে কাঠামোর দিক দিয়ে এ পরিষদ সহজ-সরল হতে পারে; বা স্তরীভূতও হয়। অন্যকথায়, এ পরিষদের সদস্যগণ সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারেন বা তাদের ক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন পরিমাণের হতে পারে। পোলাণ্ডের ব্যবস্থা প্রথমটির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান দ্বিতীয় ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরতন্ত্রের মধ্যে অন্য ধরনের দৃষ্টান্ত মেলে। ঈশ্বরতন্ত্রকে অন্য আর এক ধরনের ধনিকতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা ঠিক নয়; কেননা সংগঠনের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য রয়েছে তার মূলে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ মূলের পার্থক্য মাত্র। নির্ভেজাল ঈশ্বরতন্ত্র অবশ্য খুব বিরল। ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা সচরাচর দেখা যায়, তা হচ্ছে অন্য ধরনের কর্তৃত্বের সাথে ঈশ্বর-তন্ত্রের সংমিশ্রন। কখনও কখনও তা ঐক্যবদ্ধ হয়, আবার কখনও কখনও তাতে ক্ষমতার দ্বিত্বও দেখা যায়। মিশরের রাজবংশে, অতীতের অনেক প্রাচ্য দেশীয় সাম্রাজ্যে, 'হোলি রোমান সাম্রাজ্যে' এবং রেনেসাঁর পূর্বে অধিকাংশ মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় এবং খেলাফত অবসানের পূর্বে তুর্কী সাম্রাজ্যে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

সম্মিলিত ধনিকতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ একইভাবে হতে পারে। অন্য-কথায়, এক্ষেত্রেও শাসন পরিষদ হতে পারে বংশানুক্রমিক বা নির্বাচিত বা একনায়কতান্ত্রিক। রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারকে আমরা এক নায়কতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করতে পারি। দৃশ্যতঃ এ হ'ল 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র'। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে সর্বহারাদের সমর্থনপুষ্ট ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর এক নায়কতন্ত্র। এটা অবশ্য এক অভিনব ব্যবস্থা—নতুন ধরনের এক 'শ্রেণী সীমিত' ধনিকতন্ত্র; এতে অন্যান্য ধনিকতন্ত্রের ন্যায় বাহির থেকে নাগরিকত্ব-সীমিত হয় নি; বরং 'সামাজিক-অর্থনৈতিক' দৃষ্টিকোণ থেকে নীচের দিক থেকে এ ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব সীমিত হয়েছে। এ এমন এক ব্যবস্থা যা ধনিকতন্ত্রেই উদ্ভূত হয়। যখন কোন প্রবল ধনিকতান্ত্রিক কাঠামো হঠাৎ করে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তখন এতদিনের অধীনস্থ জনসমূহ প্রধান্য লাভ করে 'পূর্ব প্রভুদের' পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

বৃহৎ বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকেও সম্মিলিত ধনিকতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু সম্মিলিত ধনিকতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হ'ল সাম্রাজ্য। দেশীয় সাম্রাজ্য ও সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করেছি। দেশীয় সাম্রাজ্যে থাকে এক পাশাপাশি ভূখণ্ডের বিরাট এক জনসংখ্যা। শাসক শ্রেণী বা শাসক পরিবারের সামরিক বাহিনীও তার আধিপত্যের ঐক্যবোধে তারা থাকে আবদ্ধ। বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা সচেতনভাবে কোন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয় না বা সে জনসংখ্যা কোন কার্যকর সম্প্রদায়ও গঠন করে না। অবশ্য টিসিন '(Tsin), হ্যান (Han), মিং (Ming) ও মাঞ্চু (Manchu) পরিবারের মত চীনা রাজবংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীন বসতিস্থাপন, বিজয়াভিযান এবং ভূমি অধিকারের জন্য তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক সাধারণ সংস্কৃতি ও সামাজিক সংমিশ্রণ। এ ছাড়া, রাজবংশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অনুভূতি তেমন সুদৃঢ় হত না। যাহোক, একজন বিজয়ীর প্রতিভা বলে এ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের ক্ষেত্রে হ্যান, চেঙ্গিজ খান ও কুবলাই খানের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ছোট ছোট বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রেও বিবাহ বন্ধন বা শাসক পরিবারের মধ্যে ঐক্যমতের ফলেও বৃহৎ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভৌগলিক বা কুলগত সম্পর্কের ভিত্তিতে এসব সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হত। কেন্দ্রীয় সরকার এদের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব বিস্তার করত না। প্রদেশগুলোর থাকত তাদের নিজস্ব সংগঠন। প্রদেশগুলোকে রাজস্ব দিতে এবং প্রয়োজন বোধে অস্ত্র সাহায্য দিতে হত। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন ছাড়া এদের হাতে মোটামোটি ন্যস্ত থাকত স্বৈরাচারী ক্ষমতা।

এমনি বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রের প্রধান দুর্বলতা ছিল প্রদেশগুলোর কেন্দ্র-বিমুখী প্রবণতা। কোন দৃঢ় ঐক্য নীতির বন্ধনে প্রদেশগুলো কেন্দ্রের সাথে আবদ্ধ ছিলনা। এবং কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে তারা কোন সাহায্য লাভ করত না এবং রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার অমিতব্যয়িতার ফলে তাদের অনেক ব্যয়বাহুল্য ঘটত। তাছাড়াও, বংশানুক্রমিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে অনেক সময় অযোগ্য হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হ'ত ও তাদের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পেত। এর ফলে সাম্রাজ্যের সমগ্র কাঠামো বিপর্যস্ত হ'ত এবং অনেক সময় তা ভেঙ্গে যেত। এর ফলে সাম্রাজ্যের জ্যোরত-কেন্দ্র কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হ'ত বা এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে পরিবর্তিত হ'ত।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় গোষ্ঠির সাম্রাজ্য বা সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের গঠন প্রণালীতে ছিল কতকগুলো বিশেষ বৈচিত্র্য। দেশীয় সাম্রাজ্য থেকে সামুদ্রিক সাম্রাজ্য কুলগতভাবে বা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ছিল অনেক কম সমজাতীয়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীও ভিন্ন সভ্যতার লোকজনও এর অন্তর্ভুক্ত হ'ত। ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তা আনে নিশ্চিয়তাবোধ; কেননা তখন অধীনস্থ জনগণ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সহজে সংহত হতে পারে না। 'বিভক্ত করে শাসন করার' কোন কৌশল এতে প্রয়োজন হয় না; কেননা যে সমুদ্রের উপর তার ক্ষমতা নির্ভরশীল, তা আগেই তাকে বিভক্ত করে রেখেছে। এ সাম্রাজ্য অতি ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করে এবং তার ক্ষমতাও অত্যন্ত নিশ্চিত। ভেতর থেকে এর বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা খুব কম। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্ব এতে তেমন বেশী নয়। কিছু কিছু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সামুদ্রিক সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র কার্যকরী হয়; কিন্তু দেশীয় সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র কার্যকরী হবার সম্ভাবনা ছিল নেহাত কম। দেশীয় ক্ষমতা থেকে সামুদ্রিক ক্ষমতায় সামরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল খুব কম; কারণ সামুদ্রিক ক্ষমতা অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত এবং জনসংখ্যা ও সশস্ত্র বাহিনীর উপর তা তেমন নির্ভরশীল ছিল না।

তাছাড়া, সামুদ্রিক সাম্রাজ্য বাণিজ্যিক সুযোগ থেকে তার আধিপত্যের উৎস ও সুবিধা অর্জন করত। অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পারস্পরিক সম্পর্কের যে দিক রয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তা নেই। পরিবর্তিত অবস্থায় তা সহজেই খাপ খাওয়াতে পারত। এখনও তার স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্যে ভূখণ্ডের নিয়ম অনুসারে রাজস্ব আদায়ের নীতি প্রয়োগ করে। স্পেন তার সাম্রাজ্যকে নিছক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেছে এবং তার সম্পদকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আধুনিক উপনিবেশ স্থাপনকারী সাম্রাজ্যগুলো অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাদের নীতি পরিবর্তিত করেছে। উৎপত্তিমূলেও তারা প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো থেকে ছিল আলাদা; কেননা বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আধুনিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশ স্থাপনের পেছনে থাকে এক সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য। নিজ দেশের নিয়ন্ত্রাধীনে বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের জন্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে কাঁচামাল ও মূল্যবান ধাতু সংগৃহীত হয়েছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সময় উপরি জনসংখ্যাও সেখানে চালান দেয়া হয়েছে। উপনিবেশ অগ্রগতি সাধন করার সাথে সাথে অনেক বেশী স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছে। এভাবে

www.nagorikpathagar.org

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে এবং গ্রেন-ভিলের নীতির ভয়ঙ্কর ব্যর্থতা এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। সুতরাং উপনিবেশ স্থাপনকারী সাম্রাজ্যের প্রবণতা ছিল অনেক পরিমাণে কম সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার দিকে। সেসব অঞ্চলে তার নিজস্ব জাতীয়তার জনগণ বসতিস্থাপন করে, সেসব এলাকার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনেক অংশে তার দাবী পরিত্যাগ করেছে এবং তার পরিবর্তে চেয়েছে সহ-যোগিতামূলক ঐক্য ও অর্থনৈতিক সুবিধা। এ সব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য এক ধরনের স্থায়ী মৈত্রীবন্ধন বা রাষ্ট্র সমবায়ের আকার ধারণ করেছে। যে সব অঞ্চলে আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল বা কোন বিজাতীয় সভ্যতা কার্যকর উপনিবেশ স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করেছে সেখানে তা প্রাচীন ধরনের আধিপত্য বিস্তার না করে এক প্রকার অভিভাবকত্ব করেছে এবং তারই মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা ও সামরিক শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। শুধুমাত্র ঐসব অঞ্চলে সে পুরোনো দিনের দমন মূলক নীতি বজায় রেখেছে এবং তাও পরিবর্তিতরূপ—যেখানে কোন অর্ধমৃত সভ্যতার আদিবাসিদের উপর তারা শাসন করেছেন।

তিন: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও তার অগ্রগতির আলোচনা করব। প্রধান প্রধান স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের যে বিভিন্নরূপ রয়েছে এখন তার বিবরণ দিতে চাই। কার্যতঃ প্রায় সকল আধুনিক রাষ্ট্রকে আমাদের সংস্কার নির্ধারিত মানে গণতান্ত্রিক সরকার বলে গণ্য করা হবে; তবে কোন দু'টির মধ্যে প্রকৃতিগত মিল নেই। আংশিকভাবে গণতন্ত্র মাত্রাগত এবং আংশিকভাবে তা হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বিশেষ কৌশলগত এক ব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাচীনতম শ্রেণীবিভাগ হ'ল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ —এ দু' ধরনের গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সব নাগরিক আইন প্রনয়ণে অংশগ্রহণ করে এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রে তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে চূড়ান্ত ও আইনগত সার্বভৌমের সম্মেলন ঘটে। রুশোর মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হ'ল একমাত্র সঠিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; কিন্তু কার্যতঃ তার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। একে গণতন্ত্রের মর্মবিরোধীও বলা যায়। আমরা আগেই বলেছি যে, প্রাচীন নগর রাষ্ট্রগুলো

www.nagorikpathagar.org

আদৌ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। সেগুলো গণমুখী ধনিকতন্ত্র এবং সে ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণীভুক্ত নাগরিকরা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সুযোগ ভাগাভাগি করে নিত। এ সব উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্থায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাষ্ট্রের বিবর্তনের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূলতঃ গণতন্ত্র হ'ল আধুনিক ব্যবস্থা। এ সব রাষ্ট্রে কোন সংহতি ছিল না এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মূলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থের যে ঐক্যবোধ, তাও অনুপস্থিত ছিল। সাধারণ ইচ্ছা ছিল অনিশ্চিত ও আংশিক। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কিছু পরিমাণ সংহতি, যার ফলে কয়েকজন 'বহু'র পক্ষে কাজ করে; কারণ কয়েকজনের উপর 'বহু'র আস্থা রয়েছে এবং 'বহু' তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম। তাছাড়া, এক সাধারণ স্বার্থ যে রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করে তার অল্প প্রমাণই রয়েছে। আমরা আধুনিক বিশ্বে কয়েকটি অস্পষ্ট 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র' দেখতে পাই; বিশেষ করে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ছোট ছোট পার্বত্য ক্যাণ্টনে তা চালু রয়েছে। কিন্তু সেখানে রয়েছে এখনও অবিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং পিতৃতান্ত্রিক নীতি আজও সেখানে সাধারণ জীবনের ঐক্য নিশ্চিত করে।

প্রতিনিধিত্বের নীতি হ'ল গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। এটা সত্য যে, কতকগুলো আধুনিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে জনমত প্রকাশের জন্য কয়েক ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অবশ্য গণ-নির্দেশ ও গণ-উদ্যোগের মত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়নের নিয়মিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে না; বরং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে কোন কোন সময়ে কোন বিশেষ প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাদের প্রয়োগ করা হয়। যদি সেগুলো প্রতিনিয়ত কার্যকর থাকত, তবে তাতে সরকারের দায়িত্ব বিনষ্ট হত এবং আসলে এ দায়িত্ববোধ ছাড়া গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ত। তাছাড়া, প্রত্যেক গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দলীয় ব্যবস্থা। গণতন্ত্র দলীয় ব্যবস্থার বিকাশ সাধনও করেছে। দলীয় নীতির ভিত্তিতে যেসব প্রশ্ন সরকারের কাজ-কর্মকে সচল রেখেছে বা যা গণমনকে আলোড়িত করে তার সাথে গণ-নির্দেশ ও গণ-উদ্যোগ অনেকটা সঙ্গতিহীন। যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দলীয় নীতি সুস্পষ্ট নয়, অথচ যাদের সমাধান একান্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন, শুধু সেসব ক্ষেত্রে গণ-নির্দেশ প্রয়োগ করা যায়। আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে মদ্যপান নিরোধ প্রশ্নে এর প্রয়োগ দেখা গিয়েছে।[১]

এ সব ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত না করে গণ-নির্দেশের আবেদন জানানো হয়, এবং আসলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। গণ-উদ্যোগকে অপূর্ণ এক সুইস প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। ছোট ছোট রাজনৈতিক গোষ্ঠী সহযোগে গঠিত এবং বিশেষ ক'রে বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ধর্ম প্রভৃতি ভিন্নমুখী প্রভাব থেকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত যুক্তরাষ্ট্রে এর যে গুরুত্ব, তা অনস্বীকার্য হ'লেও তার বাইরে এর মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কার্যতঃ এ হ'ল নগর রাষ্ট্রের এক ব্যবস্থা এবং ওরেগন ও কলোরেডোর মত অল্প জন-সংখ্যার রাষ্ট্রেই শুধু তার নিয়মিত প্রয়োগ দেখা যায়। বৃহৎ রাষ্ট্রে এর প্রয়োগ বিরল না হ'লে তা দায়িত্বহীন রাজনৈতিকদের নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের এক বিরক্তিকর ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। এটাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে জনপ্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও সততার উপর জনগণের আস্থা খুব কম, সে ক্ষেত্রেই এর দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে।[২]

১। সংবিধানের প্রতিষ্ঠাকল্পে বা তার সংশোধনে গণ-নির্দেশের প্রয়োগ এবং সাধারণ আইন প্রণয়নে তার প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান আছে। প্রথম ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয় সাধারণ ইচ্ছা নির্ধারণের এক পদ্ধতি হিসেবে, সরকারের এক ব্যবস্থারূপে নয়; কেননা তার ফলে সংবিধান রচিত হয়; যার বিধান অনুযায়ী সরকার কাজ চালাবে। এ ভাবে প্রয়োগ করলে তাতে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে এবং আইন প্রণয়নের প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থায় তা বিকল্প হিসেবে প্রযোজ্য হয় না। এ ক্ষেত্রেও অবশ্য বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে; কেননা কোন কোন সময় সাধারণ আইন প্রণয়নকেও সংবিধানের সংশোধনের পর্যায়ে ফেলা হয়। আমেরিকার অষ্টাদশ সংশোধনী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

২। লাউয়েলের '*Public Opinion and Popular Government*' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠা। গণ-উদ্যোগের বিশেষ ব্যবহার অবশ্য অন্যকথা। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যেমন এস্তোনিয়ায় প্রয়োগ হয়েছে বা জার্মানীর নতুন সংবিধানে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে বা সাংবিধানিক কোন অচলাবস্থা দূর করবার জন্য যে ভাবে এর প্রয়োগ হয় তা যুক্তিযুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন না কোন ধরনের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং এই প্রতিনিধিত্ব-নীতির বৈশিষ্ট্য ও আওতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ করাই হবে সবচেয়ে সহজ কাজ ; এ সব রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তাদের প্রধান আইন পরিষদ প্রতিনিধিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রেও দু'টো বিশিষ্ট শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীতে দু'টি আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের প্রধানসহ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে শুধুমাত্র 'সাধারণ সভা' হ'ল প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধিত্ব মূলক। এ সভা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে অপ্রতিনিধিত্ব মূলক আর একটি আইন সভা দেখা যায়। এ ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের প্রধান নির্বাচনে নির্বাচিত হন না। তাছাড়াও এ ব্যবস্থায় থাকেন একজন স্হায়ী শাসনতান্ত্রিক প্রধান। এ ব্যবস্থার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হল ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ দু'টি চরম ব্যবস্হার মধ্যেও রয়েছে আরও অনেক শাসন ব্যবস্হা। তাই এদের শ্রেণীবিভাগ বড় কঠিন হয়ে পড়ে। আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যপদ কোন কোন সময় নির্ধারিত হয় বংশানুক্রমিক নীতির ফলে; কোন কোন সময় তা নির্বাচনের মাধ্যমে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে, বা উভয়ের সংমিশ্রিত এক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কোন কোন রাষ্ট্র আবার দ্বিতীয় কক্ষকে পুরোপুরি তুলে দিয়েছে। প্রধান শাসক কোন কোন রাষ্ট্রে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি জাতীয় পরিষদ বা আইন পরিষদের দ্বারাও নির্বাচিত হন। মন্ত্রীপরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল থাকে, আবার কোথাও কোথাও তা রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল থাকে না।

এসব পদ্ধতির সংমিশ্রনের ফলে সরকারের যে অসংখ্য প্রকারভেদ হয়েছে তার বিচার-বিবেচনা করলে আমাদের শ্রেণী বিভাগ অহেতুক জটিল হয়ে পড়বে। বিচিত্র ঐতিহাসিক পরিস্হিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পরিমাণের সাথেও এসব প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। এর মর্মবাণীর দিকে না তাকালে সরকারের আকার বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়বে। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিনিধিত্ব

www.nagorikpathagar.org

মূলক কিনা, এ বিচার করলেই চলবে না ; সাথে সাথে ভেবে দেখতে হবে তা কার্যকরী কি না। তেমনি প্রধান শাসক নির্বাচিত না বংশানুক্রমিক, এ বিবেচনা যথেষ্ট নয়। এর সাথে সাথে আমাদের ভেবে দেখতে হবে প্রধান শাসকের ক্ষমতা প্রাচুর্য রয়েছে কি না তাও। রাষ্ট্র প্রধানের কর্তৃত্ব বংশানুক্রমিক বা অন্য কিছু এ ভিত্তিতে সীমিত রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভবত: সব থেকে কঠিন, বা প্রধান শাসক আইন পরিষদের উপর নির্ভরশীল কি না এর ভিত্তিতে সংসদীয় এবং প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাও খুব শক্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে অন্যটির আলোচনা হবে। রাজনৈতিক বিবর্তন ধারায় প্রথমটির গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বংশানুক্রমিক হস্তান্তর গণতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় ; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সম্পন্ন হ'লে ঐতিহ্যের অবশিষ্টাংশ বা ঐক্যের প্রতীকরূপে নাম মাত্র সম্রাট থাকলে কোন অসুবিধা হয় না। সাধারণভাবে সম্রাট তখন হয়ে পড়েন সামাজিক বা শ্রেণী মর্যাদার জ্যোতিঃকেন্দ্রস্বরূপ। সীমিত রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তা সত্বেও এক পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় ; কারণ রাজার কোন ক্ষমতা না থাকলেও রাজতন্ত্রের বাহ্যিক সামাজিক মর্যাদার যে মনস্তাত্বিক প্রভাব, তার ফলে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায় ও শ্রেণী রাষ্ট্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যেমন সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান সমর্থন লাভ করে।[১]

ধনিকতন্ত্রের মত গণতন্ত্র এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এ দু'ধরনের হ'তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে একই সরকারের অধীনে কতকগুলো রাজনৈতিক এককের সম্মিলন ঘটে ; যদিও তাদের স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা বজায় থাকে। সাম্রাজ্যে অবশ্য অংগরাজ্যগুলো এক সাধারণ সরকার গঠন করে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংগরাজ্যগুলো কিছু পরিমাণ সার্বভৌম ক্ষমতাও উপভোগ করে এবং সম্মিলিতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার জন্ম দেয়। সাধারণ ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্যাপক ভিত্তিক হয়, যদিও গৃহ যুদ্ধের সময় তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যের পেছনে থাকে সংকীর্ণ ইচ্ছার

১। এম. ভি লাভলে (*Loveleye*) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হ'ল অদ্ভুত গোছের সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। (*'Essai sur les For mes de Government,'*)।

www.nagorikpathagar.org

এক ভিত্তি। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ কোন রাষ্ট্র সমবায় বা মৈত্রিবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র; কেননা যুক্তরাষ্ট্র একটি সত্যিকারের রাষ্ট্র গঠন করে, কিন্তু রাষ্ট্র সমবায় ঐকামত প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রগুচ্ছ। যেকোন সময় সে চুক্তি বা মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করে সেগুলো আবার স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। এতে অংগরাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয় না; বরং তা সীমিত হয়।

কতকগুলো রাষ্ট্রের মিলনের ফলে যে সংঘ গড়ে ওঠে, তাদের স্থান হয় যুক্তরাষ্ট্র ও মৈত্রীবন্ধনের মাঝামাঝি এক জায়গায়। মৈত্রীবন্ধন থেকে তাদের পার্থক্য হ'ল এই যে, তাদের এক সাধারণ সরকার থাকে এবং কতকগুলো সামগ্রিক বিষয়ে; বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা সে স্বীকৃত সরকারের মাধ্যমে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের পার্থক্য হ'ল এই যে. সে সাধারণ সরকার অংগরাজ্যগুলো নিয়ে কাজ-কারবার করে; অংগরাজ্যের নাগরিকদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল আমেরিকার রাষ্ট্র সমবায়। মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে তার ব্যবস্থাপত্র রচনা করে। এটা ছিল আলগা ও বেখাপ্পা এক ঐক্য এবং অংগরাজ্যের উপর বা ব্যক্তিবর্গের উপর তার তেমন বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ছিল না। আরও উল্লেখযোগ্য ও জটিল প্রকৃতির রাষ্ট্র সমবায় হচ্ছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন্স্। উপনিবেশ স্থাপনকারী সাম্রাজ্যের বহু পরিবর্তনের পর এর জন্ম হয়। একটি মাত্র বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে তার বাহ্যিক ঐক্য নিশ্চিত হয় এবং তাই সমগ্র সাম্রাজ্যের পক্ষে কাজ করত। অংগ রাষ্ট্রগুলোর স্বায়ত্বশাসন যে পরিমাণই হোক না কেন, সাম্রাজ্যের এক সদস্য হিসেবে তাদের পদমর্যাদা ছিল না; কিন্তু কোন আন্তর্জাতিক মর্যাদা ছিল না।[১] অপরপক্ষে, তার আভ্যন্তরীণ ঐক্য; কিন্তু কোন নিয়ম বা সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি; বরং তা আংশিকভাবে নির্ভর করে ঐতিহ্য, অনুভূতি এবং জাতীয়তার সাধারণ উপাদানের উপর এবং আংশিকভাবে তা নির্ভর করে মূল রাষ্ট্র ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের মধ্যে সংগঠিত বিশেষ ব্যবস্থাপনার উপর। লীগ অব নেশন্সের সংবিধান এখনও রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়। যদি তা

১। এ জটিল ও আকর্ষণীয় বিষয়টির জন্য কেনেডীর (*Kennedy*) '*Constitution of Canada*' গ্রন্থের পঁচিশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

কোনদিন বিকাশিত হয়, তবে এ শ্রেণীর মধ্যে পড়বে। এর সঠিক কার্য-কারিতার জন্য এক নতুন ধরনের 'রাষ্ট্র সমবায়' গঠন করতে হবে; যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো মূল সংস্থার উপর সীমিত ক্ষমতা ন্যস্ত করবে। সে ক্ষমতা বলে মূলরাষ্ট্র রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে; তবে নাগরিকদের সে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের প্রতি কোনরূপ আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না।[১]

এ ধরনের রাষ্ট্র সমবায়কে নেহাত মৈত্রীবন্ধনের পর্যায়ে না ফেলে বাস্তব রাষ্ট্রের শ্রেণীভুক্ত করাই মনে হয় উচিত। এ ধরনের সম্মিলনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপের তত্ত্বগত অসুবিধা দূর করা যায়; যদি সার্বভৌমত্বের ব্যাপক ব্যাখ্যা দান করা হয়। অন্যত্র এর আলোচনা অবশ্য হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অংগরাষ্ট্র বা আংশিক রাষ্ট্র এবং মূল রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি অংগ রাষ্ট্রের নাগরিকদের রয়েছে দ্বিবিধ রাজনৈতিক আনুগত্য। অবশ্য এ আনুগত্য প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নাগরিক ওহিও'র নাগরিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, অথবা বলা যায়. বাভারিয়ার নাগরিক এবং 'রাইখ্'-এর নাগরিক। এ দ্বিত্ব সম্ভব হয় লিখিত সংবিধানের দ্বারা; কেননা তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও অংগ রাষ্ট্রের সরকারের আওতা নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, যদি সংবিধান অংগ রাষ্ট্রের উপর শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ বা ফৌজদারী আইনব্যবস্থা ন্যস্ত করে, তবে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কোন আইন সংবিধান বহির্ভূত বলে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে, সংবিধান যদি কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ বা শুল্ক ব্যবস্থা বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয় ন্যস্ত করে তা হ'লে সেসব ক্ষেত্রে অংগ রাষ্ট্রের কোন আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। কোন বিষয়ে অবশ্য যুগ্ম আইন প্রণয়নও চলে। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগ রাষ্ট্র উভয়েই আইন প্রণয়ন ও শাসন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। জটিল ব্যবস্থার সঠিক মতবাদ তখনই মেলে যখন

১। প্রাচীন 'এচিয়ান লীগের' মাধ্যমে এমনি ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য সে ব্যবস্থায় লীগের জাতীয় পরিষদে অংগ রাজ্যের নাগরিকদের নামমাত্র ভোটাধিকার ছিল।

www.nagorikpathagar.org

'সাধারণ ইচ্ছার' উপর আমরা সম্মেলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরোপ করি। এমনি সম্মেলনে সার্বভৌম ক্ষমতার সুবিন্যস্ত বিভাগ সম্পন্ন হয়। কোন সঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনগত সার্বভৌমত্বের স্তরে চূড়ান্ত ঐক্য খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। এ বিষয়ে অবশ্য অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। লিখিত সংবিধান হচ্ছে চূড়ান্ত ও মৌলিক ইচ্ছার প্রকাশ যা যুক্তরাষ্ট্র বা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো প্রকাশে সক্ষম হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও বিভিন্নরূপ দেখা যায়।[১] জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচিত্র পরিবেশে এ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন ভিন্ন ভিন্ন দেশে এত বিভিন্ন যে এ সম্পর্কে কোন সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করা সত্যিই শক্ত। ১৮৭১—১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জার্মান ব্যবস্থায় এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংগ রাষ্ট্রগুলোকে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনেরও অধিকার দেয়া হয়। অবশ্য এসব ব্যবস্থাকে ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করাই উচিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি একক হিসেবে প্রধানতঃ অংগ রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বত্রই যুদ্ধ পরিচালনা বা শান্তিপ্রতিষ্ঠার একক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে থাকে। এ নীতি বাদ দিয়ে অংগরাষ্ট্র ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের অন্য কোন নীতি নেই। তবে সুযোগ সুবিধা বিবেচনা ক'রে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ, বাহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকত্বদান, মুদ্রা ব্যবস্থা ও আন্তঃ পরিবহণ ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সাধারণভাবে ন্যস্ত হয়।

কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে অংগ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা ও কাজ কারবারকে কেন্দ্রের কাজকর্ম ও ক্ষমতা থেকে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। কানাডার অবস্থাও তাই। সেখানে অবশিষ্ট ক্ষমতা বা যে সব ক্ষমতা কেন্দ্র বা অংগরাষ্ট্র কোনটিরই হাতে ন্যস্ত হয় নি তা কেন্দ্রের, নিয়ন্ত্রণাধীন আসবে। যে সব বিষয় অংগরাষ্ট্রগুলোর হাতে সুস্পষ্ট রূপে তুলে দেয়া হয়েছে তা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র কানাডার সুশাসন

১। এর বিভিন্ন রূপের জন্য নিউটনের (*Newton*) *'Fedral and Unified Constitutions'* গ্রন্থ এবং স্মিথের (*Smith*) *Federation in North America'* গ্রন্থ দেখুন।

www.nagorikpathagar.org

ও শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করবার জন্য যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে; অঙ্গরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক প্রণীত আইনকে সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করলে কেন্দ্রীয় সরকার সে আইনকেও বাতিল ক'রে দিতে পারবে। এদিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা ঠিক এর উল্টা। সংবিধানের দশম সংশোধনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, "যে সকল ক্ষমতা সংবিধানের ধারা মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় নি বা যে সকল ক্ষমতা অংগ রাষ্ট্রগুলোর জন্য নিষিদ্ধ হয় নি সেগুলো অংগরাষ্ট্র বা জনগণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে"। তবে এ ধরনের নিয়মনিষ্ঠ সীমাবদ্ধতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সরকারী বোর্ড ও কমিশনের মাধ্যমে, সাধারণ কর্মসূচীতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা নিশ্চিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল বন্টনের মাধ্যমে এবং বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সংগঠনের ক্রমবর্ধমান সম্মানের মাধ্যমে ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্র আন্তঃপ্রাদেশিক বিষয়ের উপর নিজস্ব কার্যক্রম বাড়িয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও হচ্ছে অনেকটা মাত্রাগত এবং তার সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে শক্তিশালী ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অংগরাষ্ট্রগুলোর সম্মতি লাভ করলে তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর ফলে যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা আরও হৃদ্যতাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং স্বতন্ত্র সার্বভৌমত্বের সৃষ্ট বিজাতীয় মনোভাব দূর হয়। সমস্ত অংগ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুক্তভাবে সম্পর্কের নতুন জাল বোনা হ'তে থাকে। বহু জাতীয় স্বার্থের বিশ্বজনীন চরিত্র মুক্তিলাভ ক'রেও স্বীকৃত হয়। সুসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে শুল্ক প্রতিরোধ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সাধারণ মনোভাব গঠনে বাধার সৃষ্টি আর করে না, এবং ভ্রমণকারীদের বিভিন্ন ভূখণ্ডকে বিভক্তকারী অদৃশ্য কোন বাধার অকস্মাৎ অস্বস্তিকর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় না। সব রকমের সাধারণ সুযোগের সাথে সহযোগিতা করে সাধারণ আইন ও সাধারণ জীবন মান। সুষ্ঠু ভিত্তিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতির সূচনা করে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর শাসন শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হবে। সাধারণ সরকারের দ্বারা যে সব স্বার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় সে সব বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হ'তে থাকে এবং 'স্বতন্ত্র স্বার্থের সুব্যবস্থার জন্য স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত হয়। অনুরূপভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও সুশাসনের যুক্তি শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রায়ত ও

www.nagorikpathagar.org

ও বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজন সৃষ্টি করে। ফলে উভয় দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি চ'লে আসে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা বড় সুবিধা হল এই যে, এতে ক্ষমতার অস্বাভাবিক কেন্দ্রায়ন না ক'রেও সাধারণ স্বার্থের স্বীকৃতি দেয়া হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন দু'টি রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা তা অনুধাবন করতে পারব। নিউইয়র্ক ও ভার্জিনিয়া—এদু'টি অংগরাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য আর একটি রাষ্ট্রের অংগরাজ্য—অন্টারিও ও নিউইয়র্কের মধ্যে বা ওয়াশিংটন ও কলম্বিয়ার মধ্যে ততটুকু পার্থক্য নেই। অন্যভাবেও ব্যাপারটাকে দেখা যায়, নিউইয়র্ক ও অন্টারিও এর মধ্যে জলবায়ু 'ভূখণ্ড' জনসংখ্যাও সামাজিক অগ্রগতির যে সমতা লক্ষ্য করা যায় নিউইয়র্ক ও ভার্জিনিয়ার মধ্যে ততটুকু সমতা নেই বটে, কিন্তু আদান-প্রদান ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধাও একই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের অবাধ অগ্রগতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক সৃজনধর্মী সংহতিবোধ। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের ফলে অত্যন্ত সুবিধাজনক ক্ষেত্রেও তেমন সংহতিবোধ সৃষ্টি হয় নি।

এখন আমরা রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ করতে পারি। অবশ্য এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রকে সুস্পষ্টভাবে ও চূড়ান্ত পর্যায়ের কোন মহাজাতি ও প্রজাতিতে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ধারায়ও আধুনিক কালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রের এ প্রকারভেদ অজ্ঞাতসারে একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয়। জীবদেহের প্রকারভেদের যে অপরিবর্তনীয়তা রয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠাদের ক্ষেত্রে তা থাকতে পারে না। ঐতিহাসিক ও সম কালীন রাষ্ট্রগুলোর সংগঠনের কতকগুলো বিশিষ্ট নীতি রয়েছে যা অনেক সময় অপূর্ণভাবে এবং অনেক সময় সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

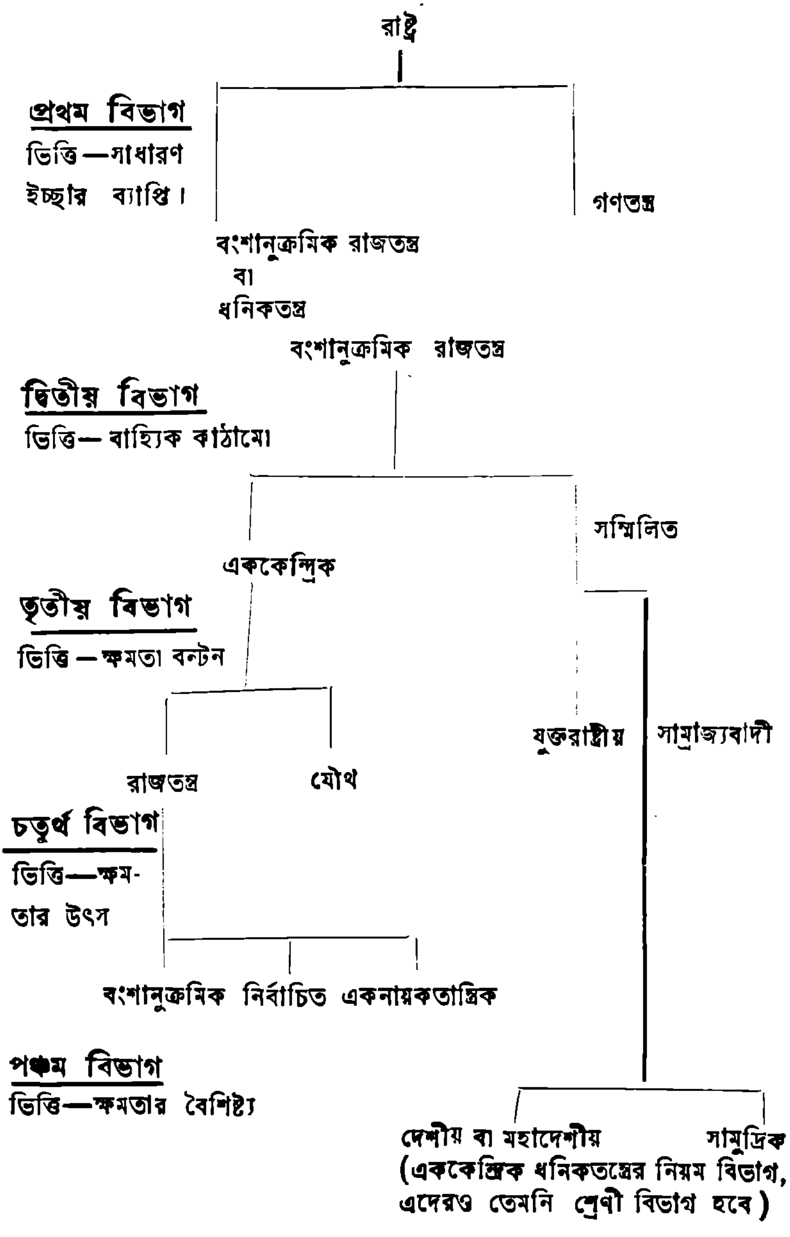

www.nagorikpathagar.org

গণতন্ত্র

দ্বিতীয় বিভাগ

ভিত্তি—বাহ্যিক কাঠামো

এককেন্দ্রিক — সম্মিলিত

সম্মিলিত: রাষ্ট্র সমবায় — যুক্তরাষ্ট্র

তৃতীয় বিভাগ

ভিত্তি — এককেন্দ্রিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, কিন্তু সম্মিলিত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক।

প্রতিনিধিত্বমূলক

চতুর্থ বিভাগ

ভিত্তি — নামমাত্র সম্রাটের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি—

সীমিত রাজতন্ত্র — প্রজাতন্ত্র

পঞ্চম বিভাগ

ভিত্তি—আইন বিভাগের সাথে শাসন বিভাগের সম্পর্ক

সংসদীয় — অসংসদীয়।

সম্মিলিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলতে বুঝায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সাথে অঙ্গগুলোর সম্পর্ক, নাগরিকদের সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক অবাধ হ'লে তাকে বলা হবে গণতন্ত্র—তা অংগ রাষ্ট্রগুলোর আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের ক্ষমতা গ্রন্থি

এক : ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ

এ গ্রন্থে আমরা সরকারের কার্যক্রমের সুষ্ঠু আলোচনা করছি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা। যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভূত ভিন্নমুখী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবরণে যাই, তবে তাতে শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি কতকগুলো মৌল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় সীমিত থাকি তাই যথেষ্ট হবে; কেননা সেগুলো সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিখ্যাত নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোই হ'ল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন শাসক ও শাসিতদের মধ্যে রয়েছে এক মৌল পার্থক্য—এ নীতি কিন্তু তেমন মৌলিক নয়, এবং রাষ্ট্রের জন্মের সাথে সাথেও তার জন্ম হয় নি। এ হ'ল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক বৈশিষ্ট্য। কোন রাজতন্ত্র এ নীতি ঘোষণা করে নি, কেননা এতে সার্বভৌমত্বের যে ধারণা রয়েছে রাজতন্ত্রে তার কোন নমুনা মেলে নি। এ নীতিতে শুধু যে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ থেকে পৃথক হয়েছে তা নয়, বরং এতে আইন বিভাগকে শাসন বিভাগের উপর মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী করা হয়েছে এবং কোন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এ গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় নি। প্রাচীন নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাপনায়ও এ নীতি জন্ম লাভ করে নি। নগর রাষ্ট্রের 'ম্যাজিস্ট্রেসি' বা যৌথ শাসন ব্যবস্থা যে পর্যায়ে কার্যকর ছিল তাতে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রয়োজন ছিল না।[১] আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ

১। এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় যে, অনুরূপ যৌথ শাসন ব্যবস্থার ধারণায় নির্ভরশীল সোভিয়েট শাসন-পদ্ধতি আইন বিভাগের মধ্যে তেমন পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়নি। বনের (Bonn) *Die Auflosung des Modernen Staate'* গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

থেকে অন্যান্য কাজ কারবারের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা নির্ভর করে আইনের কর্তৃত্ব ও আইন প্রণেতাদের কর্তৃত্বের পার্থক্যের উপর। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের প্রকাশিত ইচ্ছা যে আইন, তা যদি সার্বজনীন হয় তা হ'লে যারা সময় সময় রাষ্ট্রের নামে কাজ করবার ক্ষমতা লাভ করে তাদের ইচ্ছার উপর আইনের নির্ভরশীলতার বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে, কেননা তারাই আইনের ব্যাখ্যা দান করে, আইনের পরিবর্ধন করে ও আইনকে কার্যকরী করে। মঁতেস্কুর ধারণার মূল ছিল এটাই এবং তিনিই ছিলেন এ নীতির উদ্গাতা; তিনি মনে করতেন যে, আইনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ কর্মের স্বতন্ত্র প্রকাশ খুঁজে পেতে হবে। তাঁর নিজের সহজ সরল কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, 'যদি স্বাধীনতা ও আইনের স্থায়িত্ব বিধান করতে হয় তবে তার বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্য একমাত্র ক্ষমতাই হ'তে পারে ক্ষমতার প্রতিরোধ।'[১]

সরকারের কাজকর্মের সুস্পষ্ট তিনটি বিভাগের ধারণা অত্যন্ত প্রাচীন এবং অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্সে' তা সূচিত হয়।[২] মঁতেস্কুর পূর্বেও অনেক চিন্তাবিদ, বিশেষ ক'রে জন লক এ স্বতন্ত্রীকরণের বাস্তব গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে ব'লেছেন, কিন্তু 'L' Esprit des Lois, গ্রন্থের লেখক আর এক ধাপ এগিয়ে যান। তাঁর কাছে কাজ কর্মের বিশ্লেষণ তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যতটা ছিল স্বতন্ত্র শাখায় এ নীতির প্রকাশ। তাঁর নিকট এটা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাস্তব ব্যবস্থা। অবশ্য এ মতবাদের দার্শনিক তত্ত্ব তিনি তেমন ক'রে পরীক্ষা করেন নি বা অনুধাবনও করেন নি। তাঁর মতে এ ত্রিবিধ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয়— স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত ও অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সে ক্ষমতার প্রয়োগ হওয়া দরকার। ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেট্সের মত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগ-রাষ্ট্রের সংবিধানে এ মতবাদ সে ভাবেই বিধৃত হয়। ফরাসী বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করেন যে, এ নীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের মর্মার্থের এক অংশ

১। 'L' *Esprit des' Lois* গ্রন্থের একাদশ খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়,

২। পলিটিক্স্ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ এবং বর্ণনা করেন যে, 'যে সব সমাজে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নির্ধারিত হয় নি সেখানে কোন সংবিধান নেই।[১]'

এ মর্মস্পর্শী ও সহজ সরল মতবাদে অবশ্য রাজনৈতিক তত্ত্বের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। আদৌ আমরা কি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা বলতে পারি? আমরা কি একক ও অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন দিক বা তাদের প্রকাশ নিয়েই শুধু ভাবছি? যদি তাই হয় তবে কি ভাবে তাদের প্রকাশকে আমরা স্বতন্ত্র করতে পারি? ক্ষমতা বলতে কি আমরা শুধু সরকারের কার্যক্রমকে বুঝি বা রাজনৈতিক দেহের ঐক্য বজায় রেখে স্বতন্ত্র শাখার মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে? আমরা কি ক্ষমতা ও কার্যক্রমকে স্বতন্ত্র করে দেখব এবং হরিওর (Hauriou) মতে বলব যে, বাস্তবে কাজকর্ম মিশ্রিত হ'লেও ক্ষমতা কিন্তু ইচ্ছার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন?

কার্যক্রম ও কার্যক্রমের সংস্থার মধ্যে যে পার্থক্য তা অতি সুস্পষ্ট। সংসদকে আমরা একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি এবং তার কাজ হ'ল আইন প্রণয়ন করা। মন্ত্রী পরিষদ হ'ল একটা রাজনৈতিক সংস্থা এবং তার কাজ হ'ল শাসন পরিচালনা করা। কেবিনেটের মধ্যে আমরা আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের কাজকর্মের সম্মেলন দেখি। বিচারালয় হ'ল আর একটি সংস্থা যার কাজ হচ্ছে বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পন্ন করা। এমনি আরও অনেক সংস্থা আছে যাদের স্বতন্ত্র কাজকর্ম রয়েছে। যদি আমরা হরিও এবং অন্যান্য লেখকদের অনুসরণ ক'রে ক্ষমতা ও কাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে যাই তবে এ স্বাতন্ত্র্য আরও জড়িয়ে যায়। যেখানে কোন কাজকর্ম রয়েছে সেখানেই রয়েছে সে সব কাজকর্ম সম্পন্ন করবার ক্ষমতা। যেখানে কোন কাজকর্ম রয়েছে সেখানে রয়েছে তেমনি সম্ভাবনা। চোখের কাজ হ'ল দেখা। এ কর্মের অনুশীলনের ফলে আমরা কি আবিষ্কার করতে পারি যে, এ দেখার পেছনে রয়েছে আর এক শক্তি যাকে আমরা বলি দৃষ্টিশক্তি? কোন ক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার অনুশীলন সম্ভব নয়। এ আলোচনার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম ও ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য তাতে বিভিন্ন স্বত্বার অহেতুক সংখ্যা

১। '*Princples de droit public* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৬, প্যারিস।

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধি হয়। আমাদের সমস্যা হ'ল রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রকৃতি সমস্যা ; তাদের মধ্যে পার্থক্যবোধ এবং স্বতন্ত্র শাখা বা সংস্থার মাধ্যমে তাদের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও উপযোগিতা। মঁতেস্কু যদিও 'ক্ষমতা' বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি তিনি এ অর্থেই তা ব্যবহার করেন।

সুতরাং প্রথমতঃ সরকারের সর্বনিম্ন কাজকর্মের ধরন কি? অন্য কথায় কোন কোন মৌলিক পন্থায় সরকার তার কাজ সম্পন্ন করে? সরকার তার নিজের জন্য বা নিজের অধিকারের কোন কাজ সম্পন্ন করে না, বরং সব সময় তা রাষ্ট্রের নামে কাজ চালায়। তাছাড়া, তার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সমাজের মধ্যে এক সাধারণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুতরাং তাকে প্রতিষ্ঠিত বিধি বা আইন অনুসারে অবশ্যই কাজ করতে হবে। যদি সরকার কোন আইন তৈরী করে বা সংশোধন করে বা কোন আইনকে বাতিল করে তবেও তাকে একই কারণে আইন প্রণয়নের প্রতিষ্ঠিত নীতি মেনে চলতে হবে। সর্বশেষে, সরকার আইন প্রণয়নের প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানকেও সংশোধন করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাকে সবসময় প্রতিষ্ঠিত বিধিমতে কাজ করতে হবে, তা না হলে সংবিধান সরকারের হাত থেকে সংবিধান রচনার ক্ষমতা কেড়ে নেবে। সরকার যখন কোন নিয়ম প্রবর্তন করে তখন সে আইন বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে—তা সে সাধারণ আইনই হোক বা সাংবিধানিক আইনই হোক। এটি হ'ল সরকারের এক মৌলিক কাজ। কোন উন্নত রাষ্ট্রে সরকারের অন্যান্য কাজকর্ম আইনের দ্বারা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হ'তে পারে। সুতরাং আইন প্রণয়নমূলক কাজকর্ম হ'ল যুক্তিযুক্তভাবে সর্বোচ্চ।

এ বিশ্লেষণকে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারি এবং আইন প্রণয়নকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। তাদের একটি হচ্ছে সাধারণ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং অপরটি হচ্ছে সংবিধান। আমরা এটাও দেখেছি যে, এসব কাজকর্ম রাষ্ট্রের মধ্যে একই বা স্বতন্ত্র সংগঠন দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে কাজকর্মের আরও সূক্ষ্ম বিভাজন দেখতে পাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এটা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে সংবিধান নির্ধারিত পরিস্থিতিতে একটা সংবিধান-সংশোধন সংস্থা আহ্বান করা হয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের আর একটি নিয়মিত বিভাগ-সুপ্রিম কোর্টের উপর এক

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, যার ফলে কোন সাধারণ আইন সংবিধান-সম্মত হ'ল কিনা তা সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট করতে পারে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও সংবিধান রচনার ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা রয়েছে এদের নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সরকারের নিয়মিত কাজকর্ম প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে—একটি হল আইন প্রণয়নের কাজ এবং অপরটি হল আইনকে বাস্তবায়িত করবার কাজ। এ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সরকারের ঐসব কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়না যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার উপর নিভরশীল নয়। ধনিকতন্ত্রের কোন শাসকের কাজ বা সবশক্তিমান সম্রাটের কোন্ কাজ এ পর্যায়ভুক্ত। এসব কাজ হ'ল বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ, সন্ধিস্থাপন, যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি বজায় রাখার কাজ যা সাধারণভাবে পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্ভুক্ত। জনলক সরকারের কাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং তার মতে যৌথ কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উল্লিখিত কাজ কম—তিনি যে ভাবে সরকারের কাজকর্মের শ্রেণীবিভাগ করেন অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বা যৌথ কাজ কর্ম। তা তাঁর আমলের উপযোগী ছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মঁতেস্কু তা বাতিল করে সরকারের কাজকর্মের নতুন শ্রেণী বিভাগ করেন। আধুনিক গণতন্ত্রেও বৈদেশিক দপ্তরের ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, তাকে 'শাসন বিভাগীয়'-এ নামে আখ্যায়িত করা হলেও তা তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এ ক্ষমতা এত স্বতন্ত্র যে, তাকে আইনপ্রণয়নের পদ্ধতি বহির্ভূত বলেও গণ্য করা চলে। গণতন্ত্র যতই বিকাশ লাভ করছে ততই এ দাবী সোচ্চার হয়ে উঠছে যে সংসদ এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুক। এ নিয়ন্ত্রণ যতই কার্যকরী হয় সে পরিমাণে বৈদেশিক দপ্তর সঠিক শাসন বিভাগীয় দপ্তরের রূপ গ্রহণ করে।[১] সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি একমাত্র পূর্ণ গণতন্ত্র

১। এটাও অবশ্য বলা চলে যে, সন্ধিস্থাপনও একধরনের আইন প্রণয়ন। আমেরিকার সংবিধানেও রয়েছে কোন সন্ধিচুক্তি সেনেট কর্তৃক সমর্থিত হয়ে কার্যকরী হ'লে তা দেশের আইনের মর্যাদা লাভ করে (ওক্স এবং মোয়াতের *Oakes and Mowat*) *The great Eurpean Treateis of the 19th Century*' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫)।

www.nagorikpathagar.org

সরকারের সকল নিয়মিত কাজকর্ম এ দু'শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হ'তে পারবে।

ধনিকতন্ত্রের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আইন বিভাগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। গণতন্ত্রে অবশ্য এর ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে সরকারী কাজকর্মের আরও বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। আইনের বিচার বিভাগীয় প্রয়োগ জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত হ'তে পারে; তবে তার বাস্তবায়ন আর একটা সীমিত শ্রেণীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ ভাবে জার্মান রাষ্ট্রে আইনের ব্যাখ্যা এবং সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার জনগণের হাতে থেকে যায় যদিও সে বিচারের রায় কার্যকরী করবার দায়িত্ব চলে যায় রাজা ও তাঁর কর্মচারীদের উপর।[১] ব্যাপক অর্থে বিচার বিভাগীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে আইনের বাস্তবায়নের অংশবিশেষ, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে, এবং যেহেতু বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম আইন পরিষদ এবং মন্ত্রি পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন তাই আমরা সরকারের ক্ষমতার তিনটি বিভাগ মেনে নিয়েছি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এসব কাজকর্ম সম্পন্ন করবার জন্য সরকারের স্বতন্ত্র শাখার প্রয়োজন হবে কেন? কেন একটি অপরটির প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে? প্রথমত: আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল কাজকর্ম সমপর্যায়ের নয় বা তাদের পদমর্যাদাও এক নয়। বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম স্পষ্টত: আইন বিভাগীয় কাজ কর্মের অধীন, যদিও বিচার বিভাগের আওতা আইনের ব্যাখ্যাদান ও তার প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। তাছাড়া, গণতন্ত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে শাসন বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব বা তার সমান মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং ক্রমশ: তা আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে এসে পড়েছে। শাসন বিভাগের এ-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যেক দায়িত্বশীল সরকারের এক মৌল শর্ত এবং এ ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকতে পারে না। যে প্রক্রিয়ায় উপনিবেশগুলো স্বায়ত্বশাসিত

১। রেডলিচ ও হার্স্টের (*Redlich and Hirst*) *Local Government in England'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তারও প্রথম পদক্ষেপ ছিল শাসন বিভাগকে উপনিবেশের আইন পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল করা এবং অন্য কোন সরকারের নিয়োগকে বাতিল ক'রে আইন পরিষদের উপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত করা।[১] অনুরূপভাবে ধনিকতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ পরিক্রমায় এবং রাজতন্ত্রের অবসানে বা তাকে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক এক আইন পরিষদের সংগঠন এবং মন্ত্রী পরিষদের উপর তার আধিপত্য স্থাপন।[২] সুতরাং বিভিন্ন কাজকর্ম স্বতন্ত্র শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হবার শর্ত যে প্রত্যেকটি শাখার কাজকর্মের ক্ষমতা তা ঠিক নয়। তাছাড়া, তাদের একটি যে, অন্যটির কাজে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারবে তা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিচার বিভাগ আইন পরিষদের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না।[৩]

যখন মঁতেস্কু এ তত্ত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তখন সরকারের অন্যান্য ক্ষমতাগুলো আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে নি। সরকারের সকল কাজকর্ম আইন অনুসারে সম্পন্ন হ'তে থাকলেই স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে। তাঁর নির্দেশ থেকে এটাই ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মঁতেস্কুর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রলোভন থেকে আইনের পবিত্রতা রক্ষা করা। তিনি স্বতন্ত্রীকরণের এ সোপারেশ করেন এবং বিশেষ করে বিচার বিভাগ তার প্রয়োগের উপর জোর দেন। অবশ্য গণতন্ত্রের মহান নীতির সাথে তুলনা করলে এ সোপারেশকে তেমন মূল্যবান মনে হয় না। এর প্রকৃষ্ট পন্থা হবে সচেতন নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক ক্ষমতার সাথে দায়িত্ব বোধের সম্মিলন ঘটানো।

মঁতেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি স্পষ্টতঃই অবাস্তব। প্রত্যেক আইন পরিষদকে কিছু কিছু শাসন বিভাগীয় কর্তব্য পালন করতে হয়। এটি হ'চ্ছে সরকারের প্রধান শাখা এবং অনেক সময়ই নাগরিকদের

১। কেনেডীর (*Kennedy*) *The Constitution of Canada* গ্রন্থের দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

২। এড্যামসের (*Adams*) '*The Origin of the English a Constitution* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের দ্বারা কংগ্রেসের উপর কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট এক ভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করে।

www.nagorikpathagar.org

নিকট প্রতক্ষ্যভাবে দায়ী একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক শাখা। সুতরাং কোন কোন সময় শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় প্রশ্নের মীমাংসায় আইন পরিষদকে এগিয়ে আসতে হয়। তাছাড়া, আইন প্রণয়ন এবং শাসন বিভাগীয় কাজ বা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে তেমনি কোন ধরা-বাধা পার্থক্য দেখা যায় না। মন্ত্রিপরিষদের জরুরী আইন বা নির্দেশ-নামা অনেক সময় আইনের পরিবর্তে চালু থাকে। পুরোনো সংবিধানে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ায় মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশগুলো ছিল গণনির্বাচিত পরিষদের বিরুদ্ধে ধনিকতন্ত্রের ধারক ও বাহক স্বরূপ। আজ পর্যন্ত আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও শাসন বিভাগ বা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে তেমন কোন স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। বৃটিশ পার্লামেন্টে কোন বিল 'সরকারী বিল' হিসেবে উংথাপিত হবে বা 'বেসরকারী বিল' হিসেবে উংথাপিত হবে তা নির্ভর করে পার্লামেন্টের মর্জির উপর। সরকারী বিলের রয়েছে সঠিক আইনগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বেসরকারী বিলকে স্থানীয় সরকারের পর্যায়ে ফেলা হয় এবং এ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট এক ধরনের শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কানাডার কোন কোন প্রদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের আইন অথচ প্রায় সর্বত্রই তা আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফয়সালা হয়। আজকে আইন পরিষদ শাসন বিভাগ বা বিচার বিভাগের কোন কাজ সম্পন্ন করলে যে স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে তা নয়, বরং তার ফলে দক্ষতা হ্রাস পাবে। আইন প্রনয়ণের কাজ সম্পন্ন করে এক প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থা। এ সংস্থার আয়তন একদিকে যেমন বৃহদাকার, তেমনি তার সদস্যগণও অনেকটা অদক্ষ। সুতরাং শাসন বিভাগের বিশেষ কাজের জন্য আইন পরিষদ উপযোগী নয়। বিচার বিভাগীয় কাজের জন্যও তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, কেননা প্রথমতঃ আইন পরিষদ দৈনন্দিন রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত; দ্বিতীয়তঃ, তার সংগঠন ও মানষিকতা ও বিচার বিভাগের মূল স্তরের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তৃতীয়তঃ, বিচারকের যোগ্যতা ও শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আইন পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করা হয় না।

সম্ভবতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের আসল সমস্যা হচ্ছে এসব কাজ-কর্মকে এমনভাবে সংযোজন করা যেন দায়িত্ব নিপুণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। দায়িত্বের অর্থ হ'ল প্রতিনিধিত্ব এবং নিপুণতার জন্য দরকার দক্ষ জ্ঞান। এ দু'টোকে সরকারের কোন এক শাখায় সম্মিলিত

www.nagorikpathagar.org

করা যায় না। শাসক ও বিচারকের ক্ষেত্রে যদি প্রতিনিধিত্বের নীতি প্রয়োগ করা হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমনটি দেখা যায়—তাহলে আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে যাব। তার ফলে সেসব পদের জন্য প্রয়োজন হবে দক্ষতা। জনপ্রিয়তার আবেদনে সেগুলোর মীমাংসা হবে এবং তার ফলে শাসন ব্যবস্থার মান অবনত হ'তে বাধ্য। তাছাড়াও, এ ব্যবস্থায় আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বা সংহতি প্রতিষ্ঠার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। শাসন বিভাগ আইন পরিষদের নিকট দায়ীও নয়, তার উপর নির্ভরশীলও থাকে না। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য।[১] সুতরাং এ জন্য যা প্রয়োজন তা কিন্তু স্বতন্ত্রীকরণ নয় বরং সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের সঠিক প্রন্থা, এবং তা করতে হবে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিকে সামনে রেখে যে, সরকার হ'ল এক ন্যায্য জিম্মাদার এবং শাসিতদের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হ'তে হবে।

প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্র সরকারের এসব কাজ কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং স্বীকৃত তিনটি বিভাগে মোটামুটি তাদের গ্রহণ করার চেষ্টা করে। এ প্রসংগে যেসব পন্হা গ্রহণ করা হয় অনেকাংশে সে-গুলো হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ। অন্যান্য কাজকর্মের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক সম্বন্ধে এটা বলা চলে যে, এ ক্ষেত্রের গ্রহণ হল খুব সহজ। কি ভাবে আদালতকে সংগঠিত করা হবে এবং কিভাবে বিচা-রকরা নিযুক্ত হবেন এ ক্ষেত্রের বড় কথা এটাই বিচারকরা শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা নিযুক্ত হতে পারেন বা আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হতে পারেন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন। তবে সাধারণ-ভাবে শাসন বিভাগ তাদের যে কোন ভাবে মনোনয়ন দান করে। এখানে ওসব বিভিন্ন পদ্ধতির গুনাগুণ আলোচনা করা সম্ভব নয় বা কোন কোন দেশে যে শাসন বিভাগীয় আদালত রয়েছে ; যার আওতাধীনে আসেন শুধুমাত্র শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তারা-তারও এখানে আলোচনা প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট হ'ব যে, বিচার কাজের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এক অস্বাভাবিক ধরনের বিচারকের স্বাধীনতার সাথে তাঁরা দলীয় রাজনীতির ওঠানামার সাথে

১। উড্রো উইলসনের (*Woodrow wilson*) *The State*' 'গ্রন্থ। তিনি বলেন, "আমাদের ব্যবস্থায় আমরা পাই বিচ্ছিন্নতা এবং দায়িত্বহীনতা বা বিচ্ছিন্নতা এবং তা দায়িত্বহীনতা"।

www.nagorikpathagar.org

জড়িত হয়ে না পড়েন। আইনের ব্যাখ্যাদান ও রায়দানের জন্য তিনি নির্জনে আসন গ্রহণ করেন সামরিক নীতি দিয়ে তাঁর কাজকর্মের সীমারেখা নির্ধারিত হয় না, বরং বিধিবিধানের মর্মবাণী ও সে মহান পেশার জন্য সে অনুশীলন; তা দিয়ে সে সীমারেখা নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত এক রক্ষাকবচের প্রয়োজন আছে। ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চয়তা বিধান না করে কারো হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না। একজন বিচারকও তাঁর আওতায় একজন ক্ষুদে অত্যাচারীর রূপ নিতে পারেন। কিন্তু আবেদন অধিকারের একটা সঙ্ঘমূলক প্রভাব রয়েছে, এবং বিশেষ পর্যায়ে বিচারক সরকারের সাধারণ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে এসে পড়েন, এবং এ প্রভাব এসে পড়তে পারে আইন পরিষদ বা আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। এ চূড়ান্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হয় যেন রাজনৈতিক কর্তৃত্বও কোনরূপে ব্যাহত না হয় এবং বিচারকের পদমর্যাদাও কোনভাবে ক্ষুন্ন না হয়।

শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিরবচ্ছিন্ন, এ গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সাধনের জন্য যেসব পন্হা রয়েছে তাদের মধ্যে কেবিনেট ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী কার্যকর মনে হয়। বেগহটের বিখ্যাত শব্দাংশে কেবিনেট ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে এক। অঙ্গুলী বন্ধনী ('Knuckle goint') রূপে যার মাধ্যমে দু'ধরনের কাজকর্মের সম্মিলন ঘটেছে। যেসব দেশে প্রধান শাসক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না সেসব দেশে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খুব কম সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা শুধু যে সরকারের দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করে তাই নয়, তার মাধ্যমে সরকারের সংহতিও রক্ষা করা হয়। এ ছাড়া, আইন পরিষদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার আর কোন নিরাপত্তা নেই, আর এ এমন এক ব্যবস্থা যা প্রমাণ করে যে, আইন প্রণয়নই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। এতে আইন পরিষদ সরকারের জ্যোতিকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পরিষদের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চূড়ান্ত সার্বভৌম কোন বিস্তৃত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্য ছাড়াই রাষ্ট্রের সামগ্রিক কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। কেবিনেট আইন পরিষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, কিন্তু যেহেতু কেবিনেট নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা ও অধিকার আইন পরিষদের রয়েছে তাই এ গোলমাল নিরসনের জন্য যা প্রয়োজন তা হ'ল

www.nagorikpathagar.org

জনগণের স্বীকৃতি। এর মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যায় তার জন্য এ ব্যবস্থা দায়ী নয়, বরং এর জন্য দায়ী হ'ল গণ ইচ্ছার নীরবতা, এবং কোন শাসন-ব্যবস্থা আর নিজস্ব সমর্থন ছাড়া শক্তিশালী হতে পারে না। অপর দিকে, যেখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নয় বা যেখানে নিয়ম-মাফিক শাসন বিভাগ আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে না সেখানে এ দু'এর কার্যকলাপকে সংবিধানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে।[১] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা অনেকটা এমনি, এ ব্যবস্থা কেবিনেট ব্যবস্থা থেকে অনেক কম নমনীয়। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা খুব সুসংহত নয়। আইনের যেটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা উচিত এ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তেমন শ্রেষ্টত্ব লাভ করে না। শাসন বিভাগ অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কাজ করে, অথবা আইন পরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে যার স্বার্থে গণতন্ত্রের নীতি অনেক সময় সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে।

কেবিনেট ব্যবস্থার মত যেখানে সরকারের একটি জ্যোতিকেন্দ্র থাকে সেখানে চূড়ান্ত সার্বভৌমের নিকট সরকারের সামগ্রিক দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। অতীতের জার্মান ব্যবস্থা বা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসন-ব্যবস্থায় যেখানে একাধিক জ্যোতিকেন্দ্র থাকে সেখানে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব অন্য এক সাংবিধানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং সরকারের পরিবর্তিত অবস্থায়ও গণ-ইচ্ছার আন্দোলনে এ পদ্ধতি তেমন অবাধগতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বস্তুত পরবর্তী পদ্ধতি অদ্ভুতভাবে এ সমস্যার সৃষ্টি করে যা প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় এবং তা হ'ল নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা ব্যবস্থা সার্বভৌমের সমস্যা। এতে সরকারের একটি শাখা অপরটিকে সংহত ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

দুই: সরকারের ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা

কার্যত: প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রই তার নিজস্ব প্রতিনিধিবর্গের অবাধ কাজকর্মকে সংহত করবার জন্য কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। কোন রাষ্ট্রেই একটি মাত্র আইন পরিষদের ক্ষমতা অপ্রতিহত নয় যে,

১। গুডনোর (*Grodnow*) '*Principles of Constitutional Government* গ্রন্থের দশম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

তা কোন প্রশ্ন বা বাধার সম্মুখীন না হয়ে কার্যকরী হতে পারে। একটি স্বাধীন শাসন বিভাগের সৃষ্ট কোন বিশেষ পরিস্থিতির কথা আমলে না এনেই বলা যায় যে, তিনটি পদ্ধতিতে আইন পরিষদ তার কার্যক্রমে সংযত হয় এবং আইন প্রণয়নে বা তার পরিবর্তন সাধনে বাধা হয়। এদের প্রথমটি হল লিখিত সংবিধান। সাধারণ কাজকর্মের আওতায় আইন পরিষদ তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়টি হ'ল আইন পরিষদের দুটি কক্ষ। কোন বিল আইনে পরিণত হবার পূর্বে প্রত্যেকটি কক্ষে তা সমর্থিত হতে হয়। তৃতীয়টি হ'ল নির্বাচক মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। নির্বাচকমণ্ডলী শুধুমাত্র যে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তা নয়, কার্যতঃ তা আইন প্রণয়নও করতে পারে ; কোন আইনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে বা আইন পরিষদে উদ্ভূত আইনে সমর্থন জানাতে বা তাকে বাতিলও করতে পারে। সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক অনুধাবনের জন্য এসব পদ্ধতির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লিখিত সংবিধানের সীমাবদ্ধতা প্রকারে ও পরিমাণে বিভিন্নতর হতে পারে। ইতালীর মত কোন কোন দেশে সাধারণ আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তনের পদ্ধতিতে সংবিধানকেও সংশোধন করা যায়। ফ্রান্সের মত কোন কোন দেশে আইন পরিষদ বিশেষ এক অধিবেশনে সংবিধানের সংশোধনে সক্ষম হয়। বেলজিয়ামের মত কোন কোন দেশে সংবিধানের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হয় এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর আইন পরিষদের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা। আবার কোন কোন দেশে বিশেষ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে আইন পরিষদের আওতার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। এ সংবিধানের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হয় এক বিস্তারিত ও জটিল প্রক্রিয়া এবং তাও এর স্বপক্ষে শক্তিশালী জনমত গ'ড়ে ওঠা না পর্যন্ত তা সম্ভব হয় না। লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক, সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে স্বীকৃতিদান আইন পরিষদের উপর কতকগুলো নৈতিক সীমারেখা আরোপ করে ; যদিও তা সংশোধনের জন্য কোন বিশেষ অনু- বিধার উল্লেখ না থাকে। নেহাত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া আইন পরিষদ তার পরিবর্তন সাধনে আগ্রহী হয় না। কিন্তু যেখানে সংবিধান তার সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন জটিল পূর্বশর্ত আরোপ করে, যেমন দুই-

২২—

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা—তা হলেও এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এটা বলা যেতে পারে যে, সংবিধান যা করে তা প্রস্তাবিত কোন পরিবর্তনের পক্ষে জনমতের সুস্পষ্ট রায় নজরে রেখে তাকে নিশ্চিত করার জন্য করে। সংবিধান এরও এক ধাপ উর্ধ্বে যায়। পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরুর হাতে বাতিলকরণের ক্ষমতা অর্পণ করে। এখন প্রশ্ন ওঠে, সরকার যদি জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়; তবে সংখ্যালঘুর হাতে সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা বাতিল করবার অধিকার তুলে দেবার অর্থ কি? এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু এ ধরনের সীমাবদ্ধতার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে পারে বা তার সমর্থন করতে পারে; কিন্তু আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, সংখ্যাগুরু এ অবস্থা মেনে নেবে? এমন কঠোর বৈশিষ্ট্যের সংবিধান কি রাষ্ট্রের জীবন্ত ইচ্ছাকে বর্তমানে বেঁধে রাখে না? অস্টিনের সাথে সুর মিলিয়ে যদি আমরা বলি যে, যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে সার্বভৌমের ইচ্ছা; তবে কি আমরা বলতে পারি না যে, এক-চতুর্থাংশের যে সংখ্যালঘু তাই হ'ল সর্বোচ্চ? সংখ্যাগুরুর উপরেও যা রয়েছে, তারই কি এটা দৃষ্টান্ত নয়? একটা সংখ্যালঘুর ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করার মধ্যেই যেন সে প্রচেষ্টা নিহিত।

সার্বভোম যে তার নিজস্ব সার্বভোমত্বকে খর্ব করতে পারে না এবং তার অতীত কর্ম যে তার ইচ্ছা বা সমর্থন ব্যতীত বর্তমান শক্তি প্রয়োগকে প্রতিহত করতে পারে না; এ সত্য বহু রাষ্ট্রের ব্যবহারবিদ্যায় সমর্থিত হয়েছে। আসলে এটাই হল একমাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা। সার্বভৌমত্বের যুক্তি হচ্ছে সংখ্যাগুরু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে সে বাতিলও করতে পারে। তবে এ থেকে এ সূত্রের জন্ম হয় না যে, তিন-চতুর্থাংশের সংখ্যাগুরু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে বাতিল করতে তিন-চতুর্থাংশের সংখ্যাগুরুর মত প্রয়োজন হয় বা তাকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন হবে এক-চতুর্থাংশের সংখ্যালঘুর মত। এ ধরনের কোন শাসনতান্ত্রিক বিধান কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলেও তা সাধারণ ইচ্ছার উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে; কেননা তার ফলে সঠিক নীতি নির্ধারণের যে কর্তৃত্ব বা চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এমন ঐতিহাসিক বহু ঘটনা ঘটেছে যেখানে সরকার সর্বকালের জন্য এক বিধান জারী করেছে বা নিশ্চয়তার আশ্বাস দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু দেখা গেছে যে, পরবর্তী সময়ে চিরস্থায়িত্বের সে নিশ্চয়তাকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে আবার বাতিল করেছে। বন্ধনের যে ক্ষমতা, তা আলগা করবার ক্ষমতায়ও রূপ নেয়। প্রধান বিচারপতি মার্শাল বিখ্যাত ডাটমাউথ কলেজ মামলায় যেমনটি করেছিলেন, তেমনি সরকার যদি আইন পরিষদ বা আদালতের মাধ্যমে তার মৌলিক প্রতিশ্রুতির সমর্থন পুনরায় স্থাপন করতে চায়, তা হ'লে তা হয় সার্বভৌমত্বের নতুন কাজ, এবং তা প্রতিশ্রুতির পুনঃসমর্থন না হয়ে হয় অনেকটা প্রত্যাহার; এটা বলা যায় যে, এ মতবাদ রাষ্ট্রকৃত প্রত্যেক চুক্তির অলংঘনীয়তা বিনষ্ট করে। অবশ্য এর উত্তরে এ বলা যায় যে, এসব ক্ষেত্রে আমরা চূড়ান্ত নীতিগত প্রশ্নে আবার ফিরে আসি। রাষ্ট্র তার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিকে পালন করতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকে; কিন্তু অন্ধভাবে সর্বকালের জন্য তা হয় না। নৈতিক দায়িত্বের প্রকৃতি সেরূপ নয়। সে প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করতে হবে। নৈতিকতার সীমারেখার আওতায় তা আসতে পারে; কিন্তু আইনগতভাবে কোন দায়িত্বের মধ্যে তা আসে না। এটা স্বীকার করলে আইনের উৎস ও অনুমোদন সম্পর্কে ভুল ধারণার অবকাশ থাকবে। তাছাড়া, এ সহজ সরল সমাধানও আমরা স্বীকার করতে পারি না যে, অতীত সরকারের প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি যা সর্বকালের জন্য দেয়া হয়েছে, তাদের সবগুলোকে রাষ্ট্রের চিরন্তন সত্য হিসেবে মেনে চলতে হবে; কারণ তা হলে তাঁদের অতীত ত্রুটি, তাঁদের আইনগত বিভ্রান্তি, তাঁদের অর্থনৈতিক নিবুর্দ্ধিতা, তাঁদের দলীয় অনুভূতি ও কুসংস্কার যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে ঐসব আইনের আকারে বর্তমান থাকবে।[১]

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের আরও কতকগুলো সমস্যা দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও তার অংগরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য এখানে প্রয়োজন একটা লিখিত সংবিধানের। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে তাদের ক্ষমতা বন্টন সম্পন্ন হয় বা তার পুনর্বিন্যাস হয়? এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতিতে বিশ্বাস করি না; তা সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকেই হোক বা অংগ-রাষ্ট্রের

১। ওর্থের (*Orth*) *'The relation of government to property and Industry'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, একটা সঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পূর্বশর্ত হিসেবে প্রত্যেকটি অংগ রাষ্ট্রের কিছু পরিমাণ স্ব-শাসনের অধিকার রয়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে তা স্বীকৃতি হয়। তার অর্থ হবে সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য অংগরাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অন্যকথায়, সে অংগরাষ্ট্রের অবস্থা হ'ল অনেকটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই। শুধু সে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য কিছু কিছু শর্ত মেনে নিয়েছে বা পরবর্তী সময়ে রাজী হয়েছে। কোন অংগ রাষ্ট্র যেহেতু কতকগুলো ক্ষমতা ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়েছে ; তাই তার যেসব ক্ষমতা রয়েছে সেগুলো যেন কোনক্রমে ব্যাহত না হয়। এসব ক্ষমতা সম্পর্কে তার সংসক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে এবং জাতীয় পরিকল্পনার বিকাশে তা ভয়ঙ্করভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে এটি হল প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্যা।

একটু আগে যে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে নিহিত রয়েছে আরও একটা জটিল সমস্যা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি অংগরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সূত্রে শুধুমাত্র ঐ সব বিষয়ে আবদ্ধ, যে শর্তে সে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। তাছাড়াও সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কেও সে সংবিধানের সূত্রে আবদ্ধ ; কিন্তু তার হাতে সার্বভৌমত্বের যে টুকু অবশিষ্ট রয়েছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নস্যাৎ না করে যেটুকু সম্ভব অংগরাষ্ট্রে সেটুকু থাকা উচিত; সে পর্যন্ত সংবিধান হ'ল একটা মৌলিক আইন ; কিন্তু তার পরের পর্যায়ে তা হ'ল আন্তর্জাতিক চুক্তিস্বরূপ। এ সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের মর্মবাণী ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ; অন্যথায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণের যে সাধারণ ধারা, তার কোন স্থায়ী গুরুত্ব নেই। এ প্রসংগে আমেরিকার সংবিধানের দশম সংশোধনী এবং সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৩নং ও ৫নং ধারা উল্লেখযোগ্য।[১] এমন ধরনের সাংবিধানিক ধারা

১। ৩নং ধারা "যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সার্বভৌমত্বের যতটুকু সীমিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ক্যান্টনগুলো সার্বভৌম এবং এভাবে যেসমস্ত অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হয়নি, ক্যান্টনগুলো সেসমস্ত অধিকার প্রয়োগ করে থাকে"।

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশোধনের যোগ্য নয় ; কেননা তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পূর্বশর্তস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে সীমিত। এ সীমারেখা নির্ধারণ করে অংগরাষ্ট্রগুলোর সংরক্ষিত সার্বভৌমত্ব এমন সীমিত সার্বভৌমত্বের মতবাদকে সার্বভৌম শক্তির পুরোনো তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা খুব শক্ত; কিন্তু রাষ্ট্রের বাস্তববাদী ব্যাখ্যার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আরও বিস্তৃতভাবে এর আলোচনা করব।

কিন্তু সীমিত হ'লেও যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কম বাস্তব নয়। এটাও নির্ভর করে এক সাধারণ ইচ্ছার উপর এবং সময়ের গতির সাথে সাথে তাও ব্যাপক আকার ধারণ করে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সাধারণ ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য তার সদস্যদের সামগ্রিক ইচ্ছা ছাড়া কিছুই নয়। এর মধ্যেই রয়েছে তার ঐক্য ও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। যুক্তরাষ্ট্র তার অংগ রাষ্ট্রগুলোর সংরক্ষিত সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শুধু যে বিচ্ছিন্নতার বীজ নাশ করে তাই নয়, এর ফলে তার নিজের সংহতি ও ঐক্যও শতগুণে বেড়ে যায়; তার সাধারণ নাগরিকত্ব-বোধ সাধারণ স্বার্থ দ্বারা সুরক্ষিত হয়। প্রথা ও পূর্ব দৃষ্টান্ত তার স্বপক্ষে কাজ করবে। এতে একজাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে. এবং তা তার অংগরাষ্ট্রগুলোর স্বায়ত্ত শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বায়ত্তশাসনকে প্রতিহত করবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না; কেননা সাধারণ লক্ষ্যের গভীরতা যত বাড়বে তারাও তেমনি নিজেদের যথাযথ স্থান খুঁজে পাবে। প্রত্যেকটি অংগরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্তাবলী গ্রহণের ব্যাপারটি কালক্রমে ঐক্যের প্রতি স্থায়ী শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হবে এবং স্বার্থ ও নীতির বিরোধিতা তেমন গভীর বিভেদ আর সৃষ্টি করবে না। এমত অবস্থায় অংগরাষ্ট্রগুলো নিয়মমাফিক তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় তারা পূর্ণ আইনগত ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে; যেখানে সাধারণ ইচ্ছার

৫নং ধারা "রাষ্ট্র সমবায় ক্যান্টনগুলোর ভূখণ্ডের নিরাপত্তা দেয় এবং সংবিধানের ৩নং ধারায় বর্ণিত সার্বভৌমত্বেরও নিশ্চয়তা বিধান করে। তাছাড়াও জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার, নাগরিকদের শাসনতান্ত্রিক অধিকারেরও নিশ্চয়তা দেয় এবং যেসব অধিকার ও সম্পদ কর্তৃত্বের হাতে জনগণ সমর্পণ করেছে তাদেরও নিরাপত্তা বিধান করে"।

www.nagorikpathagar.org

সম্মিলন এমনভাবে ঘটবে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বন্টনের আর কোন ধরাবাধা সীমানা থাকবে না।[১]

যে পদ্ধতিতে আইন পরিষদের কাজকর্ম সীমিত বা সংযত হ'তে পারে, সেদিকে এখন নজর দেয়া যাক। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কতকগুলো অংগরাষ্ট্রকে বাদ দিলে প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রের আইন পরিষদ হ'চ্ছে দ্বি-কক্ষীয়। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে যেসব নতুন সংবিধান গ'ড়ে উঠেছে, ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে বাদ দিয়ে প্রায় সকলেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিপ্লব ও সংকটকালে তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছে। ক্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ড, বিপ্লবের সময় ফ্রান্স এবং সংবিধান রচনার পূর্বে আমেরিকা এমনি পরীক্ষা চালায়; কিন্তু প্রত্যেকেই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের নীতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং মনে হয় নিশ্চয়ই কোন শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে; যার জন্য রাষ্ট্র দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং উভয় কক্ষের সমর্থন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।

কিন্তু সে যুক্তি কি, এ প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্বের পক্ষে সাধারণভাবে এ যুক্তি দেখানো হয় যে, এর ফলে প্রথম কক্ষে দ্রুত ও অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন কিছুটা সংযত হয়। এ যুক্তি অত্যন্ত কার্যকরী হ'লেও কিন্তু দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের জন্ম এতে ব্যাখ্যাত হয় না। সমাজের কুলভেদ প্রথার ফলেই তার জন্ম হয়। অভিজাত শ্রেণী সরকারের একটা শাখায় তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদের জন্ম হয়েছে। পরবর্তী কালের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলো এ নীতিকে সুবিধাজনক মনে করে। অংগরাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় কক্ষের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। এ ভাবে এ নীতি সরকারের সর্বজন স্বীকৃত বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাই দ্বিতীয় কক্ষ থাকা উচিত কি না বা কোন যুক্তিতে দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্ব

১। ঐক্যবদ্ধ হবার প্রক্রিয়ায় কোন যুক্তরাষ্ট্র আরও সংহত হয়ে গেলে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় কি না, তা এক শক্ত প্রশ্ন। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে জার্মান 'রাইখ'-কে কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা যায়? ম্যাকবেন ও রোজার্সের (*Mcbain and Rogers*) '*The new constitution of Europe*' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

সমর্থনযোগ্য এ প্রশ্নের চেয়ে অধিক আলোচনা হয়েছে কিভাবে দ্বিতীয় কক্ষকে সংগঠিত করা যায়। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের অস্তিত্বের ফলে সার্বভৌমত্বে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সে বিষয়েও তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। 'এক এবং অবিভাজ্য' সার্বভৌম শক্তির শ্রেষ্ঠতম সমর্থক পর্যন্ত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের সমর্থন করেছেন এবং মনে করেছেন যে, দু'টি কক্ষ সম্মিলিত না হয়ে বরং বিভক্তই হবে।

আইন পরিষদের দুটি কক্ষকে সাধারণভাবে বলা হয় উচ্চতর এবং নিম্নতর কক্ষ। এ নামকরণকে স্বীকার করলে অনেক অসুবিধা দূর হয়। কারণ তখন এ দু'টি কক্ষকে নিম্ন আদালত ও আপীল আদালতের সাথে তুলনা করা যেতে পারবে এবং ফলে তাদের মধ্যে কর্তৃত্বের কোন দ্বন্দ্ব দেখা যাবে না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে এ সম্পর্কের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।[১] গণতন্ত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে নিম্নকক্ষ সাধারণভাবে হয়ে উঠেছে বেশী প্রভাবশালী এবং কোন সময়ই সে নিজেকে নীচু বলে মনে করে না।

কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সর্বত্রই দ্বিতীয় কক্ষকে অপ্রধান করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সাধাণতঃ এ কক্ষ অনেক কম 'জন প্রিয়', কম প্রতিনিধিত্ব মূলক এবং জনমতের ওঠানামার সাথে সাথে এ কক্ষ তেমন বেশী তাল রেখে চলে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় কক্ষ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তা ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না; কেননা গণসমর্থনের ভিত্তিতেই সে কর্তৃত্ব উদ্ভূত হয়। আবার যদি তা ঐ ভাবে সংগঠিত হয় তবে তা প্রথম কক্ষের দ্বিত্ব ঘটায়, এবং ফলে তার ভিত্তি ন'ড়ে ওঠে। আইরিশ ফ্রিস্টেটের মত কতকগুলো আধুনিক সংবিধানে অনেক কৌশলে দ্বিতীয় কক্ষের জন্য প্রতিনিধির ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে যা প্রথম কক্ষের ভিত্তি থেকে স্বতন্ত্র, এবং ফলে তাতে প্রথম কক্ষের যে জন প্রতিনিধিত্ব মূলক বৈশিষ্ট্য তা নষ্ট হয় না।[২]

১। ম্যাকবেন ও রোজার্সের গ্রন্থ—তৃতীয় অধ্যায়।

২। আইরিশ ফ্রি স্টেটের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সেনেটে (দ্বিতীয় কক্ষ) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে এবং এ উদ্দেশ্যে সমগ্র রাষ্ট্র একটা নির্বাচন কেন্দ্রে পরিণত হবে। এর প্রার্থীরা 'ডাইল' ও সেনেট কর্তৃক মনোনীত হবে। প্রার্থীদের মনোনয়নের ভিত্তি হবে এই যে, তাঁরা মহান দেশ সেবা বা অনুরূপ কাজের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের মর্যাদা বাড়িয়েছেন বা তাঁদের বিশেষ যোগ্যতা বা গুণাবলীর জন্য তাঁরা জাতীয় জীবনের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংবিধানের ৩০—৩৪ নং ধারা।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য এ ধরনের সমস্যার কোন সহজ সমাধান আছে বলে এখনও সন্দেহ পোষণ করা হয়।

সমান কর্তৃত্বের দু'টি কক্ষ রাখাও সম্ভব; যাতে একটি অপরটির আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা বাতিল করতে পারবে। এটা সম্ভব, কিন্তু এর ফলে অনেক অশুভ পরিণতি দেখা দিতে পারে। ফ্রান্স, সুইডেন বা অন্যান্য দেশের মত এ ব্যবস্থায় কোন নিয়মনিষ্ঠ অচলাবস্থা দেখা দিলে যুক্ত অধিবেশনের দ্বারা তার সমাধান হতে পারে; কিন্তু যদি দুটি কক্ষই জনমতের সমান সমর্থন লাভ করে, তবে অবশ্য এ ব্যবস্থার সমাধান হবে না, এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষের ইচ্ছাই কালে কার্যকরী হবে। তা ছাড়াও, শাসন বিভাগের সাথে দু'টি কক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আইন পরিষদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতার কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয় না, যদি সে দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মন্ত্রিপরিষদ ও দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের বিরুদ্ধে যোগসাজস গড়ে তোলে, তবে দায়িত্বশীল সরকারের ভিত্তি ন'ড়ে উঠবে। এখানে ব্রিটিশ ব্যবস্থার পক্ষে প্রবল যুক্তি রয়েছে। এ ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিপরিষদ কমন্স সভাকে ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতাও লাভ করেছে। কেবিনেট ব্যবস্থার কার্যকারিতার অর্থ হল প্রথম কক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইটিই হ'ল সরকারের ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, ইউরোপে সম্প্রতি যেসব সংবিধান গড়ে উঠেছে, সেগুলো গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক বোধের প্রেরণায়, এবং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে যে, মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবে এবং দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের তুলনায় অনেকটা অপ্রধান হবে।[১]

এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটির মীমাংসা না হলে দু'টি কক্ষের কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব শক্ত। বিভিন্ন দেশে দু'টি কক্ষের ক্ষমতার মাত্রায় ও প্রকারে এত পার্থক্য রয়েছে যে, কোন আভাষ দিলে মোটেই চলবে না। দ্বিতীয় কক্ষের হাতে নিয়ম মাফিক আইন

১। ম্যাকবেন ও রোজার্সের গ্রন্থ—তৃতীয় অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করলেও প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় তা বহন করবে না। জনমত যে মর্যাদা দান করে তার উপরই অনেকটা নির্ভর করে; কেননা তাই হল ক্ষমতার প্রকৃত উৎসের অনুমোদন। কমন্স সভার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে লর্ড সভা এ সত্য অনুধাবন করে। কানাডার সেনেটের মত একটি দুর্বল দ্বিতীয় কক্ষ সংবিধান অনুযায়ী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী; কিন্তু বাস্তবে তা একেবারে অথর্ব। এর সদস্যগণকে কেবিনেট সারাজীবনের জন্য মনোনয়ন দান করে। আবার আমেরিকার সেনেটের মত শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ প্রভূত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং এরূপ অবাধে অন্য কোন সেনেট ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করলে তার ফলে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিতে পারে।[১]

প্রথম কক্ষের সাথে দ্বিতীয় কক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতকগুলো মোটামুটি স্বীকৃত নীতি রয়েছে, যদিও সেগুলো সর্বজনস্বীকৃত নয়। এটা সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, সরকারের ঐক্য বজায় রাখতে ও গণতন্ত্রের দাবীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে দ্বিতীয় কক্ষের উচিত নয় প্রথম কক্ষের সমান ক্ষমতা প্রয়োগ করা; তা সে বস্তুগত দিক থেকেই হোক আর চূড়ান্ত ক্ষমতাই হোক। সাধারণভাবে এটাও স্বীকার করা হয় যে, যেসব দেশে কেবিনেট ব্যবস্থা প্রচলিত, সেখানে শাসন বিভাগের সম্পর্ক প্রথম কক্ষের সাথেই থাকা উচিত, দ্বিতীয় কক্ষের সাথে নয়।[২] এসব ঐক্যমত আধুনিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রয়েছে এবং এদের প্রভাবে সরকার হয়ে ওঠে সুবিন্যস্ত ও সংহত।

১। উদাহরণস্বরূপ '১৯০৯ সনে ট্যারিফ বিলটি সেনেট (আমেরিকার) থেকে ফেরৎ যায় ৮৪৭টি সংশোধনী প্রস্তাবসহ' (সেনেটর নত—*'The Political Quarterty, Februaly, 1914.*

২। এটা বারে বারে বলা হয়ে থাকে যে, কোন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের দুটি কক্ষের আইন পরিষদ থাকা উচিৎ। তাদের ক্ষমতা মোটামুটি সমান থাকা উচিত। উচ্চতর কক্ষ হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অভিভাবক। সুতরাং এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কেবিনেট পদ্ধতি হবে অনুপযোগী। 'কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া বিল' পাশ হবার সময় কয়েকজন প্রতিনিধি জোরেশোরে মত প্রচার করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—স্যার আর. সি. বেকার (এডিলেডে অনুষ্ঠিত জাতীয় অস্ট্রেলেশিয়া অধিবেশনের সরকারী রিপোর্ট—১৮৯৭, পৃষ্ঠা ২৭—৩১, সিডনীতে অনুষ্ঠিত ১৮৯৭ সনের অস্ট্রেলেশিয়ান যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিবেশনের আলোচনা—পৃষ্ঠা ৭৮২)। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, কেবিনেট পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুরোপুরি কার্যকর হ'তে পারে।

www.nagorikpathagar.org

এ নীতি যদি গ্রহণ করা যায়, তবে প্রশ্ন ওঠে, দ্বিতীয় কক্ষের যুক্তিযুক্ত কাজকর্ম কি হতে পারে ? এর উত্তরে এটা বলা হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় কক্ষের সঠিক ভূমিকা হওয়া উচিত 'দ্রুত ও অবিবেচনা-প্রসূত আইন প্রণয়ন সংযত করা' এবং পুনঃপরীক্ষার সংস্থা হিসেবে কাজ করা। দ্বিতীয় কক্ষের পুনঃপরীক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের কেবিনেট সরকারের সৃষ্ট পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সৃষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত। কেবিনেট শাসিত সরকারে আইনের খসড়া তৈরীর জন্য রয়েছে একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ এবং তার সাথে থাকে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের এক সংস্থা। ফলে নেহাত কৌশলগত পুনঃ পরীক্ষার জন্য এ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় কক্ষের উপর নির্ভর করতে হয় না বা করাও উচিত নয়। অবশ্য এ অবস্থা যেখানে বিদ্যমান নেই, সেখানে দ্বিতীয় কক্ষের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। যদি বলা হয় যে, দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের দ্রুত আইন প্রণয়নের ব্যাপারটাকে সংযত ক'রে, তবে আসলে তার অর্থ হয় এই যে, যেহেতু দ্বিতীয় কক্ষ তেমন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়; তাই প্রথমটি থেকে তা বেশী রক্ষণশীল হতে পারে। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু যদি আমরা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিকতা খুঁজে ফিরি এই আশায় যে তা জনমতের এক অংশের সুবিধার জন্য ব্যস্ত থাকবে; তবে তা হবে সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এ প্রসংগে মিলের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, দু'টি কক্ষের আইন পরিষদের পক্ষে যে যুক্তি, তার প্রতি আমি খুব কম গুরুত্ব আরোপ করি। বলা হয় যে, দ্বিতীয় কক্ষ দ্রুত আইন প্রণয়নকে বাধা দেবে ও দ্বিতীয় বার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। কিন্তু তা যাই হোক, দ্বিতীয় কক্ষ হবে অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে সংগঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ এবং তাতে কোন বিষয় বিচার-বিবেচনা করতে দু'বারের বেশী সময় লাগে না। তবে দু'টি কক্ষের পক্ষে যে যুক্তি আমার কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তা হ'ল এক মনঃস্তাত্ত্বিক অনুভূতি। ক্ষমতার অধিকারী যদি মনে করে যে, শুধুমাত্র তার বিবেচনার উপর সবকিছু নির্ভর করবে তা হলে শাসন ব্যবস্থায় তার খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে; তা সে ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তিই হোক বা কোন পরিষদই হোক। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন এক ব্যক্তিচক্র অন্য কারো সাথে পরামর্শ না ক'রে যদি তাদের ইচ্ছাকে

www.nagorikpathagar.org

কার্যকরী করতে পারে তা যতই অল্প সময়ের জন্য হোক না কেন, তা হ'লে তা সুবিধাজনক হয় না।[১] সম্ভবতঃ এটিই হ'ল চূড়ান্ত যুক্তি, এবং এমনভাবে যদি দ্বিতীয় কক্ষের সংগঠন করা সম্ভব হয় যাতে প্রকৃতিগতভাবে সে বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী দলগুলোর কোন একটিরও প্রতি অনুরক্ত না হয়ে নিজের কাজ করে তবে এ যুক্তি সত্যিই অজেয় হয়ে থাকে।

কিন্তু এ এমন এক ব্যবস্থা যা অর্জন করা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। ফলে অনেক দেশেই দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা দলীয় আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। পরিণামে এর অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে; কেননা প্রথম পক্ষের সাথে দ্বন্দ্বের ব্যাপারে দ্বিতীয় কক্ষ কোন দলের নিকট আবেদন করতে পারে না। সুতরাং তাকে দেশের নিকট আবেদন করতে হয়। এতে তার প্রধান কাজ-কর্মের নতুন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হ'ল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব ঘটানো; যাতে নির্দিষ্ট বিল-সংক্রান্ত বিষয়ে জাতির মতামত প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতে পারে।[২] এভাবে কাজ করলে অন্য কক্ষটিও অন্ততঃ তার সমর্থন বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে এবং রাষ্ট্রের সে ইচ্ছার বিরোধিতা না করে বরং তা রক্ষণ করে এই ভেবে যে, তা শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই।

এবারে কতকগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা যাক, যাদের মাধ্যমে চূড়ান্ত সার্বভৌম আইন প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। জনগণ যে একমাত্র প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমেই আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে তা নয়, অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমেও তারা সে সুযোগ লাভ করে। এগুলো গণ-উদ্যোগ ও গণ-নির্দেশ।[৩] আধুনিক

১। মিলের (*Mill*) '*Representative Government*' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়।

২। দ্বিতীয় কক্ষের সংস্কার সাধনের অধিবেশন: ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রধান মন্ত্রীর নিকট ভাইকাউন্ট ব্রাইসের পত্র—*C m d*—৯০৩৮। আইরিশ ফ্রি স্টেটের সংবিধান অনুযায়ী সেনেটর তিন-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোন বিলকে গণনির্দেশের জন্য পাঠান হয়।

৩। এদের সাথে অনেক সময় 'পদচ্যুতিও' 'সংশ্লিষ্ট'। 'পদচ্যুতির' মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে; কেননা এ অধিকার প্রয়োগ ক'রে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারী কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে পারে বা কোন আবেদনের মাধ্যমে তাদেরকে পুণনির্বাচনের ঝুঁকি গ্রহণে বাধ্য করে।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দিকে যে গতি, এগুলো তারই পরিচয় বহন করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মর্মার্থ হ'ল, যে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে জন মতের সঠিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, অথবা আইনের এমন কতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে, বিশেষ ক'রে সংবিধান বা মৌলিক আইন সংক্রান্ত এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যেখানে কোন প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়। অবশ্য সংবিধানের কোন সংশোধনী এবং সাধারণ আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ বিধির মধ্যে আমাদের পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তারা সংবিধানের পেছনে বিশেষ অনুমোদন দেয় এবং তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, অথচ সংশোধনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে প্রয়োজন বা যে কর্ম পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত, এসব বাস্তব প্রশ্নে তারা জড়িয়ে যায় না। আগেই বলা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অপেক্ষা শক্তিশালী ইচ্ছা গড়বার নিয়মনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সংখ্যালঘুর হাতে সার্বভৌম সিদ্ধান্তের একাংশ তুলে দেবার ফলে ব্যর্থ হয়। সহজ সরল পথে গণ-নির্দেশের প্রয়োগ হ'লে চূড়ান্ত সার্বভৌম প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্য থেকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি পরিষদের সিদ্ধান্ত জটিলতর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও সংখ্যাগুরু সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু তা হয় প্রত্যক্ষ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, তাই তাদের বাছাই বা পছন্দের এক বিশেষ তাৎপর্য থাকে। সুতরাং সাংবিধানিক আইনকে কোন বিভ্রান্তি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না ক'রে স্বতন্ত্র করতে হবে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ আইন থেকে আলাদা ক'রে নিতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে অবশ্য এ ধরনের স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়ে থাকে। সুইজারল্যাণ্ডকে এসব প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আবাসভূমি বলা হয়। সেখানে কোন সাংবিধানিক প্রশ্নে গণ-নির্দেশ অবশ্য পালনীয়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় এসব পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাংবিধানিক প্রশ্নে এদের প্রয়োগ হয়েছে। ইউরোপে সাম্প্রতিককালে যেসব সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোতেও এদের অনুসরণের এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নব্য জার্মানীতে, এ

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তবে সংবিধানের সংশোধনীর ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে এদের প্রয়োগ করা হয় মাত্র।[১]

যখন অবশ্য সাধারণ আইন প্রবর্তন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ বা গণনির্দেশের প্রয়োগ করা হয় তখন অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। যেখানে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ রয়েছে, সেখানে নির্বাচক মণ্ডলীর আলগা আইন প্রণয়নের প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাছাড়াও, এ ধরনের প্রত্যক্ষ আইন প্রণয়নের ফলে যে জনগণের মধ্যে গভীর এক রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় বা তাদের দায়িত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পায় তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা ছিল নগর সম্প্রদায়ের সম্পদ। রুশো আধুনিক সমাজের জটিলতা ও আয়তনকে উপেক্ষা ক'রে এদের যথার্থতা প্রচার ক'রেছিলেন। আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে প্রধানতঃ সুইজারল্যাণ্ডের ছোট্ট ছোট্ট অঞ্চলে এবং ওরিগণ ও আরিজোনার মত জটিলতা বিহীন ও অল্পসংখ্যক অধিবাসির রাষ্ট্রগুলোতে। পেশাদারী রাজনৈতিকদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আস্থাহীনতা থেকে যদি এসব পদ্ধতি অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে, তবে তার সঠিক প্রতিকার রয়েছে অধিকতর গণতন্ত্রের শিক্ষা প্রসারের মধ্যে; কেননা তার ফলে সার্থক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন আইনের বিষয়ে যদি পরিষদের দু'টি কক্ষ একমত না হ'তে পারে তবে গণ-নির্দেশের প্রয়োগের যৌক্তিকতা রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আইরিশ ফ্রি স্টেটে এর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন জরুরী বিষয়ে অবশ্য গণ-নির্দেশ ও গণ-উদ্যোগের প্রয়োগ করা যেতে পারে; যেমন—কোন কোন রাষ্ট্রে 'মদ্যপান নিরোধ' প্রভৃতি বিষয়ে, যদি ঐসব বিষয় কোন দলের কর্মসূচীর অন্তর্গত না থাকে। তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐসব বিষয়েও গণভোট হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা; কেননা একবার গণ-ইচ্ছা নির্ধারিত হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠিত সরকার ঐ মত অনুসারে বাঞ্ছনীয় আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হ'তে পারে। কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে গণ-ইচ্ছা যাচাই করা চলে। এ পন্থায় আইন পরিষদের দায়িত্বও অক্ষত থাকে।

১। ১৯১৯ সনের আগস্ট সংবিধান—৭৬ নং ধারা।

www.nagorikpathagar.org

সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা থেকে আমরা ঐক্য ও সুবিন্যস্ত এক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি, যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সাথে সাথে দায়িত্ব যেন বিভক্ত না হয়। এও বুঝেছি যে, একই কাজ করবার জন্য সমান কর্তৃত্বের একাধিক সংস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। যদি ঐক্য অর্জন করতে হয় এবং চূড়ান্ত সার্বভৌমের নিকট সরকারের দায়িত্ব সংন্যস্ত ও সংরক্ষিত করতে হয় তবে কাজ-কর্মের বিভাগ করতে হবে; কিন্তু কাজকর্মের সংস্থার দ্বিত্ব ঘটানোর প্রয়োজন নেই। জাতীয় সরকারের সাথে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের যে সম্পর্ক, তার আলোচনায় এ নীতির অন্য দিকও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

তিন: কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন:

আমরা যদি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং সকল নাগরিকের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করি তবে আধুনিক রাষ্ট্রের অত্যন্ত জটিল শৃঙ্খলাবোধের নেহাত এক অস্পষ্ট ধারণা লাভ করি। রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে কোন জনগোষ্ঠী বা জাতির সহজ সরল এক সংগঠন নয়। এর ঐক্যের ভিত্তি যাই হোক না কেন, রাষ্ট্র একটা ভৌগলিক সংগঠন। এমন কতকগুলো বৃহৎ স্বার্থ রয়েছে যা হ'চ্ছে সকল নাগরিকের সাধারণ স্বার্থ; এ ছাড়াও রয়েছে কতকগুলো স্বার্থ যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এদের মধ্যে কতকগুলো ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন এক এলাকা বা জেলার বিশেষ অবস্থায় নির্ধারিত হয়েছে, আবার কতকগুলো নির্ধারিত হয়েছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা বা জনসংখ্যার বিশেষ বন্টনের জন্য বা ঐতিহাসিক কারণে। এসব কারণে এদের এক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এদের অধিকাংশের মূলে এ সত্য নিহিত যে,কতকগুলো মানবীয় প্রয়োজনের সন্তুষ্টি কোন এক বিশেষ এলাকায় হ'তে পারে। তাই তারা এসব এলাকায় সুস্পষ্ট প্রকাশ লাভ করেছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একগুচ্ছ জটিল সংস্থা বিদ্যমান। সবগুলো মিলিয়েই রাষ্ট্র, এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিন্যাসের জন্ম দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ সম্পর্কের বিভিন্ন বিন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বা কিভাবে ছোট ছোট স্বাধীন সম্প্রদায় বৃহৎ সম্প্রদায়ে মিশে গেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে সম্প্রদায়ে স্থানীয় ঐতিহ্য ও জাতিগঠনের প্রেরণার প্রাণশক্তির অনুপাতে কিভাবে কেন্দ্রায়ণ ও বিকেন্দ্রিকরণের গতি-প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ছাড়া আর এর মর্মার্থ অনুধাবন করতেও পারব না। এ ক্ষেত্রে আমরা বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা বিন্যাসের সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মতামত ব্যক্ত করতে চাই মাত্র।

তাদের আওতা বা সীমারেখার ভিত্তিতে আমরা তিন প্রকার কাজ-কর্মের পরিচয় পাই, এবং রাষ্ট্র এসব কাজ সম্পন্ন করে। প্রথমতঃ, কতকগুলো কাজ আছে যা বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত ; স্পষ্টতঃ সন্ধি-স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও পরিচালনা, সামরিক বাহিনী ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত কাজকর্ম, শুল্কসহ কয়েক ধরনের কর ধার্যের ব্যাপার এবং নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, যেসব বিষয় বিশেষ কোন এক এলাকার সাথে অন্তুতভাবে জড়িত নয়, তাও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হওয়া উচিত। শাসন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র স্থানীয় সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করে, যেমন কর নির্ধারণের কর্মকর্তা ; এসব কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন। এসব কাজ যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করে, তাই এতে স্থানীয় কর্মকর্তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ কতকগুলো এমন কাজ রয়েছে যাদের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য থাকলেও সুনিপুণ সম্পাদের জন্য এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় ; তদিও তা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। বিচার বিভাগ পরিচালনা, পুলিশ বিভাগীয় কাজ, দরিদ্রের সেবা, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক কাজকর্ম এবং অন্যান্য অনেক কাজ এ পর্যায়ে পড়ে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এসব কাজে অংশ গ্রহণ করলে শাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং কিছু কিছু দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থানীয়

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করবার বিশেষ কারণও আছে। এর দ্বারা সরকারের প্রদত্ত সেবার বদলে স্থানীয় লোকজনদের উপর কাজের বোঝার একাংশ চাপিয়েও দেয়া হয়। এ ক্ষমতা অর্পণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত পর্যালোচনার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পায় এবং ফলে কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি থেকেও রাষ্ট্র মুক্ত হয়।

সবশেষে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা কোন স্থায়ী এলাকার সাথে অদ্ভুতভাবে জড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে অর্থে কোন এলাকার বিচার কাজ পরিচালনা সাধারণ ব্যবস্থার অংশ, এ অর্থে কোন শহর বা নগরের পানি সরবরাহ সাধারণ ব্যবস্থার অংশ নয়। কোন শহর বা নগরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাটা কিন্তু এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। ট্রাম ব্যবস্থা বা সাধারণ পরিবহণ ব্যবস্থার মত অনেক জিনিসের বেলায় এটা খাটে। এদেরকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় 'জনকল্যাণমূলক কাজ'। এসব কাজের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকা উচিত। এসব কাজের অনুধাবন সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং এর প্রয়োজন মিটাতেও তারা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সক্ষম হয়। এটা নিসন্দেহ যে, এসব ব্যাপারে এক ব্যাপক স্বার্থ জড়িয়ে আছে; কেননা কোন একটা এলাকা স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। এ ব্যাপক স্বার্থের জন্য সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র কিছু পরিমাণ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা হাতে রাখে। এ উদ্দেশ্যে কোন প্রকল্প হাতে নেবার আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হয় এবং কেন্দ্রের বিধিবিধান স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মেনে চলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইংল্যাণ্ডে নতুন প্রকল্পগুলোকে পার্লামেন্ট বেসরকারী বিলের আকারে অনুমোদন করে থাকে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় কাজ কর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়, দরিদ্রের সেবা আইনের পরিচালনা এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়ের উপর কতকগুলো উপদেশমূলক ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে থাকে।

যেসব কাজ-কর্মের বর্ণনা দেয়া হ'ল তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মাত্রায় স্থানীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থে রূপান্তরিত হয়। তবে এটা বাঞ্ছনীয় যে, যেসব বিষয় কোন স্থান বা

www.nagorikpathagar.org

অঞ্চলের স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত, কিন্তু ব্যাপক গণস্বার্থের জন্য সে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত নয়। কাজকর্মের যে শ্রেণী-বিভাগ এ মুহূর্তে করা হ'ল তাতে ক্ষমতা বিন্যাসের যুক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্যাটা হ'ল স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর ভিন্নমত রয়েছে। নেপোলিয়নের রাষ্ট্রে যে ভাবে ক্ষমতার চরম কেন্দ্রায়ণ করা হয় তা সর্বত্রই পরিত্যাগ করা হয়েছে। আধুনিক ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী ও হল্যাণ্ডের মত কতকগুলো রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নিজস্ব কর্মচারীর মাধ্যমে কিছু পরিমাণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এ প্রসংগে ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক বা প্রিফেক্টের কথা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত পরিষদও গঠন করা হয়েছে যাদের ক্ষমতা থাকে প্রচুর। প্রুশিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৌশলী বিশারদদের নিয়োগ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু ফরাসী প্রিফেক্ট ব্যবস্থার মত স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কাজে কেন্দ্রের হাতে কোন ব্যবস্থাপনার ভার থাকে না। অপর দিকে, ইংলণ্ড ও সাধারণভাবে এ্যাংলো-স্যাকসন দেশগুলোয় স্থানীয় কাজকর্মের পরিচালনায় কেন্দ্রের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্থানীয় সরকারের শাখাগুলো বিশেষভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং আইনানুমোদিত আওতায় তারা অবাধে কাজ পরিচালনা করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কাজ করে এবং নিজেদের সীমা লঙ্ঘন না করে ততদিন পর্যন্ত তাদের স্ব-শাসন নিশ্চিত থাকে।

এটাও অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সাধারণ প্রশ্নে খুব কম সময় জটিলতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার মাত্রা ও আওতা হয়ে ওঠে বিচার-বিবেচনা ও বোঝাপড়ার এক বিশেষ বস্তু। এ ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ হ'ল ক্ষমতা বন্টন ও ক্ষমতার আওতার প্রশ্ন। যখন মানুষ ক্ষমতার অধিকার বা ন্যায়নিষ্ঠতা নিয়ে না ভেবে প্রাথমিকভাবে কল্যাণমূলক কাজের চিন্তা করে তখন ক্ষমতা বিন্যাসের

www.nagorikpathagar.org

সব চেয়ে বড় বাধা দূর হয়ে যায়, এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্কে সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্য অনেকটা প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য এর ফলে কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধের সমস্যা সমাধান লাভ করে না। এ হ'ল ভয়ঙ্কর এক জটিল সমস্যা, কিন্তু যেহেতু এটা একটা বাস্তব ব্যাপার, তাই অতি সহজে তার গুণাবলীর ভিত্তিতে তার সমাধান আনা যায়। অথচ কর্তৃত্বের আন্তর্জাতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল, এবং মানুষ দুর্জ্ঞেয় দাবীর ভিত্তিতে এতই বিভ্রান্ত যে তারা এ ব্যাপারে তার গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবেচনা করতেও রাজী নয়।

শিল্পের অগ্রগতি তথা শহর এলাকার উন্নয়ন ও যাতায়াত ব্যবস্থার সমৃদ্ধি বৃহৎ সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছে ব'লে স্থানীয় সরকারের সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে যেমনটি ছিল, আজকে স্থানীয় এলাকার চারদিকে কোন বিচ্ছিন্নতার চক্র নেই। নগরী তার অংশ বিশেষকে এবং তার উপর নির্ভরশীল আবাস এলাকাকে পশ্চাদভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে সীমানা তাই শুধু বিনষ্ট হয় নি, অগ্রগতির সাথে সাথে নগরী ও নগরীর মধ্যে সীমারেখাও নিঃশেষ হয়ে পড়েছে।[১] বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন বিভক্তিকরণ প্রয়োজন হয়, এবং সাথে সাথে সমগ্র এলাকায় বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য সাধারণ নিয়ন্ত্রণেরও দরকার রয়েছে। এভাবে উঠেছে আঞ্চলিকতার দাবী যার মাধ্যমে কতকগুলো লক্ষ্য সামনে রেখে সাধারণ এক শাসন ব্যবস্থায় বৃহৎ এলাকাগুলো সম্মিলিত হবে।[২] সাধারণ নীতি অতি সহজে বিধিবদ্ধ করা যায় এবং তা হ'ল—সাধারণ নিয়ন্ত্রণের আওতা হবে জনকল্যাণকর কাজ-কর্মের সার্থক আওতা। কিন্তু আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যেভাবে প্রকৌশলী অগ্রগতি পরিবর্তন সূচিত করছে তাতে তার প্রয়োজন পিছিয়ে পড়ছে।

১। সম্ভবত এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ফরাসী ফ্ল্যাণ্ডার্স এলাকা।

২। কোলের (*Cole*) '*The Future of Local Government*' গ্রন্থ

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দলীয় ব্যবস্থা

এক : দলের বিবর্তন

রাজনৈতিক দল বলতে আমরা সে জনসমষ্টিকে বুঝি যা বিশিষ্ট এক অর্থনীতির ভিত্তিতে একত্রিত ও সংহত হয়েছেন এবং যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়াসী। এরূপ দলীয় সংগঠন ব্যতীত নীতির কোন সুসংহত বক্তব্য, কার্যপদ্ধতির কোন সুশৃঙ্খল বিবর্তন, সংসদীয় নির্বাচনের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়মিত প্রয়োগ সম্ভব হয় না। তাছাড়া, দলীয় সংগঠন ব্যতীত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের যে কোন একটিও কার্যকর হয় না যাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করে বা ক্ষমতা বজায় রাখে। দলীয় সংগঠনের অনুপস্থিতিতে কুচক্রীদল বা উপদল গড়ে উঠতে পারে, সরকারের নিকট আবেদন ও দরখাস্ত পেশ হ'তে পারে, বা দলীয় নিয়ন্ত্রণের পূর্ব আমলে যেমনটি ছিল তেমনি সংঘ বা জনগণের চুক্তি, কর্মসূচী বা প্রতিবাদ সংগঠিত হ'তে পারে, কিন্তু সরকারকে সমর্থন দান বা তার উপর প্রভাব বিস্তার ছাড়াও একটা রাজনৈতিক দলের করণীয় আরও একটু বেশী। রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে চায়। সুতরাং একদিকে এর অর্থ হ'ল একধরনের সংসদীয় ব্যবস্থা, ও অন্যদিকে, এক সর্বজন স্বীকৃত নির্বাচকমণ্ডলী যা তাদের ভোটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে আইন পরিষদের জন্ম দান করে। দলের প্রাথমিক কাজ হ'ল নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করা এবং নির্বাচকমণ্ডলী সরকার নির্ধারণ করে।

দলীয় ব্যবস্থার শর্ত হ'ল নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা, এবং যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি ততদিন পর্যন্ত দলীয় ব্যবস্থার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। যখন সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন সংসদ ও রাজার ক্ষমতার মধ্যে সীমিত ছিল—তখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—কে শাসন করবে? কিন্তু দলীয় ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে, কোন্ নীতি অনুসরণ করবার জন্য সরকার গঠন করা হবে? সংসদ নীতি নির্ধারণ করলে রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্নে সেখানে দলীয় ভাব সৃষ্টি হয়। দেশে দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে সংসদে তার জন্ম হয়। সংসদের সংখ্যাগুরু দল ঐশ্বরিক অধিকার ভিত্তিতে শাসন করতে পারে না, তাদের সে শাসন জনমতের দ্বারা সমর্থিত হতে হয়। সংঘবদ্ধভাবে জনমত প্রকাশিত হয় এবং এভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে দল গড়ে ওঠে।

প্রথম দৃষ্টিতে দলীয় ব্যবস্থার বিলম্বিত বিকাশকে একটু অদ্ভুত মনে হয়। বহু দিন পর্যন্ত দল প্রাথমিক পর্যায়েই থেকে যায় এবং অতীতের সংঘগুলোর মত তা রয়ে যায় সংবিধান-বহির্ভূত। সাধারণ-ভাবে সেগুলোকে মনে করা হত কুচক্রীদল বা বিভক্তকারী প্রতিষ্ঠান-রূপে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্যের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীরূপে। আমেরিকার সংবিধানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে এক যৌথ ব্যবস্থার প্রবর্তনই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। ম্যাডিসনও এ সাধারণ মতবাদে বিশ্বাস করতেন যে দলীয় প্রভাব ক্ষতিকর।[১] তাছাড়া, দলীয় সংগঠন যে গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যকারিতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এ কথা কেহ মনে করতেন না। ব্লুণ্টস্‌লি তাঁর ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'Theory of the State' গ্রন্থেও দলীয় সরকারের কোন আভাষ দেন নি। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় যখন মন্ত্রিপরিষদ ও গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিত এবং জন-গণের প্রতি আবেদনের ভেতর দিয়ে যখন তার মীমাংসা হত যার ফলে মন্ত্রিপরিষদ পদচ্যুত হতে বাধ্য হত (১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের পীল কেবিনেটের পতন এ ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত), বা যখন কোন অপ্রিয় সরকার পদত্যাগ করাই শ্রেয় জ্ঞান করত তখন থেকে দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং রাজনৈতিক দল নতুন পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'বার্মিংহাম দলের' মত, দলীয় সংগঠন এভাবে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

একমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সার্বভৌম সুস্পষ্টভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটা অবশ্য বলা যেতে পারে যে গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক শাসনামলে দলীয় ব্যবস্থা ব্যতীত

১। মরোর (*Morrow*) ভূমিকা—মূল গ্রন্থকার মর্স (*Morse*) গ্রন্থটি *'Parties aud Party Leader.'* পৃষ্ঠা—২৯।

www.nagorikpathagar.org

সরকার ছিল নির্বাচিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। নগর-রাষ্ট্রেই দলীয় ব্যবস্থার সূচনা লক্ষ্য করা যায়। পেরিক্লিসের এথেন্সে ও গ্র্যাকচাই-এর রোমে দলীয় ব্যবস্থা অঙ্কুরিত হয়। যাহোক, তার সমর্থক অগ্রগতি এবং সরকারের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয় আংশিকভাবে সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার বিকাশের অভাবে এবং আংশিকভাবে নাগরিকত্বের সীমাবদ্ধতার জন্য। শুধুমাত্র গণতন্ত্রেই দলীয় ব্যবস্থা সার্থকতা লাভ করে। অন্যথায় নির্বাচনের অধিকার যা হ'ল একটা সুরক্ষিত সুযোগ, দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কুচক্রের পুরস্কারে রূপ নেয় এবং তখন তা আর কোন সুশৃঙ্খল আবেদনের ফলশ্রুতি থাকে না। প্রাচীন গণতন্ত্র তখনও ছিল আকারে প্রকারে শ্রেণী রাষ্ট্র। সুতরাং দলীয় বিজয়ের মাধ্যমে না হয়ে বরং বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের চূড়ান্ত পরিবর্তন সাধিত হয়। থুসিডাইডিসের তৃতীয় গ্রন্থের বিরাশী অধ্যায়ে শ্রেণী রাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভয়ঙ্কর চিত্র পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নতা ছাড়া অন্য কোন পন্থায় সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এর আরও প্রমাণ পাওয়া যায় রোমের ঘটনাপ্রবাহে। সেখানে গ্র্যাকচাই-এর আমল থেকে শুরু করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত যে ঘটনাচক্র আমরা লক্ষ্য করি তা এ সত্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।

বিবদমান মধ্যযুগীয় নগরীগুলো রাজনৈতিক নীতির ভিত্তিতেই বিভক্ত ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু গোয়েল্‌ফ্‌ ও গিবেলাইনদের মধ্যে যে সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ছিল নিছক দলীয় সংঘর্ষ। শাসনতান্ত্রিক আবেদনের অভাবে প্রকৃত রাজনৈতিক মত পার্থক্যে যে সব প্রশ্ন দেখা দিত তা দলীয় কোন্দলে অর্থহীন হয়ে পড়ত। এসব সংঘর্ষ এতই অর্থহীন ছিল যে কখনও কখনও ঐতিহাসিকরা কোন্‌টা কোন নীতির উপর সংঘটিত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে হিমসিম খেয়ে যান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডাচদের 'হুক্‌স্‌' ও 'কডফিসের' সংঘর্ষের কথা বলা যেতে পারে।

আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রাসাদ চক্রান্ত বা বিপ্লব প্রভৃতি হচ্ছে শুধুমাত্র পন্থা যাদের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। দলীয় ব্যবস্থার অভাবে ক্ষমতাসীন সরকার শুধুমাত্র প্রথা বা চিরাচরিত রীতিনীতির চাপে নিয়ন্ত্রিত হয়, যদিও কোন সংকটকালে প্রথাই সবচেয়ে দুর্বল হয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে, অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায় যা স্বৈরাচারিতার উচ্ছাভিলাসে অতি সহজে সংযত হয়ে পড়ে। তাছাড়াও, দলীয় ব্যবস্থার অভাবে ক্ষমতাহীন সরকার প্রজাদের ভীতি ও সংশয়কেও দূর করতে সক্ষম হয় না, যদিও নিজেদের সুবিধা দস্তুর মত আদায় হয়। বিপ্লবের ভয়েও সরকার সঠিক পথ অবলম্বনে প্রয়াসী হয়।

দলীয় ব্যবস্থার অভাবে রাষ্ট্রের কোন স্থিতিস্থাপকতা নেই এবং নেই কোন সঠিক আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা। এর অভাবে সরকার হয়ে ওঠে অনমনীয় এবং অনুভূতিহীন। সরকার তখন সেবার মনোভাব ত্যাগ করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী আধিপত্যের রুদ্ধদ্বার ব্যবস্থা বা বিভিন্ন উপদলের যুদ্ধক্ষেত্র। দলীয় ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে রয়েছে এ ধারণা যে মানুষ এক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। মানুষ সরকারের ভিত্তি হিসেবে নীতিকে ক্ষমতা থেকে অনেক শ্রেয় জ্ঞান করে এবং শক্তি প্রয়োগ থেকে আলোচনা বা সমালোচনাকে অনেক বাঞ্ছনীয় মনে করে। তারা মতবাদের দ্বন্দ্বকে অস্ত্রের ঝনঝনা থেকে অনেক বেশী সৃজনধর্মী মনে করে। শক্তি প্রয়োগকারী ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক যে রাষ্ট্র তা ও আবেদনের জোরে হস্তান্তরিত হয়। এটাই হ'ল দলীয় ব্যবস্থার বিরাট বিজয়, এবং দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির ফলেও তার গুণাগুণ ঢাকা পড়ে না।

শ্রেণী রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবার ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থা যথেষ্ট সাহায্য করে। আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এক পর্যায়ে ছিল শ্রেণী রাষ্ট্র এবং তা প্রভাবশালী শ্রেণীগুলোর স্বার্থে তাদের দ্বারা পরিচালিত হত। দেশের অন্য লোকজন ছিল তাদের অধীন। জনসাধারণ ও শ্রেণীগুলোর মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজক শ্রেণী ছিল এদের অন্তর্ভুক্ত। অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের মূল ছিল দু'টি—একটি তাদের ভূমির মালিকানা এবং অন্যটি ছিল যুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব। তাছাড়া, বংশমর্যাদা ও পদমর্যাদা তাদের আরও গৌরবজনক করে তুলেছিল। যাজকদের কর্তৃত্ব কিন্তু ভিন্ন ধরনের মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে মর্যাদা ছিল সংস্কৃতির মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব। সাধারণ জনগণের অজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। এমনি পরিস্থিতিতে সরকার জনমতের পরিবর্তনশীল সাম্যাবস্থায় সৃষ্টও হয়নি এবং পরিচালিতও হ'ত না। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সাধারণ জনতার কোন হাত ছিল না। শাসক শ্রেণী চিরকাল ধরে শাসন করে

www.nagorikpathagar.org

এসেছেন, কারণ তারা নির্ভর করেছেন ঐতিহ্যের উপর, জনমতের উপর নয়। এদিক দিয়ে শ্রেণী শাসন ছিল দলীয় শাসনের ঠিক উল্টো। দলীয় শাসনের ফলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে এবং প্রত্যেক দল পরবর্তী কালে সুযোগ লাভ করে, কিন্তু শ্রেণী শাসনের অর্থ হ'ল নিছক অনমনীয়তা, এবং তার ভিত্তি ছিল অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এসব দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে দল তার জয়যাত্রা শুরু করে। যে সব সামাজিক পরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীগুলোর মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয় তাদেরই মধ্যে নিহিত রয়েছে দলের উৎস। যে সব প্রভাবে সমাজের বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে এবং প্রধানতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রভাবে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, নগরীর জন্ম হয়েছে, তাদেরই মূলে রাজনৈতিক দলের জন্ম কাহিনী নিহিত। যখন এসব প্রভাব থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা শাসকশ্রেণীর মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখনই রাজনৈতিক দল গঠনের শুভ মুহূর্তের সূচনা হয়। স্বাভাবিক ভাবে মৌলিক দল হ'ল মর্যাদা ও শ্রেণীর বিরুদ্ধে সুসংহত প্রতিবাদ স্বরূপ। মধ্যবিত্ত বণিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই এ দল প্রথমে সংগঠিত হয়। তবে পুরোনো ব্যবস্থা ধ্বসে পড়লে দল নতুন আকারে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কালক্রমে তাই প্রোটেস্ট্যান্টদের নাগরিকত্বের অধিকার দান করে। দলীয় ব্যবস্থার অর্থ হ'ল অধিকারের পারস্পরিক স্বীকৃতি, কিন্তু শ্রেণী ব্যবস্থা অধিকারের স্বীকৃতি দানকে ঘৃণা করেছে, এবং যখন স্বীকার করেছে তখন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে তা করতে বাধ্য হয়েছে। অবহেলিতদের প্রথমে ভোটাধিকার দিতে হয়েছে এবং তারপর তারা দল গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যখন এ পর্যায় উপস্থিত হয়েছে তখন শাসক শ্রেণীও রাজনৈতিক দলের আকারে নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছে। এ প্রবণতা শাসক শ্রেণীর সহজাত প্রবৃত্তি বিরোধী, কেননা দল যখন আবেদন করে তখন সে ঐতিহ্যের নামে কোন আবেদন না করে আবেদন পেশ করে নীতির নামে এবং এ আবেদন পেশ করে জনসাধারণের কাছে, আর প্রয়োগ করে প্রচার যন্ত্র, ব্যবহার করে নীতিমালা। শাসক শ্রেণীর শাসন সুবিধার শেষ হ'ল। এখন থেকে ঘটনা প্রবাহ ও নীতির উপর তাদের উত্থান পতন নির্ভরশীল হ'ল।

সুতরাং প্রথমে যদিও শ্রেণীর মুখোমুখি রাজনৈতিক দল সংহত হয়েছিল, এখন কিন্তু ব্যবস্থাপনার যুক্তিতে তাদের নতুন অবস্থার মোকাবেলা করতে

www.nagorikpathagar.org

হ'ল। জনসাধারণের নিকট আবেদনে শ্রেণী স্বার্থের দাবী অস্পষ্ট হয়ে পড়ল। তাছাড়াও, নতুন পরিস্থিতিতে পুরোনো শ্রেণী ব্যবস্থার মনস্তাত্বিক ও অর্থনৈতিক সংহতি ও ভেঙ্গে পড়ল। দলীয় সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করল।

প্রথমে বাণিজ্যিক ও নগর জীবনের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবীতে যে দল গঠিত হয়েছিল তার বিরোধী দল হিসেবে দেখা দিল ভূমি স্বার্থ সংরক্ষণ মূলক দল। ইংলণ্ডের 'হুইগ' ও 'টোরী' দল এ দু'টি বিরোধী স্বার্থের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলের ভদ্রলোক ও তাদের সমর্থকদের নিয়ে গঠিত হ'ল টোরী দল, এবং হুইগ দলে রইলেন ঐসব বিত্তশালী ব্যক্তি, নতুন পুঁজিপতি ও তাদের সহকর্মীবৃন্দ। তাদের পুরোভাগে রইলেন কতকগুলো নতুন অভিজাত পরিবার যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে বা সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতা ও প্রতি-পত্তি লাভ করেছেন। সমগ্র ইউরোপে কালক্রমে অনুরূপ অগ্রগতি ঘটনা ভূমিস্বার্থের প্রতিনিধিরা রক্ষণশীল দলে থেকে গণতন্ত্রায়নের গতি প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হ'লেন, কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে উদার-নৈতিক দল যা মূলত ছিল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল গণতন্ত্রের বিকাশের আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাইল। সাধারণ ভাবে রক্ষণশীল দল পর্যুদস্ত এক কর্মসূচী সমর্থন করে বসল, এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্রোত এত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল যে উদার-নৈতিক দল আর তাল রেখে চলতে পারছিল না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে চার্টিস্টদের মত সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তা বা প্রগতিশীল দলগুলোর সাংবিধানিক দাবীর বেশীর ভাগই মেনে নেয়া হ'ল। কিন্তু প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেকটি বিজয় বা পরাজয়ের পর বিরোধী দলগুলো নতুন নতুন কায়দা অবলম্বন করেছে। কোন দলই তার অতীতকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। সব সময়ই তাকে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে বা পুরোনো সূচীর পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে। তাদের মৌলিক নীতিকে এমন করে ঢেলে নিতে হয়েছে যেন জনমতের বর্তমান অবস্থায় তাদের আবেদন কার্যকর হয়। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় দলই বিভিন্ন পর্যায়ে সমানভাবে তাদের আবেদনকে আকর্ষণীয় করবার জন্য নতুন নতুন পথ খুঁজে বার করেছে এবং কর্মসূচীর পুনর্গঠন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় শ্রেণী ও দলের পুরোনো পরিচয় ক্রমে ক্রমে মুছে যেতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

যখন কোন প্রভাবশালী শ্রেণী তাদের আসন অধিকার হারিয়ে ফেলে তখন তার সংহতি আর বজায় থাকে না। তখন সে নতুন করে গড়ে ওঠা কোন শ্রেণীর সাথে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নতুন সম্পদের সুযোগে অংশ গ্রহণ করতে চায়। যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়েছিল বা তুলনামূলক ভাবে কমে গিয়েছিল তখন সামন্তবাদী শাসক শ্রেণীও তাই করেছিল। শাসনের অধিকার ছাড়া একটা শ্রেণীর যা থাকে তা হচ্ছে অনিশ্চিত এক ঐক্যবোধ' নতুন সম্পদের বিরুদ্ধে প্রাচীন মর্যাদা বেশীদিন টেকে না। বর্তমান সভ্যতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদে প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে শ্রেণী স্বাতন্ত্র্য। সামাজিক সংঘগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য আয় ও পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি আমরা 'জীবন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের' মত বাহ্যিক প্রমাণ খুঁজতে চাই বা প্রথা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হই তবে কোন দেশের জনসংখ্যার শ্রেণী বিভাগ প্রধানতঃ সম্পদের ভিত্তিতেই করতে হবে।[১]

অতীতের বংশ ও মর্যাদা ভিত্তিক শ্রেণীগুলোর তুলনায় এ ধরণের আয় ভিত্তিক শ্রেণীগুলোর ঐক্যবোধ অনেকবেশী গতিশীল এবং পরিবর্তনীয়। এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী তেমন কোন সুদৃঢ় ব্যবধান বন্ধন নেই, এবং এদের নেই কোন মর্যাদার প্রতীক বা প্রতিষ্ঠিত কোন জীবন ব্যবস্থা। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সরকার কোন রকম নামমাত্র মর্যাদার সোপারেশ করে নি, কেননা তাতে বিশিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সাধারণ অনুভূতি ছিল তা আহত হতে পারত। আয় ভিত্তিক শ্রেণীগুলোর একটি অন্যটির সাথে স্থান পরিবর্তন করতে পারে, এবং তাদের মধ্যে বিশেষ কোন স্বার্থ সংহতি নেই। কার্ল মার্কস্ মধ্য যুগীয় মতবাদের মানদণ্ডে তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে আধুনিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শ্রেণী অনুভূতি ও শ্রেণী স্বার্থকে অনেক বাড়িয়ে বলেছেন এবং আধুনিক সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সংঘাত তার বৈশিষ্ট্যকে আরও বেশী করে তুলে ধরেছেন। প্রথমত বলতে হয় যে, এর ফলে সমাজ দ্বি-খণ্ডিত হয় না। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রকৌশলী গোষ্ঠি, সরকারী কর্মচারী, কুশলী কর্মী, ছোট খাট ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সহযোগে গঠিত মধ্যবিত্ত অবস্থাকে

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিবাহের উর্বরতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দেখতে হবে —রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড (ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের আদমশুমারী, ১৯১১)।

www.nagorikpathagar.org

সে ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে ব্যাখ্যায় পুঁজিপতিদের স্বার্থকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু আসলে পুঁজিপতিদের মধ্যেও রয়েছে স্বার্থের সংঘাত. এবং শ্রমিকদের মধ্যেও আছে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিলাস সামগ্রীর উপর আমরা কি করের বোঝা চাপিয়ে দেব? করের বোঝা বাড়িয়ে দিলে এসব সামগ্রীর প্রস্তুত কারক মজুররা যেমন তার প্রতিবাদ করে, তেমনি করে তাদের উপভোগকারীরা। বিদেশ থেকে আমরা কি অবাধে শ্রমিক আমদানী করব? তা হ'লে স্থানীয় কর্মীরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠবে। কর্মীদের জন্য দ্রব্য মূল্য কমিয়ে দেবার জন্য কি শুল্ক হার কমিয়ে দেব? নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনকারী হিসেবে তারা তা'হলে পুঁজিপতি উৎপাদকদের সাথে মিলিত হবে। শুধুমাত্র দাসত্বের পর্যায়ে একদলের সাধারণ স্বার্থ অন্যদলের সাধারণ স্বার্থের বিরোধী হতে পারে। কিন্তু যখনই কোন ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয় তখনই সে সংহতি ভেঙ্গে পড়ে। দেশীয় উৎপাদনকারীর স্বার্থ আমদানীকারীর স্বার্থের সাথে অনেক সময়ই সংগতিপূর্ণ হয় না। ভূমি কৃষকের স্বার্থ শিল্প-শ্রমিকের স্বার্থের সাথে এক নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র এ দু'য়ের সম্বন্ধে দল গঠনের যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা তা ও এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। অপর পক্ষে, মুনাফা ও মজুরীর মধ্যে যে বিরোধিতা তাও সীমিত এবং উভয়ই এক সাধারণ স্বার্থে আবদ্ধ। অগ্রগতির আমলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়েই লাভবান হয়, কিন্তু সংকটকালে তারা সকলেই দুঃখভোগ করে।[১] এসব বিচার বিবেচনায় আমরা বুঝতে পারি কিভাবে রাজনৈতিক দল শ্রেণী স্বার্থ থেকে উদ্ভূত হলেও জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে বিকাশ লাভ করে।

দলীয় ব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশ সংবাদ আদান-প্রদানের ঐসব সংস্থার অগ্রগতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেগুলোর মাধ্যমে দেশের সব শ্রেণী ও অংশ জনমতের ওঠানামা ও ঘটনা প্রবাহের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এ সব সংস্থার মধ্যে প্রেস বা পত্র-পত্রিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রেস শুধুমাত্র সংবাদের বাহন মাত্র নয়, এ হচ্ছে প্রচারের বিশিষ্ট এক শাখা, এবং এর মাধ্যমে জনমত যেমন প্রভাবিত হয় তেমনি জনমতের প্রকাশও ঘটে। প্রেস শুধুমাত্র খবরাখবরের মাধ্যমই নয়,

১। লেইটনের (*Layton*) '*Introduction to the Study of Prices*' গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে তা হচ্ছে কুসংস্কারের এক বিরাট প্রতিভূ এবং তার কার্যকর প্রয়োগের এক যন্ত্রও বটে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তা দলের সাথে একাত্মতা স্থাপন করে। তার প্রভাব বিস্তারের পদ্ধতি এত শক্তিশালী ও এত ব্যাপক যে নির্বাচন, দমন এবং সোপারেশের মাধ্যমে সে যে নীতি সমর্থন করে তার সমর্থনে বিরাট এক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার ক্ষমতাও সীমিত। প্রেস দলের আওতা ভয়ঙ্কররূপে বাড়িয়ে তোলে এবং তার কার্যক্রমকে মর্যাদা দান করে, কিন্তু সাধারণভাবে সে তার নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয় না। বৃটেনের র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সরকারের মত সরকার অধিকাংশ পত্রপত্রিকার বিরূপ প্রচারণা সত্ত্বেও নির্বাচিত হয়েছে। কোন দল নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র একই সুরে কথা বলে। তাই তার স্বতঃউৎসারিত বক্তব্যকে তেমন গ্রাহ্য করা হয় না। বিরোধী স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক বিরুদ্ধ মতবাদী পত্রিকার জন্ম হয় এবং তা তেমনি শক্তিশালীভাবে বিরোধী পক্ষের মতামত প্রকাশ করে। সব থেকে বড় কথা হ'ল—যে পরিমাণে বিক্রী হয় বা বিতরিত হয় তার উপরই পত্রিকার শক্তি নির্ভর করে এবং তার আর্থিক সফলতা নির্ভর করে তার জনপ্রিয়তার উপর। এটা সত্যি যে কোন পত্রিকার আবেদন অনেকাংশে নির্ভর করে সেসব ক্রিয়া কলাপ ও পদ্ধতির উপর যা তার সমর্থিত বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কিন্তু পাঠকরা আপত্তি করে এমন দৃষ্টিভংগী যদি কোন পত্রিকা গ্রহণ করে তা'হলে তার দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসে। লর্ড কিচেনারের বিরুদ্ধে দৈনিক মেইল পত্রিকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে তার ফলাফল বোঝা যায়। কোন পত্রিকা তা সত্ত্বেও যদি তার দৃষ্টিভংগীর কোনরূপ পরিবর্তন না আনে তবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। একবার সে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললে বাইরের কোন আর্থিক সমর্থন তা পূরণ করতে পারে না। মাঝে মাঝে কোন শক্তিশালী পত্রিকাসংঘ সরকার ও বিরোধী পক্ষের নীতির সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু তাদের মতের প্রতি দেশে এক শক্তিশালী সমর্থন থাকলেই তারা একাজে প্রবৃত্ত হয়। বৃটেনের রদারমোর প্রেস তাদের রুঢ় (Ruhr) নীতির জন্য জর্জ ও বল্ডুইনের উভয় দলকে আক্রমণ করে। অবশ্য তাদের সকল প্রভাব সত্ত্বেও পত্রপত্রিকা পাঠকের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রেসদলের নীতিকে দেশের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়, এবং এভাবে তাকে

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যাপক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সাহায্য করে। এ ছাড়া, পত্র-পত্রিকা জনমতের প্রচলিত ধারাকে আরও জাগ্রত ও বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে। দলীয় ব্যবস্থার বিবর্তনে এগুলোই হ'ল পত্র-পত্রিকার সঠিক অবদান।

দুই : দলীয় ব্যবস্থার বিন্যাস

আমরা এখন দেখাব—বিশেষ পরিস্থিতিতে দলের নৈতিক অধঃপতন বাদ দিলে রাজনৈতিক দলগুলো এক সরল শ্রেণীর বিন্যস্ত—তা দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই হোক আর বহুদলীয় ব্যবস্থাই হোক। এতে দলের পুরোপুরি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ যেন বৃহৎ বিকল্পের রাজনৈতিকরূপ, এবং মানুষের কাজে কর্মে সর্বত্র তাই ঘটে এসেছে। একজন ঘরে বসে থাকতে চায় কিন্তু অন্যজন আবিষ্কারের নেশায় পাগল। একজন চায় নিরাপত্তা কিন্তু অন্যজন দুঃসাহসী কোন অভিযানে জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চায়। একজন অতীতে বিচরণ করে, কিন্তু আর একজন ভবিষ্যতে স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় সুখী কিন্তু আর একজন সে ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে আগ্রহী। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দু'টি দৃষ্টিভংগী সুপ্ত রয়েছে, কিন্তু জীববিজ্ঞানীর ভাষায় —তাদের একটি হয়ে ওঠে প্রবল, এবং অপরটি থাকে চাপা। পরিস্থিতি ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর সব কিছুই নির্ভর করে। সম্পদ, জন্ম এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা স্পষ্টতঃ রক্ষণশীলতার জন্ম দেয় এবং দারিদ্র্য ও সুযোগের অভাব অন্যদিকে প্রেরণা যোগায়। শ্রেষ্ঠত্ববোধ মানুষকে রক্ষণশীল করে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনা মানুষকে প্রগতির পথে ঠেলে দেয়। রক্ষণশীল ব্যক্তি কুলগৌরব ও জাতীয় ঐক্যের সৌধ রচনা করে। সে পূর্ব দৃষ্টান্তের ধীর স্থির বিবর্তন এবং কালের প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী। সে অনুভব করে যে প্রকৃতি বা মানব ইতিহাস লাফে লাফে এগিয়ে চলে না। কিন্তু প্রগতিবাদী সময়ের ব্যাপারে অধৈর্য। সে বর্তমানে ইতিহাসের গতিকে সচল দেখতে চায়। তার কাছে মহান ঐক্য হ'ল মানবতা, তার জাতি নয়। পরিবেশের ক্ষমতা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে তার পরিবর্তন চায়। কোন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একবার হয়ে গেলে তার চরমতাকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রগতিবাদী সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচক, কিন্তু রক্ষণশীল সামাজিক মতবাদের সমালোচনা করে।[১]

এমনি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভংগীর উপর দল নির্ভরশীল। কিন্তু হাজারো রকমের এমনি পরিস্থিতিতে মানুষ যে কোন এক পথ বেছে নিয়েছে। কার্যকরী বুদ্ধি ও সাহসিকতা তাকে একদিকে পরিচালিত করে, কিন্তু সুপ্ত ও ভীত মনোবৃত্তি তাকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। তবে তীব্র হতাশা যে কাউকে যেকোন দিকে ঠেলে দিতে পারে। যৌবনকাল থেকে মানুষ বৃদ্ধ বয়সে অনেক বেশী রক্ষণশীল হয়ে থাকে। আত্মস্বার্থ ও অহঙ্কার ভাগ্যবানদের একদিকে নিয়ে যায় এবং ভাগ্যহীনদের অন্যপথে ঠেলে দেয়। প্রগতিবাদী তার প্রগতির পথে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও রক্ষণশীলও তার মতবাদের আওতায় উদার পন্থী হয়ে যায়। যে কোন দলের কর্মসূচীর ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে এবং এতেও অনেক উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অনেকের মধ্যে বিরোধিতার প্রবণতা এতই প্রবল যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি বা দুর্ভাগ্য বা ক্ষমতাসীন দলের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার মানসিকতার জন্য অনেক সরকারী দলে ভিড়ে যায়। তাদের জন্য দলীয় সরকার ভয়ঙ্কর ভাবে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে এবং জাতির জন্য তা শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে।

কতকগুলো ভয়ঙ্কর প্রবণতা রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে এক একটা দলের বিশেষ সৃজনশীলতা তার কর্মক্ষেত্র রচনা করে। রক্ষণশীল দল বরাবরই বিশেষ সুযোগ সুবিধার ধারক ও বাহক হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে এবং আজও তা সম্পদশালীদের দল বলেই পরিগণিত। এ দল নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব তেমন আগ্রহের সাথে অনুধাবন করে না এবং ক্ষমতা সম্পর্কে একবার নিরাপত্তা বোধ লাভ করলে তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ফলে সময়ের গতি প্রকৃতির ফলে যে নতুন নতুন দাবী দাওয়া ওঠে তাকে এ দল নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়। ১৬৯৩ ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন সংস্কার আইনের প্রত্যাখ্যানে ইংলণ্ডের টোরি দলের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গণতন্ত্র প্রসার লাভ করার সাথে সাথে

১। কেন্টের (*Kent*) *'The English Radicals'* এবং ফিলিং-এর (*Feiling*) *'History of the Tory Party, 1640—1714'* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এগ্রন্থ নিচয়ে এসব পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রগতিবাদী সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচক, কিন্তু রক্ষণশীল সামাজিক মতবাদের সমলোচনা করে।[১]

এমনি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভংগীর উপর দল নির্ভরশীল। কিন্তু হাজারো রকমের এমনি পরিস্থিতিতে মানুষ যে কোন এক পথ বেছে নিয়েছে। কার্যকরী বুদ্ধি ও সাহসিকতা তাকে একদিকে পরিচালিত করে, কিন্তু সুপ্ত ও ভীত মনোবৃত্তি তাকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। তবে তীব্র হতাশা যে কাউকে যেকোন দিকে ঠেলে দিতে পারে। যৌবনকাল থেকে মানুষ বৃদ্ধ বয়সে অনেক বেশী রক্ষণশীল হয়ে থাকে। আত্মস্বার্থ ও অহঙ্কার ভাগ্যবানদের একদিকে নিয়ে যায় এবং ভাগ্যহীনদের অন্যপথে ঠেলে দেয়। প্রগতিবাদী তার প্রগতির পথে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও রক্ষণশীলও তার মতবাদের আওতায় উদার পন্থী হয়ে যায়। যে কোন দলের কর্মসূচীর ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে এবং এতেও অনেক উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অনেকের মধ্যে বিরোধিতার প্রবণতা এতই প্রবল যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি বা দুর্ভাগ্য বা ক্ষমতাসীন দলের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার মানসিকতার জন্য অনেক সরকারী দলে ভিড়ে যায়। তাদের জন্য দলীয় সরকার ভয়ঙ্কর ভাবে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে এবং জাতির জন্য তা শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে।

কতকগুলো ভয়ঙ্কর প্রবণতা রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে এক একটা দলের বিশেষ সৃজনশীলতা তার কর্মক্ষেত্র রচনা করে। রক্ষণশীল দল বরাবরই বিশেষ সুযোগ সুবিধার ধারক ও বাহক হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে এবং আজও তা সম্পদশালীদের দল বলেই পরিগণিত। এ দল নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব তেমন আগ্রহের সাথে অনুধাবন করে না এবং ক্ষমতা সম্পর্কে একবার নিরাপত্তা বোধ লাভ করলে তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ফলে সময়ের গতি প্রকৃতির ফলে যে নতুন নতুন দাবী দাওয়া ওঠে তাকে এ দল নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়। ১৬৯৩ ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন সংস্কার আইনের প্রত্যাখ্যানে ইংলণ্ডের টোরি দলের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গণতন্ত্র প্রসার লাভ করার সাথে সাথে

১। কেণ্টের (*Kent*) *'The English Radicals'* এবং ফিলিং-এর (*Feiling*) *'History of the Tory Party, 1640—1714'* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এগ্রন্থ নিচয়ে এসব পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যমপন্থী বলে যা পরিচিত তার অর্থই হ'ল তাই। কোন গভীর ও স্থায়ী প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভংগী ও নীতির প্রকাশ ঘটে দলের পরিচায়ক এসব শব্দে।

ভৌগলিক ও জাতীয়তাবাদী দলগুলো এ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা সঠিক কোন সরল রেখায় বিন্যস্ত হয় না। কোন নীতির প্রশ্নে সামগ্রিকভাবে নাগরিকদের নিকট তাদের আবেদন থাকে না। তারা অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। ঐসব দলের কাছে প্রশ্ন থাকে—'কে রাষ্ট্রকে শাসন করবে'? 'কি ভাবে রাষ্ট্র শাসিত হবে?' এ প্রশ্নে তারা মাথা ঘামায় না। পর্যায়ক্রমিক সরকার গঠনের ব্যবস্থা এসব দলে সম্ভব হয় না। একদিকে থেকে অন্য দিকে শক্তিবৃদ্ধি হবার কোন সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে থাকে না। প্রত্যেক দলই থাকে কঠিন ও অনমনীয় এক শক্তিকেন্দ্র। যুদ্ধপূর্ব হাঙ্গেরীতে যেমন ম্যাগিয়ার দল আধিপত্য লাভ করেছিল তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে কার্যতঃ সে দলই একচেটিয়া ভাবে সরকার পরিচালনা করে। সেখানে অন্য কোন বিরোধী দল গড়ে ওঠে না যে দল সরকারীদলের ক্রটি বিচ্যুতি ও ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে সে দলে ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হয়। এ পরিস্থিতিতে দলীয় ব্যবস্থা থাকলেও তাকে সঠিক ব্যবস্থা বলা চলে না, এবং তাতে রাষ্ট্রে এক বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা সূচিত হয়। শ্রেণী পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলও তেমনি বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা বহন করে, এবং দলীয় ব্যবস্থার সাথে তাও সামঞ্জস্য-হীন। যথাযথরূপে কাজ করতে হ'লে প্রত্যেক দলকে জাতীয় আবেদন সৃষ্টি করতে হবে এবং তার বিঘোষিত নীতি অনুসারে জনকল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—সে গভীর ও স্থায়ী প্রশ্নটি কি যাকে কেন্দ্র করে দল তার নীতি নির্ধারণ করবে? হিউম তাঁর 'রচনাবলীতে' তিন ধরনের দলের কথা বলেছেন, যেমন স্বার্থ থেকে উদ্ভূত দল, নীতিভিত্তিক দল এবং স্নেহ থেকে উৎসরিত দল। তিনি আরও বলেছেন যে নীতি ভিত্তিক দল শুধুমাত্র আধুনিক কালেই গড়ে উঠতে পারে, এবং সম্ভবতঃ তা হ'ল অসাধারণ ও অনুমেয় এক সংস্থা যা সমগ্র মানবীয় ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে।[১] কিন্তু স্নেহ হ'ল তার উপলক্ষ থেকেও ক্ষণস্থায়ী। স্বার্থের প্রতি জনগণের আকর্ষণ রয়েছে এবং সর্বদা তা নীতির ছদ্মবেশ ধারণ

১। রচনা নং—৮

www.nagorikpathagar.org

করতে পারে। সাধারণভাবে সকল দলই নীতি ভিত্তিক। এ নীতি একদিকে যেমন দলের মধ্যে সংহতি আনে, তেমনি অন্য একদিকে অন্য দল থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। যে সব সাধারণ নামে দল পরিচিত তাদের মধ্যেই রয়েছে দলের মৌলিক নীতি, যেমন 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'রক্ষণশীল', 'উদারনৈতিক', 'সংস্কার বাদী', 'প্রগতিবাদী' এবং 'চরম পন্থী'। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে মূলতঃ একদল আর একদল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। দক্ষিণপন্থী দলগুলো প্রচলিত ব্যবস্থাকে চালু বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সংঘটিত হ'লে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চায়। তারা অতীতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্তমানের আলোকে খাপ খাওয়াতে চায়, এবং তাদের পূর্বসূরীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পরিবর্তনটুকু ছাড়া যতটুকু সম্ভব কম পরিবর্তন করা যায় তাই তারা করতে চায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি বামপন্থী দলগুলোর তেমন কোন শ্রদ্ধা নেই। তারা বিনা দ্বিধায় তাদের সংস্কার করতে বা পরিবর্ধন করতে প্রস্তুত এবং চরম পন্থী দলগুলো তাদের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করে থাকে।

কিন্তু যদিও এরূপ মানসিকতা দল বিন্যাসের সার্বজনীন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তথাপি সকল প্রশ্নে সব সময় মানুষের একই দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটেনা। গ্ল্যাডস্টোনের মত কোন কোন লোক ধর্মীয় ব্যাপারে রক্ষণশীল হয়েও সাংবিধানিক বিষয়ে হন উদারনৈতিক, অথবা স্পেন্সারের মত কেহ কেহ সাধারণ দৃষ্টিভংগীতে প্রগতিবাদী হয়েও অর্থনীতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। এমনও হতে পারে যে কোন ব্যক্তি অবাধ বাণিজ্য বা সংরক্ষণ নীতিতে কোন দলের সাথে ঐক্যমত হ'লেও সে দলের সাথে তার মানসিকতার কোন ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেক যুগে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয় এবং সে সমস্যাবলী সে যুগের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় মত পার্থক্যের যুগে রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক হবে এরই ভিত্তিতে দল গঠিত হত। গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির যুগে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দল গড়ে ওঠে। আসলে এ যুগ থেকেই আধুনিক দলগুলো উদ্ভূত হয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যে সময়ে ভূমি-স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করেছিল তখন রাজনৈতিক ক্ষমতার জ্যোতিকেন্দ্র নিজকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার

www.nagorikpathagar.org

জ্যোতিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছে। ফলে শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলীই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজা সমর্থক টোরি-দল ও রাজার বিরোধী পক্ষের হুইগ-দল যথাক্রমে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। মোটামুটি বলতে গেলে বলতে হয় যে, ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা সরকারের রূপ কেমন হবে, তাই ছিল অত্যন্ত অর্থবহ সমস্যা। তারপর থেকে এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য পরবর্তীকালে লর্ডসভা নিয়ে যখন দ্বন্দ্ব শুরু হয় তখন নতুন এক সমস্যায় তার পুনরুত্থান ঘটে। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও এ ধারা চলতে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই দলীয় দ্বন্দ্বের কেন্দ্র সাংবিধানিক প্রশ্ন থেকে দূরে সরে যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য সাংবিধানিক প্রশ্নের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'ডেমোক্র্যাটিক' দল প্রথমে জন্মলাভ করে। সংবিধান সমর্থিত হবার পর যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তার কতকগুলো জাতীয়তাবাদী ও অভিজাত বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অসন্তুষ্টি দানা বাঁধে। তারই ফলশ্রুতি ছিল এ ডেমোক্র্যাটিক দল। সামগ্রিকভাবে নতুন শাসন ব্যবস্থা রক্ষণশীল ও সংবিধানের কেন্দ্রায়ত প্রবণতার অনুসারী ছিল। ফলে তা গণতন্ত্রের অন্যান্য দিকে ও বিশেষ ক'রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে ডেমোক্র্যাটিক দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যও নতুন আবেদন সৃষ্টি করে। 'বিদেশী ও বিদ্রোহ সংক্রান্ত' আইনের বিরুদ্ধে এ দলের মনোভাব তারই পরিচায়ক। এ দল বহিরাগতদের নাগরিকত্ব দানের বিষয়কে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে এবং সংরক্ষণমূলক শুল্ক নির্ধারণে যে বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়, এ দল তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু তখন অবশ্য 'ডেমোক্র্যাট' (গণতন্ত্রী) ও 'রিপাবলিকান' (প্রজাতন্ত্রী) শব্দগুলোর তেমন কোন শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য ছিল না।

আমরা এ শেষ উদাহরণকে গ্রহণ করে দেখাতে পারি, কিভাবে দলের সমজাতিক বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কিভাবে নতুন সমস্যা ও নতুন বিভাগের ফলে যে পরিবর্তন

www.nagorikpathagar.org

সূচিত হয় তার মধ্য দিয়ে তা চলতে থাকে। দল ভেঙ্গে যেতে পারে এবং পুনর্গঠিত হতে পারে; কিন্তু পুরোনো দৃষ্টিভংগী বজায় থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে তখন এক গুরুত্বহীন প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করে এবং সেটি হ'ল ক্রীতদাস সমস্যা; বিশেষ করে যেসব রাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ঐসব ভূখণ্ডে তার প্রতিরোধ করার সমস্যা। কোন প্রচলিত দল এ নীতির সাথে একাত্মতা লাভ করেনি। দক্ষিণাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারকারী ডেমোক্র্যাট দল বা হুইগ-দল যা এর মধ্যে অনেক বোঝাপড়া করেছে বা অন্য কোন অপ্রধান বা অস্থায়ী বা গোষ্ঠীভিত্তিক দলও এ বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করেনি। এ ঘটনার প্রাধান্যকে লক্ষ্য রেখে এক নতুন দল গ'ড়ে ওঠে এবং 'রিপাবলিকান' দলের জন্ম হ'ল। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দলীয় কার্যক্রম এ পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে উঠল এবং এর বিরোধী নীতিকে সম্বল ক'রে ডেমোক্র্যাট দল কার্যক্রম স্থির করল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও অনিবার্যকারণে দলীয় বিভাগ ও ভূখণ্ডের সীমারেখা এক হয়ে গেল এবং এর ভয়ঙ্কর কুফল শীগ্‌গীরই দেখা দিল। দলগুলো জাতীয় দল আর রইল না, এবং কোনটিই সমগ্র জাতির কাছে সংবেদনশীল রইল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তার সংহতি রক্ষার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হ'ল। তারপর থেকে দলীয় কার্যক্রম নতুন পথের সন্ধান পায়। সাংবিধানিক প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব তেমন আর রইল না এবং দু'দলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এককথায়, অর্থনৈতিক প্রশ্ন তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়গুলো আরও তীব্রভাবে নির্ধারিত হয়। আমেরিকায় অর্থনৈতিক স্বার্থের অগ্রগতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা তেমনভাবে ব্যাহত হয়নি, এবং অর্থনৈতিক সুযোগের প্রাচুর্যের জন্য মানুষ একাজে রাষ্ট্রের উপর তেমনভাবে নির্ভরশীল ছিল না। সদা বর্তমান শুল্ক প্রশ্ন ছাড়া অর্থনৈতিক মত-পার্থক্য কেন্দ্রীভূত ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রার প্রচলন; সস্তা মুদ্রা বা যৌথ কারবারের মত নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের ক্রটি বা অভিযোগ প্রভৃতির প্রশ্নে। যখন এসব প্রশ্ন তেমন আর গুরুত্বপূর্ণ রইল না তখন বৃহৎ দলগুলোর মধ্যকার পার্থক্য কমে এল। কিন্তু ইউরোপে অর্থনৈতিক মত-পার্থক্য আরও গভীরে প্রবেশ করে। সম্প্রতি যারা ভোটাধিকার লাভ করেছে তাদের সংখ্যা

www.nagorikpathagar.org

অনেক বেড়ে গেছে এবং দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে তারা আর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। তাই তারা চেয়েছিল এর পুনঃপরীক্ষা বা তার সম্পূর্ণ অবসান। সংবিধান বা ধর্ম বিষয়ে অতীতের দ্বন্দ্ব আজকের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বহীন হয়ে ওঠে। কয়েকটি একগুঁয়ে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী শুধুমাত্র দলের নতুন কার্যক্রমের বাইরে রয়ে গেল। নিম্নের তালিকায় এদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল এবং আধুনিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাও লিপিবদ্ধ হ'ল।

আধুনিক রাষ্ট্রের দলীয় বিন্যাস

চরম-বামপন্থী	বামপন্থী	ডানপন্থী	চরম-ডানপন্থী
কম্যুনিস্ট দল	প্রগতিবাদী দল	রক্ষণশীল দল	প্রতিক্রিয়াশীল দল
সমাজতান্ত্রিক দল	উদারনৈতিক দল		

নীতি	উৎপাদনের উপাদানগুলোর সরকারী বা সাধারণ মালিকানা ও ব্যক্তিগত খাজনা, সুদ ও মুনাফার অবসান।	ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বা আংশিক সরকারী বা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ,	সংরক্ষণশীল শুল্ক ছাড়া সর্বনিম্ন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চালু রাখা।

দৃষ্টিভংগী	সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শান্তিবাদী। বিপ্লবাত্মক, সংস্কারমূলক। শ্রেণী সচেতন।[1]	সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী। শিল্প সম্প্রসারণমূলক। যুদ্ধবাদী। শ্রেণী সচেতন।[1]

বলা বাহুল্য, এসব নীতি ও দৃষ্টিভংগী একদল থেকে অন্য দলেও ছড়িয়ে পড়ে এবং এগুলো সামগ্রিকভাবে দলের বৈশিষ্ট্য হ'লেও তা

১। প্রত্যেক সংঘে কিছু পরিমাণ শ্রেণী সচেতনতা গড়ে ওঠে; কিন্তু এক্ষেত্রে এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটে এবং নীতি ও কার্যপদ্ধতিতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

তাদের সকল সদস্যদের বেলায় খাটে না। এটাও সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক সংঘর্ষের কলাকৌশলের জন্য বিভিন্ন দল যে নাম ধারণ করে, তা ঐসব দলের নীতির পরিচায়ক নয়। ফ্রান্সের 'Action Liberale Populaire' দলের ন্যায় কোন কোন দল মূলতঃ রক্ষণশীল হ'য়েও নিজেকে 'উদারনৈতিক' বা 'প্রগতিবাদী' বলে জাহির করে। তাছাড়াও, 'উদারনৈতিক' ও 'রক্ষণশীল' শব্দগুলোও অনেকটা আপেক্ষিক,—এবং তারা কোন সন্দেহাতীত নীতি জ্ঞাপন করে না। কোন এক সময়ে কোন দেশে জনমতধারা বামপন্থী হ'তে পারে, অথচ অন্যত্র বা অন্য সময়ে সে গতি ডানপন্থীও হ'তে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের জনমতধারা ছিল বামপন্থী; কিন্তু আমেরিকায় তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেনি। আবার যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে এ গতিধারা ছিল অত্যন্ত দোদুল্যমান। সাধারণ প্রগতি ও দুঃসময়ের প্রভাবে বা সমগ্র সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী আশাবাদ বা হতাশার মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম প্রভাবের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে দলীয় বিন্যাস পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে যে পার্থক্য, তা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যকার পার্থক্যের মত ব্যাপক নয়। মতবাদের বিবর্তনে কোন দল তার পূ'নাম' অক্ষুণ্ণ রেখেও এমন নীতি গ্রহণ করে যা হয়ত একদিন তার বিঘোষিত নীতির বিরোধী ছিল। ক্ষমতা সংরক্ষণে বা ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় দল যে সুযোগ সন্ধানী পন্থা অবলম্বন করে, তাও তার নীতি ও নামের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ প্রসংগে শ্রমিকদের সম্পর্কে ডিজরেলী বা বিসমার্ক যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তা ও উল্লেখযোগ্য।

আমাদের উল্লিখিত তালিকায় এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে যে, কোন দল একই অভিমতের সমজাতিক কোন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং অস্পষ্টরূপে নির্ধারিত সীমারেখায় যে মতবাদের বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটে দলীয় নীতির মাধ্যমে। প্রত্যেক দলে আবার একটা ডান ও একটা বাম শাখা থাকে। জটিল পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়ে দুটো স্বতন্ত্র দলেরও সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং মতের ঐক্য লক্ষ্য না ক'রে বরং সংগঠনের ঐক্য লক্ষ্য করেই আমরা দলের সংজ্ঞা নির্ধারণ করি। কোন কোন দেশে সরকার সংগঠন সংক্রান্ত প্রকৃত বিষয়টি পরস্পরবিরোধী দুটি দলের মধ্যে সীমিত থাকে এবং অন্য দলগুলো এত দুর্বল যে, ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে তাদের কোন কার্যকরী

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ছ'টি জাতীয় দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে। যদি তাদের মধ্যে কোন একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা হলেও তা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রিপাবলিকান দলের অবস্থা ঠিক এমনি হয়েছিল। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বৃটিশ দলীয় ব্যবস্থারও এ গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়, এবং আসলে সকল ইংরেজি ভাষভাষি রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থার গড়নই এমনি। কিন্তু ইংলণ্ডে একটা বামপন্থী দলের অগ্রগতির ফলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সাধারণভাবে যেখানে কোন একটি বামপন্থী দল ক্ষমতা অর্জন করেছে, সেখানেই তা কয়েকটি স্বতন্ত্র দলীয় সংগঠনে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং প্রধানতঃ একারণেই ইউরোপে বহুদলীয় ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে। এতে সরকারের ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর আলোচনাও একটু প্রয়োজন।

তিন: বহুদলীয় ব্যবস্থা ও সরকারের কলাকৌশল

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চালু থাকলে সরকার সংগঠন খুব সহজ হয়ে ওঠে এবং অদ্ভুত গোছের কোন সংকট দেখা না দিলে তা অনেকটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপ নেয়। কোন এক দল ক্ষমতাচ্যুত হলে অন্যদলটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। যে দল ক্ষমতাচ্যুত হ'ল তার নেতৃবর্গ হন বিকল্প সরকারের নেতৃবর্গ। বিরোধী দল তাই সরকারের ব্যবস্থাপনায় এক বিশিষ্ট অংশে পরিণত হয়। এ সত্যের স্বীকৃতি এ পর্যন্ত যেতে পারে যে বিরোধী দলের নেতাও নিয়মিত বেতন লাভ ক'রে একজন সরকারী কর্মকর্তার পদমর্যাদা লাভ করেন। কানাডায় এর দৃষ্টান্ত মিলবে। এর ফলে একদিকে কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়; কেননা ক্ষমতাসীন দলকে অন্য কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। অন্যদিকে তাতে দায়িত্বও কেন্দ্রিভূত হয় ও তা পালনের পন্থাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতাচ্যুত হ'লে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয়।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ ব্যবস্থায় দলীয় সংগঠনে বোঝাপড়া ও সমঝোতার এক সাগ্রহ-ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে, এবং এর প্রতি নির্বাচক মণ্ডলীর এমন এক ঐতিহ্যগত শ্রদ্ধা থাকে যাতে তারা কোন সাধারণ বিষয়ে তাদের পার্থক্য মুছে ফেলতে পারে। জনমতের রাজনৈতিক প্রকাশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা এক বিশিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়। যেখানে নাগরিকদের এক বৃহৎ অংশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গভীর কোন পরিবর্তন দাবী করে না; সেখানকার জন্য এ ব্যবস্থা উপযোগী। কিন্তু যেখানে চরম বামপন্থী ও চরম ডানপন্থী দলের অনুসারীদের সংখ্যা থাকে যথেষ্ট পরিমাণে সেখানে এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না; কেননা উভয় দলের মধ্যমপন্থীরা কোন এক সংগঠনে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া, যেখানে নতুন কোন বিষয় মাথা তোলে বা পুরোনো বিষয়ে নতুন কোন মত সৃষ্টি হয়, সেখানেও এ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মৌলিক বিষয় হচ্ছে তার সংহতি রক্ষা। বহুদলীয় ব্যবস্থার তেমন কোন সমস্যা নেই। এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠী অবাধে সংহত হয় এবং এ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা একত্রিত হতে বা পৃথক হতে পারে। বিভিন্ন মতাবলম্বীরা সাধারণ সংগঠন থেকে মুক্ত হয়ে কোন বোঝাপড়া ছাড়াই তাদের মতবাদ সংহত করতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে আসে বোঝাপড়া; কেননা তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয় না এবং রাজনৈতিক সফলতাও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন দলই সাধারণভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় না। এর ফলে শুধু যে দলীয় কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটে তা নয়; বরং সরকারের সামগ্রিক কলা-কৌশলেরও পরিবর্তন ঘটে। সরকার নির্ভর করে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে এবং এ সমন্বয় সাধিত হয় তাদের মধ্যে দর কষাকষি ও মতৈক্যের মাধ্যমে। এক সরকার কোন দলের সরকার নয়; বরং এ হ'ল কতকগুলো দলের সমবায় সরকার। এ সমবায় বামপন্থী বা ডানপন্থীদের সহযোগিতায় বা মধ্যমপন্থী ও বাম পন্থীদের সহযোগিতায় গ'ড়ে উঠতে পারে। এ ধরনের সরকারের পতন হ'লে বেশ কয়েকটি বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকে এবং কোন্‌টি যে এর স্থলাভিষিক্ত হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। ফলে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বা ক্ষমতার জন্য সহজ সরল প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে। সরকারও অনেকটা স্থিতিহীন ও অস্থায়ী হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

সরকার সমর্থক দলের যেকোন একটি কোন বিষয়ে মনক্ষুন্ন হ'লে তা তখন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এমন কি সমবায়ের বাইরের কোন দলের সাথেও তারা সম্মিলিত হয়ে সরকারের পতন ঘটায়। সুতরাং সরকার তখন জনমতের পরিবর্তনের প্রতি অনেক বেশী সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। নীতির ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়; বিশেষ ক'রে ঐসব ক্ষেত্রে, যেখানে শাসন বিভাগ আইন পরিষদের উপর নির্ভরশীল থাকে। সরকার ও নেতৃবর্গের পতন ঘটে নাটকীয় আকস্মিকতায়। তারা আর অতীতের নিশ্চয়তা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় না।

বহুদলীয় ব্যবস্থার এসব ফলাফল সুবিধাজনক না অসুবিধাজনক, তা কিন্তু অনেকটা দৃষ্টিভংগীর ব্যাপার। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হয় সত্যি; কিন্তু তার জন্য তাকে মূল্য দিতেও হয়। নাগরিকদের পছন্দের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। স্বাধীন মতামত সম্পন্ন ভোটদাতাদের উভয় সংকটে পড়তে হয়—দু'টি দলের পরস্পরবিরোধী মতামতের যে কোন একটি তাদের গ্রহণ করতে হয় বা বর্জন করতে হয়, এবং এটাও হয় যে, তারা যে দলের পক্ষে ভোট দিয়েছে; হয়ত সে দলের সাথেই তার মতবিরোধ সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তার ভোটদান অর্থহীন হয়ে পড়ে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সাথে জড়িত নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোও এমন হয় যে তাতে মত-পার্থক্যের তেমন কোন সুযোগ থাকে না। দু'টি দলের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধিতার ভিত্তি রয়েছে; তার ফলে কোন বুদ্ধিদীপ্ত পছন্দের স্থান সংকীর্ণতম হয়ে আসে। রাজনৈতিক নেতাকেও অনেক বেশী আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়। তাঁকে একদলের সমগ্র কর্মসূচীকে মেনে নিতে হয় এবং অন্য দলের সমগ্র কর্মসূচীকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। দলীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক সফলতার সংকীর্ণ বিচার-বিবেচনায় সে কর্মসূচী প্রণীত হয়। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা এসব ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করা হয়।

কিসে কাজ হবে, কিসে আবেদন বাড়বে এবং কিসে জয়যুক্ত হওয়া যাবে—এগুলো যার প্রধান চিন্তা, এমনি সাধারণ রাজনৈতিকদের প্রচুর সুযোগ দান করে এ ব্যবস্থা। যারা কোন ঘটনার পরিমাপ করে অথচ তার শক্তি যোগায় না, যাদের কাজকর্ম অন্যদের বিশ্বাস বাড়ায়, অথচ যাদের নিজেদের কোন বিশ্বাস নেই—এমনি লোকদের জন্য এ ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় নেতা সমর্থনের জন্য কম বেশী দর কষাকষি করেন; কিন্তু দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নেতা শুধু সাধারণ পর্যায়ে নীরবে স্থান ক'রে নেন এবং সে পর্যায়ে তার সমর্থকরা সম্মিলিত হয়।

এমনি পরিস্থিতিতে দলীয় সংগঠন বা পেশাদার রাজনৈতিকদের আভ্যন্তরীণ কর্মী সম্প্রদায় কর্তৃত্ব অর্জন করে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য কম বেশী প্রায় প্রত্যেকটি দলীয় সরকারে এমনি পরিণতি ঘটে; কিন্তু যেখানে 'ভেতর' ও 'বাহিরের' মধ্যে একক ও স্থায়ী পার্থক্য বিদ্যমান, সেখানে তা অনেক বেশী পরিমাণে বেড়ে যায়। এর সব থেকে নগ্ন প্রকাশ ঘটে—আমেরিকার 'স্পয়েল' (Spoil System) ব্যবস্থায়; কেননা অন্য দেশ অপেক্ষা এখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে।[১] 'স্পয়েল' ব্যবস্থায় বিজয়ী দল ক্ষমতাসীন হয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা বন্টন করে দেয়। এ দ্বিবিধ নীতির ফলে রাজনৈতিক মতবাদের অবাধ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য লেখকের মতে[২] তা রাজনৈতিক সম্মিলনে এক ধরনের কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে। এর ফলে নির্বাচক ও নেতৃবর্গ উভয়ই অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন এবং সে সুযোগে 'দলীয় সংগঠন' ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

আমাদের এ বিবেচনা ঠিক নয় যে, কোন রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে এদের যে কোন একটি বেছে নেবে। জনমতের অবস্থার উপরই তা নির্ভর করে; কেননা জনমত সম্প্রদায়ে যেসব শক্তি কর্মরত, তাদের প্রতি সংবেদনশীল। সব রাষ্ট্রই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা নিয়ে পথ পরিক্রমা শুরু করেছে; কিন্তু এখন অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বহুদলীয় ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে। যখন অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ প্রাধান্য লাভ করে, তখন দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে এক

১। এছাড়াও অন্যান্য কারণ এর মূলে রয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিদেশাগত অনেক নির্বাচকের উদাসীনতা এবং সংবিধানের দিক থেকে জনসাধারণের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ও শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের বহু সংখ্যক কর্মকর্তার নির্বাচনের ফলে এ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

২। সিজউইকের (*Sidgwick*) '*Elements of Politics*' গ্রন্থের ঊনত্রিশ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

ধরনের পার্থক্য বজায় রাখা সহজ নয়। তখন বিভিন্ন ধরনের বহু দৃষ্টিভংগী ও নীতি সম্ভব হয়; তাই তারা স্বতন্ত্র সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করতে চায়। সংমিশ্রিত স্বাতন্ত্র্যও গ'ড়ে ওঠে; কারণ মানুষের সব স্বার্থ চিরন্তন নিয়মে একটি সংগঠনের সাথে হুবহু মেলে না। সুতরাং দলীয় ব্যবস্থার সংগঠনে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমজাতিক বিন্যাস; এক ধরনের পার্থক্য নয়। রাজনৈতিক দলগুলো সমগ্র দেশের প্রতি সংবেদনশীল এবং এর অর্থ হ'ল, তারা সকল পরিবেশে সকল অবস্থায় জনগণের সমর্থন দাবী করে। যেখানে দু'টি দল বর্তমান, সেখানে তৃতীয় দলও দেখা দিতে পারে, এবং এদের কিছুমাত্র শক্তি বৃদ্ধি হ'লে সাময়িকভাবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার শক্তির মূল হ'ল এই যে, এতে সুস্পষ্ট প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন হ'ল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সহজ ও সরল বিষয়ের। কিন্তু বিষয় তেমন সহজ থাকতে নাও পারে।

তা যাই হোক, যেকোন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মৌলিক সত্য হ'ল, সরকার যতদূর সম্ভব ব্যাপক জনমতভিত্তিক হওয়া উচিত এবং দলীয় স্বাতন্ত্র সত্ত্বেও সমগ্র জনসংখ্যার ঐক্য বজায় থাকা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ পর্যায়

আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের বিবর্তন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

চতুর্দশ অধ্যায়

আধুনিক 'রাষ্ট্রতন্ত্রের' বিবর্তন

এক। সূচনা: সকল সামাজিক তত্ত্বের প্রাথমিক অসুবিধা

সমাজ-বিজ্ঞানীরা যখন রাষ্ট্রের বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বা সামাজিক ব্যবস্থার কোন অংশের ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসেন তখন তিনি এক অদ্ভুত ও সুস্পষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ অসুবিধা হ'ল তার বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু অনুধাবনের সাথে তার নৈতিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় সমন্বয় বিধানের জটিলতা। নৈতিক মূল্যায়নও প্রয়োজনীয়; কেননা তা-ছাড়া সামাজিক কাঠামোর কোন অর্থ বা যৌক্তিকতা নেই। আবার তার বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু অনুধাবনও একান্ত প্রয়োজনীয়; কেননা তাছাড়া তার মূল্যায়নের কোন ভিত্তি নেই, নেই কোন সত্যানুগ্রহ। রাষ্ট্র হ'ল মানবীয় উদ্দেশ্য সাধনের এক সংস্থা বিশেষ, এবং তার বৈশিষ্ট্য তখনই পরিবর্তিত হয় যখন তা সম্প্রদায়ের কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার হ'তে থাকে, বা যখন তাকে বিশেষ কোন লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োগ করা হয় বা যখন তার লক্ষ্য সীমিত হয় বা ব্যাপক ভিত্তিক হয়। যেসব স্বেচ্ছাকৃত ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে রাজনৈতিক চিন্তাবিদের নিজস্ব মূল্যবোধের মিল থাকে তাকে তিনি বহু চেষ্টা করেও পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন না। বিভিন্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব লক্ষ্য অর্জিত হয় বা যেসব উদ্দেশ্য দমিয়ে রাখা হয় তাদের বিচার-বিবেচনায়, যেসব মনোভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও বিকাশ অনুপ্রেরণা লাভ করে তাদের আলোচনায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণে মানবজীবনের যে পরিণতি ঘটে তার পর্যালোচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিশারদ যে বস্তুগত বা নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ অর্জন করেন, সমাজ-বিজ্ঞানীর পক্ষে তা অর্জন করা অসম্ভব; কেননা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিশারদ শুধুমাত্র বস্তুগত দিক লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত।

নিরঙ্কুশ বিবর্তনবাদকে আবাহন করেও আমরা নৈতিক মূল্যবোধ নির্ণয়ের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হ'তে পারি না; যদিও বিবর্তনবাদের স্বয়ংক্রিয়

www.nagorikpathagar.org

প্রভাবে মানব সমাজ এক বিশিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয় ব'লে মনে করা হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় মার্কস্ এ সূত্র সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁরই ব্যাখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদে তার ব্যাখ্যার ত্রুটি সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজের বিবর্তনকে যেভাবেই আমরা ব্যাখ্যা করি না কেন, সামাজিক ব্যবস্থার প্রত্যেক পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি মানুষের সচেতন প্রচেষ্টা, যা সে ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে পরিবর্তন করতে বা তার রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট রয়েছে। আদর্শ মানব মন বাহ্যিক জগতের প্রতিফলন মাত্র—মার্ক্সের এ কথা অর্থহীন। তাছাড়া, মানুষের কাজকে আবহাওয়া বা ভৌগোলিক অবস্থা বা কলাকৌশলের পরিস্থিতির ফলাফল বা তাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করলেও আমরা মানুষের মনোভাবের সমস্যাকে দূর করতে পারি না। প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিরত ও কঠোর সমালোচনা ক'রে মার্কস্ নিজেই তাঁর তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন এবং এ সমালোচনার ইচ্ছাকৃত প্রয়োগের দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন।[১] যখনই আমরা সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করি তখনই মূল্যবোধের জগতে প্রবেশ করি। সেখানে অস্তিত্ব ও মূল্য আর এক নয়। অর্থনৈতিক চিন্তাবিদের মত রাজনৈতিক চিন্তাবিদকেও মানবিক অভিপ্রায় ও সামাজিক পরিণতির সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে। যিনি উদ্দেশ্যবাদকে উপেক্ষা করেন তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা করেন না; যদিও উদ্দেশ্যবাদকে যেকোন পদার্থবিদ অভিশাপগ্রস্ত মনে করেন। উদ্দেশ্যবাদকে উপেক্ষা করলে শুধুমাত্র নিজের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। এখানে তাঁর সমস্যা হবে একদিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ও তার জন্মদানকারী মানসিক দৃষ্টিভংগীর অনুধাবন করা এবং অপরদিকে মানুষ যেসব লক্ষ্য ও আদর্শকে সাধারণভাবে মূল্যবান মনে ক'রে অনুসরণ করে তাদের বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ বা দমনের পন্থা হিসেবে ঐসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে তু'লে ধরা। এটা করা অবশ্য নিশ্চয়ই সম্ভব, যদিও সেক্ষেত্রে বস্তুগত দিক সংরক্ষণ করা খুব শক্ত হয়। অসুবিধাটা বড় হয়ে দেখা দেয় যখন চিন্তাবিদ মানব কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ও সে যুগে প্রচলিত প্রধান মতবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে তার আদর্শের আলোকে সংশ্লিষ্ট করতে উদ্যত

১। হ্যানস্ কেলসেনের *'Sozializmus und Staat'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

হন।[১] এ অসুবিধা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে যদি তিনি কোন প্রতিষ্ঠিত আদর্শের নামে বা জনকল্যাণ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার আলোকে তিনি তার সংস্কার সাধন বা পুনর্গঠন বা রূপান্তর করবার জন্য কোন সোপারেশ পেশের দুঃসাহস দেখান।

এ অনিশ্চয়তার জগতে রাজনৈতিক চিন্তাবিদের জন্য শুধু এটুকু দৃঢ়ভিত্তিই রয়েছে যে, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল এবং সামাজিক কাঠামোয় প্রত্যেকটি পরিবর্তন—তা যে পরিমাণ বাহ্যিক কারণেই তা প্রভাবিত হোক না কেন, যারা সে কাঠামোয় বসবাস করে তাদের মানসিক পরিবর্তনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ব্যবস্থা মানব কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজ-বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদের বিশিষ্ট কাজই হচ্ছে এসব মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর আবিষ্কার করা।

মানব সমাজের প্রত্যেকটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বারে বারে বললেও এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মানুষের অভ্যাস তাদের ধ্যান ধারণার চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পায় এবং শুধুমাত্র সচেতন প্রয়োজনের চাপেই প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন আসেনা এবং সামাজিক কাঠামো সংগঠনের ক্ষেত্রে মানুষ কোন বাস্তু কলাবিদের মত নমুনা সামনে রেখে অগ্রসর হয় না ; বরং 'সামাজিক প্রাণী' হিসেবে তারা অগ্রসর হয় এবং সংগঠনের মাধ্যমে তাদের প্রকৃতির বিকাশ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক জ্ঞান রাজনৈতিক বাস্তবতার পেছনে প'ড়ে থাকে। এমন কি প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতার বাস্তব-চিত্র অনেকের কাছেই ভয়ঙ্কর রূপে প্রগতিশীল মনে হবে। যাঁরা সাহস ক'রে বলতেন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের মূলে রয়েছে জনগণ বা অত্যাচারী শাসকের কোন অধিকার নেই—তাঁদের লেখা গ্রন্থকে ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড পুড়িয়েছিল। আজকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি ও সীমারেখার বাস্তব অনুশীলনে এমন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যা স্বীকৃত ঐতিহ্যকে ম্লান ক'রে দেয়। আসলে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার কাজ হবে রাষ্ট্রের কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোন নতুন তত্ত্ব দেয়া অপেক্ষা সকল কুসংস্কারকে সরিয়ে দেয়া ; যাতে মানুষ রাষ্ট্রের বাস্তব কার্যকারিতার সম্পূর্ণ চিত্র দেখতে পারে।

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিল তাঁর *'On Liberty'* রচনায় এরূপ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ঘটনা বা আইন কোনরূপেই কম বাস্তব নয় ; কিন্তু তাদের বাস্তব কার্যকারিতা লক্ষ্য করা বড় কঠিন ; কেননা তারা রয়েছে মূল্যবোধের এক জগতে।

দুই : ক্ষমতার প্রতীক রাষ্ট্র, না ন্যায়বিচারের প্রতীক রাষ্ট্র !

কোন চিন্তাবিদ এমন কি ট্রিট্‌স্‌কে (Treitschke) পর্যন্ত বলেন নি যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র এক ক্ষমতা-চক্র। ক্ষমতা হ'ল উপায়, এবং উপায়ের সাথে লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন না করে আমরা আদৌ চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু বহু চিন্তানায়ক রাষ্ট্রকে ক্ষমতা-সংস্থারূপে উচ্চতর এক আসন দিয়েছেন এবং বলছেন যে, ক্ষমতা প্রয়োগই হ'ল তার বিশিষ্ট প্রকাশ। তাঁরা আধিপত্যের দ্বারা অর্জিত কীর্তিকে সর্বোচ্চ ব'লে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সামাজিক ব্যবস্থার মৌল শর্ত হ'ল বলপ্রয়োগ। এ মতবাদগুলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটা বিশ্বাস যে মানব প্রকৃতি মূলতঃ বাধাবন্ধনহীন। খারাপ কিছু করবার জন্য রয়েছে তার এক গভীর প্রবণতা। তাই তাদের জন্য রয়েছে রাজনৈতিক সংযমের নিত্য প্রয়োজন। কতকগুলো ধর্মীয় মতবাদ এ বিশ্বাসকে উৎসাহিত করে, অথবা কতকগুলো অভিজাত নীতির সাথে এ বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট। সে নীতিতে সাধারণ মানুষকে মনে করা হয় অনুন্নত ও অযোগ্য এবং তাদের সেবা করার জন্য রয়েছে যোগ্য ও উন্নত কিছু সংখ্যক লোক। তা যাই হোক সেসব চিন্তাবিদ সাধারণ কল্যাণ ও সাধারণ ইচ্ছার উপর তেমন গুরুত্ব দেননি। হেগেলীয় দর্শনের মত কখনও কখনও তাঁরা রহস্যময় এক লক্ষ্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মনে করেন যে, রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সদস্যদের সামগ্রিক কল্যাণকে ছাপিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল পথে ধাবিত হয়েছে। এ নীতির আর এক রহস্যময় প্রকাশে 'রাষ্ট্রীয় পতাকার' গৌরবময় অভিব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্মান ও শক্তির উপাসনার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদ এমনি দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন, মানবিক ব্যক্তিত্বের দাবীকে সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়েছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের যথার্থ প্রয়োগের কথা অস্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, মানবকুলের ঐক্য ও সম্ভাব্য সংহতির আবেদন জানিয়েছেন এবং কল্যাণের পন্থা হিসেবে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক সূত্র ধ'রে এসব প্রতিবাদ রাষ্ট্রের ন্যায়নীতির প্রকৃতির বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ লাভ করেছে। মানুষ যেমন স্বাভাবিকভাবে শক্তির দাপট থেকে রেহাই পাবার জন্য ন্যায়বিচারের প্রতি আবেদন করে, তেমনি তারা ক্ষমতা কেন্দ্ররূপে রাষ্ট্রের যে মতবাদ, তার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের প্রতীকরূপে রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ন্যায়ানুগ মতবাদ অবশ্য অসম্পূর্ণ ; যদিও তা বিশিষ্ট এক সীমারেখায় প্রযোজ্য। যে যে বস্তু বিভক্ত করে, ন্যায়বিচার মূলতঃ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে-সব বস্তু সম্মিলন ঘটায় বা যে-সব বস্তু খুব সাধারণ ন্যায়বিচার তেমন কিছুরই আভাষ দেয় না ; কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ক্ষমতা দাবীর বিরুদ্ধে যে দ্বন্দ্ব, ন্যায়বিচার সে ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাসের সে প্রভাত থেকেই আমরা দেখেছি যে, ক্ষমতার আদর্শ ও ন্যায়বিচারের আদর্শ রাষ্ট্রে সংগঠনের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সুতরাং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উভয়ের এ দ্বন্দ্ব পরস্পরবিরোধী দু'টি রাষ্ট্রীয় মতবাদে প্রতিফলিত হয়ে উঠল। যে-কোন রাষ্ট্রে কোন একটি মতবাদের সমর্থনে রয়েছে প্রচুর উপাদান। নিম্নস্তর থেকে সর্বদা এসেছে ন্যায়বিচারের ডাক এবং এর পেছনে রয়েছে এমন এক শক্তি যাকে প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও প্রতিরোধ করতে সাহস পায়নি। এ শক্তি অস্পষ্ট হ'লেও ভয়ঙ্কর এবং সুপ্ত রইলেও তা বিপুলভাবে বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে। তাছাড়া, এমন কি ক্ষমতার জন্যও রাষ্ট্রপ্রধান যে আনুগত্য পোষণ করেন, যুগ যুগ ধরে আস্তে আস্তে অবচেতন প্রবণতা থেকে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে রাষ্ট্র যাদের সেবা করে তাদের প্রতি তার কর্তব্য বোধ রয়েছে, আর যে ঐক্যবোধের সমর্থন ব্যতীত সরকার হয়ে পড়ে এক অনিশ্চিত ও ভয়ঙ্কর দানবীয় যন্ত্র এবং আইন হয়ে ওঠে প্রকৃতিবিরুদ্ধ—সব কিছু মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ন্যায়নীতির ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু উপর থেকে ক্ষমতার প্রেরণা নিয়ত রাষ্ট্রকে তার লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করেছে, এবং বিভাগ ও আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে ভীতি ও আনুগত্যের প্রেরণা

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে এবং সরকার যে তার নিজের অধিকারে বর্তমান রয়েছে এ ধারণা সবার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে দায়িত্বহীন ও মহিমামণ্ডিত। রাষ্ট্র তখন মনে করে যে, আইন তার নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষমতার যন্ত্রের কেন্দ্রায়নের মাধ্যমে—তা সে অর্থনৈতিক হোক আর রাজনৈতিকই হোক, ক্ষমতার লিপ্সাকে আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। জনগণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পূর্বধারণা এবং অসহায় অবস্থা সরকারকে করে তোলে স্বৈরাচারী এবং রাষ্ট্র সর্বাত্মক ক্ষমতার এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। যুদ্ধকালে ক্ষমতার প্রতীকরূপে রাষ্ট্রের অবাধ প্রকাশ দেখা যায়; কেননা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যে অনিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষ চলতে থাকে তখন ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র সাময়িকভাবে হ'লেও আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করে। ঐ পরিস্থিতিতে মানুষ যখন হয় পরাজয়ের চিন্তায় পীড়িত, তখন ক্ষমতা বাইরের ধ্বংস থেকে মুক্তি দিতে ভেতর থেকে উত্থিত হয় মুক্তিদাতার বেশে। ক্ষমতা-কেন্দ্রিক সরকার যখন বিজয় গৌরব, অর্জন করে তখন তা হয় সমগ্র রাষ্ট্রের গৌরব; কেননা বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন, তখন সবার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতাচক্ররূপে রাষ্ট্রীয় মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম প্রক্রিয়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে। একু'নাস বা দান্তের চিন্তাধারায়ও এটা ছিল অনেকটা বিজাতীয়। তাছাড়া, অর্ধস্বাধীন জনপদ, শ্রেণী গোষ্ঠী, আইন পরিষদ, এমন কি সামন্তবাদের অনির্দিষ্ট সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ, ছোট বড় বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর এখ্‌তিয়ারেও ক্ষমতার তেমন দাপটের কথা শোনা যায় নি। তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটে মেকিয়াভেলীর চিন্তাধারায়। ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার এবং দ্বিতীয় জুলিয়াস, সিজার বোরজিয়া ও মেডিসি, ম্যাক্সি-মিলিয়ান ও দ্বাদশ লুই-এর মত ক্ষমতা লিপ্সু শাসক ও সম্রাটদের আমলে লেখনী ধারণ করে তিনি সম্প্রদায়ে অসংযত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ভয়াবহ ফলাফল সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। সমন্বয় বা সমঝোতা সম্ভব হ'ত শুধুমাত্র অধীনতার মাধ্যমে এবং তা হ'ত একমাত্র শাসকের পূর্ণ আধিপত্যের স্বীকৃতির বিনিময়ে। তাই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের নজীর তুলে ধরে এক ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেন কিভাবে শাসক তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পদানত রাখবেন। কিভাবে পাশবিক ও মানবীয় উভয়গুণের যথাসময়ে প্রয়োগ হ'তে পারে—তা শাসককে অবশ্যই জানতে হবে। তাঁর কথায় বলতে হ'লে বলতে হবে—'তাঁকে ধূর্ত শৃগাল ও সাহসী সিংহের অনুকরণ করতে হবে'। সফলতাই পথের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে; কেননা সফলতাই স্থায়িত্বের

www.nagorikpathagar.org

বৃহৎ লক্ষ্য অর্জন করে। ক্ষমতার সমর্থনকারীদের অধিকাংশের মত মেকিয়াভেলী প্রধানতঃ ক্ষমতা দখলের বিভিন্ন পন্থা নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত অকপটভাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। তার আধিপত্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা মানবিকতার কোন দ্বিধা যেন তার লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি না করে।

সার্থকতার এ পর্যায়ের ঊর্ধ্বে মেকিয়াভেলী আর যেতে চাননি। 'সরকার পরিচালনার ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই।' এ দিয়ে তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সরকারের রয়েছে একটি বৃহৎ লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে 'ন্যায়ের সাধারণ মানদণ্ড' প্রয়োজনবোধে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি যদি বলতেন যে, সে লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক স্বার্থ বা শাসিতদের স্বার্থ। তবে অতি সহজেই তিনি ক্ষমতার রাজনীতির সাথে নৈতিকতার সমন্বয় বিধান করতে পারতেন। তাঁর চিন্তাধারায় যা সুপ্ত, শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনীয়তার যে মূল্য অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারায় যা সুপ্ত রয়েছে তা তিনি দাবী করতে পারতেন। এখানে আমরা এক বিকল্প ব্যবস্থার পরিচয় পাই; যার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে নৈতিক মূল্যায়নের প্রশ্ন। কিন্তু মেকিয়াভেলী শাসকের জন্য তাঁর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, জনসাধারণের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ নেই। শাসকের নিকট ক্ষমতার সুবিধা নিয়ে তিনি লিখেছেন। সুতরাং মূল্যবোধের অনুভূতি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ক্ষমতা আয়ত্তে রাখার প্রতি জোর দিতে গিয়ে লক্ষ্য থেকে পৃথক করে ফেলেছেন যা একমাত্র উপায়ের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে। মেকিয়াভেলী যতটুকু ছিলেন দার্শনিক; তাঁর থেকে অনেক বড় ছিলেন একজন রাজনীতির যন্ত্রশিল্পী। কিন্তু তার চিন্তাধারার পটভূমিকায় ছিল সুশৃঙ্খল এক রাষ্ট্রের আদর্শ এবং তার ঊর্ধ্বে ছিল জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তাঁর গ্রন্থ 'প্রিন্সের' শেষ অধ্যায়ে বোঝা যায়—যদিও তিনি লোরেঞ্জোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু আসলে ইতালীর চিন্তায় তিনি ছিলেন মশগুল। ভয়ঙ্কর অনৈক্য ও অনিশ্চয়তার কালে মানুষ ক্ষমতার কেন্দ্রেই আশ্রয় চায়। ঐক্য অর্জনই তার দয়ামায়াহীন দাবীর যৌক্তিকতা এনে দেয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নীতিবোধের কি পরিমাণ পরিহার করা প্রয়োজন, সে হচ্ছে আলাদা কথা। এটা সত্যি যে, মেকিয়াভেলীর আমলের মত অনিয়ন্ত্রিত ও বিবেকবিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রপীড়িত আমলে ভয়ঙ্কর ধরনের রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তার সমাধানের জন্য

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন এমনসব পদ্ধতি যা তৎকালে ঘৃণ্য বলে গণ্য হ'ত। কিন্তু সে দয়ামায়াহীন ক্ষমতার প্রয়োগ প্রয়োগকারীর আদর্শকে বিভ্রান্ত করেছে, এবং তাদের যে ফলাফল দেখা গেছে তাতে ঐ আমলেও ঐসব পদ্ধতি প্রয়োগের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

যথাসময়ে ক্ষমতার দর্শন আরও এক ব্যাপক ভিত্তি খুঁজে পায়। ষোল শতকে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। অন্যত্রও সেকেলে ঐতিহ্যের খোলস ভেদ করে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র উঠে আসছে। এমন কতকগুলো শক্তির প্রভাবে এক বিপ্লব দেখা গেল এবং তাতে মানুষ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে ছেড়ে পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে।[১] এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের পথ প্রস্তুত হয়। সামন্ত যুগের বিশেষ সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়। জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঐক্য আরও বৃদ্ধি পেল। রাষ্ট্র এক হয়ে পড়ল এবং তার ক্ষমতা এবং আইনও কেন্দ্রীভূত হ'ল। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আইন সার্বভৌম কর্তৃত্বের হাতে ন্যস্ত হ'ল। চরম সার্বভৌমত্বের নতুন ক'রে আবিষ্কার করা মতবাদ এ সংগ্রামের পর এমন খ্যাতি লাভ করল যা রোম সাম্রাজ্যে পর্যন্ত সম্ভব হয়নি ; কেননা এখন 'রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা' ঘোষণার পর সার্বভৌম ক্ষমতা নতুন মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ চরম ক্ষমতার প্রথম মহান উদ্গাতা হ'লেন জঁা বোঁদে। মেকিয়াভেলী যেমন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু চিন্তিত ছিলেন, বোঁদে কিন্তু তার এক ধাপ উর্ধ্বে উঠলেন এবং তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি থেকে সার্বভৌমত্বের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন। রাষ্ট্র-আইনের মাধ্যমে সংহত হয় ; কিন্তু এ আইনের একটা উৎসমূল রয়েছে। এ আইন এমন এক ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত যা অন্য কোন আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এটিই হ'ল সার্বভৌম ক্ষমতা—চরম, চিরস্থায়ী এবং অন্যান্য রাষ্ট্র নিরপেক্ষ। এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র ইচ্ছামত যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে বা শান্তি স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষমতা হ'ল সীমাহীন এবং এর জন্য অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি বা সমান শক্তির কোন সমর্থন দরকার নেই। বোঁদের মতে, রাজতন্ত্রই হ'ল এ শক্তির আধার, তবে তিনি সার্বভৌম পরিষদের কথাও স্বীকার করেছেন।

১। ফিগিসের (*Figgis*) '*Cawbridge Modern History*' তৃতীয় খণ্ড, বাইশ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

এ হ'ল সার্বভৌমত্বের আইনগত মতবাদের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। সার্বভৌমত্ব হ'ল এক এবং অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য এবং সকল নির্দেশের ঊর্ধ্বে। আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ সার্বভৌমত্বের এ প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। শুধুমাত্র আইনগত দিকের নিয়মনিষ্ঠ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এসব বর্ণনা মূল্যবান এক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের ব্যাপক বিবরণ হিসেবে তা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। কেননা এতে কাজকর্মের ঊর্ধ্বে কার্যপদ্ধতির এবং লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে উপায়ের জয়গান করা হয়েছে। 'সার্বভৌম সকল আইনের ঊর্ধ্বে।' যদি আমরা বলি যে সার্বভৌম শক্তি আইন তৈরী করেন, তবে আপত্তির তেমন কিছু থাকে না, কিন্তু অত্যন্ত সহজে এ মতবাদকে বিকৃত করে বলা হয় যে, সার্বভৌম হ'ল সকল আইনের ঊর্ধ্বে। ফলে তা ক্ষমতার মতবাদে রূপান্তরিত হয় এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাধরের হাতে অর্পিত হয়। এভাবে সংঘের সঠিক যৌক্তিকতা বিনষ্ট হয় এবং তার লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

সার্বভৌম যদি আইন তৈরী করেন, তবে তার আগে এটাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন যে, সার্বভৌমকে সৃষ্টি করেন কে এবং কি উদ্দেশ্যে আর কি শর্তে? বস্যুয়েটের মত ধর্মতাত্ত্বিক উত্তর দিতে পারেন যে, ঈশ্বরই প্রত্যেক জাতিকে তাদের শাসক বেছে দেন।' কিন্তু জনগণ তার প্রমাণ চাইতে শিখেছে। বোঁদে, হবস্, অস্টিন ও তাদের সহযোগিরা সার্বভৌমের চরম ইচ্ছার ঊর্ধ্বে প্রকৃতির আইন, বিবেকের দায়িত্ব ও স্বাধীন শক্তির নৈতিক দায়িত্বকেও স্থাপন করতে চাননি। ক্ষমতা-রথের বাধা সৃষ্টি করতে বিবেক অক্ষম। সাময়িকভাবে যদিও চিন্তাধারা বিপরিত দিকে ধাবিত হয়েছে তথাপি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে ক্ষমতা শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকেই যে দায়িত্বশীল হয়েছে তা নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও তা দায়িত্বশীল হয়েছে। একদিক থেকে সরকারকে তার সৃষ্টি আইনের ঊর্ধ্বে বলা যায়, কিন্তু সরকারের সৃষ্টিকর্তা যে রাষ্ট্র সরকার তার ঊর্ধ্বে নয়। আইনগত সত্যকে বাড়িয়ে বলতে গেলে তা রাজনৈতিক অসত্যে পরিণত হয়।

ক্ষমতার প্রতীকরূপী রাষ্ট্রের হাজারো নিদর্শন দেখবার প্রয়োজন আমাদের নেই; যদিও স্বৈরাচারিতার যুগেও আজ পর্যন্ত আইনের মতবাদে তার প্রতিধ্বনির অনুরণন আমরা দেখতে পাই। এ মতবাদের সমর্থনে বহু

www.nagorikpathagar.org

কৌশলের প্রয়োগ আমরা দেখেছি, এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির ফলে যতই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সে কৌশলের অপ্রয়োগ তত বেড়ে গেছে। ধর্মতাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রের উপর বাইবেলের কর্তৃত্ব আরোপ করেছেন এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধির গৌরব তার উপর ন্যস্ত হয়েছে। হবস্ ও অন্যান্য লেখক মৌলিক চুক্তির কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে এ মতবাদের সমর্থন করে বলেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সকল মানুষ তাদের ব্যক্তিত্বকে শাসকের ইচ্ছার উপর প্রত্যার্পণ করেছেন। এসব মতবাদে রাষ্ট্র চিত্রিত হয়েছে এক অনমনীয় ও সংকীর্ণ সংস্থারূপে। রাষ্ট্র যেন যথাযোগ্য পদ্ধতি সহকারে এক পুলিশী সংস্থা মাত্র। এসব লেখক তাই আইন মান্য করবার সাধারণ কর্তব্যের প্রতি জোর দেয়াকে সঠিক ও প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। স্বৈরাচারিতার মধ্যে ভীরু মনোবৃত্তি রুদ্ধ থেকে থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে যেমন ভয়ঙ্কররূপে বিস্ফোরিত হয়েছে; তার ফলে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অবিসম্পাদিত শাসকের আদেশের মধ্যে তারা পেয়েছে নিশ্চয়তার একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং তাঁদের মতবাদ খুব জোর ছিল একটা অর্ধসত্য। কিন্তু অন্য অর্ধ সত্যটি ঘোষণা করে যে, শক্তিই হচ্ছে মানবের রক্ষাকর্তা। স্বৈরাচারিতা ধ্বসে পড়ার ফলে যে আংশিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার পেছনে সৃজনশীল শক্তি কর্মরত থেকে আবার পুনর্গঠনে প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়ায় যা সম্ভব হয়েছে 'শক্তিশালী সরকারের' দমন তা বাস্তবায়নে কোনদিন সক্ষম হয়নি।

রাষ্ট্র শক্তির স্বৈরাচারিতার যুগেও এমন লেখকের অভাব ছিল না যারা বলতেন যে, সরকার তার নিজের কারণে প্রাণ পায়নি এবং বলতেন যে, শাসিতদের মঙ্গল ছাড়া সরকারের অস্তিত্বের অন্য কোন যুক্তি নেই। ক্ষমতার দাবীর বদলে তাঁরা ন্যায় নীতির দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা অগাস্টিনের বিখ্যাত বক্তব্যের পুনরাবৃদ্ধি করে বলতেন যে ন্যায় নীতিকে যদি সরিয়ে নাও তবে রাজ্য ও ডাকাতের মালিকানার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। ধর্মীয় বিভেদের জন্য স্বৈরাচারী শাসন বিরোধী দাবী আরও জোরদার হয়ে ওঠে। যখন কোন স্বৈরতন্ত্র জনগণের উপর একটা 'রাষ্ট্র-ধর্ম' জোর করে চাপিয়ে দিত তখন তা জনগণের গভীর ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করত এবং তাদেরকে শুধুমাত্র সহনশীলতার মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করত তা নয়, সাথে সাথে বৈধ শাসন ও অত্যাচারের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক ব্যবধান রয়েছে তাও তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে

www.nagorikpathagar.org

উঠত। জনগণের কাছে বৈধ শাসন ও অত্যাচারের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় তারা অত্যাচারী শাসককে পদচ্যুত করবার অধিকার তুলে ধরত এবং এভাবে জনগণের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব মতবাদের পুনর্জন্ম হয়। 'Vindicae Contra Tyrannos'-এর বিখ্যাত লেখক ঘোষণা করেন. 'বৈধ শাসকরা জনগণের কাছ থেকে আইন লাভ করে থাকে'।[১] হলম্যান ও তাঁর 'Franco—Gallia' গ্রন্থে এ নীতির ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে বার করেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের অধিকাংশ মতবাদের মত এ মতবাদ ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দেয়। অত্যাচারের বাতাস যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়েছে, এ মতবাদও তেমনি গৃহীত হয়েছে, এবং গ্রহণ করেছে; একদিকে যেমন ক্যাথলিক মতাবলম্বীরা; তেমনি অন্যদিকে করেছে হিউগানোরা, লুথার পন্থীরা এবং কেলভাঁ-পন্থীরা। কিন্তু এ মতবাদের ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে স্কটল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের মত দেশে; যেখানে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে ভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠাকারী সরকারের অপচেষ্টার ফলে। জার্মানীর লেখক আলথুসিয়াস সম্ভবত: এক্ষেত্রে এক অনবদ্য সৃষ্টি করেন। তিনি ডাচ প্রজাতন্ত্রের প্রান্তসীমায় বসবাস করতেন এবং ক্যাথলিক স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টট্যান্ট নেদারল্যাণ্ডের সার্থক বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হন।

আলথুসিয়াসের রাজনৈতিক চিন্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তি সংগত। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি চুক্তি ভিত্তিক যুক্ত রাষ্ট্র। বিভিন্ন প্রদেশ ও নগরের ছোট ছোট পৌর সংস্থাগুলো হ'ল সে যুক্তরাষ্ট্রের অংগ। এগুলো রাষ্ট্রে মিলিয়ে যায় না এবং বিলুপ্ত হয় না। একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যের জন্য তারা সম্মিলিত হয় এবং সে উদ্দেশ্যে তারা রাজা নির্বাচন করে ও আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্র হ'ল তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের হাতিয়ারস্বরূপ। রাজা হ'লেন তদের শাসক। চূড়ান্ত সার্বভৌম জনগণের উপর ন্যস্ত; কিন্তু জনগণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং করে পৌরসংস্থা হিসেবে। এভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা লাভ করে বিভিন্ন পৌর সংস্থা বা সমিতি। তাদের মাধ্যমে রাজাকে জনগণের নিকট তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হ'ত। রাজা ব্যর্থ হ'লে

১ *'Vindicae Contra Tyrannos'* গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদে লাস্কির লেখা ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

জনগণেকে আনুগত্যের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেয়া হত। রাষ্ট্র তাদের মঙ্গলের জন্য রয়েছে। আলথুসিয়াস রাষ্ট্রের হাতে ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। কিন্তু ক্ষমতা যতই ব্যাপক হোক না কেন, তা ছিল অর্জিত ক্ষমতা, এবং তার ছিল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সীমারেখা। আভ্যন্তরীণ সীমারেখা হ'ল প্রকৃতির আইন। এ আইন ন্যায়নীতি বলে গণ্য হ'ত এবং রাজা ও প্রজা সবারই বিবেকের উপর তা ছিল বাধ্যতামূলক। বাহ্যিক সীমারেখা হ'ল—এ নীতি গর্হিত ভাবে ভঙ্গ হ'লে সরকারকে পদচ্যুত করবার অধিকার।

দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট মতবাদ। নৈরাজ্য সমর্থন না করে এতে আনুগত্যের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির ইচ্ছাকে সার্বভৌমের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং কোন দুর্জ্ঞেয় বা ধর্মীয় যুক্তির সাহায্য না নিয়ে এর যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের ইচ্ছার সাথে শাসিতদের ইচ্ছার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এতে স্বীকৃত হয়েছে এবং এতে শাসকের ইচ্ছাকে শাসিতদের ইচ্ছার প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে ও সাধারণ মঙ্গলের মতবাদে ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস রয়েছে। সতর শতকের প্রথম দিকে ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের ঔদাসিন্য ঘোষণার সুষম সময় তখনও আসেনি। রাষ্ট্র যে নৈতিকতার বলপ্রয়োগকারী অভিভাবক হ'তে পারে না, এটাও আলথুসিয়াসের পক্ষে দেখানো সম্ভব হয় নি। অবশ্য আমাদের কালেও অনেকে এ প্রশ্ন সঠিকভাবে অনুধাবন করে না। আলথুসিয়াস সংখ্যাগুরুর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুর অধিকারের কঠিন সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।

অন্য আর একটি দিকে ডি গ্রুট কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেন। আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে যেখানে এটা ছিল অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত, তিনি সেক্ষেত্রে ক্ষমতার মতবাদকে আক্রমণ করেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক নীতি ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাঁর মতবাদে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাঁর প্রাকৃতিক বিধান—পৌর আইন, প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান ও আদর্শের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে ঘোরাফেরা করেছে। রাজনৈতিক নীতির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডি গ্রুটের ব্যর্থতার

www.nagorikpathagar.org

একটা কারণ ছিল এবং তা হ'ল এই যে, তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের প্রতি সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বের কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন; অথবা জনকল্যাণই যে সরকারের একমাত্র ও প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ তাঁর আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলাবোধে উদ্ভাসিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং তাই তাঁর যুক্তিতে নিয়ে আসে অস্বচ্ছতা ও বিভ্রান্তি।

সতর শতকের পরবর্তী পর্যায়ে সমালোচনামূলক চিন্তাধারা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে সরকারের অন্তর্নিহিত ও দায়িত্বহীন অধিকার বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হয়। স্পাইনোজা, লক ও পুফেনডর্ফ একই বছরে জন্ম গ্রহণ করে এ ক্ষেত্রে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। স্পাইনোজা[১] তাঁর গভীর ও ভাবাবেগহীন যুক্তি নিক্ষেপ করে চরম অধিকারের অবাস্তবতা তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য বলে ঘোষণ করেন। লকের[২] সাধারণ বোধ শাসন ক্ষেত্রে রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে এবং তিনি এক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দেন যেন জনগণের ন্যস্ত কোন দায়িত্ব অবহেলার জন্য সরকারকে দায়ী করা যায়। কল্যাণের জন্যই সরকার শাসনের অধিকার ভোগ করছে। পুফেনডর্ফ[৩] সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার কিছুটা আভাষ দেন এবং বলেন যে, যুক্তি সংগত আইনের সৃষ্টি ও পরিচালনার মধ্যে নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রের মূল। রাষ্ট্রের এ দায়িত্বই হ'ল তার ক্ষমতা ও সীমারেখার নির্ধারক। স্বৈরাচারী অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাই নয়; রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতার দাবীও সোচ্চার হয়ে ওঠে চারদিকে। মিল্টনের (Areo Pagitica) গ্রন্থে তার সব চেয়ে সুন্দর প্রকাশ ঘটে। মিল্টন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নীতির বলিষ্ঠ ঘোষণা দান করেন। একটি হ'ল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে ধর্মীয় জীবনের মুক্তি। অন্যটি হ'ল সে মতবাদ, যা তাঁর আমল থেকে আজ পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলে যুগিয়েছে শক্তি। তিনি বলেন যে, সমাজের মঙ্গলের জন্য দরকার হচ্ছে তার সদস্যদের স্বাভাবিক বিভিন্নতা এবং নৈতিকতা ও রীতিনীতি ক্ষেত্রে জোর করে

১। *'Tractatus Theologico—Politicus'* গ্রন্থ। ২। *'Two Treatises of Civil Government'* গ্রন্থ ৩। *'De Jure Naturae et Gertium* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

ঐক্য প্রতিষ্ঠা করলে তা যে কোন জাতির ধ্বংস ও অধঃপতন ডেকে আনবে।

রাষ্ট্রের মৌল সমস্যা যে আইন ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যবিধান, তার সঠিক অনুধাবনের জন্য লেগেছিল বহু যুগ। ক্ষমতা মতবাদে বিশ্বাসীরা এ সমস্যা নির্ধারণ করতে পারে নি। অথবা যাঁরা সম্মতি নিরপেক্ষ কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের জন্য এর কোন গুরুত্ব ছিল না—তা সে কর্তৃত্ব পদমর্যাদা থেকেই আসুক বা ঈশ্বর থেকেই আসুক না কেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক রাজনীতির প্রধান কাজই ছিল কর্তৃত্বকে তার সুস্পষ্ট উৎসের সাথে সংযুক্ত করা এবং কোন জনসমষ্টির সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা, প্রথা ও ঐতিহ্য, চিন্তাধারা ও জীবন ব্যবস্থার উপর সে কর্তৃত্বের নির্ভরশীলতা তুলে ধরা। অন্যান্য অগ্রপথিকদের তুলনায় মতেস্কুঁর[১] মধ্যে এ দৃষ্টিভংগী উল্লেখযোগ্য রূপে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাজকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন এবং সমাজের উপর আবহাওয়া, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের অন্তর্নিহিত প্রভাব তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান কারো কোন নির্দেশে গড়ে ওঠেনি এবং সেগুলো কারো কোন নির্দেশে পরিবর্তিত হয় না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠির মধ্যে এমন এক অধ্যাত্মচেতনা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাদের আইনের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। মতেস্কুঁ রাজনীতিকে করেছেন মূর্ত ও বাস্তব। মেকিয়াভেলী যেমন রাজনীতিকে এক কলা-কৌশলরূপে ব্যবহার করে তার মাধ্যমে মানুষের আবেগ ও নির্বুদ্ধিতাকে সরকারের স্বার্থবৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করেছেন। মতেস্কুঁ সে অর্থে রাজনীতিকে বাস্তবমুখী করেন নি। তিনি এক গভীর অর্থে রাজনীতিকে বিজ্ঞান সম্মত করে তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন ও প্রতিষ্ঠানকে দেখেছেন কোন জন-সমষ্টির জটিল জীবনের সামগ্রিকতার বিশিষ্ট প্রকাশ রূপে। যে সব সরকার জনগণের অধ্যাত্ম চেতনাকে উপেক্ষা করে তাদের পতন অনিবার্য। যে সব আইন তাকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে উদ্যত হয় তারা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

মতেস্কুঁর আলোচনায় রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে আমরা শক্তি এবং ন্যায়বিচারের বিকল্পের বহু উর্ধ্বে চলে যাই। রাষ্ট্র যেন এক সংস্থা

১। *'L' Esprit des Louis* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

যার মাধ্যমে কোন জনসমষ্টি বিকাশ লাভ করে ও তাদের সামগ্রিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। 'ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা' বা 'নিরাপত্তা বিধান বা সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব' ছাড়াও অনেক বেশী অবদান আইনের রয়েছে। আইন হ'ল মূলতঃ জাতীয় সত্তার সমর্থন ও কাঠামো।

এই বাস্তববাদী ব্যাখ্যা উনিশ শতকের রাজনৈতিক সচেতনতায় রূপ লাভ করে। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনুন্নত ক্ষেত্রেই ক্ষমতা ও ন্যায়বিচারের পুরোনো দ্বন্দ্ব নীতির সংঘর্ষ হিসেবে বজায় রইল। কেন্ট, বেন্থাম, মিল ও গ্রীন প্রমুখ চিন্তাবিদগণ একপক্ষ সমর্থন করেন এবং হেগেল সমর্থকরা এবং টিট্‌স্‌কের মত চরম জাতীয়তাবাদীরা অন্য পক্ষ সমর্থন করেন। এভাবে সমস্যাটি সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে এবং তার আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

তিনঃ চুক্তিবাদ ও রাষ্ট্র

ষোল শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত যে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে তা হ'ল 'সামাজিক চুক্তিবাদ'। যখন রেনেসাঁ আমলের স্বৈর-তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালান হচ্ছিল তখন এ সামাজিক চুক্তিবাদের ভূমিকা ছিল বিরাট। এ মতবাদ সার্বভৌমত্বের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, ঐশ্বরিক অধিকারের ক্রমবর্ধমান ধারণা এবং দায়িত্বহীন ক্ষমতার যে আতঙ্কে জন সমষ্টি কলুর বলদের মত বন্দী জীবন যাপন করছিল; সে সম্পর্কে ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে মুছে দিতে সাহায্য করে। যারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল এবং যারা ছিল আশাবাদী, তাদের সকলের জন্যই এ মতবাদ আর একটি সুস্পষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করে। এর ফলে ধর্ম গ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অসংখ্য অনুমেয় যুক্তি দূর হয়ে যায় এবং সঠিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনঃপত্তন হয়। রাষ্ট্রের আসল বুনিয়াদ হ'ল মানুষের ইচ্ছা ও প্রতিষ্ঠানিক জীবন গঠনে সাধারণ লক্ষ্য। তাছাড়া, পরিবর্তিত সময়ের উপযোগী পরিবর্তনের যোগ্যতাও এর ছিল; কেননা 'ধর্মীয় অনুমোদন' থেকে সাধারণ রীতি নীতির সব কিছুই চুক্তিবাদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। প্রত্যেক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক চিন্তাবিদের আলো-চনার ধারা অনুসারে চুক্তির শর্ত নির্ণয় হয়েছিল; কিন্তু সব সময়ই এর যৌক্তিকতা একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

মানবীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য রয়েছে এবং মানবীয় উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিধারণ করে।

যে মহান চিন্তাবিদ চুক্তিবাদের নীতিকে অসংগত ধারণা থেকে মুক্ত করে তাকে রাষ্ট্রের উৎস ও অস্তিত্বে পরিণত করেন ; তিনি হ'লেন টমাস হবস্। রাজা ও আইন পরিষদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্বে তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হন এবং গণতান্ত্রিক দল, বিশেষ করে স্বতন্ত্র সদস্যদের বিপ্লবাত্মক নীতির ভয়াবহ পরিণতিতে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি বিক্ষিপ্ত চার্চ থেকে উদ্ভূত তত্ত্বের উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই তিনি সামাজিক চুক্তিবাদে চরম, এক ও অবিভাজ্য, অসীম ও হস্তান্তরের অযোগ্য সার্বভৌমত্বের এক তত্ত্বের ভিত্তি খুঁজে পেলেন।[১] তিনি বললেন, যদি কোন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব না থাকে, না থাকে যদি আবেদনের কোন চূড়ান্ত আদালত এবং আইনের চূড়ান্ত উৎস, প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীর বহু ঊর্ধ্বে যদি তা সংন্যস্ত না হয় এবং না হয় যদি তা সর্বশক্তিমান, তবে মানুষের পাশবিক বৃত্তির আক্রমণ থেকে কোন নিরাপত্তা থাকে না এবং কোন রাজনৈতিক জীবনও গড়ে ওঠে না। ভয় না দেখিয়ে কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না ; সর্বোচ্চ বাধ্যবাধকতা ছাড়া কোন নিরাপত্তা থাকতে পারে না। মানবের কাছে তাই দু'টি বিকল্প রয়েছে ; একটি হ'ল প্রকৃতির রাজ্য ; যাকে বলা যেতে পারে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের এক রাজ্য ; সেখানে রয়েছে ব্যক্তির অসংযত ক্ষমতার অভিব্যক্তি এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে সীমাহীন দুঃখ। সেখানে প্রত্যেক মানুষের হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে রয়েছে প্রসারিত। আর একটি হ'ল সামাজিক রাষ্ট্র (সেখানে প্রত্যেক মানুষ সাধারণ আনুগত্য বন্ধনে অবনমিত)। হবস্ মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অদ্ভুত-ভাবে দুটি বিকল্প তু'লে ধ'রেছেন ; তাতে মানুষের দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল স্বাধীনতা পরিহার করা ছাড়া অন্য গত্যন্তর রইল না। এ হ'ল সে মহান ক্ষমতা হস্তান্তর বা সামাজিক চুক্তি। সে চুক্তিতে যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট এমনি অঙ্গীকার করল : 'আমি এ ব্যক্তিকে বা 'ব্যক্তি-পরিষদ'কে আমাকে শাসন করবার ভার দিয়ে আমার অধিকার পরিহার করছি এ শর্তে যে, তুমিও অনুরূপভাবে তোমার অধিকার পরিহার ক'রে

১। ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গ্রন্থ *'Leviathan'*-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ; কিন্তু ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দের আগে তা প্রকাশিত হয় নি।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে শাসনের অধিকার তার হাতে অর্পন কর'। 'এ হ'ল সে বিরাট-কায় দৈত্য রাজের আমল বা শ্রদ্ধাভরে বলতে পারি—মরণশীল দেবতার আমল। অমর ঈশ্বরের স্নেহচ্ছায়ায় আমরা আমাদের শান্তি ও প্রতিরক্ষার জন্য সে মরণশীল দেবতার নিকট ঋণী'।

'প্রাকৃতিক অধিকার,' 'প্রকৃতির রাজ্য', প্রাকৃতিক নিয়ম', 'চুক্তি' এবং সামাজিক সংস্কার নামে যে সব সূত্র দিয়ে হবস্ তাঁর এ মতবাদকে গেঁথে রেখেছেন তার সবগুলোয় তাঁর আমলের বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল। চুক্তির ভিত্তিতে হব্‌সের শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও মৌলিক নয়; কেননা ষোল শতকের 'Vindicae Contra Tyrannos' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিন্তু হব্‌সের চুক্তিতে যা উল্লেখ-যোগ্য, তা হ'ল এর কঠোরতা। ক্ষমতা হস্তান্তর হ'তে হবে সম্পূর্ণ। হবস্ অবশ্য ক্ষণেকের জন্য ইতঃস্তত করেছেন যখন তিনি চিন্তা করেছেন মানুষ নিরাপত্তার আকারে কোন মূল বস্তু না পেলে তাদের অধিকার হস্তান্তর করবে কেন? সার্বভৌম পেয়ে যদি তাদের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন? কিন্তু তিনি সব সময়ই তাঁর বিকল্পে অটল—হয় অধীনতা, না হয় নৈরাজ্য; 'তাই তিনি তাঁর সার্বভৌমের হাতে প্রত্যেক জিনিসের শেষ সীমা পর্যন্ত কেন্দ্রায়নের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। চুক্তিতে মানুষ সার্বভৌমের নিকট সব কিছু প্রত্যার্পণ করেছে এবং সার্বভৌমের ক্ষমতা হয়ে উঠেছে সর্বোচ্চ। সম্পত্তির উপর, মতামত প্রকাশের উপর, এমন কি ধর্মীয় উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানের উপরও সার্বভৌমের সীমাহীন ক্ষমতা। যদি কর্তৃপক্ষের শেষ ক্ষমতার প্রয়োগ বিবেকের বিরোধী হয়, তবে তার যে উত্তর হবস্ দিয়েছিলেন তা সে যুগেও সন্তোষজনক ছিল না। ইরিপাইড্‌সের বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি ছত্রে তিনি যা বলেছেন হব্‌সও তেমনি বলতেন, 'মুখ শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছে, কিন্তু মন শপথে সায় দেয় নি।' মুখে স্বীকার করাটা একটা বাহ্যিক ব্যাপার এবং আকার-ইঙ্গিতে তার মাধ্যমে আমরা আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করি। ধর্মবিশ্বাসীদের অসুবিধা হয়েছিল বেশী। প্রয়োজনবোধে রিমনের গৃহেও সে প্রণতি জানাতে বাধ্য হয়।

কিন্তু যে সময়ে স্বৈরতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ছিল, সে সময়েও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হবসের এ স্বতঃসিদ্ধ গৃহীত হয় নি। মানুষ নিজেদের কাছে

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন করেছিল—অধীনতা ও যুদ্ধের অবস্থা—এ দুটি ছাড়া কি অন্যপথ নেই? অন্য চুক্তির মত এ চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না কেন? প্রজারা পারস্পরিক ভিত্তিতে সে চুক্তি পালনের দাবী জানায় না কেন? সামাজিক রাষ্ট্রে থেকে মানুষ নতুন আর এক সার্বভৌমের জন্ম দিতে পারে না? প্রথমে সম্পন্ন হয়েছিল সমাজ গঠনের চুক্তি এবং তারপর এসেছিল সার্বভৌম শক্তি সংগঠনের ঐক্যমত। এখন প্রশ্ন ওঠে—প্রথমটিকে রেখে দ্বিতীয়টির পরিবর্তন সাধন করা কি সম্ভব নয়? এতে যদি বিপ্লব বাধে তবে সে দোষ কি প্রজাদের? এবং তা কি নেহাত অর্থহীন? এসব প্রশ্নই লককে তাঁর মতবাদ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেন।[১] কোন জীবজন্তুর প্রদর্শনীতে বা ক্রীতদাস-রাষ্ট্রে যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান, তেমনি শৃঙ্খলাই শুধু মানুষ চায় না; মানুষ চায় এমন এক সুষম ব্যবস্থাপনা, যেখানে সম্পত্তি থাকে নিরাপদ, ন্যায়নীতি হয় প্রতিষ্ঠিত এবং স্বাধীনতা হয় অর্থপূর্ণ। 'প্রকৃতির রাজ্যের দায়িত্বগুলো সমাজেও বর্তমান থাকে।' 'আইনের লক্ষ্য শুধু অবসান ঘটানো বা প্রতিরোধ করাই নয়, আইনের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও তার শ্রীবৃদ্ধি'। এভাবে লক চুক্তির অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন। মানুষের যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে এক মুহূর্তে মূর্ত হয়ে ওঠে না; বরং তা রাষ্ট্রের জীবন্ত নীতিনির্ধারকরূপে সদা বর্তমান থাকে। রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে লকের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ হ'তে পারে। হবস্ যেখানে প্রতিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দিয়েছেন, সেখানে লক সম্পত্তির সংরক্ষণের প্রতি জোর দিয়েছেন। সে আমলের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে তিনি অধিকারের পুরোনো ধারণা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, অনুমিত 'প্রকৃতির রাজ্য' থেকে মানুষ কিছু কিছু অধিকার নিয়ে সমাজে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য এ চিন্তাধারা আর তেমন অপরিহার্য নয়। এ ধারণা আবার জাগ্রত হচ্ছে যে, মানুষ হ'ল প্রকৃতপক্ষে একটা সামাজিক প্রাণী এবং সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সরকারের অস্তিত্বের সূত্র। এ নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কিন্তু অতি ধীরে তা জাগ্রত হয়েছে এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানের

১। লকের '*Two Treatises on Government*। গ্রন্থটি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর পরই প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

সূচনা সেখান থেকেই শুরু। এ ধারণা সামাজিক চুক্তিবাদের বিখ্যাত ত্রয়ীর অবশেষ জঁা জ্যাঁক রুশোর লেখায় আরও অগ্রগতি লাভ করেছে। তিনিও সামাজিক চুক্তিবাদের পুরোনো হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রকৃতির মানুষকে নাগরিক হিসেবে রূপান্তরিত করেন বটে, কিন্তু আসলে তা ছিল এক রক্ষণশীল ব্যবস্থা এবং তার মাধ্যমে তিনি এক সামাজিক দর্শনের বিকাশ ঘটান। তাঁর দর্শন ও হবসের চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল প্রভেদ! রুশোর মতবাদের মূল কথা হ'ল 'একটি সার্বভৌমের' পরিবর্তে মহান সার্বভৌমের পথ নির্দেশ। তাঁর সার্বভৌম হ'ল 'সাধারণ ইচ্ছা' এবং তিনি সে সার্বভৌমের উপর সবগুণের আরোপ করতে চান, যা হবস্ তাঁর 'একটি ব্যক্তি বা ব্যক্তি-পরিষদের' উপর আরোপ করেছেন। রুশোর সার্বভৌমও হ'ল এক ও অবিভাজ্য, সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে, অক্ষয়, অব্যয় ও সর্ব শক্তিমান। কিন্তু দুটোর মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। হবসের মতে স্বাধীনতার অস্তিত্ব শুধুমাত্র আইনের অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল; কিন্তু লক আইনের ক্ষেত্র প্রসরিত করে ও সার্বভৌমে স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে দুটোর সমন্বয় সাধন করেন; কিন্তু রুশো আইনকে স্বাধীনতার সার্থকতা ও তার বিশিষ্ট প্রকাশ বলে ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের অনিশ্চিত স্বাধীনতা সামাজিক ব্যবস্থার সুনিশ্চিত ও ব্যাপক স্বাধীনতায় রূপ লাভ করে। আইন শুধুমাত্র যে স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তার সম্ভাব্য অভিভাবক তাই নয়; বরং তার বাস্তবায়নের স্বরূপ—এ মতবাদ রাষ্ট্রের সঠিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে রাজনৈতিক দায়িত্বের সমস্যার এক নতুন ও উল্লেখ-যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রুশো বলেছেন যে, সরকারের কার্য ক্ষমতা সঠিক সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছার' উপর ন্যস্ত হ'লে সে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যখন তা ঘটে, তখন সকলে সকলের সাথে সম্মিলিত হয়ে বা সকলে সকলকে মেনে চলে আগের মত স্বাধীনভাবে চলতে পারে।

সুতরাং রুশোর মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল 'সাধারণ ইচ্ছার' ধারণা এবং তার প্রয়োগের ফলে সরকার স্ব-শাসিত সরকারে রূপান্তরিত হয়। এ নীতির গভীর সত্যটি মোটামুটি এই যে, সমাজ হ'ল এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য এবং এ ঐক্য অনুভূতি সাধারণ স্বার্থ বা সাধারণ কল্যাণের অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'আমরা সবাই সে রাষ্ট্রদেহের অংগ এবং দেহ তার কোন অংগের ক্ষতি সাধন করতে চায় না।' এ সবার কল্যাণ

www.nagorikpathagar.org

কামনা করে এবং সঠিক সার্বভৌমেরও কল্যাণ কামনা করে। প্রত্যেক সমাজে এমনি জীবন্ত ও সহজাত ঐক্য থাকতে হবে এবং সরকারের কাজ হবে তার নিশ্চয়তা বিধান করা ও তার সার্থকতা আনয়ন করা। তা অন্য কিছু করতে চাইলে তা তখন আর ইচ্ছা তার রাষ্ট্রের ইচ্ছা থাকে না। তখন তা এক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয় এবং জোর করে সঠিক সার্বভৌমের স্থান দখল করতে চায়।

এ নীতি বিরাটভাবে বিকশিত হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ—রুশো ছিলেন অত্যন্ত অধৈর্য এবং এ নীতিকে তেমন আর বিকশিত করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, কিভাবে সাধারণ ইচ্ছা জাতীয় সত্তায় প্রকাশিত হতে পারত। কিভাবে তা সকল রকমের আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারত, কি ভাবে সংকটকালে তা নির্দিষ্ট ও বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রের অবিসম্পাদিত আধ্যাত্মচেতনায় রূপান্তরিত হ'তে পারত এবং অন্য সময়ে কিভাবে সামাজিক কাজকর্মের অভ্যন্তর থেকে তা চূড়ান্ত সংযমরূপে কাজ করতে পারত তা রুশো দেখাতে পারতেন। তিনি আরও দেখাতে পারতেন, কিভাবে 'সাধারণ ইচ্ছা' যুগের প্রভাবে 'আইনের আধ্যাত্মসত্তা' সৃষ্টি করতে পারে। তাঁরই পূর্বসূরী মতেস্কুঁ এর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করতে পারতেন, কিভাবে এ নীতি আদিম জনগোষ্ঠির সংহতি রক্ষায় নিয়ত বর্তমান ছিল, এবং কিভাবে গণতন্ত্রের বিবর্তনে এ নীতি সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সবশেষে, তিনি এ নীতিকে এক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন যার আলোকে সরকারের নীতি শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা সম্ভব হয়। কিন্তু রুশো আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার অসম্ভব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁর হেগেলীয় শিষ্যগণও এ দৃষ্টিভংগীর অনুকরণে প্রলুব্ধ হন; ফলে তিনি ভয়ংকর ত্রুটিপূর্ণ জালে জড়িয়ে পড়েন; যার ফলে তার মৌলিক সত্যের আলোচনাও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি 'সাধারণ কল্যাণের ইচ্ছা' ও 'সার্বজনীন ইচ্ছাকে' এক করে দেখলেন এবং সাধারণ কল্যাণের ইচ্ছার আলোকে তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছার' সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন এবং তাকে 'জনসাধারণের ইচ্ছার' পর্যায়ে নিয়ে এলেন। 'জনসাধারণের ইচ্ছা' বাস্তব সার্বভৌম হ'তে পারে; কিন্তু তা তাঁর আদর্শ সার্বভৌম থেকে স্বতন্ত্র; এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সংখ্যাগুরুর শাসনের মূল অর্থ বিবেচনা করতে অনিচ্ছুক হ'লেন। নিষ্কাম ধারণা

www.nagorikpathagar.org

থেকে উদ্বুদ্ধ কোন একটি ভোটের মূল্যায়ন রাজনৈতিক দিক থেকে যাচাই করা সম্ভব নয়। কোন ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র ছাড়া কোথাও সমগ্র জনগোষ্ঠি আইন প্রণয়ন করতে পারে না এবং সে পর্যায়ে বিশ্ব আর কোনদিন ফিরে আসবে না। আর যদি তা ফিরে আসেও, তবেও সরকারকে সংখ্যাগুরুর সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে কাজ চালাতে হবে ; কেননা কোনদিনই ঐক্যমত লাভ করা সম্ভব নয়। রুশো রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ভিত্তি হিসেবে 'সাধারণ ইচ্ছাকে' গ্রহণ না ক'রে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের ব্যবহারিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত করতে।

পুরোনো চুক্তি মতবাদকে নতুন যুগের উপযোগী করবার জন্য রুশো তার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু তার অবস্থান পরিবর্তন করে দেন। তাঁর বিমূর্ত সার্বভৌম হবসের বাস্তব সার্বভৌমের মতই ছিল স্বৈরাচারী। এ যেন লুই কোয়াটোজের সর্বশক্তিমান বিপ্লব পরিষদের শাসনব্যবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, তাঁর সার্বভৌম সামাজিক ধর্মের কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছে যা প্রত্যেক নাগরিক মেনে চলবে ; না মানলে তাকে নির্বাসিত হ'তে হবে। তারপরেও যদি সে তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হবে।[১] স্বাধীনতার অগ্রদূত এভাবে অসহিষ্ণুতার অজুহাতে অন্যসব ধর্মমতকে মুছে ফেলেন।

এমনি অসংগতির ভেতর দিয়ে রুশোর মানসিকতার পরিচয় মেলে। এবং এসব তাঁর সামাজিক চুক্তিবাদের সমগ্র মতবাদের ত্রুটি সুস্পষ্ট ক'রে তোলে। রাষ্ট্রকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও কোনদিনই চুক্তি-বাদের মাধ্যমে সমাজের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, এবং এ মতবাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক ক'রে দেখা হয়েছে। এ বিভ্রান্তি থেকে সামাজিক চুক্তিবাদ কোনদিন মুক্তি লাভ করে নি। সমাজই হ'ল মানব জীবনের শর্তস্বরূপ ; কিন্তু এ মতবাদে সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন পূর্ণ মানবীয় ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যতীত এ চিন্তা অবাস্তব। এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র একটি 'ইচ্ছা সংগঠন' রূপে গ'ড়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র আজকের স্বরূপ সৃষ্টি করেছে।

১। *'Social Contract'* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু রাষ্ট্র যে সামাজিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছে, তা কখনও প্রাথমিক সমাজব্যবস্থার মত হ'তে পারে না ; এমন কি চরম স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায়ও তা একরূপ হয়নি। রাষ্ট্র তার পথ পরিক্রমা শুরু করবার আগেও রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্র যখন সগৌরবে ক্ষমতাদম্ভে দাবী জানিয়েছে যে, সে-ই সবকিছু ; তখনও সমাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে : "এ পর্যন্ত মাত্র, আর নয় কিন্তু।" প্রথমে নীরবে বললেও পরে সমাজ তার অধিকার সচেতনতায় তার হাতিয়ার শাণিয়ে বলেছে—'সীমা লঙ্ঘন কোরো না।' সার্বভৌমত্বেও একটা সীমারেখা আছে ; কিন্তু চুক্তিবাদ সে সীমা নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছে।

চুক্তিবাদ রাষ্ট্রকে ইচ্ছার সঠিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দুজ্ঞেয় ও সেকেলে ধারণার বিজাতীয় ও অসংগত প্রভাব থেকে রাষ্ট্রকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু চুক্তিবাদ ইচ্ছার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারে নি। এটা করবার জন্য দরকার ছিল প্রকৃতির রাজ্য ও চুক্তির সব কলাকৌশলকে পরিত্যাগ করা। রুশোর মধ্যে এ মতবাদ অগ্রগতি লাভ করেছে ব'লে মনে হয়। তিনি 'ইচ্ছার' নীতিকে গভীর এক তাৎপর্য দান করেছেন। যে সমস্যা রাষ্ট্রকে সমাধান করতে হবে তিনি তার সঠিক ব্যাখ্যাদান করেন। স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মিলন সম্পর্কে রাষ্ট্র যা সূচনা করেছে, তিনি অনেক পরিমাণে তা অনুধাবন করেছেন। এ দু'টি উপাদানের সীমাহীন বিরোধ সংক্রান্ত উভয় সংকটের সার্থক সমাধানের কথা তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করেন ; যদিও তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। সব ত্রুটি সত্ত্বেও এটা ছিল এক আদর্শ-স্বরূপ ; যার অনুসরণে রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করতে পারত। অবশ্য তিনি সে আদর্শকে রাজনৈতিক বাস্তবতার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারেন নি। এরপর দরকার ছিল অনুসন্ধানের এক আরোহপদ্ধতি এবং সামাজিক লক্ষ্যের সাথে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন। কিন্তু চুক্তিবাদী দার্শনিকগণ তা উপেক্ষা করেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনে যেভাবে রাষ্ট্র গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভংগির পরিচয় মেলে।

চার : দুজ্ঞেয় সত্তা হিসেবে রাষ্ট্র

আদিমকাল থেকে রাষ্ট্রীয় সত্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু মন বিভ্রান্ত হয়েছে। চুক্তিবাদ ছিল আসলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। রাষ্ট্র এবং

www.nagorikpathagar.org

সমাজ তার সদস্যগণের নির্দিষ্ট ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত এক সংগঠন মাত্র। এ এমন এক সৌধ, যা তাদের হুকুমে গ'ড়ে উঠেছে এবং সুবিধা বা কল্যাণ ছাড়া এর আর কোন সুদৃঢ় ভিত্তিমূল নেই। সুতরাং বিচার বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, এ মতবাদে কিছু সত্য রয়েছে ঠিক; কিন্তু তা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। এর প্রধান ত্রুটি নিহিত রয়েছে ভিত্তি ও সৌধের উপরিভাগের গাঁথুনির বিভ্রান্তিমূলক সমতায়। সমাজ হ'ল চূড়ান্ত জীবনের অন্তর্নিহিত এক সত্তা এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে তার ভিত্তিমূল নিহিত। রাষ্ট্র হ'ল তার এক প্রয়োজনীয় প্রকাশ মাত্র; রাষ্ট্র চূড়ান্ত নয়। মানুষ একটি রাজনৈতিক প্রাণী, এবং তার কারণ হচ্ছে মানুষ মূলতঃ একটি সামাজিক প্রাণী। এই সেদিন পর্যন্ত এ দু'য়ের পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণের সব প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সামাজিক চুক্তিবাদীরা যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হবস্‌ ও লকের মত কেউ কেউ সামাজকে সর্বসম্মত ইচ্ছার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। ইচ্ছার এরূপ ঐক্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানিক সৌধ গ'ড়ে তুলেছে। ফলে কোন গভীর ঐক্যের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সে সৌধ অনিশ্চিত ও কৃত্রিম হয়েই রইল। রুশোর মত কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক চুক্তির মধ্যে সমাজের গভীর তাৎপর্যকে ধ'রে রাখতে চাইলেন; কিন্তু কোন কুশলী মন সে সত্যকে যথাযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। ইচ্ছার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে স্থাপন করার প্রচেষ্টায় চুক্তিবাদীরা সঠিক পন্থা অবলম্বন করেন; কিন্তু সমাজ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তাঁরা দু'টিকে এক পর্যায়ে ফেলেছেন এবং কোনটিরই যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নি।

সামাজিক চুক্তির প্রতিপক্ষরাও একই কারণে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। সমাজের চুক্তি ভিত্তিকে অস্বীকার করায় তাঁরা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সত্যি; কিন্তু রাষ্ট্রের বেলায় তাঁদের সে অস্বীকৃতি সঠিক ছিল না। চুক্তিবাদীদের অবদানকে তাঁদের প্রতিপক্ষরা অস্বীকার করতে চাইলেন। চুক্তিবাদীরা আইন ও সরকারের মত প্রতিষ্ঠান থেকে অস্পষ্ট রহস্য উন্মোচন করলেন; কিন্তু তাই ছিল তাদের মূল্যবান এক সম্পদ। বার্কের মত মনীষী আবার সে রহস্য পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী হ'লেন। এদিক দিয়ে তাঁরা অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক চিন্তাধারার অগ্রগতি রোধ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন এটা নিসন্দেহ। সমাজের সংগোপন গর্ভে এমনসব শক্তি ক্রিয়ারত রয়েছে, যা আমাদের চিন্তা থেকেও গভীর এবং আমাদের ইচ্ছা থেকেও প্রবল; কিন্তু সচেতন সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রকে আমাদের সচেতন লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করতেই হবে। যখন বার্ক আর একবার সরকারকে দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেলেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে আর একবার যুক্তির বিরুদ্ধে ঐতিহ্য ও ধর্মের আবেদন তুলে ধরলেন, তখন তিনি আমাদের উপকার না ক'রে বরং অপকারই করলেন; তিনি সুস্পষ্ট পুনর্ব্যাখ্যা দিয়ে চুক্তিবাদের ধারণাকে রুশোর চেয়েও ধর্মনিষ্ঠ ও সার্বজনীন ভাবধারায় রূপান্তর ক'রে কোন্ উপকার করলেন? তাছাড়া, বার্ক পুরোনো জীবদেহের সাথে সাদৃশ্যের প্রতি আবেদন জানিয়ে যখন চরম অধিকারকে সমর্থন জানালেন, যা ইতিমধ্যেই অতীতে ঝরাপাতায় গুমরিয়ে মরছিল, তখন তিনি চিন্তাধারার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতেই চাইলেন।

চুক্তিবাদীরা চুক্তির মাধ্যমে সমাজের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, এবং সাথে সাথে এটাও বলা প্রয়োজন যে, তাঁদের প্রতিপক্ষদের প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে নতুন আলোর সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়। সাদৃশ্য তুলে ধ'রে কোন কিছু প্রমাণ করতে যাওয়া খুব স্বাভাবিক; কিন্তু সাদৃশ্য সত্যিই এক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। প্রথম থেকেই মানুষ রাষ্ট্র দেহকে একটা ব্যক্তির সাথে বা মনের সাথে বা মনুষ্য দেহের সাথে তুলনা ক'রে এসেছে। মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তু'লে ধরবার জন্য তা সহায়ক হয় সত্যি বা; সত্যিই তা ঐক্যের বাস্তবতা ও সার্থকতা তুলে ধরতে সাহায্য করে; কিন্তু এ সাদৃশ্যকে এক পর্যায়ের বাইরে টেনে নিলে তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো মনের তিন অংশের সাথে সমাজের তিনটি শ্রেণীর তুলনা ক'রে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। মধ্যযুগের চিন্তাবিদগণও অত্যন্ত নিপুণভাবে ও চরম পর্যায়ে দেহের সাথে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য তুলে ধ'রেছেন। তুষা নিবাসী নিকোলাস আবিষ্কার করেন যে, রাষ্ট্রদেহে সরকারের কার্যালয়গুলো হ'ল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আইন হ'ল তার স্নায়ু, সম্রাট হলেন মাথা এবং প্রজারা হ'ল মাংস।[১] রাজনৈতিক তত্ত্বের পরবর্তী ইতিহাসেও এমনি ধরনের

১। গীয়ার্কের (*Gierke*) '*Political Theories of the Middle Age*' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হবস্‌ও তাঁর রাষ্ট্রকে আখ্যায়িত করেছেন এক মরণশীল দৈত্যরূপে। যখন চুক্তিবাদের কাল ফুরিয়া এল, তখন এ ধারণা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সামাজিক চুক্তিবাদের কলাকৌশলের প্রতিবাদে বার্ক জীবন্ত দেহের যুক্তির অবতরণা করেন। স্পেন্সার ও শাফলের লেখায় এ গতি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। পরবর্তীকালে অতি দ্রুতগতিতে জীবদেহের সাথে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য ধারণা—তথা রাষ্ট্রের উপর বা সমাজের উপর এক খাদ্যবাহী ব্যবস্থা, স্নায়ু-কেন্দ্র, রক্তপ্রবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতির আরোপ অত্যন্ত ও অনর্থক কাল্পনিক মনে হ'তে লাগল। যখন ব্লুন্টস্‌লী রাষ্ট্রকে পুরুষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব'লে ঘোষণা করেন, তখন এ তত্ত্বের সমর্থকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠলেন।[1] এ ভাবে জৈবিক মতবাদ তার মর্যাদা হারাল এবং যাঁরা 'চুক্তিবাদী সত্তা' বা 'আধ্যাত্মিক সত্তা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাঁরাও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন না।

রাষ্ট্রের সঠিক প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য মানুষ আবার দেহ ছেড়ে মন বা ব্যক্তির আশ্রয় নিতে চাইল। কেউ কেউ বলল—রাষ্ট্র হ'ল এক বৃহত্তর মন বা অতি মানব; যার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য রাষ্ট্র সংগঠনকারী ব্যক্তিদের মন বা পুরুষকে ছাপিয়ে ওঠে। রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছার' ব্যাখ্যায় এ মতবাদ কিছুটা সমর্থন পায়। রুশো অত্যন্ত দুর্বোধ্যভাবে 'সাধারণ ইচ্ছা' ও 'সকলের ইচ্ছার' মধ্যে এক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর এক ও অবিভাজ্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সদস্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা থেকে ছিল মহত্তর ও পবিত্রতর এবং অনেক বেশী বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন। জাতির ঐক্য ও অধ্যাত্ম সত্তার নামে ফিক্‌টে (Fichte) এ ধারণা গ্রহণ করেন; কিন্তু হেগেলের দর্শনে এর চরম বিকাশ হয়।[2]

রাষ্ট্র এক জীবন্ত ব্যক্তির মত (শুধু এক জীবন্ত সত্তা নয়) তার আত্ম-সচেতনতায় নিহিত রয়েছে তার ঐক্য। রাষ্ট্র হ'ল সমষ্টিগত এক ব্যক্তির মত যেন এক মহিমামণ্ডিত ব্যক্তির মত যেন এক গৌরবময় ঈশ্বর; যাঁর চিন্তাধারা আমাদের চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র এবং যাঁর কাজকর্ম আমাদের কাজকর্ম থেকে ভিন্ন। হেগেল রাষ্ট্রের উপর যে 'আইনগত ব্যক্তিত্ব'

১। ব্লন্টস্‌লির (*Bluntschli*) *'Theory of the State'* গ্রন্থের প্রথম প্রমথ, খণ্ডঅধ্যায়।

২। হেগেলের (*Hegel*) *'Philosophie des Rechts'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

আরোপ করেন, রাষ্ট্র শুধুমাত্র তাই নয়। আইনের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির রয়েছে একটা সুস্পষ্ট অর্থ; কিন্তু হেগেলের নিকট রাষ্ট্র ছিল অধিকার ও দায়িত্বের সহজসাধ্য মুখপাত্রের ঊর্ধ্বে। এর মাধ্যমে তিনি জাতি গঠনের যে ঐক্য, তা প্রকাশ করেছেন। আমরা যখন কোন জনগোষ্ঠীর মন বা অধ্যাত্ম চেতনা সম্পর্কে বলি, তখন তাদের মনের বা অধ্যাত্ম চেতনার সাধারণ গুণাবলীর কথা মনে করি। কিন্তু হেগেল শুধুমাত্র সাধারণ গুণাবলীর কথা ভাবেন নি বা একই প্রকৃতির মানুষদের সাধারণ প্রকৃতির কথা ভাবেন নি। তিনি সমগ্র জাতির দেহে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি-কারী মনের কথা চিন্তা করেছেন,—যে মন পরিচালনা করে ও শাসন করে এবং যে মন রাষ্ট্রের সদস্যদের মনের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব। এমন কি তা নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতিহাসের গতিকে সক্রিয় রাখে। ব্যক্তি তার সাময়িক অস্ত্রশস্ত্র এবং এক একটা যুগ তার সৃজনশীল ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।

এ মন কিভাবে ব্যক্তি মনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা এক রহস্য এবং আরও রহস্যজনক হচ্ছে কিভাবে সে মন রাষ্ট্রের সাথে একাত্মবন্ধনে আবদ্ধ। হেগেলের সাম্প্রতিককালের একজন শিষ্য বার্নার্ড বোসাঙ্কেট প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে রাষ্ট্রের ইচ্ছা হ'ল তার সদস্যদের 'প্রকৃত' ইচ্ছা; যদিও তাদের 'বাস্তব' ইচ্ছা 'প্রকৃত' ইচ্ছার অনুরূপ নয়।[১] কিন্তু যদিও আমরা হেগেলের ব্যাখ্যায় 'বিবেকবান ইচ্ছা ও' 'প্রকৃত ইচ্ছার' ক্ষমতা গ্রহণ করি, তা হ'লেও বুঝাতে পারিনা কিভাবে সরকারের কাজকর্মে প্রতিফলিত 'কার্যকারী ইচ্ছা' উন্নত বিবেক বিচারসম্পন্ন ব'লে বিবেচিত হবে। তা না হ'লে বলতে হবে যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত ইচ্ছা সরকারের ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র। ফলে সেটাও অবাস্তব। হেগেল এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট। যদিও তিনি কার্যকরী জাতিকে জাতীয় মনের মূর্তপ্রতীক ব'লে স্বীকার করেন নি; তথাপি তিনি ঘোষণা করেন যে, 'শাসন তান্ত্রিক সম্রাট' হলেন বিবেক বিচারের একটা শাখা ও তার প্রকাশ। এ ভাবে তিনি তাঁর দেশ ও কালের গতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এ মত প্রতিষ্ঠা করেন যে, সরকারের স্বর্গীয় পথ পরিক্রমায় রাজাদের কোন স্থান নেই।

১। *Bosanguet*-এর *'Philosophical Theory of the State'* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। হেগেলীয় চিন্তাধারার সমালোচনার জন্য হবহাউস (*HobHousc*) *'Metaphysical Theory of the State'* দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের ঐক্য ও প্রকৃতির ব্যাখ্যাস্বরূপ 'একক মন', 'ব্যক্তি' বা 'সত্তা' প্রভৃতি যেসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি কঠোর সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ এর ফলে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যদি সম্প্রদায়ের উপর এক স্থায়ী মনের গভীর ও স্থায়ী সংহতির গুণ আরোপ করা হয়; তবে রাষ্ট্রের উপর সে-গুলো আরোপ করার কোন যুক্তি থাকে না; কেননা আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্র হ'ল সম্প্রদায়ের সৃষ্ট এক সংগঠন এবং তার রয়েছে কতক-গুলো সীমিত লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের বিশেষ কতকগুলো পন্থা। রাষ্ট্র কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয় যে, তার নিজের জন্য কতকগুলো লক্ষ্য সে আপন অধিকারে বা আপন কল্যাণের জন্য অর্জন করবে। তার সদস্য-দের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সে এক হাতিয়ার মাত্র এবং এ উদ্দেশ্য বাদ দিলে তার সমগ্র কাঠামো অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের ঐক্য তার নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার ঐক্য বাহির থেকে আসে এবং যারা তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সম্প্রদায় এ ঐক্যকে সংহত রাখে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত কোন কিছু নয় বা তা আত্মনির্ধারিত নয়। এটা একটা ন্যস্ত ক্ষমতার মত, একটা প্রাপ্ত শক্তিস্বরূপ বা কার্যভার তুল্য। প্রথমতঃ আমাদের সামাজিক ঐক্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তারপর আমরা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐক্য সম্বন্ধে জানব ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারব।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্রের ঐক্যকে তার কোন অংশের ঐক্য বা সদস্যদের ঐক্য ব'লে ব্যাখ্যা করতে চাইলে তা হবে নিছক ত্রুটিপূর্ণ। রাষ্ট্র বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। তাই বলে কোন ব্যক্তির ঐক্য রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। কোন বৃক্ষরাজি সমন্বিত কুঞ্জবন একটা বৃক্ষ নয়, বা বহু সংখ্যক প্রাণীর কোন খোয়াড়কে একটা প্রাণী বলে গণ্য করলে ভুল হবে। তেমনি বহুসংখ্যক ব্যক্তির কোন সমাজকে একটা ব্যক্তি ব'লে বিবেচনা করাও অর্থহীন। এ ধরনের বিবেচনার ফলে যে সম্পর্ক ব্যক্তি বর্গের মধ্যে ঐক্য রচনা করে তা হারিয়ে যায়। আমরা দ্রব্যের প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্কে এক ক'রে দেখলে যা খুঁজে ফিরি অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের বিষয়—তা হারিয়ে যায়। কিভবে বিভিন্ন মন সংযুক্ত হয়েছে আমরা তা জানতে চাই; কিন্তু আমাদের বলা

www.nagorikpathagar.org

হয় যে, সম্পর্কের ব্যবস্থাই হচ্ছে মন।[১] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এমন সহজ ও বিভ্রান্তিকর উত্তর অবাস্তব। যে বিজ্ঞানে বলা হয় যে, পরমাণু ব্যবস্থাকে পরমাণু ব'লে ধরতে হবে বা তারকা মণ্ডলটাই একটা তারকা; সে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কি ধারণা পোষণ করব? একইরূপে উপাদানের ঐক্যকে তার নিজস্ব উপাদানের কাঠামোর সাথে তুলনা করা উচিত নয়।

এমনি অযৌক্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার বাস্তব অসুবিধা নিহিত রয়েছে সামজিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যায়। রাষ্ট্র যদি বৃহৎ এক ব্যক্তি বা বৃহত্তর কোন মন হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের মত তার নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে এবং রয়েছে তার নিজস্ব সার্থকতা; যা তার সদস্যদের মূল্যবোধ ও সার্থকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাষ্ট্র যেন তার নিজস্ব অধিকারে বেঁচে রয়েছে। এ চিন্তাবিদগণের মতে, রাষ্ট্র তার সদস্যদের সমষ্টি নয়, এবং এ থেকে আরও বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের যে লক্ষ্য রয়েছে তা তার সদস্যদের ভাল মন্দের লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্রও হ'তে পারে। আসলে স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করার এ আর এক অভিনব পন্থা। আমি নিম্নলিখিতভাবে অন্যত্র এ মতবাদের সমালোচনা করেছি: "এতে মানব সম্প্রদায়কে মানুষের চেয়ে বড় কিছু বা জাতিকে তার সদস্যদের উর্ধ্বে কিছু ব'লে গণ্য করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মানুষের জন্য কাজ করা ছাড়াও মানব সম্প্রদায়ের উপকার করা যায়, বা জাতির সদস্যদের সেবা না ক'রেও জাতির সেবা করা সম্ভব। সমাজের লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে তার সদস্যদের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের সামগ্রিকতাকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখলে সমাজের সদস্যদের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তা বিশিষ্ট এক লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এর মূল্যায়নে আমরা শুধু যে গুরুত্বদানে ব্যর্থ হই তা নয়; একে সতসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করলে বাস্তবেও তার মূল্যহ্রাস হয় যথেষ্ট পরিমাণে। যদি সমগ্রের লক্ষ্যের বাস্তবায়নে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা তার ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকে, তবে ব্যক্তিত্বের ধারণা নিছক কল্পনা; কেননা প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে তা যেমন নির্ভরশীল, তেমনি প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েই সে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়।"[১]

১। ম্যাকডোগালের (*Mcougale*) '*The Group Mind*' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

যে ত্রুটির কথা বর্ণনা হ'ল তা যেকোন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়: যদি সে ব্যবস্থায় সমগ্র বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে তার কোন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ—তা সে সমষ্টিগত মনই হোক আর সামাজিক সত্তাই হোক। সম্প্রদায় বা তার সৃষ্ট রাষ্ট্রকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে হ'লে এ ধরনের সাদৃশ্যমূলক তুলনা পরিহার করতে হবে। রাষ্ট্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে আমাদের প্রথমে সামাজিক ঐক্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে; কেননা রাষ্ট্রের অনুধাবন সূত্র নিহিত রয়েছে তার নিজস্ব সংগঠনের বাইরে—সম্প্রদায়ের মধ্যে; যে সম্প্রদায়ের সেবায় রাষ্ট্র নিয়োজিত। সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে এবং তার ঐক্য বজায় রেখেছে। এর আগেই আমরা আংশিকভাবে তা দেখিয়েছি এবং পরবর্তী এক অধ্যায়ে এর বিস্তৃত আলোচনা হবে।

২। '*Philosophical Review*' পত্রিকায় ১৯১৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় লেখকের প্রবন্ধটি ছাপান হয়। তার শিরোনামা ছিল '*Personality and the supra—Personal*'।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম পর্যায়

আধুনিক কালের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

www.nagorikpathagar.org

সাত

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

আধুনিক কালের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

এক ঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমূহবাদ।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর নতুন নতুন সমস্যার উদয় হ'ল। একদিকে দেখা দিল নতুন এক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবেশ, যা শ্রেণীরাষ্ট্রে কোন দিন দেখা দেয় নি। শ্রেণীরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। ফলে সেখানে সম্প্রদায়ের নৈতিক জীবন বা অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কোন সমষ্টিগত কাজের প্রয়োজনও হয়নি; বাঞ্ছনীয় ও মনে হয়নি। ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ ক'রে শ্রেণীরাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত না—এটা ঠিক; কিন্তু জাগতিক বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিয়ম মাফিক গণতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারই বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একথা খুব খাটে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন ছিল প্রাচীন শ্রেণীরাষ্ট্রের ধ্বংসের একটা শক্তিশালী কারণ; তেমনি নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা করতে অর্থনৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এগিয়ে আসে। অ্যাডাম স্মিথের মত লেখক এ মতবাদের পূর্বসূরী ছিলেন। কিন্তু এ মতবাদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। শুধুমাত্র প্রাচীন মতবাদীরাই যে এর বিরোধিতা করে তা নয়, যারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রাচীন বা নব্য অর্থনৈতিক উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে তাদের কাছ থেকেও এ মতবাদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ ভাবে এক নতুন সমূহতন্ত্রের জন্ম হয়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমূহতন্ত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার ফলে উনিশ শতকে রাজনৈতিক ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় মত বিরোধের সৃষ্টি হয়; তবে তার পূর্বের ব্যাখ্যার দিকে নজর দিলে মনে হয় সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। অবশ্য কোন পক্ষের বিজয়ের ফলে এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি; বরং তারা যে যে অবস্থাকে পূর্বশর্ত হিসেবে ধ'রেছিল, তাদের বিলুপ্তির ফলে এর সমাপ্তি ঘটে। সে মতবিরোধ এখন নতুন ক'রে স্থান পরিবর্তন করেছে।

www.nagorikpathagar.org

স্বাতন্ত্র্যবাদের একজন শ্রেষ্ঠতম উদ্‌গাতার যুক্তি এখানে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। মিলের সংক্ষিপ্ত "On Liberty" প্রবন্ধে এ মতবাদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এটা অংশত: এক নৈতিক আবেদন। অসহিষ্ণুতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের জানা উচিত। যারা তাদের মতামত ও বিশ্বাস সংগঠন করে তাদের দৃষ্টিভংগি, তাদের প্রথা ও আচারণ বিধি জানা উচিত এবং সাথে সাথে জানা উচিত অন্যায়, পাপ বা নির্বুদ্ধিতা সম্পর্ক বিশ্বের নৈতিক মান ও ব্যবহার বিধি, এবং তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বৈধ কাজকর্মের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও জানতে হবে; এ দৃষ্টি-ভংগির বিরুদ্ধে মিল ব্যক্তিত্ববাদের নামে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। তিনি দাবী তোলেন যে, বিভিন্নতা ও মত-পার্থক্যের মধ্য দিয়ে জীবন হয় সমৃদ্ধ। তিনি এটাও বলেন যে, যাঁরা বিশ্বকে সুন্দর করেছেন, গতিশীল ক'রেছেন, তাঁরা সাধারণভাবে ঘৃণিত হয়েছেন। সুতরাং ব্যক্তিত্ববাদ হ'ল কল্যাণের এক মৌলিক উপাদান। ঐতিহ্যবাদী জনসাধারণের অসহিষ্ণু মনোভাবের ফলে এ মতবাদ দমিত হ'তে পারে। তাছাড়া, ক্ষমতার রূঢ় দাস ব'লে পরিচিত আমলাশাহী ও কর্মচারীদের অত্যাচারেও এর পথ রুদ্ধ হ'তে পারে।

নৈতিক আবেদন হিসেবে মিলের যুক্তি সব সমালোচনার উর্ধ্বে। এ অখণ্ডনীয় সত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত যে সংখ্যাগুরুর অধিকার সংখ্যাগুরুর সততার অধিকার নয় এবং সত্যের চাবিকাঠি ক্ষমতার অধিকারীর হাতে দেয়া হয় নি। এ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের উপরও জোর দেয়া হয়েছে যে, ভাল প্রথাও যদি সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে তাহলে তাই বিশ্বকে কলুষিত করতে পারে। তাদের কৌশলগত নিপুণতা দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের বিচার করা উচিত নয়; বরং সে সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বর্তমানে কতটুকু জনকল্যাণ অর্জিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে তা কতটুকু সাহায্য করতে পারবে, তারই মানদন্ডে তাদের বিচার হওয়া উচিত। তাঁর নৈতিক আবেদনের সাথে তেমন কোন পার্থক্য নির্দেশ না করে মিল তাঁর রাজনৈতিক আবেদনও উত্থাপন করেন। তিনি এ নীতির শুরুতেই বলেন: 'একটি মাত্র যে কারণে মানব সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে অন্যের স্বাধীন কর্ম প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করতে পারে তা হল আত্মরক্ষার তাগিদ'। এ বক্তব্যের প্রকৃতি দেখে এ আভাস পাওয়া যায় যে, মিল সামাজিক মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। যেসব কাজ সমাজের সাথে

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট ও যেসব কাজ সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাদের মধ্যে যখন সীমিত পর্যায়ে তিনি পার্থক্য নির্দেশ করতে উদ্যত হন, তখন সে আভাস আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কতগুলো 'স্পষ্ট ও ন্যস্ত দায়িত্ব' রয়েছে, যাদের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এসব দায়িত্বের বাইরে প্রত্যেকটি মানুষ অবাধে তাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে মিল আমাদের একটি রাজনৈতিক নির্দেশ দিতে চেয়েছেন এবং আমাদের হতাশ করেছেন। যেসব 'স্পষ্ট ও ন্যস্ত দায়িত্বের' কথা তিনি ব'লেছেন. সে সম্পর্কে বলতে গেলে কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—কে সেগুলো নির্ধারণ করেছেন? সেগুলো বস্তুপ্রকৃতির সাথে কিভাবে জড়িত? মিল বলেছেন: মাতাল হবার জন্য কোন লোককে শাস্তি দেয়া উচিত নয়; কিন্তু কার্যরত কোন সৈনিক বা পুলিশের লোক মাতাল হ'লে তাদের শাস্তি দেয়া উচিত। মনে করা যাক—একজন লোক মাতাল হয়ে গাড়ী চালাচ্ছে। সে কি যতক্ষণ গাড়ীর দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সজ্ঞানে থাকার 'স্পষ্ট ও ন্যস্ত দায়িত্ব' ভঙ্গ করেছে? মনে করা যাক—একটি লোকের এমনি মেজাজ যে, মাতাল হ'লেই সে ভয়ঙ্কর কিছু ক'রে বসবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ঙ্কর কাজটি না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আইন তাকে বাধা দেবে না? আইন প্রণয়নের সময় মানুষের মন-মেজাজ হিসেবে আনা হয় না এবং কে মাতাল হয়ে সাধারণ স্থানে বিপদ সৃষ্টি করবে তার হিসেব ক'রে কোন আইন তৈরী সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে মিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও আমরা তাতে খুশী হ'তে পারি না। মিল আত্মরক্ষার যে যুক্তি দেখিয়েছেন, মানুষ তারই উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের নিরোধ মূলক ও শাস্তিদানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে। আত্মরক্ষার দাবী আইনের ক্ষেত্রে যোগ্যতর একমান হিসেবে বিচার্য হতে পারে না। মানুষের কল্যাণের জন্য আইনের বহু ব্যাপক প্রয়োগ হ'লে ক্ষতি কি? মতবাদ বা মানুষের বিশ্বাস দমনের বিরুদ্ধে মিলের যুক্তি সত্যিই শক্তিশালী; কিন্তু আচরণের বাহ্যিকরূপ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি খুব দুর্বল; কেননা কোন বাঞ্ছনীয় সমাজ ব্যবস্থা বা অগ্রগতির কর্মসূচীর জন্য মানুষের যেকোন কাজে আইনের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত। এমন কতকগুলো কাজ রয়েছে, যেগুলোকে অসমর্থন করা যায় না; কিন্তু তথাপি সাধারণ কল্যাণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কল্পে আইন সেগুলোকে সমর্থন না-ও করতে পারে। এমনি অসমর্থনের কাজের নিদর্শন

www.nagorikpathagar.org

প্রচুর পরিমাণে মিলবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং মিল নিজেও তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখায় এসব স্বীকার করেছেন এবং সে আমলেও সেগুলোর ভয়ঙ্কর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।[১]

আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে—অন্যান্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত মিল সামাজিক চুক্তিবাদের বিভ্রান্তিকর মতসিদ্ধ থেকে নিজেকে মুক্তি করতে পারেন নি। ব্যক্তিত্ব বিকাশের যুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তি এক নয়; কেননা ব্যক্তি বিকাশের শর্ত সমাজের অবস্থার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে এবং তা অনেকটা সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক চুক্তিবাদের তাত্ত্বিকরা মানুষকে মূলতঃ 'সমাজ বিরোধী' ব'লে ভেবেছেন এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে সামাজিক মানুষে পরিণত করবার প্রয়াস নিয়েছেন। কিন্তু মিল মানুষকে কোন কোন ক্ষেত্রে 'সামাজিক' ব'লে গণ্য করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণরূপে 'ব্যক্তি' হিসেবে মনে করেছেন। কিন্তু আমরা যদি অনুভব করি যে, মানুষের প্রকৃতি হ'ল একই রকম এবং যদি মনে করি যে, সব বিষয়ে সে একটা সামাজিক প্রাণী এবং সাথে সাথে স্ব-শাসিত এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত, এবং তাদের সামাজিকতা ও ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র নয়; তবে আর এক ধরনের সমঝোতা আমাদের খুঁজতে হবে। সে ক্ষেত্রে বস্তুনিরাপেক্ষ স্বাধীনতা নিয়ে আমরা খুশী হ'তে পারি না। মিল স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত ও জীবনের লক্ষ্য ব'লে পরিগণিত করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনের এক উপায় হিসেবে স্বাধীনতার যৌক্তিকতা রয়েছে, এবং সেদিক দিয়ে বস্তু নিরপেক্ষ স্বাধীনতা অর্থহীন। সমাজ জীবনের আলোকেই স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা একটি নয়; এর বহু প্রকার ভেদ রয়েছে। রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, হাজারো বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত কর্মের স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আরও অনেক প্রকারের স্বাধীনতা। এদের আবার অন্যান্য বহু বিভাগ রয়েছে; যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা

১। মিলের (*Mill*) '*Principles of Political Economy*' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়। সর্বোচ্চ কাজের সময় নীতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে, কাজের সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ বাঞ্ছনীয় হবে এবং এ নির্ধারণ ক্ষেত্রে আইনের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে, সপ্তম অধ্যায়ে তিনি শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন ত ও তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে বেসুরো।

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি। একমাত্র সম্ভাব্য মানে বিচার করলে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার গুরুত্বও কম বেশী হ'তে পারে এবং জনকল্যাণের সাথে সেগুলো সংশ্লিষ্ট। তাছাড়াও, এসব স্বাধীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। মিল নিজেই অনুভব করেন যে, প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হ'ল শ্রমিকদের পরাধীনতা। সুতরাং এ সকল স্বাধীনতার মধ্যে আমাদের পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে ও মঙ্গলজনক স্বাধীনতাগুলোকে বেছে বার করতে হবে। স্বাধীনতার মহান নামের জন্য সব স্বাধীনতা সুখদ নয়। নিছক কোন পৃথকীকরণের নীতিতে আমরা জীবনের পথ খুঁজে পেতে চাই এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিকট স্বাধীনতা তার চেয়েও কিছুটা বেশী। এ হ'ল নঞার্থক এবং নিয়মনিষ্ঠ। কিন্তু সুস্পষ্ট সদার্থক বাস্তবতা বা জনকল্যাণ সমাজের মধ্যে যাকে আমরা খুঁজে ফিরি; তাই হ'ল চূড়ান্ত এবং তা যেকোন নিয়মনিষ্ঠ আচারের উর্ধ্বে। অনেক সময় তা স্বাধীনতা থেকেও মূল্যবান।

মিলের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছি; কেননা অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী বিচার-বিবেচনা থেকে তাঁর যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ সম্পর্কে অন্যান্যদের আলোচনা প্রথমে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে শক্তিশালী করলেও কালে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেগুলো উনিশ শতকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে ফেলে। অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নীতির জন্ম হয় পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা থেকে; কিন্তু নতুন সামাজিক পরিবেশের জন্য তাও কিছুদিন পর অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি স্বাধীনতার নামে এক কলঙ্ক লেপন করে। এতে মনে হ'ত যে, অসমান ব্যক্তিরা কোনদিনই স্বাধীনতা লাভ করবে না এবং সংরক্ষণমূলক আইন না থাকলে স্বাধীন ব্যক্তিরা প্রবল পরাক্রম হয়ে উঠবে। এমনি ধ্বংসাত্মক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লোকেরা আবার রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করে এবং 'অবাধ প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত যুগের অবসান ঘটে। এর সাথে সাথে এ মতের প্রচারকদেরও বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে এ মতের সমর্থকরা আবার সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং 'জীবন সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতর ব্যক্তিদের রক্ষা পাবার' নীতির কথা তুলে ধরেন। কিন্তু সভ্য দুনিয়ায় তাঁদের তত্ত্ব অন্তসারশূন্য বলে মনে হ'ল। বিচক্ষণ স্পেন্সার ক্ষণকালের জন্য সফলতা অর্জন করেন বটে, কিন্তু জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া

www.nagorikpathagar.org

দেখা দিল তাতে মনে হয় ; তাঁর বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার দিন ফুরিয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের সাথে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং এ বিজ্ঞানেও এ সত্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে যে, একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, তেমনি অন্যদিকে মানুষ যে সমাজে বাস করে সে তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সুস্থ অবস্থায় বা অসুখে, শক্তিশালী হয়েই হোক আর দুর্বল হয়েই হোক —মানুষ কোন অবস্থায় সাধারণ কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বেঁচে থাকে না বা থাকতে পারে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এসব অবস্থার সুন্দর উপসংহার টেনেছেন 'মানুষ' ও 'রাষ্ট্রের' মধ্যেকার দ্বন্দ্বে। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্নতা ও সমৃদ্ধির জন্য মানুষ যখন সব দিক সম্পর্কে অবহিত হ'ল, তখন তারা এ অবাস্তব সিদ্ধান্তকে মানতে রাজী হ'ল না। বিভিন্ন ধরনের অরাজনৈতিক সংঘের সুমহান অগ্রগতিকে অস্বীকার ক'রে কোন মতবাদ টিকতে পারে নি। এগুলোই সামাজিক প্রয়োজনের সাক্ষ্য বহন করে এবং এভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতবাদে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অন্ততঃ এগুলোর ব্যাখ্যা ক্ষমতার প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের কথা অনর্থক। শুধুমাত্র মানুষের সাধারণ প্রয়োজন ও সাধারণ লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের ব্যাখ্যা দেয়া চলে। পরিবার, ক্লাব, দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য সংঘ বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু তাই নয়, যেসব অনুভূতি এসব সংঘের জন্মমূলে রয়েছে সে আলোকে তারা সংঘের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের সুস্পষ্টতা তুলে ধরে এবং এতে প্রমাণ হয় যে, বাধ্যকরী আওতার ঊর্ধ্বে যে সৃজনশীল কর্মক্ষেত্র রয়েছে তাতে রাষ্ট্র ও এসব সংঘের সমান ভূমিকা থাকবে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধবাদী মতবাদসমূহ তন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যেন যমজ ভাই। তাই তারও ভাগ্য হয়েছিল অনুরূপ। মানবীয় সংঘের বিরাট জটিলতার দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, তাহ'লে আমরা বুঝতে পারবো যে, নিয়ন্ত্রণের একই কেন্দ্রে সব কিছুর পরিচালনা ন্যস্ত করবার পরিকল্পনা অত্যন্ত নিরর্থক। নিয়ন্ত্রণের একই কেন্দ্রে শুধু যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ন্যস্ত হয়েছিল তা নয়, তার সাথে সাথে অসংখ্য

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক সংঘের কাজকর্ম, বিভিন্ন সমিতি ও একচেটিয়া কারবারের কাজকর্ম, শ্রমিক সমিতি ও সমবায় সমিতিগুলোর কর্মপ্রচেষ্টা, হাজারো রকমের উৎপাদক সংঘ। পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবসায়ী উদ্যোগও ন্যস্ত হয়। তাছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্ন চক্র, আর্থিক, বানিজ্যিক, শিল্প ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত কাজকর্মের যৌথ প্রচেষ্টা এবং পেশাগত ও কৌশলগত উদ্যোগ; যেগুলো আর্থিক স্বার্থের সাথে ছিল জড়িত। এসব অসংখ্য ঐক্য ও অনৈক্যের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পুরোনো মতবাদগুলো ছিল অবাস্তব ও অর্থহীন। মার্কস্ অত্যন্ত সঠিকভাবে সেগুলোকে 'কাল্পনিক' আখ্যা দেন; কিন্তু যেহেতু তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোর উপর জোর দিয়েছেন; সেজন্য সে মতবাদগুলোর কঠোর নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাকেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যারা দুঃখভোগ করেছে, তাদের মধ্যে গভীর ক্রোধের সঞ্চার করেন। কিন্তু যে নতুন ভূমিকা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করেন তা রাষ্ট্র কিভাবে পালন করবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দান থেকেও বিরত থাকেন। সমাজের বহুমুখী গাঁথুনীকে তিনিও সহজতর ক'রে তোলেন এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিক দল এ দু'ভাগে কালোয় সাদায় সমাজের চিত্র অংকন করেন। প্রচারের জন্য তা অত্যন্ত সুবিধাজনক হ'লেও শিল্প সমৃদ্ধ সমাজের বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষা তা থেকে বাদ প'ড়ে যায়। রাশিয়ার মত মোটামুটি আদিম সমাজে এ ধরনের প্রচারণার আবেদন ছিল; কেননা সেখানে যুদ্ধের বিভীষিকায় অত্যাচার ও কুসংস্কারের দৃঢ় বন্ধন ধ্বসে পড়ে। চরম পর্যায়ে মানুষ ভালমন্দ উভয় অবস্থারই সরলীকরণ করে ফেলে। কিন্তু তেমন সুবিধাজনক অবস্থাতেও সমাজতন্ত্র তার দাবীকে সে অবস্থার উপযোগী করতে বাধ্য হয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দাবী স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কেননা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানকার প্রভাবশালী নেতৃবর্গ সে অবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার বহুদিকে বিস্তৃত ও স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক কেন্দ্রায়ত নির্দেশনা কোন ক্রমেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বাস্তব পন্থা নয়।

আমরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দিতে চাই না। এক্ষেত্রে আমাদের সহজ বক্তব্য হ'ল এই যে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার উপর ভিত্তি করেই এ দু'টি মতবাদ

www.nagorikpathagar.org

গ'ড়ে উঠেছে এবং তাদের কোনটিতেই সমগ্র সামাজিক সত্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠেনি। আধুনিককালের বিশাল সংঘমূলক কাজকর্মের আলোকে সে মতবাদগুলো এত সীমিত যে, এদের উপর ভিত্তি ক'রে কোন বাস্তব তত্ত্ব আর গ'ড়ে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবী জানায় যে, শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টা সীমিত রাখা উচিত। কিন্তু এর ফলে হাজারো অন্যান্য মুক্ত সংঘের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়; যদিও এটা সত্য যে, মানুষ যা চায় তাদের প্রায় প্রত্যেকটিকে কোন না কোন সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে খুঁজে পেতে চায়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র রাষ্ট্র কেন তার সদস্যদের সুস্পষ্ট পথে কল্যাণ আনবার অধিকার ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে? রাষ্ট্র সামাজিক মানুষের সবচেয়ে মহান ও বৃহৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্বেও বা বিশ্বজনীন আইনের হাতিয়ার লাভ করা সত্ত্বেও কেন সে তাদের যথার্থ প্রয়োগ করবে না? তাছাড়া, রাষ্ট্র এসব ক্ষমতা প্রয়োগ না করলে তার বিকল্প হিসেবে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান, যৌথ কারবার-গুচ্ছ, শ্রমিক সমিতি বা অর্থনৈতিক সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘগুলোর মত সীমিত লক্ষ্যের কম গুরুত্বপূর্ণ সংঘের উপর কি তার ক্ষমতা হস্তান্তর করছে না? এসব আংশিক ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থের তুলনায় সাধারণ স্বার্থ কি এতই নগণ্য যে, রাষ্ট্র শুধু নিজ অধিকার বজায় রাখবে; অথচ কিছুই করবে না? অন্যদিকে রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে সমাজতন্ত্র দাবী জানায় যে, এসব অসংখ্য সংঘের স্থান দখল করতে হবে রাষ্ট্রের। আধুনিক সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ঐক্য অর্জন করতে হবে। কিন্তু আমরা যা দেখাতে চাই, তা হ'ল এ দুটো ভিন্নমুখী ক্ষমতার বাধ্যতামূলক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমাজের প্রগতি ব্যাহত হবে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন কাজ—এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজ-জীবনের ঐক্য প্রতিফলিত হবে সে আশা অর্থহীন।

এমন বিশাল উদ্যোগের জন্য রাষ্ট্রের অক্ষমতা অনুধাবন ক'রে অনেক সমাজতন্ত্রবাদী প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক প্রকৃতির একটি বিকল্প ব্যবস্থার আভাষ দিয়েছেন। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ বা 'সিণ্ডিক্যালিজমের' দৃষ্টিভংগী হ'ল এই—এ মতবাদের অনুসারীরা রাষ্ট্র ও পেশাগত সমিতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্র বাদ বা 'গিল্ড সোস্যালিজমের' তীব্র সমালোচনা করে। সংঘমূলক সমাজ-

www.nagorikpathagar.org

তন্ত্রের অনুসারীরা বর্তমানের শ্রমিক সমিতিগুলোকে উৎপাদকদের এক সংঘে রূপান্তরিত করতে চায়। এর অন্তর্ভুক্ত হবে কোন এক শিল্পের সব উৎপাদকরা, প্রশাসক ও শ্রমিকরা। উপভোগকারীদের স্বার্থরক্ষা ও বিতরণ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্রের কিছুটা কর্তৃত্ব থাকবে। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সম্পর্কে বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ প্রসংগে বরং পেশাগত সমিতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে; কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের সঠিক কাজকর্ম ব'লে যা মনে করি, কৌশলে এ মতবাদে তারও সমালোচনা করা হয়েছে। আমরা এ প্রসংগে এ পর্যন্ত স্বীকার করি যে, ঐক্যবদ্ধ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে, তা বর্তমানের বিভক্ত ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এটা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ হ'ল এক অসাম্যের ও দ্বন্দ্বের ব্যবস্থা। সচেতন সহযোগিতার দ্বারা এ ব্যবস্থার কতকগুলো চরম অসাম্য ও অনৈক্য দূর হ'তে পারে সত্যি; কিন্তু অন্যগুলো এর সহজাত। গিল্ড সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা যে বিভেদ দূর করতে চান, তা হ'ল সুপ্ত পুঁজিপতি ও কার্যকর শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান। তাঁরা সুপ্ত পুঁজিপতিদের উৎখাত করে তথা খাজনা ও মুনাফার অবসান ঘটিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করতে চান। এত বিশাল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা আমাদের এ আলোচনায় সম্ভব নয়; কিন্তু এটা সত্যি যে, যদি তা আদৌ হ'ত, তা হ'লে রাষ্ট্রের উপর আরও এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপে যেত এবং রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব এ মতবাদে রাষ্ট্রের যে সীমিত কাজকর্মের আভাষ দেয়া হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তাঁদের শিক্ষার সাধারণ দৃষ্টিকোণই হ'ল রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে ছোট করে দেখানো। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিকে তাঁরা এ যুক্তিতে সমালোচনা করেন যে, কোন ভৌগলিক এলাকার ভিন্নমুখী জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে কোন একজন ব্যক্তি সক্ষম নন। তিনি বরং উৎপাদক গোষ্ঠী বা লৌহশিল্পের শ্রমিক বা শিল্পী বা শিক্ষক বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট এক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দান করতে পারেন। আসলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে মোটামুটিভাবে সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব সম্ভব; কিন্তু কোন একটি উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির অভাবে বর্তমান ব্যবস্থাকে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে 'পেশা ভিত্তিতে আইন পরিষদের' বিরোধিতায় আমাদের আরও বিভ্রান্তিকর এক

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশে পড়তে হবে। বিভিন্ন সংঘের নির্দিষ্ট স্বার্থের সংঘাতে যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক না কেন, 'গণরাষ্ট্রের' ধারণা এখনও কিন্তু বেঁচে আছে। মানুষ তাদের নিজস্ব স্বার্থের সাথে এর দাবী এক ক'রে ফেললেও নাগরিকত্বের ধারণা আজও বাস্তব। সাধারণ কল্যাণের ধারণাই গোষ্ঠীগত লক্ষ্যের সচেতনতার উপর আলোকপাত করে। সাধারণ স্বার্থের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোই মানুষের চিন্তাকে সেদিকে ধাবিত করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট স্বার্থগুলো যথাযোগ্য গুরুত্ব পাবে না বা সেসব স্বার্থের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটবে না তা নয়; বরং যদি সেগুলো বেশী গুরুত্ব লাভ করে, তবে সাধারণ স্বার্থ বিপদগ্রস্থ হবে। এ বিপদের প্রধান রক্ষাকবচ হ'ল রাষ্ট্র; কেননা রাষ্ট্রীয় সংগঠন স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে 'সাধারণ ইচ্ছাকে' স্বীকার করে এবং কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটে। তাছাড়া, আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে 'যোগ বিয়োগের' ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিরোধী লক্ষ্যগুলো অনেক পরিমাণে দূর হয়ে যাবে; যদিও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। রুশোও একথা বলেছেন। পেশাগত প্রতিনিধিত্বের প্রতি গিল্ড্ সোস্যালিস্টদের আকর্ষণ অনেকটা রাষ্ট্রের উপর আক্রমণেরই সামিল।

এখানেই রয়েছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। অন্যান্য সংঘগুলো তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা সীমিত; কিন্তু রাষ্ট্র হ'ল তার নির্দিষ্ট হাতিয়ার বা পন্থার দ্বারা সীমিত; যদিও তার লক্ষ্য হ'ল সাধারণ। গিল্ড সোস্যালিজমের দর্শনে এ পার্থক্য চাপা প'ড়ে যায়। আমরা বলতে পারি যে, দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী দু'রকমের প্রতিনিধিত্ব হ'তে পারে। একটি হ'ল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব; কিন্তু অপরটি হ'ল মানুষের প্রতিনিধিত্ব। প্রথমটি সহজ ও সুস্পষ্ট হ'লেও কিন্তু আংশিক অপ্রতুল। যে ঐক্য সমাজকে প্রকৃত এক বর্ধিষ্ণু সত্যে পরিণত করে এর মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে না। মানুষ শুধুমাত্র কৃষক, বা যান্ত্রিক শিল্পী বা বিশিষ্ট মতাবলম্বী বা সঙ্গীত প্রেমিক বা অন্য কোন শিল্প বা অবকাশ বিনোদনের কোন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব ক'রে খুশী হয় না। তারা সাথে সাথে নাগরিক হিসেবেও প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। অন্যথায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঐক্য অপ্রকাশিত থেকে যায় এবং সমাজের ঐক্যও প্রকাশিত হয় না। অপূর্ণভাবে হ'লেও এ প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন

www.nagorikpathagar.org

হয় দলীয় ব্যবস্থার অগ্রগতির মাধ্যমে। আমরা দেখেছি যে, যদিও দলে শক্তিশালী নির্দিষ্ট স্বার্থের আধিপত্য বজায় থাকে, তথাপি দলের ধ্যান-ধারণায় ও নীতিতে থাকে নাগরিকত্বের ব্যাপক দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ। এটা না হ'লে রাষ্ট্র ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেত। কিন্তু রাষ্ট্র ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে এবং সকল ক্ষুদ্রায়ত স্বার্থের অভ্যন্তরে 'গণরাষ্ট্রের' অনুভূতি বেঁচে রয়েছে ও কাজ ক'রে চলেছে।

গিল্ড সোস্যালিজমের পরিকল্পনা হ'ল সব অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়া ; কিন্তু আসলে তার ফলে রাষ্ট্রের গুরুত্ব কমে যায়। পেশা-ভিত্তিতে কোন আইন পরিষদ গঠিত হ'লে অবশ্যম্ভাবীরূপে তা আর রাষ্ট্রীয় সংসদ ব'লে গণ্য হবে না, বা তা হ'লে রাষ্ট্রের মধ্যে যে নির্দিষ্ট স্বার্থগুচ্ছ প্রাধান্য লাভ করবে তাদের স্বার্থেই তা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে। অবশ্য যেকোন ব্যবস্থায় এ ফল ফলতে পারে ; কিন্তু আশার কথা হ'ল—এ হ'ল অন্য ব্যবস্থার নীতি বিরোধী। একটা জাতি শুধুমাত্র শিল্প ও পেশা নিয়ে গঠিত হয় না। এসব শিল্প ও পেশা যুক্তি-যুক্তভাবে একটা 'অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাচন করতে পারে ; কিন্তু যদি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সে পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়, তা হ'লে যে প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে সমগ্র প্রক্রিয়া-টিকে অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্র নামমাত্র টিকে থাকলেও কার্যতঃ তার অবসান ঘটে। তাই সম্ভবতঃ আঞ্চলিক গুরুত্বহীনতা সত্বেও আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাস্তব এ কারণে যে, তা কোন পেশার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং তার মূলে রয়েছে নাগরিকত্বের পেশা। যেকোন ছদ্মবেশেই হোক, বা সিণ্ডিক্যালিস্টদের মত খোলা খুলি আক্রমণই হোক, রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণ হচেছ এক স্থায়ী রাজ-নৈতিক চিন্তাধারার চরম অভিব্যক্তি। এ আক্রমণ রাষ্ট্রের উপর নয় ; বরং তা হচেছ চরম সার্বভৌমত্বের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এক আক্রমণ। এ আক্রমণ ধারা যে দিকে রচিত হচেছ, সেদিকে এগিয়ে দেখা যাক।

দুই : চরম সার্বভৌমত্বের প্রতি আক্রমণ।

আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোন চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা নয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছার মত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব মানুষের জীবনে অবাধ শর্তহীন তেমন কিছু নয় ; বরং এ হ'ল এক কার্যপদ্ধতির

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগ, এবং কার্যপদ্ধতি কেমন হবে, সে সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদের দ্বারা তা সীমিত ও তার উপর নির্ভরশীল। তার প্রয়োগের জন্য যে ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার দ্বারাও সার্বভৌমত্ব অনেকাংশে সীমিত ও তার উপর নির্ভরশীল। এ যেন কোন এক সংঘের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সংঘের চেয়ে তার বৈশিষ্ট্য চরম হ'তে পারে না। সার্বভৌমত্বের আইনগত মতবাদ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বে বহুদিন ধ'রে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। স্বস্থানে সে মতবাদ যথেষ্ট প্রয়োজনীয় মনে হ'লেও সার্বভৌমত্বের মূল প্রকৃতির ব্যাখ্যায় তা শুধুমাত্র যে অপ্রতুল, তা নয়; মিথ্যাও প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ, আইনগত মতবাদটি হ'ল নিছক নিয়মনিষ্ঠ। সার্বভৌমত্বে নিয়ম মাফিক কোন সীমারেখা নেই এবং লিখিত সংবিধান বিহীন কোন এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সরকার যেকোন বিষয়ে অবাধে আইন প্রণয়ন করতে পারে, এ কথার কোন গুরুত্ব নেই। আইনগতভাবে রাষ্ট্র হ'ল সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী; কেননা রাষ্ট্রই হ'ল সকল আইনের উৎস। কিন্তু দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেজন্য রাষ্ট্র চার্চ বা রাজকীয় প্রাচীন ক্লাবের চেয়ে কোন অংশে বেশী ক্ষমতার অধিকারী নয়; কেননা চার্চ হচ্ছে ধর্মীয় আইনের উৎস এবং রাজকীয় প্রাচীন ক্লাবটি গলফ্ খেলার বিধিবিধান প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, তাদের ছোট ক'রে দেখা আমাদের কোনক্রমেই উচিত নয়; তবে আমাদের এটা বলতেই হবে যে, রাজনৈতিক আইন হ'ল এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মাত্র। রাষ্ট্র সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাত্র এবং তার কাজকর্ম ও দাবী-দাওয়াকে এ সত্যের সাথে সামঞ্জস্য-বিধান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনগত মতবাদে শুধুমাত্র ক্ষমতার আভাষ রয়েছে। এতে কোন সেবা বা কল্যাণমূলক কাজের কোন ইঙ্গিত নেই। কিন্তু ক্ষমতা হ'ল কল্যাণকর্মের হাতিয়ার মাত্র। শেষ পর্যায়ে কল্যাণ কর্মের যোগ্যতাই স্বীকৃত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে কল্যাণ সাধিত হয়, তার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্য লক্ষ্য থেকে উপায়কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। মানুষ অতি সহজে গ্রহণ করবার অভ্যাস গঠন করে এবং এভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আনুগত্যবোধ দৃঢ় হয়। যখন তারা চিন্তা করে তখন সব সময়ই আইন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চিন্তায় রত থাকে; কেননা তাদের ফলাফল তাদের প্রভাবিত করে। কোন লোকই রাষ্ট্রের

www.nagorikpathagar.org

কাজকর্মকে সীমাহীন ব'লে গণ্য করে না। সুতরাং অসীম সার্বভৌমত্বের মতবাদ সত্যিই ভয়ংকর মিথ্যা। তার কল্যাণ কর্মের সীমার বাইরে সরকারের হাতে ক্ষমতা আরোপ করা, তাই অত্যন্ত ভয়ংকর এবং এর ভিত্তিতেই সব রকম অত্যাচারের সৃষ্টি হয়।

আমাদের আমলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও অতীতের চিন্তাধারার মধ্যে মূল পার্থক্যই হ'ল সার্বভৌমত্বের সীমিত বৈশিষ্ট্য। অন্যযুগে নৈতিক কারণে মানুষ চরম ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা সুবিধা ও ন্যায়নীতির বিবেচনা তুলে ধরেছে এবং সেদিকে শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা 'উন্নততর আইন, বা 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বা তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের কথা ঘোষণা করেছে এবং আবেদন জানিয়েছে যে, শাসকের তা মানা উচিত। সরকার যখন ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অবহেলা করেছে, তখন তারা বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছে। কর্তব্য ছিল মহান; কারণ ক্ষমতা ছিল এত বেশী সীমাহীন। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা পরিলক্ষিত হয়েছে একমাত্র ধর্মীয় বা 'সমাজ-অতীত' ক্ষেত্রে। ধর্মনিরপেক্ষ বা জাগতিক কাজকর্মে সার্বভৌমের ছিল চরম ক্ষমতা। এ প্রশ্নও উঠেছিল, কে সার্বভৌম? কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন যে, রাজা সার্বভৌম, কেউ বা বলেছেন আইন পরিষদ এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণ জনগণকে সার্বভৌম ব'লে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কিত এসব দ্বন্দ্বে কোন দিন তার সমাজ নির্ধারিত আওতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ওঠেনি। হবসের মত রুশোর নিকটও সার্বভৌম ছিল তেমনি চরম ও একক ক্ষমতা সম্পন্ন। অথচ রাষ্ট্র তখনও সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখাই ছিল।

উনিশ শতকের নতুন অগ্রগতির ফলে নতুন মতবাদটির জন্ম হয়। গণতন্ত্রের দিকে যে অগ্রগতির ধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে, তার ফলে সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্নের সমাধান হয়। তারপর মানুষ তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়। শিল্প যুগের ফলে সামাজিক সংগঠনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তার ফলেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সহজ দ্বন্দ্ব ছিল, তার অবসান ঘটে। নতুন যুগের অসংখ্য ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রকৃত ক্ষমতার প্রয়োগ করে তার ফলে একটি সর্বব্যাপক কর্তৃত্বের ধারণা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে রাজনৈতিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের নতুন পর্যালোচনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

এক নতুন ও ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন মতবাদে সমাজকে এক ও অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের নির্দেশনায় এক ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু যদি সার্বভৌমত্ব সীমিত হ'ত, যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধীনে অন্যান্য ক্ষমতা হ্রাস না পেত, তবে সমাজের ঐক্য কোথায় ছিল? সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, আদৌ তার কোন ঐক্য ছিল কি? এ হ'ল আমাদের শেষ প্রশ্ন; কিন্তু এর উত্তর দেবার পূর্বে আমাদের সেসব প্রভাব সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে—যাদের প্রভাবে এক গোষ্ঠির চিন্তাবিদ প্রাচীন মতবাদের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেন।

অন্ততঃ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমত্বের নতুন মতবাদকে আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। প্রাচীন মতবাদের কাছাকাছি যেটি তার প্রতিফলন ঘটেছে গ্রীনের রাজনৈতিক দর্শনে। আইনের আওতা ও নৈতিকতার আওতার মধ্যে তিনি সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।[১] রাজনৈতিক দায়িত্বের প্রয়োগ হ'তে পারে এবং তার প্রয়োগও হওয়া উচিত; কিন্তু নৈতিক কর্তব্যের প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। কোন নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মুক্ত ইচ্ছায় নৈতিক দায়িত্বের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং সমাজে অবাধ নৈতিক কাজকর্মের পথে বাধা অপসারণের জন্যই রয়েছে রাজনৈতিক আইন। এ এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলে, যেখানে স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে। যেহেতু বাহ্যিক অনুমোদনের মাধ্যমে আইন কার্যকরী হয়। তাই ঐসব কাজকর্ম থেকে তাদের বিরত থাকা প্রয়োজন, যাদের মূল্যবোধ ঐসব কাজকর্মের ধারণা ও মতিগতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যায় যে, ধর্ম ও নৈতিকতাসহ মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের সমগ্র সৃজনশীল দিকগুলো রাষ্ট্রের আওতার বাইরে রয়েছে। আইন যে সীমিত আওতার এক পন্থা, এ সত্যে তার স্থান নির্ধারিত হয়। নিজের প্রকৃতির প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে রাষ্ট্রের শুধুমাত্র ঐসব কাজকর্মই সমাধা করা উচিত, যা সমাজে উন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে হয়।

যেসব কার্যকর শক্তির ফলে রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সংঘের জন্ম হয়, এ নীতি তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত

১। এ পার্থক্য ত্রুটিপূর্ণ; কেননা গ্রীন হেগেলীয় মতবাদের প্রভাবে নৈতিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার অধিকারকে সামাজিক স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল মনে করতেন। নৈতিক অধিকার ব্যক্তি-প্রকৃতির প্রকাশ ঘটায়। তাঁর এ মৌলিক মতবাদের সাথে তাঁর পার্থক্য নির্দেশ খাপ খায় না।

www.nagorikpathagar.org

হবে। কিন্তু গ্রীনের নিকট তা অনেকটা বস্তুনিরপেক্ষ থেকে যায়। তিনি সাবধানে কয়েকটি বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ করেন; কিন্তু তাঁর লক্ষ্য মূলতঃ ছিল নৈতিক। তাই তিনি তাঁর যুক্তির আলোকে যুদ্ধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাজনৈতিক শাস্তিদান, মদ্যপান নিরোধ, আইন প্রণয়ন প্রভৃতির ভালমন্দ উভয় দিক বিবেচনা করেন। কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর একই বিবেচনা জাগ্রত রয়েছে—নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মুক্ত মানুষ যে পরিবেশে কাজ করে রাষ্ট্রের শুধুমাত্র সে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যা প্রয়োজন, তাই করা উচিত। কিন্তু তাঁর চিন্তার সূত্রে তখনও রয়েছে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র। রাজনৈতিক আইন ছাড়া অন্যান্য পন্থা বিশিষ্ট অন্যান্য সংঘের অস্তিত্বের ফলে কিভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে প্রভাবিত হয়েছেন, তা তিনি মোটেই ভাবেন নি; তা যদি তিনি ভাবতেন, তা হ'লে বুঝতেন যে, রাষ্ট্রের কি করা উচিত। এটি আসল সমস্যা নয়, বরং আসল সমস্যা হ'ল, রাষ্ট্র কি করতে পারে; কেননা অন্যান্য শক্তি রাষ্ট্রকে ঘিরে রেখেছে। বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের কাজকর্মে রাষ্ট্রের কাজকর্ম অনেকখানি সীমিত এবং রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হয়ে অন্যান্য সংঘ নিজেদের মত কাজ ক'রে চলেছে। গ্রীন সার্বভৌমত্বের আধুনিক সমস্যার কাছাকাছি এসেছেন।

নতুন মতবাদকে পরীক্ষা করবার দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হ'ল বিবর্তন বাদের গতি। আমাদের আলোচনায় আমরা এ গতিধারাই অনুসরণ করেছি। সামাজিক সংগঠনের বিকাশ ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, রাষ্ট্র একটা সম্প্রদায় ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে এবং এককালে তারই মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল রাষ্ট্র, পরিবার, চার্চ এবং অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নতুন নতুন সব সংঘের সম্ভাবনা। পেছনে তাকিয়ে এ অবিচ্ছিন্ন অবস্থাকে আমরা সাধারণভাবে রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত করে থাকি। গ্রীক নগর সম্প্রদায়ে যেমনটি দেখা গেছে এক সময় রাষ্ট্রের মধ্যে তেমনি এক পর্যায়ের কেন্দ্রিভূত নিয়ন্ত্রণ গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনও রাষ্ট্র ছিল সমাজের এক বিশিষ্ট দিক; তখনও তা সমাজ নামে পরিচিত ছিল না। নগর ছিল একদিকে যেমন রাষ্ট্র, তেমনি ছিল এক স্বগোত্রীয় ব্যবস্থা, একটা ধর্মীয় ব্যবস্থা আরও অনেক কিছু। এমনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে; কেননা এ পদ্ধতিতে এটাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্র সম্প্রদায় নয়; বরং সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ দিক; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য সব বিষয়ে তা প্রধান্য বিস্তারের

www.nagorikpathagar.org

দাবী জানাল। কার্যতঃ অবশ্য এ গর্বিত দাবী কোন দিনই বাস্তবায়িত হয়-নি; কেননা প্রথা ও রীতি-নীতি সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে বাধার প্রাচীর খাড়া করে। কিন্তু এ ব্যাপারে গুরুত্ব তখনই প্রকাশিত হয়, যখন মানুষের স্বার্থের বিভিন্নতা ও জটিলতার জন্য বহু সংঘের অভ্যুদয় ঘটে। যেসব কাজকর্ম রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি বা নির্দিষ্ট সংঘের প্রতি যেসব কাজকর্মের বিশেষ আবেদন দেখা দেয় সেসব সমাধানই ছিল এসব সংঘের লক্ষ্য। পাশ্চাত্যে ধর্মীয়মতের বিভিন্নতার ফলে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায় স্বার্থের অন্যতম স্বার্থ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভ করে। সর্বাত্মক ক্ষমতা মতবাদে এই হ'ল প্রথম ভাঙ্গন। পরবর্তীকালে অনুরূপ ভাবে অনেক স্বার্থই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আমাদের আমলে দ্বন্দ্ব-মুখর অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রবল স্রোতে প্রায় সবগুলোই ভেসে যায়। বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংঘের সুস্পষ্ট ক্ষমতার সাথে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাতে রাষ্ট্র সমাজজীবনের একটি সর্বশক্তিমান সংস্থারূপে আর টিকে থাকতে পারল না। রাষ্ট্রকে অনেকের মধ্যে একটি সংঘের পদমর্যাদা নিয়ে খুশী থাকতে হ'ল—তা তার কল্যাণকর্ম যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন।

একবার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলে সার্বভৌমত্বের সমগ্র বিষয়টি নতুন আলোকে প্রকাশিত হয়ে উঠল। আমাদের এখন সমাজের উপর একটা অস্পষ্ট শক্তির নৈতিক বা স্বেচ্ছাকৃত সীমারেখা সম্বন্ধে বিবেচনা করলে চলবে না, বরং এখন আমাদের নির্দিষ্ট কোন সংঘের সুস্পষ্ট সীমারেখা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের নির্দিষ্ট পন্থা নিয়ে ভাবতে হবে। আইনশাস্ত্রের অধ্যায়ন থেকে উদ্ভূত আনুসঙ্গিক অগ্রগতি ও অন্যান্য সংঘগুলোর অবস্থা আরও জোরদার করেছে। আইনগতভাবে স্বীকৃত একটি সংঘ এখন হয়েছে সমিতি। এ নামই তার সুস্পষ্ট সীমারেখা, সুস্পষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিচায়ক। সুতরাং একই সাথে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র এবং এসব সমিতির মধ্যে সম্পর্ক কি? দ্বিতীয়তঃ, সুস্পষ্ট অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী রাষ্ট্রকে আমরা কি একটা সমিতি ব'লে গ্রহণ করতে পারি?

এ প্রশ্নগুলোর অভ্যন্তরে সমিতির প্রকৃতি সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন এসে যায়। একটা সমিতি একটা প্রকৃত মানুষের অধিকারও

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্বসম্পন্ন হতে পারে কি না, এ ধরনের অন্তহীন আইনগত ঝগড়াকে আমাদের এখানে উপেক্ষা করতে হবে। আইনগত অর্থে কোন সমিতি একটা ব্যক্তির মত। এককভাবে ব্যক্তির মত তারও রয়েছে অধিকার ও দায়িত্ব। অন্যকথায়, সমিতির যে অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, সেসব অধিকার ও দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে সমিতির সদস্যদের নয়। একটা সমিতির যে অর্থ ভাণ্ডার থাকে তার সদস্যগণ সে অর্থকে নিজেরা ভাগযোগ ক'রে নিয়ে নিতে পারে না। যদি কোনটির ভোটাধিকার বা একচেটিয়া অধিকার থাকে, তবে তা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা কার্যকর হয়। অন্যদিকে, তার প্রতিনিধিদের ক্ষতিকর কাজের জন্য কোন সমিতিকে দায়ী করা যায়। অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে, কোন সমিতি ফৌজদারী কোন কাজে জড়িত হ'তে পারে না; কিন্তু ক্ষতি-পূরণের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়। তার অংশীদারদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে ও সমিতির সমৃদ্ধি বেড়ে যেতে পারে। আবার তার অংশীদারদের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সমিতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে তা দেউলিয়া হ'তে পারে।

উল্লিখিত যুক্তি সত্ত্বেও কিন্তু আমরা গায়ার্কে বা মেটল্যাণ্ড বর্ণিত কোন সমিতির উপর আরোপিত 'সমষ্টি মন' 'সমষ্টি ইচ্ছা' বা 'সমষ্টি ব্যক্তিত্ব' সম্পর্কে একমত হ'তে পারি না। সমিতির একটা একক সত্তা আছে বটে, কিন্তু তার অখণ্ডতা নেই। এটা একটা সংগঠন মাত্র এবং এর মাধ্যমে তার সদস্যরা একটা সাধারণ লক্ষ্য অনুসরণ করে। এ লক্ষ্য কিন্তু আসলে সংগঠনের লক্ষ্য নয়; বরং তা হ'ল সদস্যদের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে সদস্যদের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটে। এর মৌল অর্থ কিন্তু বাইরে কোন এক স্থানে নিহিত রয়েছে। অবিচ্ছিন্ন সত্তা রয়েছে মাত্র দু'টি এবং তাদের অর্থ তাদের মধ্যেই নিহিত। তারা হল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়; সব শেষে এটাও বলা চলে যে, ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছাড়া কোন লক্ষ্য নেই এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ছাড়া অন্য কোন মূল্যবোধ নেই। সম্প্রদায়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এ সব লক্ষ্য ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন ঘটে এবং সমিতি হ'ল শুধুমাত্র এক নির্দিষ্ট উপায়। সম্প্রদায় হ'ল ব্যক্তির সমষ্টি; কিন্তু সমিতি হল সদস্যদের সমষ্টি মাত্র। সদস্যদের ঐক্য তথা সমিতির ঐক্য একটা বিশেষ দিকের ঐক্যমাত্র। তাই দেখা যায়, সদস্য পদের দিক থেকে একটা সমিতি আর একটি সমিতির প্রায় অনুরূপ; কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.org

এমনি মিল অর্থহীন। তাই আমরা যখন কোন সমিতিতে প্রবেশ করি, তখন আমাদের একাংশ মাত্র তার মধ্যে আসে; কিন্তু সম্প্রদায়ে আমরা আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে প্রবেশ করি। আমাদের যুক্তি যদি সঠিক হয়, তবে বলব যে, রাষ্ট্রেও তার সদস্যদের সমগ্র সত্তার প্রকাশ ঘটে না, আমরা রাষ্ট্রে বাস করি না; বরং রাষ্ট্রের সাহায্যে বাস করি।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, রাষ্ট্র ও সমিতি ব'লে স্বীকৃত অন্যান্য সংঘের মধ্যে কি সম্পর্ক বর্তমান? রাষ্ট্র এ সব সংঘকে বিশেষ মর্যাদা দেয় এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। রাষ্ট্র এসব সমিতির জন্ম দেয় না, বরং তাদের আইনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র।[১] কোন পেশাগত গোষ্ঠী বা কোন ধর্ম মতে বিশ্বাসীদের সংঘরাষ্ট্রের কোন স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট তাদের জন্ম দিতেও পারে না, তাদের ধ্বংস সাধনও করতে পারে না। রাষ্ট্র কোন যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতে পারে; কিন্তু তাও খুব জোর সংগঠনের পদ্ধতিকে পাল্টিয়ে দিয়ে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে তা করতে হয়। কিন্তু সমাজের মাটিতে বৃহৎ সংঘগুলো রাষ্ট্রের মতই আদিম আদিবাসী। রাষ্ট্র তাদের স্বীকৃতি দেবে কি দেবে না এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবার তার কিছু নেই। মেটল্যাণ্ড বলেছেন, যেসব সংঘ সমষ্টিগতভাবে কাজ ক'রে চলেছে তাদের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের অধিকার ও দায়িত্বকে রাষ্ট্র স্বীকার ক'রে নিতে কার্যত: বাধ্য; এবং তাদের নিয়মনিষ্ঠ স্বীকৃতির ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য তেমন কোন পার্থক্য জন্মায় না।

এখন কথা ওঠে, রাষ্ট্র তাদের স্রষ্টা না হ'লেও কি সমিতিগুলো থেকে শ্রেষ্ঠতর? রাষ্ট্র তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের কাজ কর্মের সীমারেখা নির্দেশ ক'রে দেয় এবং সীমালঙ্ঘন করতেও বারণ ক'রে দেয়। যখন তারা তাদের সীমা লঙ্ঘন করে তখন রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি-

১। এ সত্য আদালতেও স্বীকৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি যুক্ত রাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৩২১ নং নির্দেশ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি (লিন্ডলে ক্লার্ক এ শ্রম আইনকে সংবিধান-বহির্ভূত ঘোষণা করেন): 'এ বিষয়ে তর্ক উঠেছিল যে, সমিতিগুলো রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং চতুর্দশ সংশোধনী মোতাবেক তারা ব্যক্তি পর্যায়-ভুক্ত নয়; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা অপ্রমাণিত হয়'। (*Gulf C & S F.R. Co V Ellis (1897), 165 U.S. 150, 17 Sup. et 255*).

www.nagorikpathagar.org

মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ থেকে কি মনে হয় না যে, রাষ্ট্র তাদের প্রভুতুল্য ? রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী না হ'লে তার নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় বিধানের বাস্তব কাজ কি রাষ্ট্র সম্পন্ন করতে পারবে ? একমাত্র রাষ্ট্রেরই রয়েছে বাধ্যকরী ক্ষমতার অধিকার এবং এতে কি রাষ্ট্র ও সমিতির মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতাল দাঁড়ায় না ? এ আইনগত সত্য থেকে কি গভীর সত্যটি পরিস্ফুট হয় না যে, সমিতিগুলো হল আংশিক স্বার্থের বাহক আর রাষ্ট্র হ'ল মানুষের সার্বজনীন স্বার্থের অভিভাবক, ধারক ও বাহক ?

এটা সত্যি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর উত্তর দেবার পূর্বে আমাদের আইনগত দিক থেকে সামাজিক বাস্তবতার দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র অন্যান্য সমিতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে না। তাদের লক্ষ্য বা কার্যপদ্ধতিও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ; রাষ্ট্র তাদের সীমানা নির্ধারণ করে এবং এক সাধারণ ব্যবস্থায় তাদের অন্তরীণ রাখে। তাদেরকে রাষ্ট্র নিজের অধীনস্থ কোন সংস্থা ব'লে মনে করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সংঘ অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র কোনটির প্রতি বিশেষ নজর দেয় না। কোন ট্রেড ইউনিয়নকে 'ওখানে যাও', কোন নিয়োগকারী সংস্থাকে 'এখানে এস' বা চার্চকে 'ওটা কর, প্রভৃতি কোন নির্দেশ রাষ্ট্র দেয় না। এগুলোই হল চরম সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং রাষ্ট্র এগুলো প্রয়োগ করে না। এটা সত্যি যে, রাষ্ট্র সাধরণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ; কিন্তু সে সাধারণ স্বার্থ রাজনৈতিক প্রকাশের মত যথেষ্ট পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ হ'লে বা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের যোগ্য হবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট হ'লে, তা সাধারণ স্বার্থের আওতায় পড়ে। এটা সত্যি যে, রাষ্ট্র সাধারণ কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে ; কিন্তু এটাও সত্যি যে, সমগ্র সাধারণ কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব রাষ্ট্র করে না। প্রথার মধ্যেও সাধারণ কল্যাণ নিহিত ; কিন্তু রাষ্ট্র তার সংরক্ষণ করে না। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মত বিষয়েও রয়েছে সাধারণ কল্যাণ এবং তা যেমন নিভর করে বিভিন্ন সংঘের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের উপর ; তেমনি নির্ভর করে রাষ্ট্রের সাধারণ কজ কর্মের উপর। সাধারণ কল্যাণ কোন সহজ সাধ্য লক্ষ্য নয় যে, কোন স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা তা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়। হাজারো সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংঘের আংশিক কাজকর্ম ও সাধারণ কল্যাণের অংশ বিশেষ।

আমরা এটাও স্বীকার করি না যে, বিভিন্ন সংঘের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সাথে গভীরভাবে জড়িত ও অন্তরঙ্গ স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ স্বার্থ মানুষের আনুগত্যে গভীর ও উচ্চ আবেদন সৃষ্টি করে। এজন্য বলা যায়, চরম সার্বভৌমত্বের মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রে কার্যকর হ'লে বহুমুখী সংস্কৃতি সম্পন্ন সামাজিক জীবনের পক্ষে তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঐক্য নীতিকে টেনে নিয়ে গেলে তা হবে দ্বিধাবিভক্তির নীতি। রাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে সামাজিক ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সে এমন এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সমাজিক মানুষের সাধারণ প্রয়োজন ও সাধারণ প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটায়। কোন আনুগত্যই এমন প্রয়োজনীয় নয় এবং কোনটিই এমন স্থায়ী হ'তে পারে না। লক্ষ্য বছরের সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে তা মানুষের প্রবৃত্তির এক ঠাসবুনোনীতে পরিণত হয়েছে। এ অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষ একদিকে যেমন বাধ্যকরী ক্ষমতার সে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছে, তেমনি সে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমারেখাও মানুষ আবিষ্কার করেছে। এর ফলে রাষ্ট্র শুধু যে ক্ষমতা লাভ করেছে তা নয়, ক্ষমতার অনুপাতে রাষ্ট্রের হাতে কাজকর্মের দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছে, এবং এ দায়িত্ব হ'ল তাদের অন্যতম; যার জন্য মানুষ নিজেরা সমাজ জীবনে সুসংহত হয়েছে; রাষ্ট্র ও ক্ষমতার উৎসে রয়েছে সামাজিক মানুষের সদিচ্ছা। শেষ পর্যায়ে এখান থেকেই রাষ্ট্র তার ক্ষমতার সত্তার লাভ করে। রাষ্ট্র মানুষের অধিকার সৃষ্টি করে; কিন্তু মানুষই প্রথমে রাষ্ট্রের অধিকার সৃষ্টি করেছে। যথার্থই বলা হয়েছে যে, "তার সদস্যদের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা সদস্যদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল। রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করে; কেননা ব্যক্তিই প্রথমে রাষ্ট্রকে সে ক্ষমতা প্রয়োগে অনুমতি দিয়েছে। রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগে সমর্থ হ'লেও সম্প্রদায়ের উপর বল প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে যেসব সমিতি রয়েছে, তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ করতে পারে; যদি নাগরিকরা রাষ্ট্রের হাতে সে ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী হয়।[১]

১। এ. ডি. লিণ্ডসের (*A. D. Lindsay*) *The State in Recent Political Theory* প্রবন্ধ—১৯১৪—খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে *Political*

www.nagorikpathagar.org

এখন আমরা অবশিষ্ট প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করি : রাষ্ট্র নিজেও কি একটা সমিতি ? রাষ্ট্রের কি কোন আইনগত দায়িত্ব নেই ? তার সদস্যরা তার বিরুদ্ধে কি কোন অধিকার দাবী করতে পারে ? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সম্পত্তির মালিক হিসেবে তার অধিকার অন্যান্য সম্পত্তির মালিক-দের অধিকারের দ্বারা কি সীমিত ? প্রশ্নটা প্রথমে অর্থহীন মনে হবে। রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার আইনে কিভাবে আবদ্ধ হবে ? আইন যদি রাষ্ট্রের নিছক নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্র কোন ক্রমেই আবদ্ধ হ'তে পারে না। কিন্তু আসলে আইনের মহান গ্রন্থে রাষ্ট্র শুধু কতক-গুলো নতুন বাক্য লিখতে পারে এবং এখানে ওখানে কিছু পুরোনো বাক্য কেটেছেঁটে দিতে পারে। গ্রন্থের বেশীর ভাগ রাষ্ট্র কর্তৃক আদৌ লিখিত হয় নি, এবং সে অংশের নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে রাষ্ট্র নিজেই আবদ্ধ। অবশ্য কালে কালে রাষ্ট্র তার কিছু পরিবর্ধন করতে পারে বটে। মানুষ যেমন তার দেহের পুনর্গঠনে সক্ষম হয় না, তেমনি কোন সময়ে কোন রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে তার আইনকে পুনর্গঠিত করতে পারে না। বহু যুগের সাধনায় যে কাঠামো গ'ড়ে উঠেছে, তাই তার বর্তমান কাজ-কর্মকে নির্ধারিত করে এবং সীমিত করে। ক্র্যাবে যে যুক্তি জোরেসোরে প্রচার করেছেন, এ অর্থে তার সত্যতা অনস্বীকার্য। তিনি বলেছেন যে, আইনের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অপেক্ষা অনেক প্রবল।[১] আইন রচয়িতা অপেক্ষা আইনের সরকারী অভিভাবক হিসেবেই রাষ্ট্র সমধিক পরিচিত। রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হ'ল আইনের প্রশাসন বজায় রাখা। এর অর্থ হ'ল, রাষ্ট্র নিজেও আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং যে আইনকে রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে তার মূল্যবোধের বন্ধনে নিজেও আবদ্ধ।

যে আইন রাষ্ট্র কার্যকরী করে, সে তার আওতা বহির্ভূত থাকলে রাষ্ট্রের কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে পড়বে—তা ভেঙ্গে পড়বে। অন্যান্য সমিতির মত রাষ্ট্রও যদি তার কোন প্রতিনিধির কাজের জন্য আইনের চোখে দায়িত্বশীল না হয়, তা হলে আইনের সার্বজনীনতার ভয়ঙ্কর এক ছেদ

Quarterly পত্রিকায় প্রকাশিত। সত্যি বলতে কি, এসব সমিতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রয়েছে বলা ঠিক নয় ; বরং বলা যেতে পারে যে, তারা রয়েছে সম্প্রদায়ের ভেতর। আসলে আমাদের এটাই বলা উচিত যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ; শুধুমাত্র নাগরিক হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক মানুষ হিসেবে তাদের যে ইচ্ছা প্রকাশিত, তারই উপর রাষ্ট্র শক্তি প্রতিষ্ঠিত।

১। ক্র্যাবের (*Krabbe*) *'The modern Idea of the State'* গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

পড়বে এবং তার ফলে আইনের সার্বজনীনতা অস্বীকৃত হবে। কোন কোন সময় বিভিন্ন ছলাকলায় রাষ্ট্র আইনের প্রতি তার আনুগত্যের কথা স্বীকার করে। দয়া দাক্ষিণ্যের আকারে হ'লেও রাষ্ট্র আদালতের মাধ্যমে তার বা তার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি যেন সুবিচার পায়, তাও স্বীকার করে। এখন যা প্রয়োজন, তা হ'লে তার সমিতি সুলভ বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। ইংলণ্ডে যেমনটি হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিদের ক্ষতিকর কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে—তা নেহাত হাস্যকর। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের যথার্থ সার্বভৌমত্ব কোন অংশে ক্ষুণ্ন করে না; বরং আমরা আইনের সার্বভৌমত্ব ব'লে যার আখ্যা দিই এতে তারও সার্থকতা আসবে।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমিতির যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা রাষ্ট্রের রয়েছে। রাষ্ট্র সাথে আইনের সম্পর্ক সংক্রান্ত যে তত্ত্বগত অসুবিধা রয়েছে অর্থাৎ একমাত্র রাষ্ট্রেরই যে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে, রাষ্ট্রের একটা বাস্তববাদী ব্যাখ্যার দ্বারা সে অসুবিধার মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যদি অকপটে স্বীকার করি যে, রাষ্ট্র এক ধরনের সংগঠন মাত্র; এবং সম্প্রদায়ের মত বৃহত্তর এক শক্তি দ্বারা তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, যদিও নিজের আওতায় তার ক্ষমতা চূড়ান্ত, এবং প্রত্যেকটি সংগঠনই সম্প্রদায়ের এক এক দিকের প্রকাশ মাত্র; তবে অসুবিধা দূর হয়।

www.nagorikpathagar.org

ষোড়শ অধ্যায়

রাষ্ট্রের পুনর্ব্যাখ্যা

এক : সম্প্রদায়ের একাংশ হ'ল রাষ্ট্র

আধুনিক কালের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে উভয় সংকট দেখা দিয়েছে, শেষ অধ্যায়ে তার কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আমরা দেখিয়েছি, রাষ্ট্রকে অন্যতম সংঘ হিসেবেই যে শুধু গণ্য করতে হবে তা নয়; কার্যতঃ তার কার্যক্রমের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাকে একটি সমিতি হিসেবেও গণ্য করতে হবে। রাষ্ট্র কল্যাণ সাধনে রত; তাই তার নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রয়েছে। সে ধনী, তাই তার মালিকানার অধিকার রয়েছে। প্রভুত্বব্যঞ্জক দান খয়রাতের মত নয়, বরং সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করে এবং এ ব্যাপারে তার দায়িত্বও রয়েছে। একজন ভৃত্য তার প্রভু থেকে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠতর নয়। অন্যান্য অধিকার যেমন কাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কাজ কর্মের দ্বারা সীমিত, রাষ্ট্রের অধিকারও তাই সে দিক থেকে সীমিত হওয়া উচিত। অধিকার নিশ্চিত করবার দায়িত্ব হ'ল রাষ্ট্রের। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তার কিছু কিছু ক্ষমতার প্রয়োজন এবং রাষ্ট্র সে ক্ষমতা লাভ করেছে। তার এ দায়িত্ব যেমন সীমিত, তেমনি তার ক্ষমতারও সীমরেখা থাকা উচিত। তার নিজস্ব প্রকৃতি ও তার প্রতিনিধির ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমিত। তার নিয়ন্ত্রণাধীনে যেসব নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে, তার আলোকে এবং তার প্রতিনিধির কাজকর্মের অভিজ্ঞাতর ভেতর দিয়ে আমরা তার ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারি। অন্যান্য সংস্থারও যেমন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, রাষ্ট্রও তার উর্ধ্বে নয়।

কিন্তু সে উভয় সংকট এ ক্ষেত্রে আবার দেখা দেয়। যে ক্ষমতা অধিকার নির্ধারণ করে, তা নিজে দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিরূপে? যে একটি মাত্র সংস্থার বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে, তা নিজে নিয়ন্ত্রিত হয় কিরূপে? রাষ্ট্র যদি চূড়ান্ত কোন কর্তৃপক্ষ না হয়, তবে অন্যটি

www.nagorikpathagar.org

হবে কিভাবে ? আর যদি কোনটিই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী না হয়, তবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কিভাবে হতে পারে ? রাষ্ট্র যদি এ ক্ষমতার অধিকার না হয়, তবে প্রত্যেক সংঘের স্থান নির্দিষ্ট করবে কে ? কে তার সীমানা নির্ধারণ করবে ? রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বোচ্চ না হলে আইন কিভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে ? আবার অন্যান্য সংঘগুলো রাষ্ট্রের সৃষ্টি নয়। তাদের রয়েছে নিজস্ব ক্ষমতা ও নিজস্ব কর্মক্ষেত্র। এ নিশ্চিত সত্যটি সত্ত্বেও রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয় কিভাবে ?

আমরা শেষ বারের মত যদি আইনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাই, তবে তার উত্তর পেতে পারি। আইন ও প্রথার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার দিকে আমরা মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি দি, তবে দেখব এমন অনেক প্রথা রয়েছে যা রাজনৈতিক আইনের মত অত্যন্ত সাগ্রহে পালিত হচ্ছে। প্রথাগুলো সংরক্ষণ করছে সম্প্রদায় নিজেই, কোন সংগঠনের সাহায্যে বা কোন আইনের দ্বারা তা সংরক্ষিত হচ্ছে না। অন্যদিকে, আইন সংরক্ষিত হচ্ছে রাষ্ট্রের দ্বারা। শেষ পর্যায়ে উভয়ই একইভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে ; কেননা তা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের দ্বারা চালু রয়েছে। শেষপর্যায়ে তারা উভয়ই হ'ল সামাজিক বোধ, সংহতিবোধ এবং সাধারণ কল্যাণ বোধের প্রকাশ মাত্র। এ বস্তুনিরপেক্ষ সত্যে আমরা সামাজিক ঐক্যের মূল সূত্র খুঁজে পাই। রাষ্ট্রে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র হ'ল অন্যতম এক বিকাশ ; যার মাধ্যমে সে ঐক্য প্রকাশিত। এ ক্ষেত্রে আমরা মূল্যবোধের এক জগতে এসে পড়েছি। এবং তার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তা অনুভূত হতে হবে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সব রকম বস্তুনিষ্ঠ মূল্যবোধ ও তাদের ধারক ও বাহক প্রতিষ্ঠান ও সংঘগুলো বস্তুনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত মানুষদের কাছ থেকে লাভ করে প্রাণবায়ু ও অনুপ্রেরণা, তেমনি সমাজের সমগ্র ক্ষেত্রে সব রকম সামাজিক সম্পর্কের মূলে রয়েছে সামাজিক মানুষগুলোর বস্তুনিরপেক্ষ জীবনবোধ। স্বীকৃত বা অনুভূত সংহতির গুরুত্ব অনুযায়ী তারাই সৃষ্টি করে রাষ্ট্র, চার্চ, শ্রমিক সমিতি এবং নিয়োগকারীর সংঘ। রাষ্ট্রের কি করা উচিত বা কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করে তারাই এবং প্রত্যেক সংঘের কার্যক্রমের সীমারেখা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তারাই নির্ধারণ করে। সম্প্রদায়ই হ'ল এসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমি। সম্প্রদায় কোন সংগঠন নয় ; বরং তা হ'ল সংগঠনের উৎসস্থল। কোন সংগঠন বা কোন সরকারই সামাজিক

www.nagorikpathagar.org

ঐক্যের নিরাপত্তা দেয় না। চূড়ান্ত ঐক্য নিহিত রয়েছে মানুষের সংহতি-বোধে—রাষ্ট্রের ক্ষমতায় নয়। প্রতিরোধকারী বা বিভাগকারী স্বার্থের চেয়ে সাধারণ স্বার্থ যে অনুপাতে বেশী, সে অনুপাতে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ একটা সামাজিক প্রাণী এবং মানুষ এ সত্য যত বেশী অনুভব করে, সমাজে শৃঙ্খলাবোধ ততবেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অনুভূতির মধ্যেই রয়েছে ঐক্যের রহস্য।

রাষ্ট্র যেন সমাজ জীবনের উচুঁ সড়ক। তার দু'ধারে রয়েছে নগর ও মাঠঘাট। এ সাধারণ ব্যবস্থা সকল সেবায় নিয়োজিত। রাষ্ট্রের সহায়তায় জীবনের কাজকারবার পরিচালিত হয়। যারা রাষ্ট্রের সেবা গ্রহণ করে, তাদেরকে এর অস্তিত্বের জন্য কাজ করতে হয়। এ হ'ল সবরকম সামাজিক যোগাযোগের ভিত্তিমূল। সুতরাং মানুষের পদমর্যদা যাই হোক না কেন, হয় সে হবে রাষ্ট্রের সদস্য, না হয় হবে রাষ্ট্রের অনুগত। সে রাষ্ট্রের দায়িত্বে অংশীদার না হ'লে অন্ততঃ তাকে রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। কোন মানুষ কিন্তু রাষ্ট্রের সড়কে বাস করে না, বা রাষ্ট্রের জন্যও তার জীবন নয়। তার বাসস্থান হয় কোন মাঠে-প্রান্তরে, না হয় কোন নগরে এবং সেখানেই সে তার শ্রমের ফল কুড়িয়ে নেয়। অতীতের সহজ ও সরল দিনে যখন রাষ্ট্ররূপী উচুঁ সড়কের আশেপাশে মাত্র কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ী ছিল, তখন মানুষ বলত যে, সব কিছু মিলিয়ে ছিল তাদের ঘর-সংসার। এ ভাবে সড়কের নিয়ম-কানুন অত্যাচারের ভয়াবহ একরূপ ধারণ করে; কেননা তার অভিভাবকেরা মানুষের সমগ্র জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দাবী জানিয়েছিল। তবে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে মানুষ তার সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করে। এখন তারা শিখেছে যে, সে উচুঁ সড়কের যত্ন নেবার দায়িত্ব তাদের কাছে বটে; কিন্তু এমনি বিশ্বজনীন দায়িত্ব সমগ্র জীবন নয়। নগর ও মাঠ প্রান্তর বিস্তৃত হয়ে বহু দূরে সরে গেছে। তাই সমাজ জীবনের বিভিন্ন ধরনের বহু সদস্য পদের জন্ম হয়েছে, এবং রাষ্ট্রের সদস্যপদের মধ্যে জীবনের সব কিছু খুঁজে পেতে সকলে আজ অস্বীকার করে।

অবশ্য আজও রাষ্ট্রে সদস্যপদ সব কিছু শর্ত হিসেবে টিকে রয়েছে। রাষ্ট্রও লাভ করেছে পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি। এবং লক্ষ্যের পন্থা তাতে মূর্ত হয়ে উঠছে। সে উচুঁ সড়কও হয়েছে বহু প্রশস্ত ও প্রয়োজনীয়। এখন এইটেই হয়েছে এক পন্থা; যার মাধ্যমে সমাজজীবনের বড় বড় সংঘ ও

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রগুলো পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে ও সামগ্রিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু এজন্য অভিভাবকত্বে তার পুরোনো দাবীকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার কোন কারণ নেই, যাতে জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। সে সড়ক হ'ল জীবনের একটা পন্থা মাত্র। অবশ্য সে মিথ্যা দাবীকে একেবারে নস্যাৎ ক'রে তার চরম পর্যায়ের বিরোধী দাবীকে মেনে নিয়ে সব কেন্দ্রকে স্বতন্ত্র ক'রে দেবারও তেমন কোন যুক্তি নেই। বৃহত্তর সম্প্রদায়টি এখনও সম্প্রদায়ই রয়েছে এবং উঁচু সড়কটি এখনও প্রধান সড়ক হিসেবে কার্যকর রয়েছে।

প্রত্যেক সভ্য মানুষকে হয় রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবে, না হয় তার অধীন-অনুগত প্রজা হিসেবে থাকতে হবে; কেননা সকলেই হ'লেন কোন না কোন সম্প্রদায়ের সদস্য এবং তার বাহ্যিক সামাজিক পরিবেশে সমান-ভাবে অংশীদার।[১] এ অর্থে রাষ্ট্র তার আয়তনের দিক থেকে বিশ্বজনীন, যদিও সে কারণে তার কার্যক্রমও অদ্ভুতভাবে সীমিত। আদর্শগত দিক থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্গত হ'ল সব জায়গার সব লোক, এবং যদি সব রাষ্ট্র মানব সমাজের মত বিস্তৃত এক সার্বজনীন ব্যবস্থার অংগী-ভূত না হয়, তবে রাষ্ট্রের লক্ষ্যও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থকতা লাভ করে না। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সম্মতির মাধ্যমে এ ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করতে পারে;

১। রাষ্ট্রের সদস্যপদ ও অন্যান্য সংঘের সদস্য পদের মধ্যে বিদ্যমান এ পার্থক্যকে সাধারণভাবে বিভ্রান্তিকর উপায়ে তুলে ধরা হয় এবং তা থেকে ভ্রান্ত নীতি উদ্ভাবন করা হয়। নর্মান ওয়াইল্ড নামক সাম্প্রতিককালের একজন লেখক তাঁর সুলিখিত গ্রন্থে—'*The Ethical Basis of the State*'—মন্তব্য করেছেন যে, 'সকল মানুষই হ'ল রাষ্ট্রের সদস্য; কিন্তু সকলে কোন সংঘের সদস্য নয়' (পৃষ্ঠা—১৩৫)। সকলেই কোন না কোন রাষ্ট্রের অধীন; কিন্তু সকলে কোন না কোন সংঘের সদস্য নয়। তাছাড়া সকল মানুষ পরিবারের সদস্য এবং সকলেই কোন না কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত; যদিও সে ব্যবস্থার মত ব্যাপক কোন সংঘ নেই। লেখক আরও বলেছেন যে, "রাষ্ট্র বহুর মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়; বরং তাদের সবার ভিত্তিস্বরূপ"। যদি আমরা 'প্রতিষ্ঠানে'র পরিবর্তে সংঘ ব্যবহার করি, তবে তা অনেকাংশেই সত্য; কিন্তু এ বক্তব্য সমানভাবে পরিবার ও আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক সংঘের বেলায়ও খাটে। রাষ্ট্র যেমন নিজের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি অন্যান্য সংঘগুলোও স্ব স্ব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। আবার যদি রাষ্ট্র আমাদের সমাজিক জীবনে অপরিহার্য হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য সংঘও তেমনি অপরিহার্য।

www.nagorikpathagar.org

যদি প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তাঁর উচুঁ সড়কের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। কিন্তু সুসমঞ্জস রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এক ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থার, এবং সর্বজনস্বীকৃত এ সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্যরাজি। এ ঐক্যের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের মৌলিক পার্থক্যগুলো তাদের যোগ্যস্থান লাভ করবে। কিন্তু আসলে তা না হয়ে এ পার্থক্যগুলোকে অনেক বড় ক'রে তুলে ধরা হয়; কারণ তারা মানবতা তথা সাধারণ সামাজিক প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যগুলোকে উপেক্ষা করে। তাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, যদি সকল মানুষ একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়; তবে প্রয়োজনের তাগিদে সকলে বৃহত্তর এক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং সীমাহীন আইনের শাসনাধীনে আসবার সুযোগ পাবে।

এ যুক্তি বহুত্ববাদী সমাজের মতবাদ বিরোধীও বটে; যেখানে বৃহৎ বৃহৎ সংঘগুলো তাদের নিজের লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী হবে এবং ফলে যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে, তারই প্রভাবে তাদের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আমরাও বলেছি যে, রাষ্ট্র বৃহৎ সংঘগুলোর অন্যতম এবং তার অদ্ভুত দায়িত্ব হ'ল, সমগ্র সামাজিক সম্পর্ক গুচ্ছে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করা। অন্য সংঘগুলো যেমন সার্থকভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করে, রাষ্ট্রও তেমনি নিজের সর্বাত্মক ক্ষমতা জাহির না ক'রেও তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। কোন কোন সময়ে রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, এবং প্রত্যেকটি মানবীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে এ ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সফলতা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী। শেষ পর্যন্ত সে সফল হয়; কেননা রাষ্ট্র নিছক নিজের অধিকারে কাজ করে না। তাছাড়া, রাষ্ট্র হ'ল সমাজের একটা শাখা এবং এক বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য সমাজে তা কার্যকরী রয়েছে। সুতরাং অন্যান্য সংঘের সদস্যগণসহ সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে এবং তার মূলে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

বিভিন্ন সংঘের মধ্যে যেসব সংঘর্ষ দেখা দেয়, তা ভাবলে আমরা এটা বুঝতে পারব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা চার্চ ও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়নের কথাই বলি। কিন্তু একটা চার্চের সাথে অন্য একটি চার্চের মধ্যে যে সংঘর্ষ বা একটা ট্রেড ইউনিয়ন ও একটা নিয়োগকারী

www.nagorikpathagar.org

সংস্থার মধ্যে যে সংঘর্ষ, রাষ্ট্রের সাথে তাদের সংঘর্ষের ব্যাখ্যা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন সংঘের মধ্যে যে সংঘর্ষ, তাতে রয়েছে দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব। নির্দিষ্ট সংঘগুলো সংঘ হিসেবে একে অপরের লক্ষ্যকে অস্বীকার করে ও তার বিরোধিতা করে। অবশ্য সে লক্ষ্য-গুলো হ'ল নির্দিষ্ট, এবং সেসব দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা অক্ষত থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে অন্য একটি সংঘর্ষে লিপ্ত হ'লে তখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টিয়ে যায়। তখন তা শুধুমাত্র দুটো সুস্পষ্ট সংঘের সংঘষ বা দু'রকম সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বে সীমিত থাকে না। 'উদাহরণ-স্বরূপ, আমরা স্কটল্যাণ্ডে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা 'কাল্চার ক্যাম্পের' কথা উল্লেখ করতে পারি। এগুলো ছিল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব; কেননা যারা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তারা ছিলেন নাগরিক। প্রথমত:, এটা চার্চের আভ্যন্তরীণ বিরোধও বটে। দ্বিতীয়ত:, রাষ্ট্র ও চার্চের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত বিরোধও বটে; কেননা তা ছিল ক্যাথলিক চার্চের দাবী গ্রহণ-কারী ও তা প্রত্যাখ্যানকারী নাগরিকদের মধ্যে মতবিরোধ।

সত্যি কথা বলতে কি, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে কোন বিরোধ বাধতে পারেনা। সরকার বা সংখ্যাগুরু নাগরিকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দাবী অন্যান্য সংঘের দাবীর বিরোধী হ'তে পারে। কিন্তু এ হল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, এবং এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকত্বের সাধারণ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সে এ শিক্ষা পায়, যাতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংঘের স্ব-শাসন নীতি কোনভাবে ব্যাহত না হয়, এবং তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দাবীর পরিমাণও কমে আসে।

সুতরাং এভাবে রাষ্ট্র মিলনের সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু তার জন্য রাষ্ট্র গণতন্ত্রমুখী বিবর্তন সম্পূর্ণ হ'তে হবে। এজন্য আমরা গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের যথার্থরূপ হিসেবে বর্ণনা করতে পারি, এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার যথার্থ কর্তকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। ঐতিহাসিক দিক থেকে রাষ্ট্রের স্বার্থ শাসক বা শাসক শ্রেণী, সামরিক শ্রেণী বা ভূমির মালিক গোষ্ঠীর ধনিকতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের সাথে একাত্মবোধ স্থাপন করেছিল। এ আকারে রাষ্ট্র ছিল বিশিষ্ট এক শ্রেণীর সংগঠন, এবং রাষ্ট্র সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না করে এক বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের ধারক ও বাহক ছিল। ভূমি আইন, কোন প্রতিবন্ধক সংক্রান্ত আইন বা শ্রমিক

www.nagorikpathagar.org

বিরোধী আইনসমূহ যা রাষ্ট্র এতদিন প্রয়োগ করেছে, তা আইনের সার্বজনীনতা বিরোধী ছিল ; কেননা সেগুলো কোন সাধারণ স্বার্থ অর্জনের জন্য পরিচালিত হয় নি। রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটে আইনের মৌলিক প্রকৃতির মাধ্যমে।

দুই : সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত চিন্তা

আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে পড়েছি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা আইন প্রণেতা বা সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়, কি তারা করতে পারে বা কি করতে পারেনা। প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধানে এসব নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অস্পষ্টরূপে অনেক বিষয়ই সুসংহত কর্তৃত্বের আওতার বহির্ভূত রাখা হয়েছে। বিশেষ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে যখন পাঁচ বছরে সেখানকার আদালত তিনশো সতরটি সাধারণ আইনকে অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে সত্তরটি আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ব'লে ঘোষণা করতে পেরেছেন ; তখন নিশ্চয়ই সার্বভৌমত্বের নীতিকে আর অতীতের ভাবধারায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।[১] অন্যদিকে যে কর্তৃপক্ষ এসব আইনকে 'সংবিধান বহির্ভূত' ব'লে ঘোষণা করতে পারেন তাঁরাও এসব আইন প্রণয়ন করতে অক্ষম। কোন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ এসব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন আনতেও পারে না। এক্ষেত্রে কোন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ থাকলে তার 'না-সূচক' নির্দেশ থাকতে হবে, এবং আসলে এ কর্তৃত্ব চরম নয় ; কেননা তা নিজের নামে বা নিজের অধিকারে কিছু করে না।

এখন প্রশ্ন ওঠে, কার নামে এ ক্ষমতার প্রয়োগ হয় ? এ ক্ষমতা সরকার বা দল বা সংখ্যাগুরুর নামে প্রয়োগ হয় না। তা হয় মৌলিক আইনের নামে, এবং মৌলিক আইন তাদের যে কোনটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতর ; কেননা সে ক্ষমতাই রাষ্ট্র গঠন করে। ঐতিহ্যবাদীরা অনির্দিষ্ট ও অস্ফুট রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আরোপ ক'রে তাদের তত্ত্ব সংরক্ষণ করবার বৃথা চেষ্টা করেন, এবং বলেন যে,

---

১। পাউণ্ডের (*Pound*) *American Law Review*—জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী—১৯১০।

www.nagorikpathagar.org

বেশ কিছুদিন নিষ্কর্ম থেকে এ ইচ্ছা হঠাৎ জাগ্রত হয় ও মৌলিক আইনে পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু এটাও সত্যি যে, এমন বিশৃঙ্খল ইচ্ছায় সার্বভৌমত্বের কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। একে আমরা রাষ্ট্রের ইচ্ছা না ব'লে বরং সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ব'লে বর্ণনা করতে পারি। সাধারণ ইচ্ছা, যার ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের একটা সংস্থা হিসেবে ভিত্তি পত্তন হয়। তার কোন প্রতিনিধির কোন কাজ সাধারণ ইচ্ছা করবার প্রয়োজন নেই, এবং তার শাসন করবার প্রয়োজনও নেই, তার দ্বারা শাসন কাজও সম্ভব নয়। এটা সার্বভৌমও নয়; কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা কাজ না করলেও কোন সময় ঘুমিয়ে থাকে না। সব সময় তা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে এবং রাজনৈতিক বিভাগ থেকে গভীরতর রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। কোন সংকটকালে রাষ্ট্রের ভিত্তি পুনর্গঠন করবার জন্য তা এক বিশেষ সংস্থার নিয়োগ করে। কোন কোন সময় অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পরিবর্তন সাধন করা হয়। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা হ'ল রাষ্ট্রের জন্য ইচ্ছা, তা রাষ্ট্রের ইচ্ছা নয়। তাই এসব পদ্ধতির যতই গুরুত্ব থাক না কেন, সেগুলো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সেগুলো হ'ল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তারা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য রয়েছে।

এ ব্যাখ্যা আধুনিক সংবিধানের ভাষা ও মর্মবাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা সরকারের উপর কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করে না; বরং রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব আরোপ করে।[১] রাজনৈতিক ক্ষমতা কি করতে পারে বা তার প্রয়োগ কি ভাবে হবে, তারা তারই নির্দেশ দেয়। তারা ঘোষণা করে যে, সমস্ত ক্ষমতা উদ্ভূত হয়েছে জনগণ থেকে বা সম্প্রদায় হ'তে। যেগুলো ব্যক্তির প্রাকৃতিক বা অলঙ্ঘনীয় অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে ঘোষিত। তা হ'ল নাগরিকদের সাংবিধানিক বা আইনগত অধিকারের পূর্বের সৃষ্টি। তাই দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দশ সংশোধনীতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন অংগ রাষ্ট্র আইনের পদ্ধতি ব্যতীত বা আইনের সমান সংরক্ষণমূলক দায়িত্ব ছাড়া কোন নাগরিককে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির

১। ১৯১৯ সনের জার্মান সংবিধান এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্যগুলোর মধ্যে ১১৯ নং ধারা দ্রষ্টব্য: 'পরিবারের সততা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ পরিচালনা করা হবে রাষ্ট্র ও মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বে'

www.nagorikpathagar.org

অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। সেখানে আরও ঘোষিত হয়েছে যে—জাতি, কুল বা সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নাগরিক ও অনাগরিক কতকগুলো অধিকার উপভোগ করতে পারবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, চাকুরীর অধিকার, সংঘবদ্ধ হবার। অধিকার, ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার অধিকারের মত কতকগুলো অধিকারের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্ব আরোপ করে বলেছে যে. তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাষ্ট্রের কর্তব্য। এসব প্রতিবাদ বা ব্যবস্থাপত্র নিষ্ফল হলে জনগণ বা জনসমষ্টি বা সাধারণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে।

এ গভীরতর ইচ্ছা, যা সম্প্রদায়ের ইচ্ছা নামে পরিচিত ও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তারও সমস্যা সম্পর্কে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। যে ব্যবস্থায় সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সংখ্যাগুরুর অধিক অনুমোদন প্রয়োজন হয়, সেখানে সংখ্যালঘুর 'বাতিলকরণের' সম্ভাব্য অধিকারের ত্রুটির কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। এ সত্যের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে যে, কতকগুলো মৌলিক নীতির মাধ্যমে সামাজিক মানুষের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। যখন কোন সংবিধানে ব্যক্তিত্বের কতকগুলো অধিকার সংরক্ষিত হয় তখন কোন আইনের মাধ্যমে এসব অধিকারকে রহিত করা উচিত নয়, এবং যে কোন সংখ্যাগুরুর উচিত, এদের সংরক্ষণ করা। অবশ্য কতকগুলো বিষয় রয়েছে যা অনেকটা নীতি নির্ধারণের বিষয়, এবং সংখ্যাগুরুর মতামতে এসব নীতি নির্ধারণ করা উচিত। আবার কতকগুলো বিষয় আছে যাদেরকে রাজনৈতিক আওতায় আনা উচিত নয়। যেভাবেই তাদের নামকরণ করি না কেন, কতকগুলো অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে যা মানুষ হিসেবে সকলের প্রাপ্য এবং কোন কর্তৃপক্ষের উচিত নয় মানুষকে সেসব অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সব মত-পার্থক্যকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত করা উচিত নয়; কেননা তা হ'লে রাষ্ট্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি এ বিচ্ছিন্নতাকে প্রতিরোধ করে। রাষ্ট্রের ঐসব বিষয় নির্ধারণ করা উচিত, যাদের সম্পর্কে সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে হবে। মানুষ এ সত্য অনুধাবন করলে তারা সার্বভৌমত্বের সঠিক সীমারেখা সম্বন্ধে অবহিত হবে। সংবিধান আকারে কোন

www.nagorikpathagar.org

কোন সময় তারা এ শিক্ষাকে স্থায়ীভাবে ধ'রে রাখে। কিন্তু এর সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ হ'ল সমাজ কি সে সম্পর্কে সকলের বাস্তব অনুভূতি এবং সামাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা। এ অনুভূতিই সংখ্যাগুরুকে তাদের মতামত প্রয়োগ থেকে বিরত রাখে ও সংখ্যালঘু অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়। যে ইচ্ছা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে, সে তার স্থান নির্দিষ্ট করতেও জানে।

উপসংহারে এ কথাও বলা যায় যে, সার্বভৌমত্ব হ'ল একটা সংঘের ইচ্ছা মাত্র; সম্প্রদায়ের ইচ্ছা নয়। রাষ্ট্রের হাতে একটা কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এবং সে দায়িত্ব পালনের জন্য যে পন্থার প্রয়োজন, তাও রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের উপর এ দায়িত্ব যিনি অর্পণ করেছেন ও তার পন্থা নির্দিষ্ট করেছেন, তিনি হ'লেন সমাজের অদৃশ্য শ্রেষ্ঠতম স্থপতি।

তিন: ঐক্য কোথায় অবস্থিত

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছি একটা প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটা ফলশ্রুতি বা একটা পরিণতি সম্পর্কে এবং অবশেষে তার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হ'তে গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠারূপ থেকে সৃজনশীল উৎসের দিকে যেতে হয়েছে। যখন তা অনুধাবনযোগ্য প্রকৃতি ছাড়িয়ে যায়, যখন জীবন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে উদ্যত হই; তখন আমাদের চিন্তাধারাও অসংগত হয়ে ওঠে। এ হ'ল বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলিত স্থান। এ যদি সম্ভব হ'ত, তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু আসলে তা সম্ভব নয়; কেননা তার উর্ধ্বে আমরা উঠতে না পারলে প্রতিষ্ঠান চরম আকার ধারণ করে এবং তা হয়ে ওঠে দমনমূলক। শেষ পর্যন্ত সৃজনশীল মননশীলতা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকটি সংগঠন যেন একটা বন্দীখানা, প্রত্যেকটি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা যেন একটা সীমারেখা এবং প্রত্যেকটি আশ্রয় যেন এক একটা প্রতিবন্ধক। অন্ধভাবে গ্রহণ করলে যেকোন প্রথা বিশ্বকে কলুষিত ক'রে ফেলতে পারে; এবং সে প্রথা ভাল হ'লে তা অতি দ্রুত গতিতে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে ফেলতে পারবে; কেননা তার দাবী হবে অনেক বেশী। মানুষ যা যা তৈরী করে তার মধ্যে মানুষের সত্তার প্রকাশ ঘটতেই হবে।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক প্রক্রিয়ায় এভাবে দুটি পথের উদয় হয়েছে। একটি হ'ল উন্মুক্ত পথ, যার ফলে প্রথা এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে না প'ড়ে ; বরং সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ অংশ থেকে ব্যাপকতর অংশে প্রবেশ করে। এভাবে সর্বত্র প্রচলিত প্রথার চাপ থেকে তা রক্ষা পায়। অন্যটি হ'ল আভ্যন্তরীণ পথ, যার ফলে প্রথাটি এক সংঘ থেকে অন্য সংঘে প্রবেশ করে ; যাতে কেউ এর সামগ্রিক আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না ; অথচ প্রত্যেক সদস্যই তার কিছু না কিছু অংশে অংশীদার হয়। ফলে সংঘের ভেতরে ও বাইরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ থাকে।

ঐক্যের সন্ধানে অবশেষে আমরা ব্যক্তির কাছে যেতে পারি। যেখানে অনেক অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করে, সেখানেও আমরা ঐক্য খুঁজে পেতে পারি। এ ঐক্য নিহিত থাকে প্রত্যেকের আত্মসন্ধানের মধ্যে এবং প্রত্যেকের প্রিয় লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে। আমরা এর সন্ধান পাই আত্মসমর্পণের মধ্যে নয় ; বরং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে, কোন বন্ধন বা চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থার মধ্যে নয় ; বরং প্রত্যেক মানুষের আত্মসচেতন মননশীলতায়। জোর ক'রে সৃষ্টি করা ঐক্য হ'ল অনিশ্চিত, অস্থায়ী। সামাজিক ব্যবস্থা শুধু যে ভাল হবে তা নয়, তাকে স্থায়ীও হ'তে হবে। এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের যেমন প্রকাশ ঘটবে তেমনি তা হবে মুক্ত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিও। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তিমূল স্বরূপ। এর ফলে সমাজের কাঠামো যেমন লাভ করবে জটিলতা, তেমনি লাভ করবে তা ক্ষমতা ; কেননা তার বৃদ্ধির মূলে রয়েছে সর্বসম্মত শ্রদ্ধা। জীবনের সীমাহীন দ্বন্দ্ব এর ভিত্তিকে স্পর্শ করেনা ; কেননা সমাজের উপর-ব্যক্তির নির্ভরশীলতা হ'ল চিরন্তন। যে অন্ধবিশ্বাস ও ভুল ধারণা শক্তির উপর নির্ভর করে এবং যা জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরায় তার সমাপ্তি ঘটে পরাভব ও সংকটের মধ্যে। সম্প্রদায়ের গভীর ঐক্য কোন শ্রেণী বা জাতির বৈশিষ্ট্য নয়, তা হ'ল মুক্ত ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং তা নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সমগ্র বিশ্বের সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করে।

রাষ্ট্রকে পর্যায়ক্রমিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার নিজস্ব সীমারেখার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হয়েছে। যখন সে মূলতঃ আত্মীয় ভিত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মলাভ করে তখন আত্মীয় গোষ্ঠীর সমগ্র সংগঠনে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রের আসল গুরুত্ব প্রকাশিত হয় নাগরিকত্বের মানদণ্ডে;

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয় বন্ধনের সংকীর্ণ সূত্রে নয়। আত্মীয় বন্ধন ছিল শুধুমাত্র এক সুবিধাজনক চক্র এবং তারই মধ্যে নাগরিকত্বের নীতির বিবর্তন হয়। বহু পরবর্তী পর্যায়ে যখন রাষ্ট্রীয় সংগঠনে জাতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তার সদস্যপদ এক জাতীয়তার সাথে একাত্মতা স্থাপন করে। কিন্তু জাতীয় চক্র ছিল সম্প্রদায়ের সুবিধাজনক এক কার্যক্ষেত্র এবং সেখান থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রের বিবর্তন শুরু হয়। এর মধ্যেও নাগরিকত্বের নীতিকে মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য ও অনধিকার দাবীর হাত থেকে মুক্ত করতে হয়। আজকের রাষ্ট্র কোন জাতির সংগঠন নয়; যদিও জাতির মধ্যে সব লক্ষ্যই কার্যকর রয়েছে। রাষ্ট্র হ'ল নাগরিকত্বের সংগঠন, এবং নাগরিকত্বের ধারণা জাতীয়তার ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। এখন বহু জাতীয়-রাষ্ট্র গঠনেরও প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। এ প্রক্রিয়ায় আরও অগ্রগতি হ'লে জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে তেমন আর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে না। অবশ্য বর্তমানে জাতীয়তা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। আত্মীয়তাবোধ যেমন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, জাতীয়তাবোধও তখন তেমনি একটা গুরুত্বহীন সামাজিক উপাদানে পরিণত হয়ে পড়বে, অথবা জাতীয়তার ধারণা নাগরিকত্বের প্রভাবশালী মতবাদের সাথে মিলে যাবে। উনিশ শতকে জাতীয়তার যে আবেদন ছিল, আজ আর তার সে আবেদন নেই। সুতরাং জাতীয়তাবাদ আসলে কি, এটা আজ বলা সত্যিই কষ্টকর।

তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রকেও শক্তিপ্রয়োগের হাত থেকে মুক্ত হ'তে হবে। এককভাবে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে বা সম্মিলিতভাবে সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটাই হ'ল ঐক্য অর্জনের পথে প্রধানতম প্রতিবন্ধক। রাষ্ট্রের উপর প্রয়োজন বলে সে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে; তাই তার মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে; যদিও তাকে যথার্থভাবে আইনের সার্বজনীনতার একটা শর্তরূপে গণ্য করা উচিত ছিল। স্বাধীনতার সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করার বদলে এ বলপ্রয়োগ দমনের এক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাই তা ঐক্যের রক্ষাকবচ না হ'য়ে পড়েছে বিচ্ছিন্নতার এক তরবারী। রাষ্ট্রের মধ্যে বলপ্রয়োগ অবশেষে হয়েছে গণ-শাসনের সর্বশেষ অভিভাবক। কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এখনও শক্তির প্রতীক।

এ ভয়ঙ্কর বিরোধ যদি রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে দূর হয়, একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তথা শৃঙ্খলা ও প্রগতির মহান কাজকর্মের মাধ্যমে যদি

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে তা মানব সম্প্রদায়কে অভূতপূর্ব পরিমাণে উপকৃত করবে। তা'হলে শক্তির দিকটা নিঃশেষ হয়ে সাধারণ স্বার্থবোধ আরও গভীর হবে। রাষ্ট্র তখন প্রয়োজনের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গভীর এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। মানবিক কাজকর্মের নিয়ত পরিবর্তন ও গতিশীলতায় রাষ্ট্র তখন নিয়ত ও নিরাপত্তার অটল শক্তি গ'ড়ে তুলবে। আমাদের স্বার্থপর প্রচেষ্টার অন্তহীন দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র তখন প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষের নোংরা সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করবে, এবং অসংখ্য কীর্তিকলাপকে স্থায়ী বন্ধনে আরও সুদৃঢ়ভাবে সুসংহত করবে। অন্যদিকে রয়েছে মানব চরিত্রের উজ্জ্বলতর যে দিক—মানুষের প্রতি মানুষের সহায়তা ও সহানুভূতি, তাদের দেশপ্রেমের যে অধ্যাত্ম্য সত্তা যা সমগ্র মানব ইতিহাসে কার্যকর থেকে তাকে করেছে মহীয়ান, এবং সহযোগিতার মহামন্ত্র যা সমস্যার অনুধাবনে হয়ে ওঠে আরও হৃদয়গ্রাহী, সে পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আরও উদ্বুদ্ধ হবে এবং আলোকোজ্জ্বল পথ-পরিক্রমায় এগিয়ে যাবে নতুন আলোর সন্ধানে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com